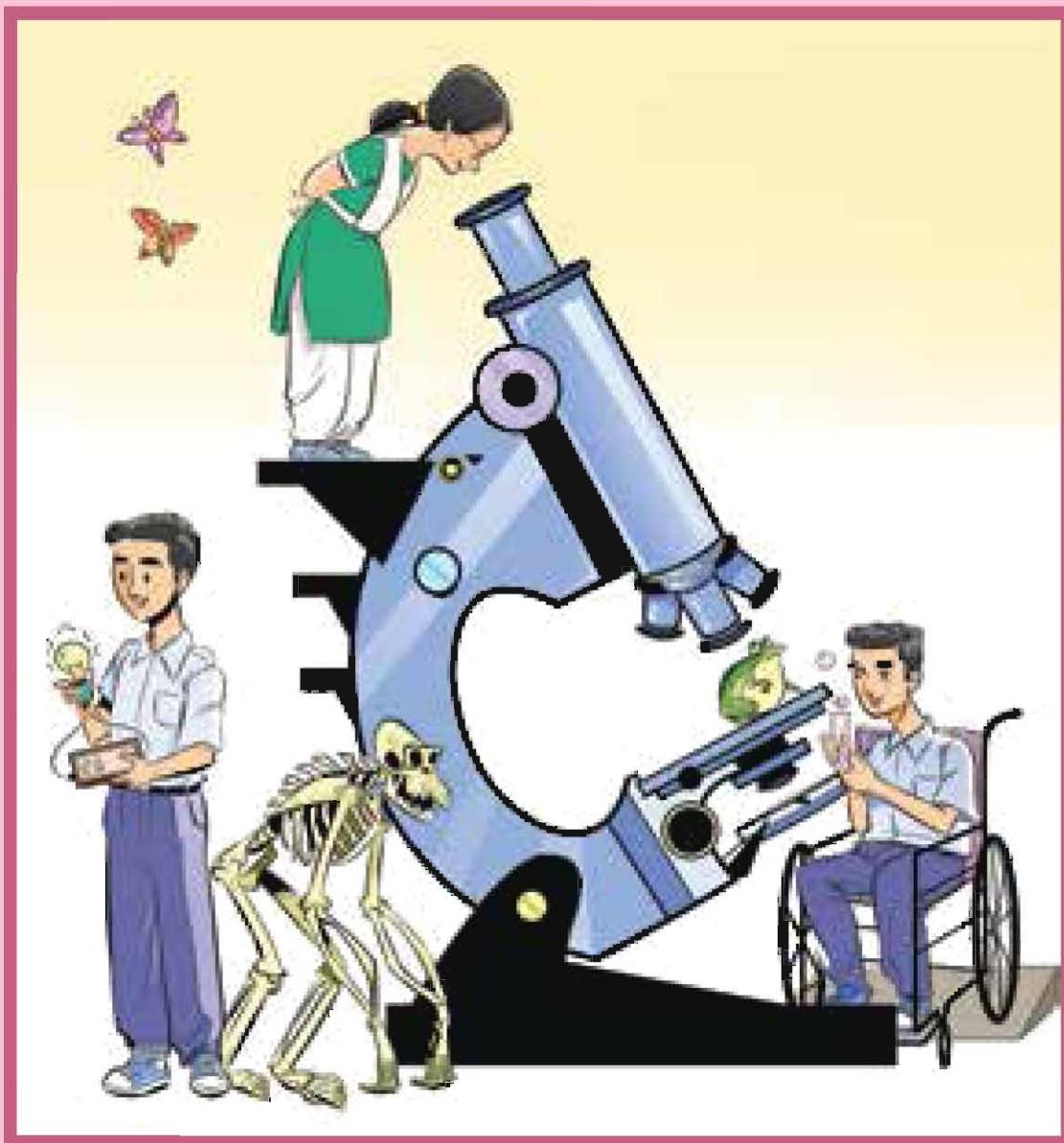


# বিজ্ঞান

## নবম-দশম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে  
নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

# বিজ্ঞান

## নবম-দশম শ্রেণি

সহজপাঠ্য, আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য করার জন্য পরিমার্জিত সংস্করণে

প্রয়োজনীয় সংযোজন, পরিবর্ধন, পুনর্লিখন ও সম্পাদনা

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল

ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ

### পূর্ববর্তী সংস্করণ রচনা

অধ্যাপক ড. শাহজাহান তপন

অধ্যাপক ড. সফিউর রহমান

ড. এস এম হাফিজুর রহমান

ড. মো. আব্দুল খালেক

### পূর্ববর্তী সংস্করণ সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. মো. আজিজুর রহমান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

# জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর, ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ২০১৭

পুনর্মুদ্রণ: , ২০১৯

প্রচ্ছদ: মেহেদী হক

চিত্রাঙ্কন: নাসরীন সুলতানা মিতু, মেহেদী হক

আলোকচিত্র: সাস্ট �SUPA ও সংগৃহিত

ফন্ট প্রণয়ন: মো. তানবিন ইসলাম সিয়াম

বুক ডিজাইন: মেহেদী হক, নাসরীন সুলতানা মিতু

পেইজ মেকাপ: মাহবুবুর রহমান খান

সমন্বয় ও সার্বিক সহযোগিতা: (পরিমার্জিত সংস্করণ) মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

## প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ির জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্গ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমর্যাদাবোধ জাহাজ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বিকাশ সাধন, সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলোর প্রতি শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করে তোলা। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের নিকট সহজবোধ্য ও আনন্দদায়ক করার লক্ষ্যে বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিকগুলোর পাশাপাশি হাতে কলমে কাজ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সূজনশীলতা, কল্পনা ও অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরণের কাজ দেয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে এবং বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা থেকে উত্তরণের প্রয়োজনীয় জীবনদক্ষতা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সক্ষম হবে। বিষয়টি শিক্ষার্থীদের কাছে সহজপাঠ্য, আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য করার জন্য ২০১৭ সালে পাঠ্যপুস্তকটিতে পরিমার্জন, সংযোজন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে।

বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশান্তি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

## সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	উন্নততর জীবনধারা	১-৩২
দ্বিতীয়	জীবনের জন্য পানি	৩৩-৫৬
তৃতীয়	হৃদযন্ত্রের যত কথা	৫৭-৮৪
চতুর্থ	নবজীবনের সূচনা	৮৬-১১৪
পঞ্চম	দেখতে হলে আলো চাই	১১৫-১২৮
ষষ্ঠ	পলিমার	১২৯-১৪৪
সপ্তম	অঞ্জ, ক্ষারক ও লবণের ব্যবহার	১৪৫-১৬৪
অষ্টম	আমাদের সম্পদ	১৬৫-১৮৩
নবম	দুর্যোগের সাথে বসবাস	১৮৪-২১১
দশম	এসো বলকে জানি	২১২-২২৯
একাদশ	জীবপ্রযুক্তি	২৩০-২৫১
দ্বাদশ	প্রাত্যহিক জীবনে তড়িৎ	২৫২-২৬৯
ত্রয়োদশ	সবাই কাছাকাছি	২৭০-২৯৪
চতুর্দশ	জীবন বাঁচাতে বিজ্ঞান	২৯৫-৩১০

## প্রথম অধ্যায়

# উন্নততর জীবনধারা



শান্ত ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। দেহের বৃদ্ধি এবং বিকাশ, দেহের তিস্তগুলোর ক্ষতি পূরণ কিংবা শক্তি উৎপাদন-এ খরনের কাজের জন্য নিরাপিতভাবে আমাদের বিশেষ কাজের খরনের খাসের প্রয়োজন হয়। আমাদের স্বাস্থ্য বহুলাঙ্গে নির্ভর করে, যে খান্ত আমরা খাই তার পুরণত মানের উপর। খান্ত আমাদের জ্ঞানায়, কাজকর্ত্তা, আচরণে ও জীবনের মানে পার্বক্য ঘটাতে পারে। খসন ক্রিয়ার সময় খাসের ক্ষেত্রকার রাসায়নিক শক্তি তাপশক্তি হিসেবে যুক্ত হয়ে জীবনের জৈবিক ক্রিয়াগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রয়োকটা জীব কার পরিবেশ থেকে প্রয়োজনযোগো এবং পরিমাণযোগো খান্ত গ্রহণ করে। প্রতিটি খান্তই আসলে এক খরনের জটিল রাসায়নিক বৌগ। এই জটিল খান্তগুলো বিভিন্ন উৎসেচকের সাহায্যে আমাদের পরিশাক্তজ্ঞের বিভিন্ন অংশে যোগ সহন খাসে প্রয়োজন হয়, এই প্রক্রিয়াকে পরিশাক্ত বলে। পরিশাক্ত হওয়া খান্ত শোষিত হয়ে দেহকোষের প্রোটোজীড়সে সংযোজিত হয়, যাকে আর্থিকরণ বলে। পরিশাক্তের পর অশাঙ্ক খান্ত বিশেষ প্রক্রিয়ার মেջ থেকে নির্গত হয়ে যায়।



## এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- খাদ্য উপাদান ও আদর্শ খাদ্য পিলামিড ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব।
- স্থান্ত্র রক্তার প্রাকৃতিক খাদ্য এবং ফাস্ট ফুডের অভাব বিলোবণ করতে পারব।
- ভিটামিনের উৎস এবং এর অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ধনিজ সবপের উৎস এবং এর অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পানি ও আশমুক্ত খাবারের উপকারিতা বর্ণনা করতে পারব।
- বড় হাস ইনডেক্সের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খালে গ্রাসামুক্ত পদার্থের ব্যবহার এবং এর শারীরিক প্রতিক্রিয়া বলতে পারব।
- শরীরে তামাক ও ছাঁগদের অক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- এইচস কী ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শারীরিক ফিটনেস বজার রাখার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।

## ১.১ খাদ্য ও পুষ্টি

পুষ্টিবিজ্ঞান অনুসারে আমরা যা খাই তার সবই কিন্তু খাদ্য নয়। শুধু সেই সব আহার্য বস্তুকেই খাদ্য বলা যাবে, যেগুলো জীবদেহে বৃদ্ধি, শক্তি উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ এবং ক্ষয়পূরণ করে, এক কথায় দেহের পুষ্টি সাধন করে। পুষ্টি হলো পরিবেশ থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু আহরণ করে খাদ্যবস্তুকে পরিপাক ও শোষণ করা এবং আন্তীকরণ ঘারা দেহের শক্তির চাহিদা পূরণ, রোগ প্রতিরোধ, বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ করা। পুষ্টির ইংরেজি শব্দ Nutrition; অপরাদিকে খাদ্যের যেসব জৈব অথবা অজৈব উপাদান জীবের জীবনীশক্তির যোগান দেয়, তাদের একসঙ্গে পরিপোষক বা নিউট্রিয়েন্টস (Nutrients) বলে। যেমন: ফুকোজ, খনিজ লবণ, ভিটামিন ইত্যাদি হচ্ছে নিউট্রিয়েন্টস। পরিপোষকের পরিপাকের প্রয়োজন হয় না, প্রাণীরা খাদ্যের মাধ্যমে পরিপোষক গ্রহণ করে। আমরা বলতে পারি, খাদ্যের কাজ প্রধানত তিনটি:

১. খাদ্য দেহের গঠন, বৃদ্ধিসাধন, ক্ষয়পূরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে।
২. খাদ্য দেহে তাপ উৎপাদন করে, কর্মশক্তি প্রদান করে।
৩. খাদ্য রোগ প্রতিরোধ করে, দেহকে সুস্থ, সুবল এবং কর্মক্ষম রাখে।

### খাদ্যের উপাদান

খাদ্যের উপাদান ছয়টি (চিত্র ১.০১), সেগুলো হলো: শর্করা, আমিষ, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ লবণ এবং পানি। এগুলোর মধ্যে শর্করা, আমিষ ও স্নেহ পদার্থ (বা ফ্যাট) দেহ পরিপোষক খাদ্য। খাদ্যের স্নেহ এবং শর্করাকে বলা হয় শক্তি উৎপাদক খাদ্য এবং আমিষযুক্ত খাদ্যকে বলা হয় দেহ গঠনের খাদ্য। ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি দেহ সংরক্ষক খাদ্য উপাদান, যেগুলো দেহের রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে।



চিত্র ১.০১: খাদ্যের ছয়টি উপাদান

### ১.১.১ শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট

শর্করা হচ্ছে মানুষের প্রধান খাদ্য। কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন নিয়ে শর্করা তৈরি হয়। শর্করা বণহীন, গন্ধহীন এবং অল্প মিষ্টি স্বাদযুক্ত। শর্করা আমাদের শরীরের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং তাপশক্তি উৎপাদন করে।

বেশ কয়েক ধরনের শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট রয়েছে এবং এদের উৎসও ভিন্ন। যেমন:

### উক্তিজ্ঞ উৎস

**শ্বেতসার বা স্টার্চ:** ধান, গম, ভুট্টা এবং অন্যান্য শস্য দানা স্টার্চের প্রধান উৎস। এছাড়া আলু, রাঙ্গা আলু বা কচুতেও শ্বেতসার বা স্টার্চ পাওয়া যায়।

**গ্লুকোজ:** এটি চিনির তুলনায় মিষ্টি কম। এই শর্করাটি আঙুর, আপেল, গাজর, খেজুর ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

**ফ্রুকটোজ:** আম, পেঁপে, কলা, কমলালেবু প্রভৃতি মিষ্টি ফলে এবং ফুলের মধুতে ফ্রুকটোজ থাকে। একে ফল শর্করাও (Fruit Sugar) বলা হয়ে থাকে।

**সুক্রোজ:** আখের রস, চিনি, গুড়, মিছরি এর উৎস।

**সেলুলোজ:** বেল, আম, কলা, তরমুজ, বাদাম, শুকনো ফল এবং সব ধরনের শাক-সবজিতে সেলুলোজ থাকে।

### প্রাণিজ উৎস

**ল্যাকটোজ বা দুধ শর্করা:** গরু, ছাগল এবং অন্যান্য প্রাণীর দুধে এই শর্করা থাকে।

**গ্লাইকোজেন:** পশু ও পাখিজাতীয় (যেমন: মুরগি, করুতর প্রভৃতি) প্রাণীর যকৃৎ এবং মাংসে (পেশি) গ্লাইকোজেন শর্করাটি থাকে।

### পুষ্টিগত গুরুত্ব

আমাদের শরীরের পুষ্টিতে শর্করার অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। শর্করা শরীরের কর্মক্ষমতা বাড়ায় এবং তাপশক্তি উৎপাদন করে। জীবদেহে বিপাকীয় (Metabolic) কাজের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয়, সেটি কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য জারণের ফলে উৎপন্ন হয়।

গ্লাইকোজেন প্রাণীদেহে খাদ্যঘাটাতিতে বা অধিক পরিশ্রমের সময় শক্তি সরবরাহ করে। সেলুলোজ একটি অপাচ্য প্রকৃতির শর্করা, এটি আঁশযুক্ত খাদ্য এবং এটি আমাদের দৈনন্দিন মল ত্যাগে সাহায্য করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য রোধ করে। এছাড়া খাদ্যে প্রোটিন কিংবা ফ্যাটের অভাব হলে শর্করা থেকে এগুলো সংশ্লেষণ করে।

## উন্নততর জীবনধারা

বা তৈরি হয়।

শর্করার অভাবজনিত রোগ থেকে রক্ষা পেতে আমাদের প্রতিদিন প্রয়োজনীয় শর্করাজাতীয় খাদ্য থেকে হয়। খাদ্যে শর্করার পরিমাণ আবার চাহিদার তুলনায় বেশি হলে অতিরিক্ত শর্করা শরীরে মেদ হিসেবে জমা হয়। তখন শরীর স্থূলকায় হতে পারে; কখনো কখনো বহুমুক্ত রোগও দেখা দিতে পারে।

নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বা শ্বসন প্রক্রিয়ায় আমরা বাতাস থেকে যে অক্সিজেন গ্রহণ করি, সেটি ফুসফুসে আমাদের রক্তের সাথে মিশে যায়। রক্তের লোহিত কণিকা এই অক্সিজেন আমাদের শরীরের কোষে পৌঁছে দেয়, সেখানে গ্লুকোজের সাথে বিক্রিয়া করে তাপশক্তি তৈরি করে এবং এই তাপশক্তি আমাদের সকল শক্তির উৎস।

খাদ্যের মধ্যে নিহিত শক্তিকে খাদ্য ক্যালরি বা কিলোক্যালরি হিসেবে মাপা হয়। ক্যালরি হচ্ছে শক্তির একক। এক গ্রাম খাদ্য জারণের ফলে যে পরিমাণ তাপশক্তি উৎপন্ন হয়, তাকে খাদ্যের ক্যালরি বলে। এক গ্রাম পানির তাপমাত্রা  $1^{\circ}$  (ডিগ্রি) সেলসিয়াস বৃদ্ধি করার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয়, সে পরিমাণ তাপশক্তি হচ্ছে এক ক্যালরি। এক হাজার ক্যালরি সমান এক কিলোক্যালরি বা এক খাদ্য ক্যালরি (One Food Calorie)। খাদ্যের ক্যালরিকে কিলোক্যালরি দিয়ে বোঝানো হয়। উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা যায়, শর্করা এবং প্রোটিনের ক্যালরি প্রায় সমান,  $4 \text{ kcal/g}$ । মেহজাতীয় খাদ্যে অর্থাৎ ফ্যাটের ক্যালরি সবচেয়ে বেশি— এর পরিমাণ  $9 \text{ kcal/g}$ । একটা খাদ্যের খাদ্য ক্যালরি বলতে বোঝায় খাদ্যটি সম্পূর্ণভাবে জারণ হলে কতখানি শক্তি বের হবে। (একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ মানুষের দৈনিক  $2500 \text{ kcal}$  এবং একজন নারীর  $2000 \text{ kcal}$  এর সমপরিমাণ খাবার খাওয়া প্রয়োজন)।

### ১.১.২ আমিষ বা প্রোটিন

কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন— এ চারটি মৌলের সমন্বয়ে আমিষ তৈরি হয়। শরীরে আমিষ পরিপাক হওয়ার পর সেগুলো অ্যামাইনো এসিডে পরিণত হয়। অর্থাৎ বলা যায় একটি নির্দিষ্ট আমিষের পরিচয় হয় কিছু অ্যামাইনো এসিড দিয়ে। মানুষের শরীরে এ পর্যন্ত  $20$  ধরনের অ্যামাইনো এসিডের সম্মিলন পাওয়া গেছে এবং এই অ্যামাইনো এসিড হচ্ছে আমিষ গঠনের একক।

উৎস দিয়ে বিবেচনা করা হলে আমিষ দুই প্রকার: প্রাণিজ ও উক্তিজ্ঞ। প্রাণী থেকে যে আমিষ পাওয়া যায় তা প্রাণিজ আমিষ। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ছানা, পনির— এগুলো প্রাণিজ আমিষ। উক্তিদ থেকে যে আমিষ পাওয়া যায় তা উক্তিজ্ঞ আমিষ। ডাল, শিমের বিচি, মটরশুটি, বাদাম হচ্ছে উক্তিজ্ঞ আমিষের উদাহরণ।

২০টি অ্যামাইনো এসিডের মধ্যে ৮টি অ্যামাইনো এসিডকে (লাইসিন, ট্রিপেটোফ্যান, মিথিওনিন, ভ্যালিন, লিউসিন, আইসোলিউসিন, ফিনাইল অ্যালানিন ও থ্রিওনাইনকে) অপরিহার্য অ্যামাইনো এসিড বলা হয়। এই আটটি অ্যামাইনো এসিড ছাড়া অন্য সবগুলো অ্যামাইনো এসিড আমাদের শরীর সংশ্লেষ করতে পারে। প্রাণিজ প্রোটিনে এই অপরিহার্য আটটি অ্যামাইনো এসিড বেশি থাকে বলে এর পুষ্টিমূল্য বেশি।

উক্তিজ্ঞ খাদ্যের মধ্যে ডাল, সয়াবিন, মটরশুটি বীজ এবং ভুট্টার মধ্যে পুষ্টিমূল্য বেশি এমন প্রোটিন পাওয়া যায়। অন্যান্য উক্তিজ্ঞ খাদ্যে অপরিহার্য অ্যামাইনো এসিড থাকে না বলে এদের পুষ্টিমূল্য কম।

প্রাণীদেহের গঠনে প্রোটিন অপরিহার্য। দেহকোষের বেশির ভাগই প্রোটিন দিয়ে তৈরি। দেহের হাড়, পেশি, লোম, পাখির পালক, নখ, পশুর শিং— এগুলো সবই প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয়। তোমরা জেনে অবাক হবে প্রাণীদেহের শুরু ওজনের প্রায় ৫০% হচ্ছে প্রোটিন।

### ১.১.৩ মেহ পদার্থ বা লিপিড

ফ্যাটি এসিড এবং প্লিসারলের সমন্বয়ে মেহ পদার্থ গঠিত হয়। আমাদের খাবারে প্রায় ২০ ধরনের ফ্যাটি এসিড পাওয়া যায়। কঠিন মেহ পদার্থগুলোকে চর্বি বলে। চর্বি হচ্ছে সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড। সাধারণ তাপমাত্রায় এগুলো কঠিন অবস্থায় থাকে। যেমন: মাছ কিংবা মাংসের চর্বি। যেসব মেহ পদার্থ তরল, সেগুলোকে তেল বলে, তেল হচ্ছে অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড। সাধারণ তাপমাত্রায় এগুলো তরল থাকে। যেমন: সয়াবিন তেল, সরিষার তেল ইত্যাদি।

উৎস অনুযায়ী মেহ পদার্থ দুই প্রকার। যেমন:

১. প্রাণিজ মেহ: চর্বিসহ মাংস, মাখন, ঘি, পনির, ডিমের কুসুম— এগুলো হচ্ছে প্রাণিজ মেহ পদার্থের উৎস।

২. উক্তিজ্ঞ মেহ: বিভিন্ন প্রকারের উক্তিজ্ঞ তেল মেহ পদার্থের উৎস। সরিষা, সয়াবিন, তিল, তিসি, ভুট্টা, নারকেল, সূর্যমুখী, পাম প্রভৃতির তেলে প্রচুর পরিমাণে মেহ পদার্থ পাওয়া যায়। কাজু বাদাম, পেস্তা বাদাম এবং চিনা বাদামও মেহ পদার্থের ভালো উৎস।

### মেহ পদার্থের কাজ

১. খাদ্যবস্তুর মধ্যে মেহ পদার্থ সবচেয়ে বেশি তাপ এবং শক্তি উৎপন্ন করে।

২. দেহের পুষ্টি এবং বৃদ্ধির জন্য মেহ পদার্থ অতি আবশ্যিক।

৩. মেহ পদার্থ দেহ থেকে তাপের অপচয় বন্ধ করে এবং ভবিষ্যতের জন্য খাদ্যভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে।

৪. ত্বকের মসৃণতা এবং সজীবতা বজায় রাখে এবং চর্মরোগ প্রতিরোধ করে।

৫. যেসব ভিটামিন (A, D, E এবং K) মেহজাতীয় পদার্থে দ্রবণীয়, সেগুলো শোষণে সাহায্য করে।

### অভাবজনিত রোগ ও প্রতিকার

মেহ পদার্থের অভাবে চর্মরোগ, একজিমা ইত্যাদি দেখা দেয়। ত্বক শুরু এবং খসখসে হয়ে সৌন্দর্য নষ্ট হওঁ

হয়। দীর্ঘদিন স্নেহ পদার্থের অভাব হলে শরীরের সঞ্চিত প্রোটিন ক্ষয় হয় এবং দেহের ওজন কমে যায়। আবার শরীরে অতিরিক্ত স্নেহ পদার্থ জমা হলে দেহে রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত ঘটে এবং এ কারণে মেদবহুল দেহে সহজে রোগ আক্রমণ করে।

### ১.১.৪ খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন

খাদ্যে পরিমাণমতো শর্করা, আমিষ এবং স্নেহ পদার্থ খাকার পরেও জীবের স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং পুষ্টির জন্য বিশেষ এক ধরনের খাদ্য উপাদানের প্রয়োজন হয়। এই খাদ্য উপাদানকে ভিটামিন বলে।

ভিটামিন প্রাণীর স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং শরীর সুস্থ রাখার জন্য অপরিহার্য। ভিটামিন হচ্ছে জৈব প্রকৃতির যৌগিক পদার্থ। আমরা যদি প্রতিদিন প্রচুর শাকসবজিসহ স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাই তাহলে আমাদের দৈনন্দিন খাবার থেকেই প্রয়োজনীয় ভিটামিন পেয়ে যেতে পারি।

কয়েকটি ভিটামিন স্নেহজাতীয় পদার্থে দ্রবীভূত হয়, আবার কয়েকটি ভিটামিন পানিতে দ্রবীভূত হয়।  
যেমন:

**স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিন:** ভিটামিন A, ভিটামিন D, ভিটামিন E ও ভিটামিন K।

**পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন:** ভিটামিন B কমপ্লেক্স এবং ভিটামিন C।

### স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিন

#### ভিটামিন A

প্রাণিজ উৎসের মধ্যে ডিম, গরুর দুধ, মাখন, ছানা, দই, ঘি, ঘৃৎ ও বিভিন্ন তেলসমূহ মাছে, বিশেষ করে কড় মাছে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন A পাওয়া যায়। উড়িজ্জ উৎসের মধ্যে ক্যারোটিন সমূহ শাক-সবজি, যেমন- লালশাক, কাচুশাক, পুইশাক, পাটশাক, কলমিশাক, ডাঁটাশাক, পুদিনা পাতা, গাজর, মিষ্টি কুমড়া, ডেঁড়স, বাঁধাকপি, মটরশুটি এবং বিভিন্ন ধরনের ফল যেমন: আম, পাকা পেঁপে, কাঁঠাল ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন A রয়েছে।

**কাজ :** ভিটামিন A যেসব কাজ করে সেগুলো হলো:

১. দেহের স্বাভাবিক গঠন এবং বর্ধন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার কাজ নিশ্চিত করে।
২. দেহের বিভিন্ন আবরণী কলা যেমন: ত্বক, চোখের কর্নিয়া ইত্যাদিকে স্বাভাবিক ও সজীব রাখে।
৩. হাড় এবং দাঁতের গঠন এবং দাঁতের মাড়ি সুস্থ রাখে।
৪. দৃষ্টিশক্তি ঠিক রাখে এবং রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে।
৫. দেহে রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করে।

**অভাবজনিত রোগ ও প্রতিকার :** ভিটামিন A— এর অভাবে রাতকানা রোগ হয়। এর অভাব দীর্ঘস্থায়ী হলে চোখের কর্ণিয়ায় আলসার হতে পারে— এ অবস্থাকে জেরপথ্যালমিয়া রোগ বলে। এই রোগ হলে আক্রান্ত মানুষ পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যেতে পারে। ভিটামিন A— এর অভাবে দেহের বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। অনেক সময় ঘা, সর্দি, কাশি, গলাব্যথা ইত্যাদি উপসর্গও দেখা দেয়। ভিটামিন A— এর অভাবে ত্বকের লোমকুপের গোড়ায় ছোট ছোট গুটির সৃষ্টি হতে পারে।

### ভিটামিন D

একমাত্র প্রাণিজ উৎস থেকেই ভিটামিন D পাওয়া যায়। এই ভিটামিন সূর্যালোকের অতিবেগুনি রশ্মির সাহায্যে মানুষের ত্বকে সংশ্লেষিত হয়। ডিমের কুসূম, দুধ এবং মাখন ভিটামিন D— এর প্রধান উৎস। বাঁধাকপি, যকৃৎ এবং তেলসমৃদ্ধ মাছে ভিটামিন D পাওয়া যায়।

ভিটামিন D শরীরে ক্যালসিয়াম শোষণ করতে সাহায্য করে, যা হাড় তৈরির কাজে লাগে। ভিটামিন D— এর অভাবে শিশুদের রিকেট রোগ হতে পারে। দৈনিক চাহিদা থেকে বেশি পরিমাণে ভিটামিন D গ্রহণ করলে শরীরের ক্ষতি হয়। এর ফলে অধিক ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস শোষিত হওয়ায় রক্তে এদের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। যে কারণে বৃক্ক (কিডনি), হৎপিণ্ড, ধমনি ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম জমা হতে থাকে।

### ভিটামিন E

সব রকম উত্তিজ্জ ভোজ্য তেল বিশেষ করে পাম তেল ভিটামিন E— এর ভালো উৎস। প্রায় সব খাবারেই কমবেশি ভিটামিন E আছে। তাছাড়া শস্যদানার তেল (Corn oil), তুলা বীজের তেল, সূর্যমুখী বীজের তেল, লেটুস পাতা ইত্যাদিতে ভিটামিন E পাওয়া যায়। মানুষের শরীরে ভিটামিন E হলো এন্টি-অক্সিডেন্ট, যেটি ধমনিতে চর্বি জমা রোধ করে এবং সুস্থ ত্বক বজায় রাখে। এ ছাড়া ভিটামিন E কোষ গঠনে সাহায্য করে এবং মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর বন্ধ্যাত্ম দূর করে। ভিটামিন E— এর অভাবে জরায়ুর মধ্যে ভূণের মৃত্যুও হতে পারে। দৈনিক সুষম খাদ্য গ্রহণ করলে এই ভিটামিনের বিশেষ অভাব হয় না।

### পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন

#### ভিটামিন B কমপ্লেক্স

পানিতে দ্রবণীয় ১২টি ভিটামিন B রয়েছে। ভিটামিনের এই গুচ্ছকে ভিটামিন B কমপ্লেক্স বলা হয়। দেহের স্বাভাবিক সুস্থিতার জন্য খাবারে ভিটামিন B কমপ্লেক্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেহের বৃদ্ধি, ম্লায় ও মস্তিষ্কের কাজ, দেহকোষে বিপাকীয় কাজ, প্রজনন ইত্যাদি সম্পাদন করার জন্য খাদ্যে ভিটামিন B কমপ্লেক্সের উপস্থিতি অতি আবশ্যিক।

ভিটামিন B কমপ্লেক্সস্ট গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিনগুলোর উৎস এবং অভাবজনিত রোগ নিচের টেবিলে দেওয়া হলো:

ভিটামিন	উৎস	অভাবজনিত রোগ
থায়ামিন (B1)	ডেক্ষিণ্টা চাল, আটা, ডাল, তেলবীজ, বাদাম, যকৃৎ, টাটকা ফল ও সবজি। প্রাণিজ উৎসের মাঝে রয়েছে যকৃৎ, ডিম, দুধ, মাছ ইত্যাদি।	দেহে থায়ামিনের চরম অভাবে বেরিবেরি রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এর অভাবে ম্যায়ার দুর্বলতা, মানসিক অবসাদ, ক্লান্তি, খাওয়ায় অরুচি, ওজনহীনতা ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়।
রাইবোফ্ল্যাভিন (B2)	যকৃৎ, দুধ, ডিম, সবুজ শাক-সবজি, গাছের কচি ডগা, অঙ্গুরিত বীজ।	এর অভাবে ঠোঁটের দুপাশে ফাটল দেখা দেয়, মুখে ও জিভে ঘা হয়, ত্বক খসখসে হয়। চোখ দিয়ে পানি পড়ে। এর অভাবে তীব্র আলোতে চোখ খুলতে অসুবিধা হয়।
নিয়াসিন বা নিকোটিনিক এসিড (B5)	মাংস, যকৃৎ, আটা, ডাল, বাদাম, তেলবীজ, ছোলা, শাক-সবজি।	এর অভাবে পেলেগ্রা রোগ হয়। পেলেগ্রা রোগে ত্বকে রঞ্জক পদার্থ জমতে শুরু হয় এবং সূর্যের আলোয় দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ফলে ত্বকে লালচে দাগ পড়ে এবং ত্বক খস খসে হয়ে যায়। এছাড়া জিভে রঞ্জক পদার্থ জমে জিভের এক্ট্রোফি হয়।
পিরিডিনিন (B6)	চাল, আটা, মাছ, মাংস, শাক-সবজি, ছোলা, ছান্কা, বৃক্ষ, ডিমের কুসুম।	এর অভাবে খাওয়ায় অরুচি, বমিভাব ও অ্যানিমিয়া রোগ দেখা দেয়।
কোবালামিন বা সায়ানোকোবালামিন (B12)	যকৃৎ, দুধ, মাছ, মাংস, ডিম, পনির, বৃক্ষ প্রভৃতি।	এর অভাবে রক্তশূন্যতা রোগ দেখা দেয়। ম্যায়ুতন্ত্রের অবক্ষয় ঘটে।

### ভিটামিন C (অ্যাসকরবিক এসিড)

টাটকা শাক-সবজি এবং টাটকা ফলে ভিটামিন C পাওয়া যায়। শাক-সবজির মধ্যে মূলাশাক, লেটুস পাতা, ধনে পাতা, পুদিনা পাতা, কাঁচা মরিচ, ফুলকপি, করলা ইত্যাদিতে ভিটামিন C আছে। ফলের মধ্যে আমলকী, লেবু, কমলালেবু, টমেটো, আনারস, পেয়ারা ইত্যাদি ভিটামিন C— এর উৎস। শুকনো ফল ও বীজে এবং চিনজাত খাদ্যে এই ভিটামিন থাকে না।

**ভিটামিন C শরীরে যেসব কাজ করে সেগুলো হলো:**

১. ঢক, ছাঢ়, দাঁত ইত্যাদির কোষসমূহকে পরিষ্পরের সাথে জোড়া লাগিয়ে মজবুত পাখুনি তৈরি করে।
২. শরীরের কত পুনর্গঠনের কাজে সাহায্য করে।
৩. দাঁত ও মাড়ি শক্ত রাখে।
৪. রেশ, আমিষ ও আয়াহাইলো এসিডের বিপাকীয় কাজে ভিটামিন C পুরুষপূর্ণ কুমিকা রাখে।
৫. ঢক মস্ত এবং উচ্ছব রাখে।
৬. রোগ প্রতিরোধ করে।

**ভিটামিন C—** এর তীব্র অভাবে স্কার্টি (দাঁতের মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়া) রোগ হয়। এর অভাবে (ক) অস্থির গঠন শক্ত ও মজবুত হতে পারে না। (খ) ঢকে বা হয়, কত শুকাতে দেরি হয়। (গ) দাঁতের মাড়ি সুলে দাঁতের ইনামেল উঠে থায়। দাঁত দুর্বল হয়ে অকালে বারে পড়ে। (ঘ) রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কমে গিয়ে সহজে ঠাণ্ডা লাগে।



### একক কাজ

**কাজ:** আমরা যে ভিটামিনগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম, সেহে সেগুলোর অভাব হলে কী কী রোগ দেখা দিতে পারে তার একটা চার্ট প্রস্তুত কর।

### ১.১.৫ খনিজ পদার্থ এবং পানি

জীবদেহের শারীরিক বৃদ্ধি এবং পুষ্টির জন্য ভিটামিনের যত্তো খনিজ পদার্থ বা খনিজ সবথেকে খুবই প্রয়োজনীয়। খনিজ পদার্থ প্রধানত কোৰ পঠনে সাহায্য করে। প্রাচীরা প্রধানত উত্তিজ্জ খাদ্য থেকে খনিজ পদার্থ পায়। আমরা শাকসবজি, কলমূল, দুধ, ডিম, মাছ এবং পানীয় জলের মাধ্যমে আমাদের খনিজ পদার্থের চাহিদা পূরণ করি। নিচে শরীরের প্রয়োজনীয় পুরুষপূর্ণ খনিজ উপাদানগুলোর উৎস, পুষ্টিগত পুরুষ এবং অভাবজনিত সমস্যাগুলোর কথা উল্লেখ করা হলো:

### লৌহ (Fe)

লৌহ অণ্টের একটি প্রধান উপাদান। প্রতি 100 mL অণ্টে লৌহের পরিমাণ প্রায় ৫০ mg। ষড়ু, প্রীতা, অস্থিমজ্জা এবং লোহিত রক্তকণিকায় এটি সঞ্চিত থাকে। লৌহের উত্তিজ্জ উৎস হচ্ছে কুশকণির পাতা, নটেশাক, নিম পাতা, ফুমুর, কাঁচা কলা, ভূট্টা, গম, বাদাম, বজরা ইত্যাদি। প্রাপিজ উৎস হচ্ছে মাছ, মাংস, ডিম, যকুৎ ইত্যাদি। লৌহের প্রধান কাজ হিমোগ্লোবিন গঠনে সহায়তা করা। হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ

কমে গেলে রক্তশূন্যতা রোগ হয়। রক্তশূন্যতা রোগের লক্ষণ চোখ ফ্যাকাসে হওয়া, হাত-পা ফোলা, দুর্বলতা, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড় করা ইত্যাদি।

### **ক্যালসিয়াম (Ca)**

এটি প্রাণীদের হাড় এবং দাঁতের একটি প্রধান উপাদান। মানুষের শরীরের মোট ওজনের শতকরা দুই ভাগ হচ্ছে ক্যালসিয়াম। খনিজ পদার্থের মধ্যে দেহে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। অস্থি এবং দাঁতে ফসফরাস ও ম্যাগনেসিয়ামের সাথে যুক্ত হয়ে এর ৯০% শরীরে সঞ্চিত থাকে। রক্তে এবং লসিকাতে এর উপস্থিতি লক্ষণীয়। ক্যালসিয়ামের উত্তিজ্জ উৎস হচ্ছে: ডাল, তিল, সয়াবিন, ফুলকপি, গাজর, পালংশাক, কচুশাক, লালশাক, কলমিশাক, বাঁধাকপি এবং ফল। প্রাণিজ উৎস হচ্ছে: দুধ, ডিম, ছোট মাছ, শুটকি মাছ ইত্যাদি।

হাড় এবং দাঁতের গঠন শক্ত রাখার জন্য ক্যালসিয়াম একটি অতিপ্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ। এ ছাড়া ক্যালসিয়াম রক্ত সঞ্চালনে, হৎপিণ্ডের পেশির স্বাভাবিক সংকোচনে এবং স্নায়ু ও পেশির সঞ্চালনে সাহায্য করে। ক্যালসিয়ামের অভাবের কারণে রিকেটস এবং বয়স্ক নারীদের অস্টিওম্যালেসিয়া রোগ হয়। এর অভাবে শিশুদের দাঁত উঠতে দেরি হয় এবং তাদের রক্ত সঞ্চালনে বিঘ্ন ঘটে।

### **ফসফরাস (P)**

দেহে পরিমাণের দিক থেকে খনিজ লবণগুলোর মধ্যে ক্যালসিয়ামের পরই ফসফরাসের স্থান। ফসফরাসও ক্যালসিয়ামের মতো হাড়ের একটি প্রধান উপাদান। ফসফরাস হাড়, যকৃৎ এবং রক্তরসে সঞ্চিত থাকে। নিউক্লিক এসিড, নিউক্লিয় প্রোটিন তৈরি এবং শর্করা বিপাকের দ্বারা শক্তি উৎপাদনে ফসফরাস প্রধান ভূমিকা রাখে।

ফসফরাসের উত্তিজ্জ উৎস হচ্ছে: দানা শস্য, শিম, বরবটি, মটরশুটি, বাদাম ইত্যাদি। প্রাণিজ উৎস হচ্ছে: ডিম, দুধ, মাছ, মাংস, কলিজা ইত্যাদি।

ক্যালসিয়ামের মতো হাড় এবং দাঁত গঠন করা ফসফরাসের প্রধান কাজ। ফসফরাসের অভাবে রিকেটস, অস্থিক্ষরতা, দন্তক্ষয়— এইসব রোগ দেখা দেয়। খাবারে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন ও ক্যালসিয়াম থাকলে ফসফরাসের অভাব হয় না।

### **পানি (Water)**

পানি খাদ্যের একটি প্রধান উপাদান। মানবদেহের জন্য পানি অপরিহার্য। দেহের গঠন এবং অভ্যন্তরীণ কাজ পানি ছাড়া চলতে পারে না। আমাদের দৈহিক ওজনের ৬০%-৭৫% হচ্ছে পানি। আমাদের রক্ত, মাংস, স্নায়ু, দাঁত, হাড় ইত্যাদি প্রতিটি অঙ্গ গঠনের জন্য পানির প্রয়োজন।

দেহকোষ গঠন এবং কোষের যাবতীয় শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া পানি ছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব করা সম্ভব

না। পানির মাধ্যমে শরীর গঠনের নানা প্রয়োজনীয় উপাদান শরীরের বিভিন্ন জায়গায় পরিবাহিত হয়। এটি জীবদেহে দ্রাবকের কাজ করে, খাদ্য উপাদানের পরিপাক ও পরিশোষণে সাহায্য করে। বিপাকের ফলে দেহে উৎপন্ন ইউরিয়া, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং বিষাক্ত পদার্থগুলোকে পানি মৃত্ত ও ঘাম হিসেবে শরীর থেকে বের করে দেয়। এ ছাড়া পানি শরীর থেকে ঘাম নিঃসরণ এবং বাস্পীভবনের মাধ্যমে শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে।

### শরীরে পানির উৎস :

১. খাবার পানি, পানীয় যেমন: চা, দুধ, কফি, শরবত।
২. বিভিন্ন খাদ্য যেমন: শাক-সবজি ও ফল।

শরীর থেকে মোট নির্গত পানির পরিমাণ গৃহীত পানির পরিমাণের সমান হলে শরীরে পানির সমতা বজায় থাকে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দৈনিক ২-৩ লিটার পানি পান করা উচিত, কারণ প্রায় ঐ পরিমাণ পানি প্রত্যেকদিনই আমাদের শরীর থেকে বের হয়ে যায়।

গরম আবহাওয়ায়, কঠোর পরিশ্রমে দেহে পানির অভাব দেখা দেয়। এ সময় পানি পানের পরিমাণ বাড়ানো উচিত। ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণে না থাকলে ঘন ঘন প্রস্তাবের কারণে শরীরে পানির অভাব হতে পারে। শরীরে পানির অভাব হলে তীব্র পিপাসা হয়, রক্ত সঞ্চালনে ব্যাঘাত ঘটে, ত্বক কুঁচকে যায়। পানির অভাবে স্নায় ও পেশি দুর্বল হয়ে পড়ে। দেহে অম্ল ও ক্ষারের সমতা নষ্ট করে এসিডোসিস রোগের সৃষ্টি হয়। শরীরে পানি ১০% কমে গেলে সংজ্ঞা লোপ পায়, এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে। অত্যধিক বমি, ডায়রিয়া ইত্যাদি কারণেও শরীর থেকে অনেক পানি বের হয়ে যেতে পারে। শরীরে পানির অভাব নিরসনের জন্য যত দ্রুত সম্ভব রোগীকে খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হয়। শরীর থেকে যে পরিমাণ পানি ও লবণ বের হয়ে যায়, খাবার স্যালাইন তা পূরণ করে শরীরে পানি ও লবণের ভারসাম্য ঠিক রাখে। (বাসায় খাবার স্যালাইন না থাকলে এক চিমটি লবণ, এক মুঠো গুড় বা চিনি এবং এক প্লাস পানি মিশিয়ে খাবার স্যালাইন তৈরি করা যায়।)

### ১.১.৬ রাফেজ বা আঁশ

এখন পর্যন্ত যে সকল খাদ্য উপাদান নিয়ে কথা বলা হয়েছে, তার বাইরেও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য উপাদান হচ্ছে রাফেজ বা আঁশযুক্ত খাবার। রাফেজ প্রধানত উত্তিদ থেকে পাওয়া যায়। শস্যবীজ, ডাল, আলু, খোসাসমেত টাটকা ফল এবং শাক-সবজি রাফেজের প্রধান উৎস। এগুলো ছাড়াও শুকনা ফল, জিরা, ধনে, মটরশুটি প্রভৃতিতে বেশ ভালো পরিমাণ রাফেজ পাওয়া যায়। এই খাবারগুলোর দীর্ঘ তন্তুময় অংশকে রাফেজ বলে। রাফেজ মূলত সেলুলোজ দিয়ে তৈরি উত্তিদের কোষপ্রাচীর। রাফেজ আমাদের দেহে কোনো পুষ্টি যোগায় না সত্যি কিন্তু কোষ্ঠকাঠিন্য, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধ

করতে সাহায্য করে। তবে ঠিক কীভাবে এ রোগগুলো প্রতিরোধ করে তা এখন পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে জানা যায়নি। রাফেজ সরাসরি খাদ্যনালির মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হতে পারে। এটি খাদ্যনালির গায়ে কোনোরূপ পিণ্ড তৈরি করে না বলে রোগ প্রতিরোধ করতে পারে।

### **রাফেজযুক্ত খাবারের গুরুত্ব**

১. এটি পরিপাকে সহায়তা করে। রাফেজ পানি শোষণ করে এবং মলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।
২. শরীর থেকে অপাচ্য খাদ্য নিষ্কাশনে সাহায্য করে।
৩. এটি শরীরের অতিরিক্ত চর্বি কমাতে সাহায্য করে।
৪. বারবার ক্ষুধার প্রবণতা কমাতে এটি কাজ করে।
৫. ধারণা করা হয়, রাফেজযুক্ত খাদ্য গ্রহণে পিত্তথলির রোগ, খাদ্যনালি ও মলাশয়ের ক্যাঙ্গার, অর্শ, অ্যাপেন্ডিকিস, হৃদরোগ ও স্থূলতা অনেকাংশে হ্রাস করে।

এ কারণে প্রতিদিন ২০-৩০ গ্রাম আঁশযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। শাক-সবজি ও ফল থেকে এ পরিমাণ আঁশ পাওয়া সম্ভব।

## **১.২ বডি মাস ইনডেক্স (BMI) বা দেহের ভরসূচি**

শিশু জন্মগ্রহণের পর তার দেহের বৃদ্ধি ঘটতে থাকে এবং পরবর্তীকালে শৈশব, কৈশোর পার হয়ে যৌবন ও প্রাপ্তবয়স্কে উপনীত হয়। মানবদেহের বৃদ্ধি ২০-২৪ বছর পর্যন্ত ঘটে এবং তারপর আর উচ্চতার বৃদ্ধি হয় না। তখন খাদ্যের কাজ হয় শুধু দেহের ক্ষয়পূরণ এবং দেহকে সুস্থ, সবল এবং নীরোগ রাখা। প্রাপ্তবয়সে সুস্বাস্থ্যের জন্য দেহের উচ্চতার সাথে দেহের ওজনের একটা সামঞ্জস্যের প্রয়োজন হয়। দেহের উচ্চতার সাথে ওজনের সামঞ্জস্য রক্ষা করার সূচককে বিএমআই (BMI: Body Mass Index) বা ভরসূচি বলা হয়। উচ্চতার সাথে যদি দেহের ওজনের সামঞ্জস্য থাকে, তবেই পুষ্টিগত দিক থেকে শরীর সুস্থ বলা হয়।

**বিএমআইয়ের সূত্র হচ্ছে:**

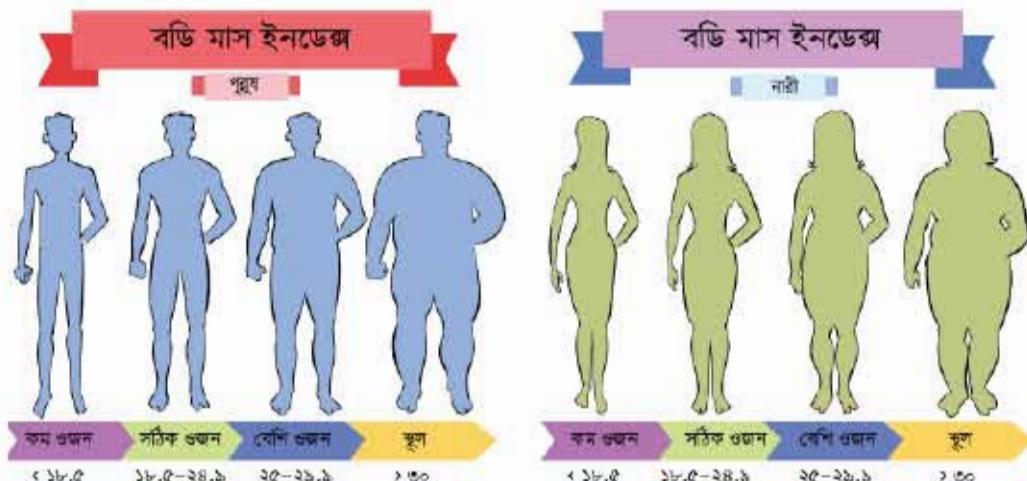
দেহের ওজন (কেজি)/[দেহের উচ্চতা (মিটার)]<sup>২</sup>

অর্থাৎ দেহের ওজনকে দেহের উচ্চতার বর্গ দিয়ে ভাগ করলে যে ফল হবে, সেটি হবে সেই ব্যক্তির বিএমআই বা ভরসূচি।



## ଉଦାହରଣ

ଖଗ୍ର ସାକ୍ ଏକଜନେର ଦେହର ଶରୀର ୮୦ କେଗି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ୧.୮ ମିଟୋମ୍ ତାହାର  
ବିଏମଆଇ =  $80/(1.8 \times 1.8) = 28.7$  (ଆମ)



ଚିତ୍ର ୧.୦୨: ବଢ଼ି ମାସ ଇନଡେଅ

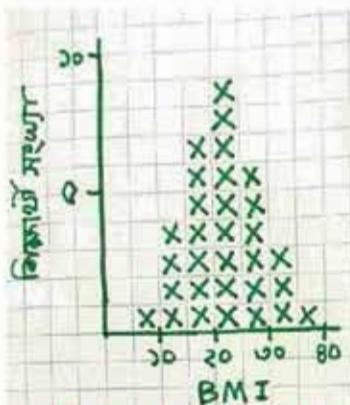
ଆମାଦେର ଦେହେ ଚର୍ବିର ପରିମାଣେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହଜ୍ରେ ବିଏମଆଇ । ୧.୦୨ ଚିତ୍ରେ ଦେଖାଲୋ ହରୋହେ ୨୫ ହଜ୍ରେ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଶାଖାବିକ ବିଏମଆଇ । ଏବଂ କମ ହଜ୍ରେ ଏକଜନକେ କମ ଶରୀର ଏବଂ ବେଳି ହଜ୍ରେ ତାକେ ଶୂଳକାରୀ ବଳେ ବିବେଚନା କରା ବାବେ ।



## ମଳଗୁଡ଼ କାଜ

**କାଜ:** ତୋଯାଦେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଧାରିତ ବିଏମଆଇ ଯେବେ କରେ ତୋକେ ହକ୍ (ଚିତ୍ର ୧.୦୩)

ହିସେବେ ଦେଖାଓ । ତୋଯାଦେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଢ଼ ବିଏମଆଇ କହୋ ।

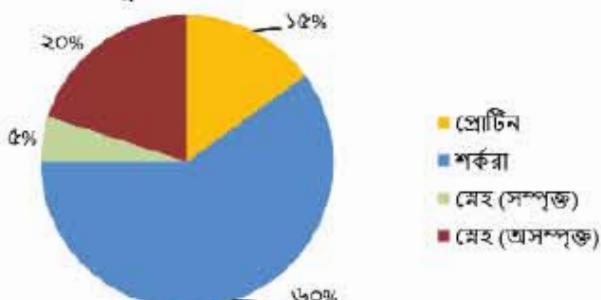


ଚିତ୍ର ୧.୦୩: ବିଏମଆଇ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାରୀ ସଂଖ୍ୟାର ହକ୍

## ১.৩ দৈনিক খাবার কেন্দ্র হবে

এ অধ্যায়ে পুনিটিক্ষণ পূর্ণস্বাস্থ আলোচনার সময় আমরা ক্যালরি ও কিলোক্যালরি সম্বন্ধে ধারণা পেরেছি। একজন পূর্ণবয়সের শারীরিক পরিশ্রম করা মানুষের দৈনিক ২০০০-২৫০০ কিলোক্যালরি খাবার প্রয়োজন করা উচিত। ভিটামিন, খনিজ সবথে এবং রাকেজ বা আশ্বের জন্য এর সাথে প্রয়োজনীয় শাক-সবজি এবং ফল খাওয়া প্রয়োজন।

একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দৈনিক  
সুসম খাদ্য উপাদানের বিভাজন



চিত্র ১.০৪: একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দৈনিক সুসম খাদ্যের বিভাজন



### একক কাজ

কাজ: ইলিশ মাছ, মুগাগির ডিম, চর্বিমুক্ত মাংস, মসুর ডাল, দই, ভাত, গোল আলু, চিনি, তেল, ঘিটি  
কুমড়া, মূলকপি, টমেটো, ছোট মাছ, হোলা, আইসক্রিম, বুটি, মধু, ধি, পুইশাক, কাঁঠাল, আম।

উপরে আয়াদের অতিপরিচিত ২১ এককার খাদ্য আছে। এ খাদ্যগুলো নিয়ে নিচের টেবিলে খাদ্যের উপাদানের একটি তালিকা তৈরি কর।

শর্করা	আমিষ	মেহ পদার্থ	ভিটামিন ও খনিজ সবথে	ফল
			শাক-সবজি	

এবার খাবারগুলোকে কম দাম এবং বেশি দাম হিসেবে বিভক্ত কর। তুমি একটি স্বচ্ছমূল্যের ও একটি অধিক মূল্যের খাদ্যতালিকা প্রস্তুত কর।

### খাদ্যতালিকা

খাদ্য উপাদানের নাম	কম দামের খাদ্যের নাম	বেশি দামের খাদ্যের নাম
১. শর্করা		
২. আমিষ		
৩. স্লেহ		
৪. ভিটামিনসমৃদ্ধ তরকারি/ ফল		
৫. খনিজ লবণ্যসুস্থ তরকারি/ ফল		

উপরের টেবিলটি থেকে তুমি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ ভালো এবং স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে হলেই যে অনেক দামি খাবার খেতে হয় সেটি সত্যি নয়। আমরা সঠিকভাবে পরিকল্পনা করে অনেক কম খরচেই অনেক স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে পারি।

### ১.৩.১ সুষম খাদ্য

খাদ্য কী এবং খাদ্যের উপাদানসমূহ কী কী, আমরা সেটি এর মাঝে জেনে গেছি। প্রয়োজন থেকে কম খেলে যেরকম আমাদের স্বাস্থ্যহানি হয়, ঠিক সেরকম প্রয়োজন থেকে বেশি খেলেও স্বাস্থ্যহানি হয়। বেশি খেয়ে স্থূলকার হয়ে যাওয়া উন্নত বিশ্বের মানুষের একটি বড় সমস্যা। তাই আমাদের শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য সব সময় সুষম খাবার যাওয়া প্রয়োজন।

সুষম খাদ্য বলতে কোনো নির্দিষ্ট খাদ্যবস্তুকে বোঝায় না। যে খাদ্যে ছয়টি উপাদানই গুণগুণ অনুসারে উপযুক্ত পরিমাণে থাকে এবং যে খাদ্য গ্রহণ করলে দেহে স্বাভাবিক কাজ-কর্মের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ক্যালরি পাওয়া যায়, তাকে সুষম খাদ্য (বা ব্যালান্সড ডায়েট) বলে। যেমন: একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ কর্মশীল পুরুষের প্রতিদিন প্রায় ২৫০০ এবং নারীর বেলায় ২০০০ কিলোক্যালরি শক্তির প্রয়োজন। এ শক্তি বা ক্যালরি আমরা খাদ্য থেকে পাই। সেজন্য আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় এমন ধরনের খাদ্য থাকা দরকার, যাতে সে খাদ্যের মধ্যে ছয়টি উপাদানই সঠিক পরিমাণে থাকে।

সুষম খাদ্যতালিকা তৈরির সময় মানুষের বয়স, লিঙ্গভেদ, কী রকম কাজ করে (অর্থাৎ অধিক পরিশ্রমী, মাঝারি পরিশ্রমী নাকি স্বচ্ছ পরিশ্রমী) ইত্যাদি বিবেচনা করা দরকার। শিশু ও বৃদ্ধদের খাদ্যতালিকায়

সহজপায় এবং চর্বি বর্জিত খাদ্যের প্রাধান্য থাকতে হবে। বাড়ন্ত শিশুদের ক্ষেত্রে প্রোটিনজাতীয় খাদ্য এবং হাড় ও দাঁতের বৃদ্ধির জন্য ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসসমূহ খাদ্য থাকতে হবে। গর্ভবতী নারীদের খাদ্যতালিকায় রক্ত উৎপাদনের জন্য এবং ভূগর্ভ শিশুর বৃদ্ধির জন্য বাড়তি প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও আয়োডিন থাকা খুবই প্রয়োজন। কোনো নির্দিষ্ট সুষম খাদ্য প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। সুষম খাদ্য তৈরি করে নিতে হয়।

### সুষম খাদ্য যেভাবে অন্তুত করা হয়

শর্করা	প্রোটিন	মেহ পদার্থ	ভিটামিন	খনিজ সূবণ
ভাত	মাছ	মাখন	দুধ, ডিম	দুধ
বুটি	মাংস	তেল	ফলমূল	ডিম
চিনি/গুড়	ডিম	বি	মাছ, মাংস	শাক-সবজি

### সুষম খাদ্য পিরামিড

যেকোনো সুষম খাদ্যতালিকায় শর্করা, শাক-সবজি, ফলমূল, আমিষ এবং মেহ বা চর্বিজাতীয় খাদ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। তোমরা নিচয়েই এর মাঝে লক্ষ করেছে যে একজন কিশোর বা কিশোরী, প্রাণ্ত বয়স্ক একজন পুরুষ বা নারীর সুষম খাদ্যতালিকা লক্ষ করলে দেখা যায় যে তালিকায় শর্করার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। শর্করাকে নিচে রেখে পরিমাণ বিবেচনা করে পর্যায়ক্রমে শাক-সবজি, ফলমূল, আমিষ,



চিত্র ১.০৫: সুষম খাদ্য পিরামিড

ম্নেহ ও চর্বি জাতীয় খাদ্যকে সাজালে যে কাল্পনিক পিরামিড তৈরি হয়, তাকে সুষম খাদ্য পিরামিড (চিত্র ১.০৫) বলে। এই পিরামিডের দিকে তাকালেই কোন ধরনের খাদ্য উপাদান কতটুকু খেতে হয় তার একটা ধারণা পাওয়া যায়।

### ১.৩.২ উন্নত জীবনযাপনের জন্য খাদ্য উপাদান বাছাই

সব মানুষের খাদ্যভ্যাস এক রকম নয়। প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক কারণে খাদ্যদ্রব্যের প্রাপ্যতাও সব দেশে এক রকম নয়। শীত ও গ্রীষ্মের প্রকোপ অনুসারেও খাদ্যের প্রয়োজন এবং পার্থক্য রয়েছে। সকল পরিবেশে মানিয়ে চলাই হচ্ছে জীবনের লক্ষ্য। এ জন্য দেহের গঠন ও বৃদ্ধিতে এবং শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলো সম্পন্ন করতে মূল খাদ্য উপাদানগুলোর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে মূল উপাদানগুলোর পরিমাণ এবং ক্যালরি ভ্যালু বিচার করে উন্নত জীবনযাপনের জন্য খাদ্য উপাদান বাছাই করতে হয়।

আমরা খাদ্য পিরামিডে কোন জাতীয় খাদ্য উপাদান কতটুকু খেতে হয় সেটা দেখিয়েছি। এখন আমরা বলব এই খাদ্য উপাদান ব্যবহার করে কী কী খাদ্য তৈরি করা যায়। যেমন খাদ্য পিরামিডের দেখানো তেল কিংবা মাখন সরাসরি খাওয়া হয় না, সেটি ব্যবহার করে অন্য খাবার প্রস্তুত করা হয়।

পুষ্টি বিশারদগণ এই খাবারকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। এগুলো হলো:

১. মাংস, মাছ, ডিম ও ডাল (মটর, ছোলা কিংবা বাদাম)।
২. পনির ও দই।
৩. সকল ভোজ্য ফল এবং খাওয়ার উপযোগী সবজি।
৪. শস্য ও শস্যদানা থেকে তৈরি খাবার যেমন: রুটি, ভাত।

সুষম খাদ্য পেতে হলে প্রতিদিন এই চার শ্রেণির খাদ্য খেতে হবে। এই চার শ্রেণি থেকে খাদ্য নির্বাচনে বৈচিত্র্য থাকা উচিত বলে পুষ্টিবিদগণ মনে করেন।

খাবার তৈরি করার সময় লক্ষ রাখতে হবে সেখানে যেন আমিষ, শর্করা, ম্নেহ পদার্থ, ভিটামিন ও খনিজ লবণ থাকে।

সকালের খাবার আমাদের দেশে অত্যন্ত হালকা ধরনের হয়ে থাকে। আজকাল গ্রাম বা শহরে প্রায় সর্বত্রই বয়স্কদের সকালের দিকে চা পান করতে দেখা যায়। চায়ের সাথে অন্তত হালকা কিছু খাবার গ্রহণ করা উচিত। সকাল বেলায় খাবার হিসেবে রুটি, মাখন বা একটি ডিম, একটি কলা খেতে পারলে দেহের যাবতীয় পুষ্টি উপাদানগুলো সংগ্রহ করা সহজ হবে। গরমের দিনে আর্থের গুড়ের সাথে চিড়া ভিজিয়ে খেলে শরীর সুস্থ থাকে।

আমাদের দেশে দুপুরের খাবারকে সাধারণত প্রধান খাদ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দুপুরের খাবারের খাদ্য উপাদান বাছাইয়ে অবশ্যই সুব্য আদ্যতালিকার সাহায্য নিয়ে সেভাবে খাদ্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। প্রতিমের দেশে মাছ প্রোটিনের উৎসুক উৎস। তবে শীতকালে মাছের সাথে মাছের মাঝে বৈচিত্র্য এলে দেবে। খাওয়ার শেষে দই অথবা ফল খাদ্যতালিকায় থাকলে ভালো হয়।

আমাদের দেশে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ও চাকরিজীবীদের অনেকেই দুপুরে খাবার সময় ঠিক থাকে না। তাই তারা বিকেলে কিন্তু হালকা খাবার খেয়ে থাকেন। আর্থিক অবস্থা অনুবায়ী বিকেলের জন্য এমন খাদ্যের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, যেন সকল ধরনের খাদ্য উপাদান থাকে।

রাতের খাবার সাধারণত সহজপাই হওয়া উচিত। এজন্য রাতে আমিষজাতীয় খাবার কম খাওয়া ভালো। ছাত্রছাত্রীদের প্রতিদিন রাতে শোয়ার আগে আর্থিক সামর্থ্য অনুসারে দুধ বা অন্য শক্তি উৎপাদক তরল খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। এভাবে খাদ্য বাছাই করে উন্নত জীবন যাপন করা যেতে পারে।

### ফাস্ট ফুড বা জাঙ্ক ফুড

ফাস্ট ফুড বা জাঙ্ক ফুড হচ্ছে এমন এক ধরনের খাবার, যা স্বাস্থ্যগত উপাদানের পরিবর্তে মুখোরচক স্বাদের জন্য উৎপাদন করা হয়। এগুলো খেতে খুব সুস্বাদু মনে হতে পারে, কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই এই খাবার শরীরের জন্য ভালো নয়। সুস্বাদু করার জন্য এতে শায়খই অতিরিক্ত রাসায়নিক পদার্থ থাকে যেগুলো অস্বাস্থ্যকর। ফাস্টফুড সাধারণত থচুর পরিমাণে থাপিজ চর্বি ও চিনি থাকে। বার্গার, ফ্রায়েড চিকেন, পিংজা, টিপস, মচমচে ভাজা খাবার, কেক কিংবা বিস্কুটে উচ্চমাত্রায় প্রাপিজ চর্বি থাকে। সক্রট প্রিংক, কোলা কিংবা লেবনের মতো প্যাসীয় পানীরতে অতিরিক্ত চিনি থাকে। আমরা যখন অধিক পরিমাণে চর্বিজাতীয় খাবার খাই, তখন আমাদের দেহ এগুলোকে চর্বিকলায় রূপান্তরিত করে এবং অধিক পরিমাণে চিনি আমাদের দাঁত ও দৃককে নষ্ট করে দিতে পারে। ফাস্ট ফুড কখনো সুব্য খাদ্যের মধ্যে পড়ে না। ফাস্ট ফুডে আমাদের জন্য দরকারি ডিটাইন ও খনিজ পদার্থের অভাব রয়েছে। ফাস্ট ফুড খাওয়ার কারণে উচিত বয়সের ছেলেমেয়েদের দেহ স্থূলকায় হয়ে পড়ে। প্যাকেট বা কোটাজাত খাবারের চেয়ে প্রাকৃতিক সঙ্গীব খাবার স্বাস্থ্যের জন্য অনেক ভালো।



### একক কাজ

**কাজ:** কোনো একটি ফাস্ট ফুড জাতীয় খাবার নিয়ে তার মাঝে কোন কোন খাদ্য উপাদান আছে এবং কোনটি নেই তার জালিকা কর।

## ১.৪ খাদ্য সংরক্ষণ

প্রাকৃতিক কারণে সব ধরনের খাদ্য সময়ের সাথে নষ্ট বা খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। খাদ্য নষ্ট হওয়ার কারণগুলো হচ্ছে: জীবাণু ও ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হওয়া এবং পরিবেশের কারণে সেগুলোর দ্রুত বৃদ্ধি, খাদ্যের মধ্যে উৎসেচকের বৃদ্ধি, পরিবেশে আর্দ্রতা, তাপে অঙ্গের পরিমাণ বৃদ্ধি। এই কারণগুলো এককভাবে খাদ্যকে নষ্ট করে না। কয়েকটি কারণ একত্রে সংগঠিত হয়ে খাদ্য নষ্ট করে। যেমন, পরিবেশে আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেলে জীবাণুর বৃদ্ধি ঘটে এবং খাবারকে নষ্ট করে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে খাদ্যবস্তুর উৎসেচকের পরিমাণের বৃদ্ধি ঘটে খাদ্যকে নষ্ট করে দেয়।

জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়া খাদ্য নষ্ট করে সেখানে এক ধরনের বিষাক্ত উপাদান তৈরি করে। এই বিষাক্ত উপাদানগুলোকে টক্সিন বলে। এই টক্সিনগুলো নানা ধরনের হয় এবং কোনো কোনো টক্সিনে আক্রান্ত হওয়াকে আমরা ফুড পয়জনিং বলে থাকি। টক্সিন স্লায়ুতন্ত্রকে আক্রমণ করে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে।

ইস্টজাতীয় ছত্রাক ফলের রস, টমেটোর সস, জেলি, মিষ্টি আচার, শরবত ইত্যাদি খাবার দ্রুত নষ্ট করে ফেলে। এতে খাবারে টক গন্ধ হয় এবং ঘোলাটে হয়ে যায়। যদি পাউরুটি কয়েক দিন খোলা স্থানে রাখা যায়, তাহলে দেখা যায় এর ওপর ধূসর বর্ণের আবরণ তৈরি হয়েছে। এটি মৌলিক জাতীয় ছত্রাক (যেমন: মিউকর, এসপারজিলাস) দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। কমলালেবু, টমেটো, পনির, আচার প্রভৃতি টকজাতীয় খাবার এগুলোর দ্বারা সহজে নষ্ট হয়।

খাদ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে আমরা এক খাতুর ফল, শস্য, সবজি, মাছ এবং অন্যান্য খাদ্য অন্য খাতুতেও পেতে পারি। বছরের কোনো একটি সময়ে ও স্থানে কোনো ফসলের উৎপাদন বেশি হলে তা সংরক্ষণের মাধ্যমে অন্য সময়ে ব্যবহার, বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তর বা রপ্তানি করতে পারি। কাজেই খাদ্যের গুণগত মান ঠিক রেখে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য বিভিন্ন উপায়ে আমরা সংরক্ষণ করে আমরা আমাদের খাদ্যঘাটতি মেটাতে পারি।

### ১.৪.১ খাদ্য সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি

খাদ্য নষ্ট হয় জীবাণু বৃদ্ধি ও জীবাণু দ্বারা নিঃসৃত উৎসেচকের ক্রিয়ার কারণে। পানি ও উষ্ণতা জীবাণু বৃদ্ধি ও উৎসেচকের ক্রিয়া ভূরাধিত করার জন্য খুবই উপযোগী অবস্থা। ফলে এ অবস্থা খাদ্যকে দ্রুত পচনে প্রভাবিত করে। পচনের সাহায্যকারী এসব বিষয়কে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা গেলে খাদ্য বহুদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা সম্ভব।

বিশেষ কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করে বাণিজ্যিকভাবে খাদ্য সংরক্ষণ ও বাজারজাত করা হয়। আমাদের বাসায় সাধারণ সংরক্ষক দ্রব্যের ও যন্ত্রপাতির ব্যবহারে খাদ্য সংরক্ষণ করা হয়। এরকম কয়েকটি

পদ্ধতির নাম এখানে উল্লেখ করা হলো:

**১. শুক্ফকরণ:** খাদ্যবস্তুকে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা একটি প্রাচীন পদ্ধতি। শুক্ফকরণ পদ্ধতিতে খাদ্যবস্তু থেকে পানি শুকিয়ে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া জন্ম এবং এনজাইম ক্রিয়াকে প্রতিহত করা যায়। খাদ্যকে অনেক দিন পর্যন্ত এভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

**২. রেফ্রিজারেশন:** রেফ্রিজারেশন পদ্ধতিতে কাঁচা শাক-সবজি, ফল, রান্না করা খাদ্য, মিষ্টিজাতীয় খাবার কিছুদিন পর্যন্ত রাখা যায়। এ পদ্ধতিতে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি ও এনজাইমের ক্রিয়া, কোনোটাই দীর্ঘদিনের জন্য প্রতিরোধ করা যায় না।

**৩. ফ্রিজিং:** ফ্রিজিং পদ্ধতিতে খাদ্যকে ও খাদ্যদ্রব্যকে  $0^{\circ}$  ফারেনহাইট অথবা তার নিচের তাপমাত্রায় রাখা হয়। এ পদ্ধতিতে খাদ্যদ্রব্য দীর্ঘদিন ভালো থাকে। ফ্রিজিং পদ্ধতিতে শুধু টাটকা শাক-সবজি, ফল, ফলের রস, মাছ, মাংস সংরক্ষণ করা হয় না, এ পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত খাবার, আইসক্রিম এবং বিভিন্ন রকমের তৈরি খাবারও সংরক্ষণ করা যায়।

**৪. সংরক্ষক দ্রব্য:** রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা খাদ্যের পচন রোধ করা যায়। এগুলোকে সংরক্ষক (Preservative) বলে। খাদ্যকে পচন থেকে রক্ষা করা এবং খাদ্যে যেন ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে না পারে সেজন্য রাসায়নিক সংরক্ষক ব্যবহার করা হয়। এগুলোর কোনো পুষ্টিগুণ নেই। সঠিক পরিমাণের মাত্রা জেনে খাদ্যে সংরক্ষক প্রয়োগ করা উচিত। রাসায়নিক সংরক্ষক পদার্থগুলো বিভিন্ন ধরনের এবং ব্যবহারও বিভিন্ন রকম। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রাসায়নিক সংরক্ষকের নাম নিচে উল্লেখ করা হলো: এগুলোর সঠিক পরিমাণের মাত্রা জেনে সংরক্ষণ খাদ্যে প্রয়োগ করা উচিত। রাসায়নিক সংরক্ষক পদার্থগুলো বিভিন্ন ধরনের এবং ব্যবহারও বিভিন্ন রকম।

(ক) ভিনেগার আমাদের অতিপরিচিত। আচার, চাটনি, সস প্রভৃতিতে ভিনেগার ব্যবহার করে জীবাণুর বৃদ্ধি রোধ করা হয়। এসেটিক এসিডের ৫% দ্রবণকে ভিনেগার বলে।

(খ) সালফেটের লবণ যেমন Sodium bisulphite অথবা Potassium-meta bisulphite ব্যবহার করে ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য অগুজীবের বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা যায়।

(গ) Sodium benzoate, এটি Benzoic Acid— এর লবণ। এটি বিশেষ করে ছত্রাক ইস্ট এর বৃদ্ধিকে প্রতিহত করে। ফলের রস, ফলের শাঁস ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য Sodium benzoate খুব উপযোগী।

উপরে উল্লিখিত রাসায়নিক সংরক্ষকগুলো ছাড়া Propionic Acid— এর লবণ এবং Sorbic Acid— এর লবণ Sorbates ব্যবহার করে দই, মিষ্টি, পনির, মাখন ও বেকারি সামগ্ৰী সংরক্ষণ করা হয়।

উপরে উল্লিখিত রাসায়নিক সংরক্ষকগুলো ভিন্ন ভিন্ন ধরনের খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে

ব্যবহার করতে হয়। এই রাসায়নিক পদার্থগুলোকে নির্দিষ্ট পরিমাণে ব্যবহার না করে যদি যথেষ্ট ব্যবহার করা হয়, তাহলে সেগুলো মানবদেহে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

**৫. চিনি বা লবণের দ্রবণে সংরক্ষণ:** চিনি ও লবণের দ্রবণ খাদ্যসংরক্ষক হিসেবে বহুবছর পূর্ব থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। লবণের দ্রবণকে ব্রাইন বলে। চিনি ও লবণের ঘন দ্রবণ বহি-অভিস্থিতিগুলোকে ধ্বংস করে খাদ্যকে পচন থেকে রক্ষা করে।

চিনি প্রয়োগ করে ফলের জ্যাম, জেলি ও মারমালেড তৈরি হয়। পেয়ারা, আপেল, আনারসজাতীয় ফলকে কেটে পরিষ্কার করে চিনির ঘণ দ্রবণে রেখে বায়ু নিরোধী করে দীর্ঘদিন রাখা যায়।

সংরক্ষিত খাদ্য ব্যবহারের আগে যদি খাদ্যের রঙের পরিবর্তন ঘটে অথবা খাদ্য ফুলে উঠে, খাদ্যের উপর সাদা অথবা কালো আন্তরণ সৃষ্টি হয় এবং খাদ্যের ওপরটা পিছিল হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে খাদ্যে পচনক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এ ধরনের খাদ্য গ্রহণ করা যাবে না, কারণ তাহলে ফুড পয়জনিং হতে পারে।

### ১.৪.২ খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার ও এর শারীরিক প্রতিক্রিয়া

বর্তমানে দুধ, ফল, মাছ এমনকি মাংসকে পচন থেকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট ফরমালিন নামক বিষাক্ত একটি রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হচ্ছে। খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের জন্য এর ব্যবহার নিষিদ্ধ। কিন্তু আমাদের দেশে কিছু অসাধু ও বিবেকবর্জিত ব্যবসায়ী তারপরও ফরমালিনকে খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহার করছে। এর দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহারে বদহজম, পাতলা পায়খানা, পেটের নানা পীড়া, শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, লিভার ও কিডনি নষ্ট হওয়াসহ ক্যান্সারের মতো মরণব্যাধি হতে পারে। ফরমালিন দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহারে মেয়েদের গর্ভজাত সন্তান বিকলাঙ্গ পর্যন্ত হতে পারে।

**বিভিন্ন ফল যেমন:** আম, টমেটো, কলা ও পেঁপে যেন দ্রুত পাকে, তার জন্য Riper এবং Ethylene নামক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হচ্ছে। এগুলো ফল পাকানোর জন্য ব্যবহার করলে সে ফলকে ৭-৮ দিন পর বাজারজাত করা উচিত। কিন্তু তা না করে অনেক সময় ২-৩ দিনের মধ্যে বাজারজাত করা হয়। এতে রাসায়নিক পদার্থগুলোর কার্যকারিতা থেকে যায় এবং এ ধরনের ফল খাওয়ার ফলে মানবশরীরে জটিল রোগ সৃষ্টি হতে পারে।

ফল পাকানোর জন্য ক্যালসিয়াম কার্বাইড নামক এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থকে ব্যবহার করা হয়। এটি এমন ধরনের যৌগ, যা বাতাসের বা জলীয় বাক্সের সংস্পর্শে এসেই উৎপন্ন করে অ্যাসিটিলিন গ্যাস, যা পরবর্তীকালে অ্যাসিটিলিন ইথানল নামক বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়। এটি স্বাস্থ্যের ভয়নক ক্ষতি করে।

আম যেন দ্রুত না পাকে এবং গাছে দীর্ঘদিন থাকে, সে জন্য আমাদের দেশে কিছু আম ব্যবসায়ী কালটার (Culter) নামের হরমোন জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ গাছে স্প্রে করে। এতে ফল দ্রুত পরিপন্থ হয় এবং

না শেকে দীর্ঘসময় গাছে থাকে। এটিও স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়।

এসব বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করার জন্য তোক্তা অধিকার রক্ষার ভোক্তা আইন আরও কঠিনভাবে প্রয়োগ করার জন্য ইলেক্ট্রনিক প্রিডিয়া ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করে সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ ধরনের ফল না কেবার জন্য জনগণকে সচেতন হতে হবে। যারা এ ধরনের রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে থাকে সহজে করে এবং ফল পাকায়, তাদের বিবুঝে কঠিন শান্তিমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ নিতে হবে। এ ব্যাপারে আয়োগ আদালত এবং জনগণের সচেতনতা সবচেয়ে বেশি কার্যকর প্রভাব ফেলতে পারে।

## ১.৫ তামাক ও ছাগল

তামাক পাছের পাতা ও ডাল শুকিয়ে তামাক তৈরি হয়। শুকনা তামাকশাতা কূটি কূটি করে কেটে তাকে বিশেষ কাপড়ে মুড়িয়ে সিগারেট এবং পাতায় মুড়িয়ে বিড়ি ও চুরুট বানানো হয়। এগুলোকে পুড়িয়ে তার খোঁয়া ও বাল্প সেবনকে ধূমপান বলে। তামাক থেকে নিকোটিন নামক পদার্থ বের হয়, যা মাদকজ্বর হিসেবে নার্কেক ঘেঁষন সামগ্রিকভাবে উৎপন্ন করে, তেমনি নানাভাবে শরীরের ক্ষতি করে। ধূমপান করলে নিকোটিন ছাড়াও আরুণ কিছু বিষাক্ত পদার্থ শরীরে প্রবেশ করে। ধূমপানের খোঁয়ায় উজ্জ্বলতায় বিষাক্ত গ্যাস ও রাসায়নিক পদার্থ এবং মাদকজ্বরের সংমিশ্রণ থাকে। এই পদার্থগুলো রক্তের হিমোগ্লোবিনের অঙ্গীজেল বহনক্ষমতা কমিয়ে দেয়। এছাড়া কতগুলো আঠালো পদার্থ ও হাইজ্যুকার্বন প্রভৃতি এতে থাকে, যা মুসকুসে নালা ধরনের ব্যাধি (চিত্র ১.০৬), এমনকি ক্যালার সৃষ্টি করে।

### ১.৫.১ ধূমপানের ক্ষতিকর দিক

আয়োগের সবচেয়ে পরিচিত মাদক হচ্ছে ধূমপান। ধূমপানের ফলে মানবদেহে যেসব ক্ষতিকারক অবস্থা ও রোগ দেখা দেয় মেঘগুলো হলো:



চিত্র ১.০৬: বেসব লোক ধূমপান করে না (বাঁয়ে) তাদের কুসকুস এবং ধূমপার্সীদের (ভালো) কুসকুস

১. ধূমপায়ীরা অন্যদের থেকে বেশি রোগাক্রান্ত হয়।
২. ধূমপায়ীরা কোনো না কোনো রোগে ভোগে যেমন: ফুসফুস ক্যাল্সার, টেঁট, মুখ, ল্যারিংক্স, গলা ও মূত্রথলির ক্যাল্সার, ব্রংকাইটিস, পাকস্থলীতে ক্ষত এবং হৃদ্যন্ত ও রক্তঘটিত রোগ। ফুসফুসে ক্যাল্সার দেখা দিলে রোগী প্রায় ৫ বছরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে।
৩. সমীক্ষায় দেখা গেছে, যারা বেশি ধূমপান করে, তাদের আয়ু কমে যায়।
৪. যেসব লোক ধূমপান করে না অথচ ধূমপায়ীদের কাছাকাছি থেকে ধূমপায়ীর নির্গত ধোঁয়া প্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে, তাদেরও শারীরিক ক্ষতি হয়।

## ১.৫.২ ধূমপান ও তামাকজাত পদার্থের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে প্রচেষ্টাসমূহ

১. বাস, রেল, খোলা স্থানে, রেস্টোরাঁয়, অফিস, হাসপাতাল, রেলস্টেশন প্রভৃতি এলাকায় ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেখানে সেখানে ধূমপান করা এখন আইনত দণ্ডনীয় এবং আমাদের দেশে এর জন্য সুনির্দিষ্ট আইনও আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই আইনের সঠিক প্রয়োগ না থাকার কারণে মানুষ এখনো যেখানে সেখানে ধূমপান করে আশপাশের বায়ুকে দূষিত করে যাচ্ছে। প্রচলিত আইনকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা আবশ্যিক। এ ব্যাপারে সরকারকে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে।
২. বিক্রয়যোগ্য তামাকজাত পদার্থের মোড়কে “ধূমপান বিষপান” বা “ধূমপান শরীরের জন্য ক্ষতিকর” কথাগুলো ছাপানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
৩. তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।
৪. স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিকটে সিগারেট ও তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও বিক্রয় সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন।

## ১.৬ ড্রাগ আসন্তি

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ড্রাগের একটি সংজ্ঞা দিয়েছে। এই সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, ড্রাগ এমন কিছু পদার্থ, যা জীবিত প্রাণী গ্রহণ করলে তার এক বা একাধিক স্বাভাবিক আচরণের পরিবর্তন ঘটে।

ড্রাগকে সাধারণ ভাষায় আমরা মাদক বলি। ক্রমাগত মাদকদ্রব্য সেবনের কারণে যখন এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যে মাদকদ্রব্যের সাথে মানুষের এক ধরনের দৈহিক ও মানসিক সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং নিয়মিতভাবে মাদক গ্রহণ না করলে শারীরিক এবং মানসিক সমস্যায় পড়ে, তখন তাকে বলে মাদকাসন্ত বা ড্রাগ নির্ভরতা (চিত্র ১.০৭)।

উজ্জ্বলতার জীবনধারা এগুলোর উপর মানুষের আসন্নি সৃষ্টি হয়, সেগুলো হচ্ছে বিড়ি, সিগারেট, আফিম ও আফিমজাত পদার্থ, হেরোইন, মদ, পেথিজিন, বারবিচুরেট, কোকেন, ভাঁৎ, চৱস, ম্যারিজুয়ানা, এলএসডি ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে হেরোইন একটি মারাত্মক জ্বাপ।

জ্বাপের উপর কোনো ব্যক্তির আসন্নি নানাভাবে জাগতে পারে, যেমন: কৌতুহল, সঙ্গদোষ, হতাপ্যা দূর করার প্রচেষ্টা, মানসিক যত্নশা জ্বলে ধাকার পদ্ধতি, নিজেকে বেশি কার্যক্ষম করা, পারিবারিক অশান্তি থেকে ঘৃণ্ণিত আকাঙ্ক্ষা কিংবা পারিবারিক অভ্যাসগত। বাবা বা মা কোনো মাদকে আসন্ন ধাকলে তার থেকে স্পষ্টভাবে ওই মাদকে আসন্ন হওয়ার সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা থাকে।



### ১.৬.১ মাদকাসন্তির লক্ষণ

যে ব্যক্তি মাদকদ্বয়ে আসন্ন, তার মধ্যে কতগুলো লক্ষণ প্রকাশ পায়। অনেকগুলো লক্ষণ সাধারণত স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। উজ্জ্বলতার জীবনগুলো হলো এরকম:

**ঠিক ১.০৭: মাদকাসন্তি একজনের জীবন পুরোপুরি ধৰণে করে দেয়।**

১. ধীৰণার প্রতি আকর্ষণ করে ধীৰণা
২. সবসময় অলোচ্ছালোভাবে ধাকা
৩. দৃষ্টিতে অস্বচ্ছতা এবং চোখ লাল হওয়া
৪. কোনো কিছুতে আগ্রহ না ধাকা এবং সুন্দর না হওয়া
৫. কর্মবিমুখতা ও হতাপ্যা
৬. শরীরে অত্যধিক শায় নিষ্পত্তি
৭. সবসময় নিজেকে সবার থেকে দূরে রাখা
৮. আলস্য ও উজ্জিঞ্চ ভাব
৯. মনসংযোগ না ধাকা, টাকা-পঞ্চা চুরি করা এমনকি মাদকের টাকার জন্য বাড়ির জিনিসপত্র সরিয়ে পোপনে বিক্রি করা ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা অনিচ্ছা ছাড়াও কিছু সামাজিক তথ্য পরিবেশের কারণেও মাদকদ্বয়ের প্রতি মানুষের আকর্ষণ জন্মাতে পারে, যেখান থেকে সে ধীরে ধীরে মাদকাসন্ত হয়ে পড়ে।

মাদকাসন্তির কতগুলো কারণ ছকে উজ্জ্বলতা করা হলো:

পরিবেশগত কারণ	পরিবারের কারণ
<ol style="list-style-type: none"> <li>১. মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা</li> <li>২. বেকারত্তি</li> <li>৩. অসামাজিক পরিবেশ</li> <li>৪. অল্প বয়সে শুল থেকে বিদায়</li> <li>৫. সিনেমা বা কোনো টিভি সিরিয়াল দেখা</li> <li>৬. আশেপাশে ড্রাগের রমরমা ব্যবসা</li> <li>৭. পেশাগত কারণ</li> <li>৮. অসামাজিক কাজ ও অপরাধ বেশি হয়, সে সব স্থানে বাস করা</li> <li>৯. যেখানে ড্রাগ নেওয়ার সুযোগ বা দল থাকে, তার আশেপাশে বসবাস করা</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>১. বাবা-মায়ের নিয়ন্ত্রণের অভাব</li> <li>২. হতাশা</li> <li>৩. একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতা</li> <li>৪. সন্তানের বেপরোয়া ভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া</li> <li>৫. পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতা</li> <li>৬. সন্তানের প্রতি যত্নহীনতা</li> <li>৭. উগ্র জীবনযাত্রা বা মানসিকতা</li> <li>৮. খারাপ সাহচর্য</li> </ol>

## ১.৬.২ ড্রাগ আসন্তি নিয়ন্ত্রণ

কোনো ব্যক্তি ড্রাগের উপর আসন্তি হলে তা বন্ধ করা বেশ কঠিন কাজ। কারণ ড্রাগ আসন্তি মানুষ নিজের শরীরে মাদকের কুপ্রভাব বুঝতে পেরেও সেটা ছাড়তে পারে না। সঠিক চিকিৎসাব্যবস্থায় মাদকদ্রব্যে আসন্তি কমানো যায়, তবে সে ক্ষেত্রে মাদকাসন্তি ব্যক্তি যদি সহযোগিতা না করে তাহলে তেমন ব্যবস্থা নেওয়া যায় না। মাদক নিরাময় হাসপাতাল অথবা কেন্দ্রে মাদকাসন্তি মানুষকে ভর্তি করতে হবে এবং যথেষ্ট সহানুভূতির সাথে তার চিকিৎসা করতে হবে।

প্রথমে আসন্তি ব্যক্তিকে তার ড্রাগ নেওয়া বন্ধুদের কাছ থেকে আলাদা করতে হয়। লক্ষ রাখতে হয় কোনোভাবেই যেন তার কাছে মাদকদ্রব্য পৌঁছাতে না পারে। এরপর তার মানসিক চিকিৎসা করা প্রয়োজন হয়, যেন সে ড্রাগের কথা মনে আনতে না পারে, তার জন্য তাকে বিশেষ কোনো কাজে যুক্ত করতে হয়। সে যে মাদকদ্রব্যে আসন্তি হয়, সেটি একবারে হঠাতে বন্ধ না করে ধীরে ধীরে মাত্রা কমিয়ে কমিয়ে শেষে একেবারে বন্ধ করতে হয়। হঠাতে করে বন্ধ করা শারীরিকভাবে বিপজ্জনক হতে পারে। ঘুম ঠিকমতো না হলে বা বেশি অস্থিরতা বা বিদ্রোহীভাব দেখা দিলে ডাক্তাররা স্নায়ু শিথিলকারক ঔষধ এবং ঘুমের উষ্ণ দিয়ে চিকিৎসা করে থাকেন।

মাদক সেবন শুধু যে ড্রাগ আসন্তি মানুষটির ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সমস্যা তা নয়, মাদক সেবন যেকোনো পরিবারে বড় রকমের সমস্যা ও বিশৃঙ্খলা বয়ে আনে। এই সমস্যা সামগ্রিকভাবে সমাজ ও দেশের উন্নতির পরিপন্থী। মাদকদ্রব্যের ব্যবসা করে সমাজের কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ধর্মী হয়, কিন্তু অন্যদিকে অনেক মানুষের এবং সমাজজীবনে ভয়াবহ দুর্ঘোগের কালো ছায়া নেমে আসে। সম্ভাবনাময় ছাত্-

ছাত্রীদের পড়ালেখা নষ্ট হওয়া থেকে শুরু করে সামাজিক অপরাধ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। শুধু তা-ই নয় মাদকাসন্তির কারণে অকালমৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। এ জন্য মাদকদ্রব্য সেবন ও এর ব্যবসা-বাণিজ্য কঠিনভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। এর জন্য ব্যক্তিগত এবং সমাজসেবামূলক সংস্থাগুলোর পাশাপাশি দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা এবং সরকারি প্রচেষ্টা মাদক নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে ফলপ্রসূ হতে পারে।

### সামাজিক প্রচেষ্টা

১. মাদকাসন্তি ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা এবং তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
২. মাদকাসন্তি ব্যক্তিকে পরামর্শ দেওয়া।
৩. পুনর্বাসন করে সমাজের স্বাভাবিক স্থানে এনে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা।

### সরকারি প্রচেষ্টা

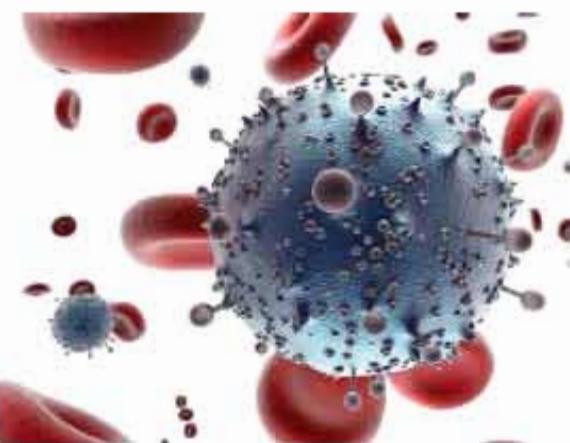
১. মাদক সেবন, বিক্রয় নিষিদ্ধ করা। এ ব্যাপারে কড়া আইন প্রণয়ন করে কঠোরভাবে সেগুলো প্রয়োগ করা প্রয়োজন।
২. মাদক সেবনের কুপ্রভাবগুলো সরকারি ও বেসরকারি প্রচারমাধ্যম দ্বারা মানুষকে অবহিত করা।
৩. আমাদের দেশে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইন বলবৎ আছে। আইনগুলো যথাযথভাবে প্রয়োগ হলে মাদকের বিষাক্ত ছোবল থেকে মানুষ ও দেশকে অনেকটুকু বাঁচানো সম্ভব হবে।

## ১.৭ এইডস (AIDS)

সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী রোগ হচ্ছে ‘এইডস’। এটি একটি সংক্রামক রোগ। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম আমেরিকায় AIDS চিহ্নিত হয় এবং তখন থেকে সারা বিশ্বে AIDS মরণব্যাধি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আফ্রিকার দেশগুলোতে এর প্রকোপ সবচেয়ে বেশি।

প্রাকৃতিক নিয়মে সব মানুষের দেহেই রোগ-জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকে, একে ইমিউনিটি বলা হয়। আমাদের রক্তের মধ্যে এমন কিছু ব্যবস্থা আছে, যার সাহায্যে আমরা প্রাকৃতিকভাবে সবরকম জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারি। রক্তের লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি প্রস্তুতের মাধ্যমে জীবাণুর আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে। AIDS— এ আক্রান্ত ব্যক্তির নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায় এবং একসময় আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু ঘটে। এ জন্য রোগটির নাম দেওয়া হয়েছে ‘অ্যাকুয়ার্ড ইম্যুন ডেফিসিয়েন্সি সিন্ড্রম’ যা সংক্ষেপে AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)। এক ধরনের ভাইরাস, যার নাম Human Immuno Deficiency Virus (চিত্র ১.০৮),

এবং যাকে সংকেপে HIV বলা হয়, এই AIDS রোগের সংক্রমণ করে থাকে।



চিত্র ১.০৮: রক্তে HIV ভাইরাস

### ১.৭.১ AIDS রোগের কারণ

HIV দেহের স্বাস্থ্যিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। দেহের রক্তস্তোত্তে প্রবেশ করার পর HIV বজ্জ্বল খেত কপিকার T- লিঙ্গোসাইটকে আক্রমণ করে। এ কারণে অগুলো নষ্ট হয়ে থাইরাস দেহের স্বাস্থ্যিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে থার। এর ফলে শরীরে মানু রকমের বিরুদ্ধ

রোগের সংক্রমণ ঘটে যার মধ্যে ডেজ্ঞাবোগ্য হচ্ছে খাসভজ্জের রোগ, অস্তিক্রমের রোগ, পরিপাকতত্ত্বের রোগ এবং টিউমার। সেখা গোছে HIV ভাইরাস সংক্রমণের পর প্রথম ৫ বছর পর্যন্ত মানুষের দেহে কোনো রোগ লক্ষণ দেখাশ পাব না। এসব মানুষ তখন এই রোগের বাহক হিসেবে কাজ করে এবং তখন তারা অন্যকে সংক্রমিত করতে পারে।

এ জোগে কাজা বেশি আক্রান্ত হতে পারে সে সমর্কে ইতিবাহে অনেক তথ্যই জানা গেছে। প্রধানত যৌন ক্রিয়ার মাধ্যমেই আক্রান্ত ক্ষমতির দেহ থেকে HIV সৃষ্টি করিয়ে দেহে সংক্রমিত হয়। সমকার্যী কিংবা নারী-পুরুষের মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত (unprotected) যৌন সংযোগের মাধ্যমে এই ভাইরাস সংক্রমিত হতে পারে। গর্ভবতী নারী এ জোগে আক্রান্ত হলে তার সম্ভাননের মধ্যে এ রোগ সেখা নিতে পারে। মাঝের বুকের মূখের মাধ্যমে আক্রান্ত নারীর দেহ থেকে সঙ্গীজ্ঞাত লিশুর দেহে HIV সংক্রান্ত হতে পারে। প্রাণ্যাত্মক সংযোগের সময় AIDS আক্রান্ত ব্যক্তির বজ্জ্বল মাধ্যমে কিংবা ছাগ ব্যবহারকারীদের সিরিজের মাধ্যমে HIV সংক্রান্ত হয়ে থাকে। খাদ্য, পানি, মশা বা কীটপতঙ্গ অথবা পাইচল রোগীর সাথৰণ স্পর্শের মাঝে এ রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। তবে রক্ত, দীর্ঘ, লালা, অশু ইত্যাদি শারীরিক তরঙ্গের মাধ্যমে AIDS সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

AIDS প্রতিরোধ করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, HIV সংক্রমণ কীভাবে ঘটে সে সময়ে সবাইকে শিকা দেওয়া। অন্যকে সংক্রমিত না করার ব্যবস্থা অবশ্যই করা এবং নিজেকে HIV সংক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখা। রক্তদান বা শুণ্খ, অনিয়ন্ত্রিত (unprotected) যৌন সমর্ক এবং ছাগ ব্যবহারকারীদের সিরিজের মাধ্যমে HIV সংক্রমণের সুরক্ষিত সহায় করার পর্যায়ের মাধ্যমে এই AIDS রোগের বিস্তার কমানো থার। সরকার এবং বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাগুলো মরণকারী AIDS— এর সংক্রমণ কীভাবে ঘটে সে সময়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করে এ রোগ থেকে জনসাধারণকে সুরক্ষিত করা যাতে পারে।

## ১.৮ স্বাস্থ্য রক্ষায় শরীরচর্চা এবং বিশ্রাম

শরীরই মানুষের প্রথম পরিচয়। তাই শরীরকে মানুষের জীবনসংগ্রামের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার বলা যেতে পারে। এই হাতিয়ারকে ঠিক রাখার দায়িত্ব আমাদেরই। শরীরকে ঠিক রাখার জন্য চাই সুষম খাদ্যের পাশাপাশি নিয়মিত শরীরচর্চা বা ব্যায়াম। এর মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে মানুষের শারীরিক দৃঢ়তা।

মানুষের জীবনে নিয়মিতভাবে ঘুম, খাওয়া এবং বিশ্রাম নেওয়া আবশ্যিক, এগুলো মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশকে সঠিকভাবে কাজকর্ম করতে সাহায্য করে। তবে মনে রাখতে হবে, এগুলো কোনোভাবেই শরীরের সুস্থ সম্পদগুলোর বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে না। এই বিকাশ একমাত্র নিয়মিত শরীরচর্চা বা ব্যায়ামের মধ্য দিয়েই সম্ভব হতে পারে। একটা গাছের সবকিছু নির্ভর করে তার শিকড়ের ওপর, ঠিক তেমনি মানুষের চলাফেরা, ভাবনা-চিন্তা ইত্যাদি সবকিছুই নির্ভর করে তার ম্লায়ুতন্ত্রের কার্যক্ষমতার ওপর। সুস্থ ম্লায়ুতন্ত্র গড়তে হলে নিয়মিত অঙ্গ চালনার সাহায্যে উপযুক্ত এবং পরিমিত শরীরচর্চার প্রয়োজন আছে।

আমরা সকলেই জানি, ম্লায়ুতন্ত্র শরীরের মাংসপেশি নিয়ন্ত্রণ করে। তাই যদি নিয়মিত মাংসপেশির ব্যায়াম করি, তাহলে সহজেই ম্লায়ুতন্ত্রকে সতেজ এবং সক্রিয় করে তোলা যাবে। এর ফলে ম্লায়ুতন্ত্রের বিকাশ ঘটবে। শুধু তা-ই নয়, নিয়মিত শরীরচর্চার মধ্য দিয়ে যদি শরীরের বিভিন্ন দেহতন্ত্র বা জৈব তন্ত্রগুলোকে সক্রিয় করে তোলা যায়, তাহলে সেগুলোরও পর্যাপ্ত বিকাশ ঘটবে এবং যার ফলে আমাদের দৈনিক কাজকর্ম সম্পাদন করার ক্ষমতা অনেকাংশে বেড়ে যাবে। দৈনিক নিয়মিত কয়েক মিনিট শরীরচর্চার মধ্য দিয়েই শরীরের পরিপাক করার ক্ষমতা বাড়াতে পারব, রক্ত চলাচলের ক্ষমতা ভালো করতে পারব, পাচন ক্ষমতা ভালো হবে, শ্বাস-প্রশ্বাস ভালো হবে, শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণও আরও সুষ্ঠু হবে। এক কথায় বলা যায়, একটা সুস্থ শরীরের অধিকারী হওয়া যাবে। মনে রাখতে হবে, মাংসপেশির সক্রিয়তা এসব ব্যাপারে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তাই নিয়মিত এমন কিছু শারীরিক ক্রিয়াকলাপের চর্চা করতে হবে, যেন শরীরের প্রধান মাংসপেশিগুলো সক্রিয় এবং উত্তোলিত হওয়ার সুযোগ পায়।

বয়স, দৈহিক গঠন, সাধারণ স্বাস্থ্য প্রভৃতি দিক বিবেচনা করে ব্যায়ামের অভ্যাস করা উচিত। ব্যায়াম যে শুধু নিরানন্দ পরিশ্রমের একটি বিষয় তা কিন্তু নয়। সব রকম খেলাধূলা একদিকে আনন্দের ব্যাপার, অন্যদিকে এগুলো শারীরিক ব্যায়ামও বটে। আজকাল ছেলেরা এবং মেয়েরা সমানভাবে দৌড়ৱাঁপ, সাঁতার, হাঁটা, সাইকেল চালানো, কারাতে থেকে শুরু করে ফুটবল, টেনিস, হকি, ক্রিকেট এসব খেলছে। শরীর ঠিক রাখার জন্য শুধু যে নিয়ম করে ব্যায়াম করতে হয় তা নয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাও সেভাবে গড়ে তুলতে হয়। একজন মানুষ প্রতিদিন যদি ৮ থেকে ১০ হাজার পদক্ষেপ নেয়, তাহলে সে সুস্থ ও নীরোগ একটি দীর্ঘ জীবন আশা করতে পারে।

অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে মানুষ যখন ঝাল্ক হয়ে পড়ে এবং শরীরের পেশিগুলো অবশ হয়ে আসে, তখন সারা শরীরকে কিছুক্ষণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রেখে আরাম করাকে আমরা বিশ্রাম বলি। ঘুমই শ্রেষ্ঠ বিশ্রাম।

দেহ-মনকে সুস্থ ও সতেজ করার জন্য প্রত্যেক মানুষের কমপক্ষে দৈনিক ৬ ঘণ্টা ঘুমের প্রয়োজন। বালক-বালিকাদের ৮/৯ ও শিশুদের ১০/১২ ঘণ্টা করে ঘুমের প্রয়োজন। যারা রাতে কাজ করে, তাদের অবশ্যই দিনের বেলায় পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়া উচিত।

**মনের বিশ্রাম:** কেবল শরীরেরই নয়, মনেরও বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন। শরীর ও মন থেকে সমস্ত রকম উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, অশান্তি, একেবারে দূর করে দিয়ে দেহ-মনকে একান্তভাবে নিন্দ্রার কোলে সঁপে দিতে পারলে তবেই দেহ মনের পক্ষে প্রকৃত বিশ্রাম হয়।

অনেক সময় দেখা যায়, এক কাজ থেকে অন্য কাজে মনেন্দিবেশ করেও শরীর ও মনকে বিশ্রাম দেওয়া যায়। একে কর্মান্তরের মাধ্যমে বিশ্রাম বলা হয়। কঠিন কায়িক শ্রমের পর চিত্তবিনোদন বিশ্রামেরই নামান্তর। আবার কঠিন মানসিক পরিশ্রমের পর কর্মান্তর বিশ্রাম খোঁজার একটা উপায়।

বিখ্যাত লেখকদের মধ্যে অনেককে দেখা যায়, যারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফাউন্টেন পেন পরিষ্কার করে যাচ্ছেন। এতে তিনি কিন্তু আসলে তাঁর কাজের মাধ্যমে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। অনেকে ছবি আঁকেন, অনেকে বাগান পরিচর্যা, পশুপাখি পালন কিংবা শৌখিন সবজি বাগান তৈরি করে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। এ সমস্ত কাজকেই বলে কর্মান্তরের মাধ্যমে বিশ্রাম গ্রহণ।

## অনুশীলনী



### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পাঞ্জের অধিনস্ত কোনটি পাওয়া যাবে?  
 (ক) মুকোজ  
 (খ) ব্রুকটোজ  
 (গ) সুক্রোজ  
 (ঘ) বিটা ক্যারোটিন

২. মেঝে হৃষীয় ডিটামিনগুলো হলো—  
 i. A, D, E  
 ii. A, B, C  
 iii. A, D, K

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii  
 (খ) i ও iii  
 (গ) ii ও iii  
 (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুজ্ঞেটি গড়ে ৩ ও ৮ নং ধাত্রের উভয় দাখ:

রহিমার ওজন ৫০ কেজি ও উচ্চতা ১.৫ মিটার। পতকাল সকাল থেকে তার বামি ও পাতলা পায়খানা হওয়ায় দেহে পানির অভাবসহ ওজন হ্রাস পেয়ে ৪৭ কেজি হয়ে গেছে।

৩. রহিমার দেহে থায়োজনীয় উপাদানটির অভাবে—  
 i. ক্রস্ট চলাচলে বিষ্য বটে  
 ii. পেশি নাড়ুক হয়ে পড়ে  
 iii. শ্বাসের ভারসাম্য বজার থাকে

নিচের কোনটি সঠিক

- (ক) i ও ii  
 (খ) i ও iii  
 (গ) ii ও iii  
 (ঘ) i, ii ও iii

৪. অসুস্থ হওয়ার পর রহিমার ভরসূচি (BMI) কত হয়েছে?

- (ক) ২২.৩ (আয়)    (খ) ২০.৯ (আয়)    (গ) ৪৯.২৫ (আয়)    (ঘ) ৪৪.৭৫ (আয়)

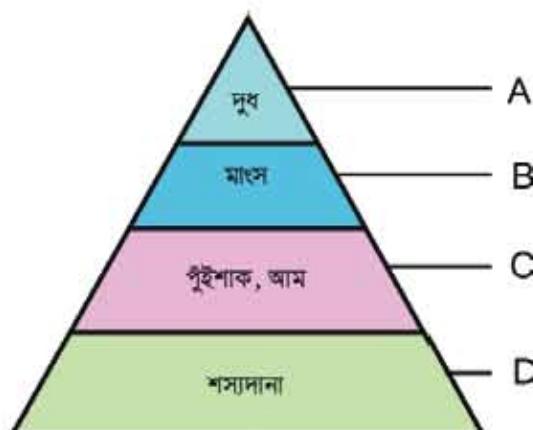


## সূজনশীল প্রশ্ন

১. ১৪ বছরের কমুর তরঙ্গ ৩৫ কেজি এবং উচ্চতা ১.৫ মিটার। ইসলোঁ কাবু দ্বারে আশে সাগ পড়ছে, খৌখোর কেবল ঝুঁটি নেই। কিন্তু দেহের ভাগসমূহ স্বাভাবিক আছে।

- (ক) কৃষ্ণাঞ্জলি কী?
- (খ) জেরগাধ্যালয়িয়া গ্রোপ বলতে কী বুবাবু?
- (গ) তনুর দুই দিনের মৌল বিপাকে কত শক্তি বায় হবে?
- (ঘ) তনুর সমস্যাগুলোর সমাধানের উপায় বিশ্লেষণ কর।

২. নিচের চিত্রটি দেখে খাদ্যগুলোর উক্ত সাং



- (ক) রামেজ কী?
- (খ) খাদ্যপ্রাপ বলতে কী বুবাবু?
- (গ) খাদ্য শিল্পায়িতের খাদ্যগুলোর বিকল্প খাদ্য ব্যবহার করে এক দিনের মুকুরের সুসম খাদ্য তালিকা তৈরি কর।
- (ঘ) D চিহ্নিত খাদ্য উপাদানটি পুরুষপূর্ণ কেন? বিশ্লেষণ কর।

# বিভীষণ অধ্যায়

## জীবনের জন্য পানি



পানির আরেক নাম জীবন। শুধু জীবন ধারণের জন্য নয়, দেশের উন্নয়নের জন্যও আমাদের পানির দরকার। নানা উৎস থেকে আমরা পানি পাই। নানা কারণে আমাদের অতিথ্রয়োজনীয় এই পানির উৎস হৃদকির মুখে পড়ছে। এই অধ্যায়ে আমরা এই হৃদকিগুলোর কথা জানব এবং কেমন করে তার মোকাবেলা করতে পারব, সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব।



## ଏই ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ପାଠ ଶେବେ ଆମରା:

- ପାନିର ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣା କରତେ ପାରବ ।
- ପାନିର ଗର୍ଭନ ସ୍ଥାନୀୟା କରତେ ପାରବ ।
- ପାନିର ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍‌ସ ବର୍ଣ୍ଣା କରତେ ପାରବ ।
- ଜଳଜ ଡାଇଲୋଗ୍ ଓ ଜଳଜ ପ୍ରାୟୀର ଜଳ୍ଯ ପାନିର ଥିଲୋଜନୀୟତା ଏବଂ ପାନିର ମାନସତ୍ୱ ସ୍ଥାନୀୟା କରତେ ପାରବ ।
- ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ପାନିର ପୁନରୀବର୍ତ୍ତନ ଧାର୍ମସମୁହେ ପାନିର କୃତ୍ୟକୀ ବିଶ୍ଵେଷଣ କରତେ ପାରବ ।
- ମାନସତ୍ୱ ପାନିର ଥିଲୋଜନୀୟତା ବର୍ଣ୍ଣା କରତେ ପାରବ ।
- ପାନି ବିଶୁଦ୍ଧକରଣ ପ୍ରକିଳ୍ପ ସ୍ଥାନୀୟା କରତେ ପାରବ ।
- ସାହାଦେଶେ ପାନିର ଉଦ୍‌ସେ ଦୂଷଣେର କାରଣ ସ୍ଥାନୀୟା କରତେ ପାରବ ।
- ପାନିଦୂଷଣେର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରତେ ପାରବ ।
- ସାହାଦେଶେର ମିଠା ପାନିତେ ବୈଶ୍ଵିକ ଉଦ୍ଘତାର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରତେ ପାରବ ।
- ପାନିଦୂଷଣ ପ୍ରତିରୋଧେର କୌଶଳ ଓ ନାଗରିକେର ଦ୍ୱାରାକୁ ବର୍ଣ୍ଣା କରତେ ପାରବ ।
- ଉତ୍ସମଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେ ପାନିର କୃତ୍ୟକୀ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରତେ ପାରବ ।
- ସାହାଦେଶେ ପାନିର ଉଦ୍‌ସେ ହୁମକିର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରତେ ପାରବ ।
- ପାନିର ଉଦ୍‌ସେ ସଂରକ୍ଷଣେ ଥିଲୋଜନୀୟତା ଏବଂ କୌଶଳ ବର୍ଣ୍ଣା କରତେ ପାରବ ।
- ‘ପାନି ପ୍ରାପିତ ସକଳ ନାଗରିକେର ମୌଳିକ ଅଧିକାର’— ସ୍ଥାନୀୟା କରତେ ପାରବ ।
- ପାନିଥିବାଦୀର ସର୍ବଜଳୀୟତା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନିରମଳୀତି ବର୍ଣ୍ଣା କରତେ ପାରବ ।
- ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନିର ସ୍ଥାନୀୟର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ୍ୟାପନେ ଏଇ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟେ ଅନୁସମ୍ବାନମୂଳକ କାଜ ପରିଚାଳନା କରତେ ପାରବ ।
- ପାନିର ସଂକଟେର (ଶୁଦ୍ଧାଳି/କୃତ୍ତି/ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାନୀୟର) କାରଣ ଅନୁସମ୍ବାନ କରତେ ପାରବ ।
- ପାନି ସ୍ଥାନୀୟର ଓ ପାନିର ସଂରକ୍ଷଣେ ସତ୍ୱତନ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋସ୍ଟାର ଅର୍ଜନ କରତେ ପାରବ ।
- ପାନିର ଉଦ୍‌ସେ ପାନିର ସ୍ଥାନୀୟର ପ୍ରବାହୁ ଦୂଷଣ ଗୋଟ ବିଷୟେ ଜଳସତ୍ୱତନ୍ତା ସୁନ୍ଦର କରବ ।
- “ପାନି ନାଗରିକେର ମୌଳିକ ମାନ୍ୟିକ ଅଧିକାର” ବିଷୟେ ସତ୍ୱତନ୍ତା ସୁନ୍ଦର କରବ ।
- ପାନିର ଅପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକର ସ୍ଥାନୀୟର ସତ୍ୱତନ୍ତ ହବ ।

## ২.১ পানি

পৃথিবীতে যত ধরনের তরল পদার্থ পাওয়া যায়, পানি তার মাঝে সবচেয়ে সহজলভ্য। মানুষের শরীরের শতকরা ৬০-৭৫ ভাগই হচ্ছে পানি। মাছ, মাংস কিংবা শাক-সবজিতে শতকরা ৬০-৯০ ভাগ পানি থাকে। পৃথিবীপৃষ্ঠের শতকরা ৭৫ ভাগই হচ্ছে পানি। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য পানি অপরিহার্য, তাই পানির আরেক নাম হচ্ছে জীবন। তাহলে পানির কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

### ২.১.১ পানির ধর্ম

#### গলনাংক ও স্ফুটনাংক

তোমাদের কি মনে আছে, পানির গলনাংক আর স্ফুটনাংক কত? পানি যখন কঠিন অবস্থায় থাকে সেটিকে আমরা বলি বরফ। যে তাপমাত্রায় বরফ গলে যায়, সেটিই হচ্ছে বরফের গলনাংক। বরফের গলনাংক  $0^{\circ}$  সেলসিয়াস। অন্যদিকে বায়ুমণ্ডলীয় চাপে যে তাপমাত্রায় তরল পদার্থ বাল্কে পরিণত হয়, তাকে বলে স্ফুটনাংক। পানির স্ফুটনাংক  $99.98^{\circ}$  সেলসিয়াস যেটা  $100^{\circ}$  সেলসিয়াসের খুবই কাছাকাছি। তাই সাধারণভাবে আমরা পানির স্ফুটনাংক  $100^{\circ}$  সেলসিয়াস বলে থাকি।

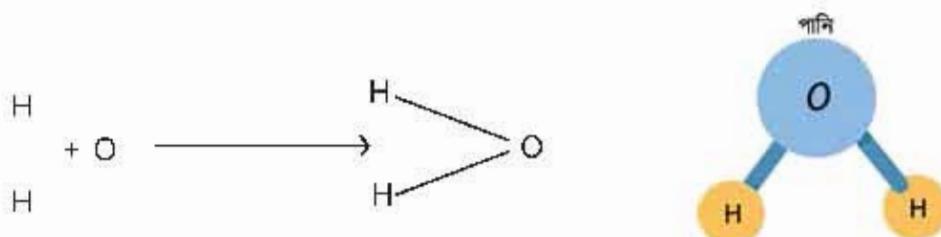
বিশুদ্ধ পানি স্বাদহীন, গন্ধহীন আর বণহীন। তোমরা কি জান পানির ঘনত্ব কত? পানির ঘনত্ব তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে।  $4^{\circ}$  সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানির ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি আর সেটি হচ্ছে ১ গ্রাম/সি.সি বা ১০০০ কেজি/মিটার কিউব। অর্থাৎ ১ সি.সি. পানির ভর হলো ১ গ্রাম বা ১ কিউবিক মিটার পানির ভর হলো ১০০০ কেজি।

#### বিদ্যুৎ বা তড়িৎ পরিবাহিতা

বিশুদ্ধ পানিতে বিদ্যুৎ বা তড়িৎ পরিবাহিত হয় না, তবে এতে লবণ কিংবা এসিডের মতো তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ দ্রবীভূত থাকলে তড়িৎ পরিবাহিত হয়। পানির একটি বিশেষ ধর্ম হলো এটি বেশির ভাগ অজৈব যৌগ আর অনেক জৈব যৌগকে দ্রবীভূত করতে পারে। এজন্য পানিকে সর্বজনীন দ্রাবকও বলা হয়। পানি একটি উভ্যধর্মী পদার্থ অর্থাৎ কখনো এসিড, কখনো ক্ষার হিসেবে কাজ করে। সাধারণত এসিডের উপস্থিতিতে পানি ক্ষার হিসেবে আর ক্ষারের উপস্থিতিতে এসিড হিসেবে কাজ করে। তবে বিশুদ্ধ পানি পুরোপুরি নিরপেক্ষ অর্থাৎ এর pH হলো ৭, যেটি সম্পর্কে আমরা সপ্তম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা জানব।

#### পানির গঠন

তোমাদের মনে কি প্রশ্ন জেগেছে যে আমাদের জীবনের জন্য অপরিহার্য এই পানি কী দিয়ে তৈরি? পানি দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু আর একটি অক্সিজেন পরমাণু (চিত্র ২.০১) দিয়ে গঠিত। তাই আমরা রসায়ন পড়ার সময় পানিকে  $H_2O$  লিখি অর্থাৎ এটিই হলো পানির সংকেত।



ଚିତ୍ର ୨.୦୧ ଏକଟି ଅକ୍ରିଜେନ ଓ ଦୁଇଟି ହାଇଡ୍ରୋଜନେର ପରମାଣୁ ଦିଲେ ଏକଟି ପାନିର ଅଣ୍ଣ ଗଠିତ ହୁଏ

ଆଧୁନିକ ପ୍ରସ୍ତରିକ ମାଧ୍ୟମେ ଏଥିର ଆମରା ଜାନି ବେଳେ ଆମରା ବେଳେ ପାନି ଦେଖି ଦେଖାନେ ଅନେକ ପାନିର ଅଣ୍ଣ ଏକଥାଏ କ୍ଲ୍ଯାସ୍ଟର (Cluster) ହିସେବେ ଥାକେ ।

## ୨.୧.୨ ପାନିର ଉତ୍ସ

ତୋମରା କି ବଲତେ ପାରିବେ ଆମାଦେର ଅତି ଦରକାରି ଏହି ପାନି ଆମରା କୋଣ ଉତ୍ସ ଥିଲେ ପାଇ? ପାନିର ସବତ୍ରେ ବଢ଼ ଉତ୍ସ ହଜ୍ରେ ସାଗର, ମହାସାଗର ବା ସମୁଦ୍ର । ପୃଥିବୀତେ ବଢ଼ ପାନି ଆଛେ, ତାର ପ୍ରାୟ ଶତକରା ୯୦ ଭାବେରଇ ଉତ୍ସ ହଜ୍ରେ ସମୁଦ୍ର । ସମୁଦ୍ରର ପାନିତେ ପ୍ରାଚୀର ଲବଣ ଥାକେ ଏହିନ୍ତା ସମୁଦ୍ରର ପାନିକେ ଶୋନା ପାନିଓ (Marine water) ବଲେ । ଲବଣେର କାରଣେ ସମୁଦ୍ରର ପାନି ପାନେର ଅନୁପରୋଗୀ, ଏମନିକି ବେଶର ଭାବ ଫେରେଇ ଅନ୍ୟ କାଜେଣ ସମୁଦ୍ରର ପାନି ବ୍ୟବହାର କରା ଯାଇ ନା ।

ପାନିର ଆର୍ଯ୍ୟକଟି ବଢ଼ ଉତ୍ସ ହଜ୍ରେ ହିମବାହ ତୁରାର ଦ୍ରୋତ, ବେଖାନେ ପାନି ମୂଳତ ବରକ ଆକାରେ ଥାକେ । ଏହି ଉତ୍ସେ ପ୍ରାୟ ଶତକରା ୨ ଭାବେର ମତୋ ପାନି ଆଛେ । ଉତ୍ସେରେ ବରକ ଆକାରେ ଥାକାଯି ଏହି ପାନିଓ କିମ୍ବୁ ଅନ୍ୟ କାଜେ ବ୍ୟବହାରେର ଉପରୋଗୀ ନାହିଁ । ବ୍ୟବହାର ଉପରୋଗୀ ପାନିର ଉତ୍ସ ହଜ୍ରେ ନଦୀ-ନଦୀ, ଖାଲ-ବିଲ, ହୁଦ, ପୁରୁର କିଂବା ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ପାନି । ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ପାନି ଆମରା ନଳକୁପେର ମାଧ୍ୟମେ ହୁଲେ ଆନି । ପାହାଡରେ ଉପର ଅଧିକ ଧାରକ ବା ତୁରାର ଗଲେଡ ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଜି କରିବାକୁ ପାରେ । ଲକ୍ଷ୍ମୀଯ ବ୍ୟାପାର ହଜ୍ରେ, ପୃଥିବୀତେ ବ୍ୟବହାରେର ଉପରୋଗୀ ପାନି ମାତ୍ର ଶତକରା ୧ ଭାଗ ।

## ବାହ୍ୟାଦେଶେ ବିଠା ପାନିର ଉତ୍ସ

ଆମରା ଆମାଦେର ବାସାର ରାଜୀ ଥିଲେ କାଣ୍ଡ ଖୋରା, ଗୋଲମ କିଂବା ଧାଉକାର ପାନି କୋଥା ଥିଲେ ପାଇ? ଯାଏହି ଫୁଲ ଫୁଲାତେ କଥନେ କଥନେ (ଯେମନ: ଇହି ଧାନେର ଜନ୍ମ) ଲାଚର ପରିମାଣେ ପାନିର ଦରକାର ହୁଏ । ଏ ପାନିଇ ବା ଆମରା କୋଥା ଥିଲେ ପାଇ? ଆମାଦେର ଦେଶେ ବର୍ଣ୍ଣ ତେବେଳ ଏକଟା ନା ଧାକାର ଘିଠା ପାନିର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହଜ୍ରେ ନଦୀ-ନଦୀ, ଖାଲ-ବିଲ, ପୁରୁର, ହୁଦ ଏବଂ ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ପାନି । ତାବେ ଅନ୍ୟ ପାନିର ମାଧ୍ୟମେ ବିଶ୍ଵାସ କରେ ଆସେଲିକ ଧାକାର ବାହ୍ୟାଦେଶେର ବିଶ୍ଵାସ ଏକାକାର ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ପାନି ପାନେର ଅନୁପରୋଗୀ ହୁଏ ପଡ଼େଇ । ତାହିଁ ଏ ସକଳ ଏକାକାର ମାନୁଷ ବୃତ୍ତିର ପାନି ସଂତ୍ରହ କରାର ପର ପରିଶୋଧନ କରେ ମେଟି ପାନ କରାନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ହେଯାଇ ।

## ২.১.৩ জলজ উদ্ভিদের জল্য পানির প্রয়োজনীয়তা

তোমরা কচুরিপানা, কুনিপানা, খড়িপানা, সিংগারা, টোপাপানা, শাপলা, পন্থ, শ্যাখলা, হাইস্লো, কলমি, হেলেকা, কেশরদাম ইত্যাদি নাম রকম জলজ উদ্ভিদের নাম শুনেছ এবং তাদের অনেকগুলো নিজের চোখেও দেখেছ। এরা কোথার জন্যে জান? এদের বেশির ভাগই পানিতে জন্মে (চিত্র ২.০২) এবং কিছু কিছু আছে (যেমন: কলমি, হেলেকা, কেশরদাম) যারা পানিতে আর মাটিতে দুজন্যাতেই জন্মে। অর্থাৎ পানি না থাকলে বেশির ভাগ জলজ উদ্ভিদ জন্মাতেই না, কিছু কিছু হয়তো জন্মাতে কিন্তু বাঁচতে পারত না কিংবা বেঁচে থাকলেও বেড়ে উঠতে পারত না। তখন কী হতো?

তখন পরিবেশের মাঝেক বিপর্যয় ঘটত।

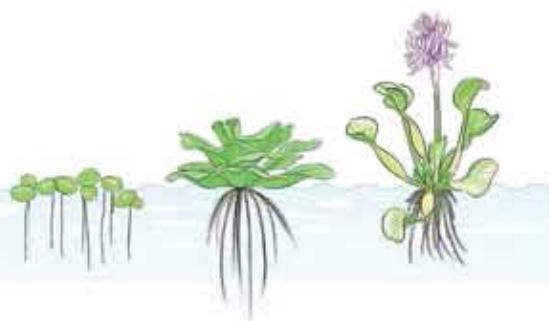
তার কারণ, এই জলজ উদ্ভিদগুলো একদিকে যেমন সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে অঙ্গিজেন তৈরি করে পানিতে ফর্বীভূত অঙ্গিজেনের মাঝা ঠিক রাখে, অন্যদিকে এদের অনেকগুলো বিশেষ করে শ্যাখলাজাতীয় জলজ উদ্ভিদগুলো জলজ প্রাণীদের খাদ্যভাবার হিসেবে কাজ করে। এসব জলজ উদ্ভিদ না থাকলে মাঝসহ অনেক জলজ প্রাণী বাঁচতেই পারত না, যেটি পরিবেশের জন্য মাঝেক হুমকির কারণ হতো।

তোমরা জান যে উদ্ভিদগুলো সাধারণত মূলের

মাধ্যমে পানি আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে। কিন্তু জলজ উদ্ভিদগুলো সাবা দেহের মাধ্যমেই পানিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান বিশেষ করে খনিজ সবথ সংগ্রহ করে থাকে। তাই এদের পুরো দেহ পানির সংলর্পে না এসে এদের বেড়ে ওঠাই হতো না।

আরেকটি সক্ষমীয় ব্যাপার হচ্ছে জলজ উদ্ভিদের কাণ্ড আর অন্যান্য অভ্যন্তরীণ খুব নরম হয়, যেটা পানির স্রোত আর জলজ প্রাণীর চলাচলের সঙ্গে যানানসই। পানি ছাঢ়া শুকনো মাটিতে এদের জন্ম হলে এরা স্তেপে পড়ত এবং বেড়ে উঠতে পারত না এমনকি বাঁচতেও পারত না।

তোমরা কি জান জলজ উদ্ভিদ কীভাবে বংশবিস্তার করে? জলজ উদ্ভিদগুলো সাধারণত অভ্যন্তরীণ উপাদানে বংশবিস্তার করে। পানি না থাকলে এই বংশবিস্তার বাধাবন্ধন হতো। তাই আমরা বলতে পারি, আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য জলজ উদ্ভিদগুলোর জন্ম খুবই জরুরি এবং তাদের বেড়ে উঠার জন্য পানির সুমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। পানি না থাকলে জলজ উদ্ভিদগুলো জন্মাতে পারত না, জন্মালেও বাঁচতে পারত না, তার ফলে পরিবেশের ক্ষয়াবহ একটি বিপর্যয় ঘটত।



চিত্র ২.০২: কুনিপানা, টোপাপানা এবং কচুরিপানা হচ্ছে জলজ উদ্ভিদের উদাহরণ।

### ২.১.৪ জলজ প্রাণীর জন্য পানির প্রয়োজনীয়তা

হাজার হাজার জলজ প্রাণীর মাঝে আমাদের সবচেয়ে পরিচিত জলজ প্রাণী হচ্ছে মাছ। মাছ ধরে পানির বাইরে রেখে দিলে কী হয়? তোমরা সবাই দেখেছ যে মাছ মরে যায়। কেন মরে যায়? কারণ আমরা যেরকম বাতাস বা অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারি না, দম বন্ধ হয়ে মারা যাই, মাছের বেলাতেও তাই ঘটে। মাছ অক্সিজেন গ্রহণ করে ফুলকা দিয়ে আর ফুলকা এমনভাবে তৈরি যে এটি শুধু পানি থেকেই অক্সিজেন নিতে পারে, বাতাস থেকে নয়। যদি পানি না থাকত তাহলে কোনো মাছ বাঁচতে পারত না। শুধু মাছ নয়, যেসব প্রাণী ফুলকা দিয়ে অক্সিজেন গ্রহণ করে শ্বাসকার্য চালায়, তাদের কোনোটাই বাঁচতে পারত না। ফলে পরিবেশ হুমকির মধ্যে পড়ত আর আমাদেরও বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে যেত। তোমরা আগের অধ্যায় থেকে জেনেছ যে প্রোটিন আমাদের বেড়ে ওঠার জন্য খুবই প্রয়োজনীয় একটি উপাদান। আমাদের প্রয়োজনীয় প্রোটিনের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগই আসে মাছ থেকে। কাজেই পানি না থাকলে আমরা প্রয়োজনীয় প্রোটিন পেতাম না, যার ফলে আমাদের দৈহিক বৃদ্ধি এবং অন্যান্য কোনো জৈবিক প্রক্রিয়াই ঠিকভাবে ঘটতো না।

## ২.২ পানির মানদণ্ড

পানি অত্যন্ত মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। আগের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে নদ-নদীর পানি আমাদের পরিবেশের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ, এটি জলজ উভিদ আর প্রাণীর আশ্রয়স্থল (Habitat)। শুধু তা-ই নয়, এই পানি কৃষিকাজে সেচের জন্য ব্যবহার করা হয়। একইভাবে জাহাজের নাবিকেরা, লক্ষণ, নৌযান বা ট্রলার দিয়ে যারা জীবিকা নির্বাহ করে, তারা সবাই নদ-নদী বা সমুদ্রের পানিই প্রক্রিয়া করে পান করে, তাদের অন্যান্য কাজেও ব্যবহার করে থাকে। তাই পানির নির্দিষ্ট মান যদি বজায় না থাকে তাহলে এটি জীববৈচিত্র্য বা পরিবেশের জন্য যেমন ক্ষতিকর হবে, তেমনি অন্যান্য কাজেও এর ব্যবহার ব্যাহত হবে। এবার তাহলে পানির মানদণ্ড সম্পর্কে একটা ধারণা নেওয়া যাক:

**পানির মানদণ্ড নির্ভর করে সেটি কোন কাজে ব্যবহার করব তার ওপর।** প্রথমে নদ-নদী, খাল-বিল কিংবা সমুদ্রের পানির মানদণ্ড কেমন হওয়া উচিত সেটা জেনে নিই।

**বর্ণ ও স্বাদ:** তোমরা জান যে বিশুধ পানি বগইন আর স্বাদহীন হয়, তাই পানিতে বসবাসকারী প্রাণী আর উভিদের জন্য নদ-নদী, খাল-বিল ইত্যাদির পানি বগইন আর স্বাদহীন হওয়াই উচ্চম।

### ঘোলার পরিমাণ

পানি ঘোলাটে হলে সেটি পানিতে বসবাসকারী প্রাণী আর উভিদের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। তার কারণ, পানি ঘোলা হলে সূর্যের আলো পানির নিচে থাকা উভিদ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে

না, যার ফলে সালোকসংশ্লেষণ বাধাগ্রস্ত হয়। এতে একদিকে পানিতে থাকা উড়িদের খাবার তৈরিতে ব্যাঘাত ঘটে, যেটা তাদের বৃদ্ধিকে কমিয়ে দেয়, অন্যদিকে সালোকসংশ্লেষণের ফলে যে অক্সিজেন তৈরি হতো, সেটাও বন্ধ হয়ে যায়। পানি ঘোলা হলে মাছ বা অন্য প্রাণী ঠিকমতো খাবার সংগ্রহ করতে পারে না।

পানি ঘোলা হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে প্রাকৃতিক কারণ, অর্থাৎ নদীভাঙ্গন, পলি মাটি ইত্যাদি। আবার মানব সৃষ্টি কারণেও পানি ঘোলা হয়, যেমন তেল, গ্রিজ ও অন্যান্য অদ্রবণীয় পদার্থের উপস্থিতি। পানিতে এসব পদার্থ, বিশেষ করে মাটি আর বালি বেড়ে গেলে তা এক পর্যায়ে নদ-নদীর তলায় জমা হতে থাকে। ফলে নাব্যতা হ্রাস পায় এবং নৌযান চলাচলে অসুবিধা ঘটে। তোমরা সংবাদপত্র বা টেলিভিশনে নিশ্চয়ই লক্ষ স্টিমার ডুবো চরে আটকে পড়ার খবর দেখে থাকবে। কেন এগুলো আটকে পড়ে? নাব্যতা কমে যাওয়াই এর প্রধান কারণ।

### তেজস্ক্রিয় পদার্থের উপস্থিতি

নদ-নদীর পানিতে কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকলে সেটা জলজ উড়িদ আর প্রাণীর দেহে ক্যান্সারের মতো রোগ সৃষ্টি করতে পারে। তাই নদ-নদীর পানি পুরোপুরি তেজস্ক্রিয়তামুক্ত হতে হবে।

### ময়লা-আবর্জনা

নদ-নদীসহ সকল প্রাকৃতিক পানি অবশ্যই ময়লা-আবর্জনামুক্ত হতে হবে। কারণ ময়লা-আবর্জনা থেকে জীবন ধ্বংসকারী সব ধরনের জীবাণু তৈরি হয়।

### দ্রবীভূত অক্সিজেন

আমাদের নিঃশ্বাসের জন্য যে রকম অক্সিজেনের দরকার হয়, ঠিক সেরকম পানিতে বসবাসকারী প্রাণীদেরও শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য অক্সিজেনের দরকার হয়। এই অক্সিজেন তারা কোথা থেকে পায়? তারা এই অক্সিজেন পায় পানিতে দ্রবীভূত হয়ে থাকা অক্সিজেন থেকে। কোনো কারণে যদি এই অক্সিজেন নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে কমে যায়, তাহলে জলজ প্রাণীগুলোর সমস্যা হতে থাকে। যদি পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন না থাকে, তাহলে মাছসহ অন্যান্য প্রাণী বাঁচতেই পারে না। জলজ প্রাণীদের বেঁচে থাকার জন্য ১ লিটার পানিতে কমপক্ষে ৫ মিলিগ্রাম অক্সিজেন থাকা দরকার।

### তাপমাত্রা

তাপমাত্রা পানির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড। পানির তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে গেলে, একদিকে যেমন দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যায়, অন্যদিকে জলজ প্রাণীর প্রজনন থেকে শুরু করে সব ধরনের শারীরবৃত্তীয় কাজেরও সমস্যা সৃষ্টি হয়।

## pH

pH হলো এমন একটি রাশি, যেটি দ্বারা বোঝা যায় পানি বা অন্য কোনো জলীয় দ্রবণ এসিডিক, ক্ষারীয় না নিরপেক্ষ। নিরপেক্ষ হলে pH হয় ৭, এসিডিক হলে ৭-এর কম, আর ক্ষারীয় হলে ৭-এর বেশি। এসিডের পরিমাণ যত বাঢ়বে, pH-এর মান তত কমে, অন্যদিকে ক্ষারের পরিমাণ যত বাঢ়ে, pH-এর মানও তত বাঢ়ে। নদ-নদী, খাল-বিল ইত্যাদির জন্য pH-এর মান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত নদ-নদীর পানি ক্ষারীয় হয়। গবেষণা করে দেখা গেছে নদ-নদীর পানির pH যদি ৬-৮ এর মধ্যে থাকে, তাহলে সেটা জলজ উদ্ভিদ কিংবা প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য কোনো অসুবিধার সৃষ্টি করে না। তবে pH-এর মান যদি এর চাইতে কমে যায় বা বেড়ে যায়, তাহলে ঐ পানিতে মাছসহ অন্যান্য জলজ প্রাণী আর উদ্ভিদের মারাত্মক ক্ষতি হয়। মাছের ডিম, পোনা মাছ পানির pH খুব কম বা বেশি হলে বাঁচতে পারে না। পানিতে এসিডের পরিমাণ খুব বেড়ে গেলে, অর্থাৎ pH-এর মান খুব কমে গেলে জলজ প্রাণীদের দেহ থেকে ক্যালসিয়ামসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ বাইরে চলে আসে, যার ফলে মাছ সহজেই রোগাক্রান্ত হতে শুরু করে।

## লবণাক্ততা

তোমরা কি জান আমাদের জাতীয় মাছ ইলিশ ডিম ছাড়ার সময় মিঠা পানিতে আসে কেন? ইলিশ সামুদ্রিক মাছ অর্থাৎ লবণাক্ত পানির মাছ হলেও প্রজননের সময় অর্থাৎ ডিম ছাড়ার সময় মিঠা পানিতে আসে কারণ সমুদ্রের পানিতে প্রচুর পরিমাণে লবণ থাকে, যা ডিম নষ্ট করে ফেলে, ফলে ঐ ডিম থেকে আর পোনা মাছ তৈরি হতে পারে না। তাই প্রকৃতির নিয়মেই ইলিশ মাছ ডিম ছাড়ার সময় হলে মিঠা পানিতে আসে। তবে সব মাছের জন্য এটি প্রযোজ্য নয়। কিছু মাছ এবং জলজ প্রাণী লবণাক্ত পানিতেই প্রজনন করতে পারে।

## ২.৩ পানির পুনরাবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণে পানির ভূমিকা

### পানির পুনরাবর্তন

এর আগে তোমরা দেখেছ যে ভূপঠের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগই পানি দ্বারা আবৃত; কিন্তু বেশির ভাগ পানিই (শতকরা ৯৭ ভাগ) লবণাক্ত, তাই সেই পানি সরাসরি বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায় না। আমাদের যে শতকরা ১ ভাগ মিঠা পানি (Fresh water) সঞ্চিত আছে, তার একটি অংশবিশেষ করে নদ-নদী, খাল-বিল ও হুদের পানি নানাভাবে প্রতিনিয়ত দূষিত হয়ে চলেছে। এমনকি ভূগর্ভের যে পানি আমরা কৃপ বা নলকৃপ থেকে পাই এবং খাওয়া থেকে শুরু করে নানা কাজে ব্যবহার করি, সেটিও নানা রকম রাসায়নিক পদার্থ (যেমন: আসেনিক) দিয়ে দূষিত হয়ে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। যদিও আমাদের পানিসম্পদ প্রচুর, কিন্তু ব্যবহার করার উপযোগী পানির পরিমাণ খুবই অল্প আর সীমিত। তাই পানি ব্যবহারে আমাদের অত্যন্ত সাশ্রয়ী হতে হবে এবং একই পানি কীভাবে বারবার ব্যবহার করা

যায়, সেটিও চিন্তা করতে হবে।

প্রকৃতিতে পানির কি পুনরাবর্তন ঘটছে? হ্যাঁ, ঘটছে। সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা পানিচক্রে দেখেছ যে দিনের বেলা সূর্যের তাপে ভূপৃষ্ঠের সমুদ্র, নদ-নদী, খাল-বিলের পানি বাস্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। একপর্যায়ে বাস্প ঘনীভূত হয়ে প্রথমে মেঘ পরে বৃষ্টির আকারে আবার ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে। এই বৃষ্টির পানির বড় একটি অংশ নদ-নদী, খাল-বিল ও সমুদ্রে গিয়ে পড়ে এবং আবার বাস্পীভূত হয় ও আবার বৃষ্টির আকারে ফিরে আসে। পানির এই পুনরাবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পুনরাবর্তন না হলে কী ধরনের সমস্যা হতো বলতে পারবে? এই পুনরাবর্তন না হলে বৃষ্টি হতো না, যার ফলে পুরো পৃথিবী মরুভূমি হয়ে যেত। প্রচণ্ড খরা হতো, ফসল উৎপাদন কমে যেত। বৃষ্টি হলো প্রাকৃতিকভাবে পানির পুনরাবর্তন।

আমরা যদি ব্যবহারের পর বর্জ্য পানি সংগ্রহ করে সেটি পরিশোধন করে আবার ব্যবহার করি তাহলে সেটিও কিন্তু হবে এক ধরনের পুনরাবর্তন।

### পরিবেশ সংরক্ষণে পানির ভূমিকা

যেহেতু পরিবেশের প্রায় প্রতিটি উপাদান ও প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে পানির উপর নির্ভর করে, তাই পরিবেশকে ঢিকিয়ে রাখতে হলে পানির ভূমিকা অপরিহার্য। পানি না থাকলে গাছপালা জন্মাবে না, ফসল উৎপাদন হবে না। এক কথায় পানি না থাকলে পুরো পরিবেশের সাথে সাথে আমাদের অস্তিত্বও ধ্বংস হয়ে যাবে।

**মানসম্মত পানির প্রয়োজনীয়তা:** সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই আমরা কী করি? হাত-মুখ ধুই। এ কাজ পানি ছাড়া কি সম্ভব? না, সম্ভব নয়। হাত-মুখ ধোয়া থেকে শুরু করে গোসল, রান্নাবান্না, কাপড় ধোয়া এবং সর্বোপরি খাওয়ার জন্য পানি অপরিহার্য। এই পানি যদি মানসম্মত না হয় তাহলে প্রত্যেকটা কাজেই সমস্যা হবে। উদাহরণ দেয়ার জন্য বলা যায় খাওয়ার পানিতে যদি গন্ধ থাকে বা সেটি যদি লোনা হয়, তাহলে কি আমরা সেটা থেতে পারব? না, পারব না। এর বাস্তব প্রমাণ হলো আমাদের দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক জেলায় নদী আর ভূগর্ভের পানি লোনা হওয়ায় তারা ঐ পানি থেতে তো পারছেই না, এমনকি দৈনন্দিন জীবনের বেশির ভাগ কাজে ব্যবহারও করতে পারছে না। তারা বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করে পরিশোধন করে তারপর সেটি পান করছে আর অন্যান্য কাজে ব্যবহার করছে। আবার খাওয়ার পানি যদি মানসম্মত না হয়, বিশেষ করে এতে যদি রোগ-জীবাণু থাকে, তাহলে সেটা থেকে মারাত্মক স্বাস্থ্য বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। সমুদ্রের লোনা পানি কি কৃষিকাজে বা শিল্প-কারখানায় ব্যবহার করা যায়? না, সেটাও যায় না। তার কারণ সমুদ্রের পানিতে প্রচুর লবণ থাকে, যেটা শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির (যেমন-বয়লার) ক্ষয়সাধন করে নষ্ট করে ফেলে। একইভাবে আমাদের বেশিরভাগ ফসলও লবণাক্ত পানিতে জন্মাতে পারে না। অর্থাৎ লবণাক্ত পানি কৃষিকাজের জন্যও উপযোগী নয়।

এক কথায় বলা যায়, শিল্প-কারখানা থেকে শুরু করে কৃষিকাজ আর দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটা কাজেই মানসম্মত পানির দরকার হয়। তা না হলে একদিকে যেমন মানুষের স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে অন্যদিকে অর্থনৈতিকভাবেও দেশের মরাত্মক ক্ষতিসাধন হতে পারে।

## ২.৪ পানি বিশুদ্ধকরণ

ভূগৃষ্ঠে যে পানি পাওয়া যায় তাতে নানারকম ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ, এমনকি রোগ সৃষ্টি করতে পারে এবং জীবন ধ্বংসকারী জীবাণুও থাকে। তাই ব্যবহারের আগে পানি বিশুদ্ধ করে নিতে হয়। ভূগর্ভের পানি সাধারণত রোগ-জীবাণু মুস্ত, কিন্তু এই পানিতে আসেনিকের মতো নানা রকম ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতির কথা এখন আমরা সবাই জানি।

পানি কীভাবে বিশুদ্ধকরণ করা হবে, সেটি নির্ভর করে এটি কোন কাজে ব্যবহার করা হবে, তার ওপর। স্বাভাবিকভাবেই খাওয়ার জন্য অত্যন্ত বিশুদ্ধ পানি লাগলেও জমিতে সেচকাজের জন্য তত বিশুদ্ধ পানির দরকার হয় না। সাধারণত যেসব প্রক্রিয়ায় পানি বিশুদ্ধ করা হয়, সেগুলো হলো পরিস্রাবণ, ক্লোরিনেশন, স্ফুটন, পাতন ইত্যাদি। নিচে এই প্রক্রিয়াগুলো বর্ণনা করা হলো:

### পরিস্রাবণ

ষষ্ঠ শ্রেণিতে তোমরা পরিস্রাবণ সম্পর্কে জেনেছ। পরিস্রাবণ হলো তরল আর কঠিন পদার্থের মিশ্রণ থেকে কঠিন পদার্থকে আলাদা করার একটি প্রক্রিয়া। পানিতে অদ্রবণীয় ধূলা-বালির কণা থেকে শুরু করে নানারকম ময়লা-অ্যাবর্জনার কণা থাকে। এদেরকে পরিস্রাবণ করে পানি থেকে দূর করা হয়। এটি করার জন্য পানিকে বালির স্তরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা হয়, তখন পানিতে অদ্রবণীয় ময়লার কণাগুলো বালির স্তরে আটকে যায়। বালির স্তর ছাড়াও খুব সূক্ষ্মভাবে তৈরি কাপড় ব্যবহার করেও পরিস্রাবণ করা যায়। বর্তমান সময়ে আমাদের অনেকের বাসায় আমরা যেসব ফিল্টার ব্যবহার করি, সেখানে আরো উন্নতমানের সামগ্রী দিয়ে পরিস্রাবণ করা হয়।

### ক্লোরিনেশন

যদি পানিতে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু থাকে, তবে তা অবশ্যই দূর করতে হবে এবং সেটি করা হয় জীবাণুনাশক ব্যবহার করে। নানারকম জীবাণুনাশক পানি বিশুদ্ধ করার কাজে ব্যবহার করা হয়। এদের মাঝে অন্যতম হচ্ছে ক্লোরিন গ্যাস ( $\text{Cl}_2$ )। এছাড়া ব্লিচিং পাউডার [ $(\text{Ca}(\text{OCl})\text{Cl})$ ] এবং আরও কিছু পদার্থ, যার মাঝে ক্লোরিন আছে এবং জীবাণু ধ্বংস করতে পারে, সেগুলো ব্যবহার করা হয়।

আমাদের দেশে বন্যার সময় পানি বিশুদ্ধ করার জন্য যে ট্যাবলেট বা কিট ব্যবহার করা হয়, সেটি কী? সেটি হলো মূলত সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড ( $\text{NaOCl}$ )। এর মাঝে যে ক্লোরিন থাকে, সেটি পানিতে

থাকা রোগ-জীবাণুকে ধ্বংস করে ফেলে। ক্লোরিন ছাড়াও ওজোন ( $O_3$ ) গ্যাস দিয়ে অথবা অতিবেগুনি রশ্মি দিয়েও পানিতে থাকা রোগ-জীবাণু ধ্বংস করা যায়। বোতলজাত পানির কারখানায় এ পদ্ধতি ব্যবহার করে পানিকে রোগ-জীবাণুমুক্ত করা হয়।

### স্ফুটন

পানির স্ফুটনের কথা তোমরা সবাই জান। এ প্রক্রিয়ায় কি পানিকে জীবাণুমুক্ত করা সম্ভব? হ্যাঁ, অবশ্যই সম্ভব। পানিকে খুব ভালোভাবে ফুটালে এতে উপস্থিত জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়। প্রশ্ন হতে পারে, জীবাণুমুক্ত করার জন্য কতক্ষণ পানি ফুটাতে হয়? স্ফুটন শুরু হওয়ার পর ১৫-২০ মিনিট ফুটালে সেই পানি জীবাণুমুক্ত হয়। বাসা-বাড়িতে খাওয়ার জন্য এটি একটি সহজ এবং সাশ্রয়ী প্রক্রিয়া।

### পাতন

পাতন প্রক্রিয়ার কথা তোমরা ষষ্ঠি শ্রেণিতে জেনেছ। যখন খুব বিশুদ্ধ পানির প্রয়োজন হয়, তখন পাতন প্রক্রিয়ায় পানি বিশুদ্ধ করা হয়। যেমন: ঔষধ তৈরির জন্য, পরীক্ষাগারে রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পুরোপুরি বিশুদ্ধ পানির প্রয়োজন হয়। এই প্রক্রিয়ায় একটি পাত্রে পানি নিয়ে তাপ দিয়ে সেটাকে বাস্পে পরিণত করা হয়। পরে ঐ বাস্পকে আবার ঘনীভূত করে বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহ করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ করা পানিতে অন্য পদার্থ থাকার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে।

## ২.৫ বাংলাদেশের পানির উৎস দূষণের কারণ

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সব দেশেই পানির প্রায় সব উৎস, বিশেষ করে ভূপৃষ্ঠের পানি, প্রতিনিয়ত নানাভাবে দূষিত হচ্ছে। এবার আমরা সেই দূষণের কারণগুলো আলোচনা করব।

গোসলের পানি, পায়খানার বর্জ্যপানি কিংবা অন্যান্য কাজে ব্যবহারের পর সেই পরিত্যক্ত পানি কোথায় যায়, সেটা কি তোমরা জান? বর্জ্যপানির বড় একটি অংশ নর্দমার নলের ভেতর দিয়ে নিয়ে নদ-নদীতে ফেলা হয় এবং সেগুলো পানিকে মারাত্মকভাবে দূষিত করে। এই বর্জ্যপানিতে রোগ-জীবাণু থেকে শুরু করে নানারকম রাসায়নিক বস্তু থাকে, যার কারণে পানি দূষিত হয়।

আমাদের বাসায় যেসব কঠিন বর্জ্য পদার্থ তৈরি হয়, সেগুলো আমরা কী করি? সাধারণত বাড়ির পাশে রাখা ডাস্টবিন বা অনেক সময় অবিবেচকের মতো খোলা জায়গায় ফেলে দিই। এসব বর্জ্য পদার্থ ১-২ দিনের মধ্যে পচতে শুরু করে। বৃষ্টি হলে সেই পচা বর্জ্য— যেখানে রোগ-জীবাণুসহ নানারকম রাসায়নিক পদার্থ থাকে, বৃষ্টির পানির সাথে মিশে নদ-নদী, খাল-বিল বা লেকের পানিকে দূষিত করে।

১০ তোমরা সবাই জান, কৃষিকাজে মাটির উর্বরতা বাড়ানোর জন্য রাসায়নিক সার, জেব সার আর পোকামাকড়

মারার জন্য কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়। এসব থেকে কি পানি দূষিত হতে পারে? হ্যাঁ, অবশ্যই পারে। বৃক্ষ হলে অথবা বন্যার সময় কৃষিজমি প্লাবিত হলে কৃষিজমিতে ব্যবহার করা রাসায়নিক আর জৈব সার এবং কীটনাশক বৃক্ষ বা বন্যার পানিতে মিশে পানিকে দূষিত করে।

শিল্প-কারখানা থেকে কি পানি দূষিত হতে পারে? হ্যাঁ, পারে। নদ-নদীর পানিদূষণের সবচেয়ে বড় একটি কারণ হলো শিল্প-কারখানায় সৃষ্টি বর্জ্য। তোমরা কি কেউ বুড়িগঙ্গা নদীতে গিয়েছ? গেলে দেখবে এর পানিতে দুর্গন্ধি এবং এর রং কুচকুচে কালো। এর কারণ হলো, বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে এক সময় গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের অন্যতম রপ্তানি দ্রব্য চামড়া তৈরির কারখানা। এই চামড়ার কারখানা থেকে প্রচুর বর্জ্য বুড়িগঙ্গা নদীতে গিয়ে পড়ার ফলে এর পানি দূষিত হচ্ছে।

সংবাদপত্র আর টেলিভিশনে বুড়িগঙ্গা নদীর দূষণ নিয়ে প্রায়ই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। বুড়িগঙ্গার মতো বাংলাদেশের বেশির ভাগ নদীর পানি টেক্সটাইল মিল, ডাইং, রং তৈরির কারখান, সার কারখানা, কাগজ তৈরির কারখানা ইত্যাদি নানারকম শিল্প-কারখানার বর্জ্য পদার্থ দিয়ে দূষিত হচ্ছে। নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার বা জাহাজ থেকে ফেলা মলমৃত্তি আর তেলজাতীয় পদার্থের মাধ্যমেও নদ-নদী আর সমুদ্রের পানি দূষিত হয়। নদীর ভাঙ্গন, ঝড়-তুফান দিয়েও মাটি, ধূলিকণা বা অন্যান্য পদার্থ পানিতে মিশে পানিকে দূষিত করে। পরিষ্কারণ থেকে পরিত্যক্ত পানি যেখানে এসিড, ক্ষারসহ নানারকম রাসায়নিক পদার্থ থাকে, সেগুলোও পানিকে দূষিত করে। রাসায়নিক পদার্থ যেমন, আসেনিক দিয়ে ভূগর্ভের পানিদূষণের কথা এখন আমাদের সবারই জানা।

## ২.৫.১ উক্তি, প্রাণী এবং মানুষের উপর পানিদূষণের প্রভাব

নদ-নদী, ডোবা-পুকুর, খাল-বিল এবং ভূগর্ভের উৎসের পানি দূষিত হলে সেটি উক্তি, প্রাণী আর মানুষের উপর নানারকম ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে, এমনকি কখনো কখনো সেগুলো মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। পানিদূষণের এই সকল ক্ষতিকর দিকগুলো এবার তাহলে একটুখানি দেখে নেওয়া যাক।

তোমরা কি জান, টাইফয়েড, কলেরা, আমাশয়, সংক্রামক হেপাটাইটিস বি— এসবই পানিবাহিত রোগ? হ্যাঁ, এই সকল জীবন ধ্বংসকারী রোগসহ অনেক রোগ পানির মাধ্যমে ছড়ায়, এমনকি সতর্ক না হলে এই রোগগুলো মহামারী আকারও ধারণ করতে পারে। এসব রোগের জীবাণু নানাভাবে পানিতে প্রবেশ করে, বিশেষ করে মলমৃত্তি, পচা জিনিস দিয়ে সহজেই এটা ঘটে। সেই পানিতে গোসল করলে, সেই পানি পান করলে, কিংবা সেই পানি দিয়ে খাবার রান্না করলে বা ধোয়াধুয়ি করলে অথবা অন্য যেকোনোভাবে সেই দূষিত পানির সংস্পর্শে এলে সেটি মানুষ কিংবা অন্যান্য প্রাণীর দেহে সংক্রমিত হয়।

শুধু তা-ই নয়, কিছু কিছু জৈব পদার্থ আছে, যেমন- গোবর, গাছপালার ধ্বংসাবশেষ, খাদ্যের বর্জ্য সেগুলো পচনের সময় পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে। তোমরা বল তো এর ফলে

কী হতে পারে? বুঝতেই পারছ এর ফলে পানিতে ছরীভূত অঙ্গিজেন করে যায়। যদি এই সকল পদাৰ্থ খুব বেশি থাকে, তাহলে পানিতে ছরীভূত অঙ্গিজেনের পরিমাণ একেবারে শূন্যে নেওয়ে আসতে পারে। তখন পানিতে বসবাসকারী মাছসহ সকল প্রাণী অঙ্গিজেনের অভাবে মারা যাবে। এই অবস্থা বেশি দিন চলতে থাকলে এক সময় এই সকল নদী, খাল-বিল প্রাণীশূণ্য হয়ে পড়বে।

আমেরিকার উত্তর পশ্চিম অঙ্গরাজ্যে ইরি (Erie) নামের একটি হৃদ আছে, যাকে ১৯৬০ সালের দিকে মৃত হৃদ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এর কারণ হলো, এই হৃদের চারপাশে বেশ কয়েকটি ডিটারজেনেট তৈরির কারখানা থেকে সৃষ্টি বর্জ্য এই হৃদে ফেলার ফলে সেখানে কসফেটের যাতা

অনেক বেড়ে পিয়েছিল। পানিতে কসফেট আর নাইট্রোজেন খুব বেড়ে পেলে তা প্রচুর শ্যাওলা জন্মাতে সাহায্য করে। এই শ্যাওলাগুলো যখন যারে যায়, তখন পানিতে থাকা ছরীভূত অঙ্গিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে। এর ফলে পানিতে অঙ্গিজেনের অভাব দেখা দেয়। যার ফলে মাছসহ সকল প্রাণী যারে গিয়ে একপর্যায়ে ইরি “মৃত” একটি হৃদে পরিষ্কৃত হয়।

এ ঘটনার পর আমেরিকার সরকার আইন করে বিশুদ্ধকরণ ছাড়া শিল্প-কারখানার বর্জ্যপানি হৃদে ফেলা নিষিদ্ধ করে দেয়। ডিটারজেনেট কারখানাগুলো জারপর থেকে বর্জ্যপানি কসকরাসমূজ্জ্বল করার পরে হৃদে ফেলা শুরু করে আবাহ আচর্যজনকভাবে, প্রায় দশ বছর পরে ইরি হৃদে আবার প্রাণীর অস্তিত্ব ধরা পড়তে শুরু করে।

আমাদের বৃক্ষিগাছ অন্তিমে এখন কি যাই পান্ত্রয়া হাব? না, পান্ত্রয়া হাব না। অর্থাৎ এর অবস্থা অনেকটাই ইরি হৃদের মতো। শুধু বৃক্ষিগাছ নদী নয়, আমাদের দেশের অনেক নদী-নদীর পানিই শিল্প-কারখানার সৃষ্টি বর্জ্যপানির কারণে দূষিত হয়ে পড়ছে, যার কারণে এদের অবস্থা ইরি হৃদের মতো হয়ে যেতে পারে। এ ব্যাপারে আমাদের এখনই সতর্ক না হলে এটি ভয়াবহ বিপর্যয় তেকে আনতে পারে। আশাৰ কথা, বৃক্ষিগাছ এবং অন্যান্য নদীৰ পানি দূষণমুক্ত কৰার জন্যে নানা ধৰনের পরিকল্পনা করে কাজ শুরু হয়েছে।

ময়লা-আবর্জনাসহ, শ্যাওলা জাতীয় উত্তিদ মৱে পেলে একদিকে যেমন অঙ্গিজেন সম্পত্তার সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে তেমনি পানিতে প্রচল্প দূর্বলের সৃষ্টি হয়। এতে করে পানিতে সৌভাগ্য কাটা, মাছ ধরা, লোকাভ্যর্থসহ সব ধরনের বিলোদনমূলক কাজে ব্যাপাত ঘটে।



চিত্র ২.০৩

আর প্রাণীর জন্য খুবই ক্ষতিকর।

পানিতে যদি ক্ষতিকর ধাতব পদার্থ (যেমন: পারদ, সিসা, আসেনিক ইত্যাদি) থাকে, তাহলে এই পানি পান করলে মানুষের শরীরে নানা ধরনের রোগ হতে পারে। পারদ, সিসা আর আসেনিকের ক্ষতিকর প্রভাব এরূপম:

**পারদ:** মস্তিষ্ক বিকল হওয়া, হৃকের ক্যালার, বিকলাত্ত হওয়া।

**সিসা:** বিচৃঙ্গবোধ বা খিটখিটে মেজাজ, শরীরে ছালাপোড়া, রক্তশূণ্যতা, কিডনি বিকল হওয়া, পরিমাণে খুব বেশি হলে মস্তিষ্ক বিকল হওয়া।

**আসেনিক:** আসেনিকোসিস, হৃক এবং ফুসফুসের ক্যালার, পাকস্থলীর রোগ।

কৃষিজগতে ব্যবহার করা অট্টের সার (নাইট্রোট ও ফসফেট) দিয়ে পানি দূষিত হলেও মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি হয়। তেজক্ষির পদার্থ যেমন- ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, সিজিয়াম, ওডেন থত্তি আরা পানি দূষিত হলে তা একদিকে যেমন জলজ উত্তিদ ও প্রাণীর জন্য হৃদকিশৰূপ, অন্যদিকে তেজনি মানুষের জন্য মারাত্মক বিপজ্জনক। তেজক্ষির পদার্থ জীবদেহে নানা প্রকার ক্যালার আর খাস-প্রস্থাসজনিত রোগ সৃষ্টি করে।

তোমরা কি বলতে পারবে পানিতে তেজক্ষির পদার্থ কীভাবে আসতে পারে? এর একটি জলস্ত প্রমাণ হলো (১১ শার্ট, ২০১১ সালে) জাপানের কুকুশিয়া শহরে ঘটে যাওয়া তেজক্ষির দুর্ঘটনা। এই দুর্ঘটনার সূনামির কারণে পানুমাধ্যবিক বিনোদ উৎপাদন কারখানা থেকে প্রচুর তেজক্ষির পদার্থ চারাদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এতে পানি থেকে শুরু করে খালছব্বোও প্রচুর তেজক্ষিমত্তা পাওয়া পেছে।

এছাড়া পানিতে অঙ্গবন্ধীয় বন্ধু থাকলে পানি ঘোলাটে হয়; এর কলে কী ধরনের সমস্যা হয় সেটা তোমরা আপেই জেনেছ।

## ২.৬ বৈশিক উষ্ণতা

### ২.৬.১ মির্ঠ পানিতে বৈশিক উষ্ণতার প্রভাব

**সমুদ্রের পানির উষ্ণতা বৃদ্ধি**

বৈশিক উষ্ণতা হলো বিশ্বের বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা, যা বিভিন্ন কারণে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে পানির তাপমাত্রাও বেড়ে যাবে। আর ১০০



চিত্র ২.০৪

বছর আগে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা প্রায়  $1^{\circ}$  সেলসিয়াস কম ছিল। তোমরা হয়তো ভাবছ, ১০০ বছরে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের গড় তাপমাত্রা মাত্র  $1^{\circ}$  সেলসিয়াস বেড়েছে, এটি আর এমনকি ব্যাপার! কিন্তু আসলে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার কারণ, তাপমাত্রা অল্প একটু বেড়ে গেলেই মেরু অঞ্চলসহ নানা জায়গায় সঞ্চিত বরফ গলতে শুরু করে। এ বরফ গলা পানি কোথায় যাবে? শেষ পর্যন্ত এই পানি সমুদ্রে গিয়েই পড়বে। এর ফলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাবে। ফলে পৃথিবীর যে সকল দেশ নিচু, সেগুলো পানির নিচে তলিয়ে যাবে। বাংলাদেশ হচ্ছে সেরকম নিচু এলাকার একটি দেশ!

### লবণ্যাঙ্কতা

সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে গেলে সমুদ্রের লবণ্যাঙ্ক পানি নদ-নদী, খাল- বিল, পুকুর, ভূগর্ভস্থ পানি আর হৃদের পানিতে মিশে যাবে। এর কথায় পানির সকল উৎসই লবণ্যাঙ্ক হয়ে পড়বে। পানির সকল উৎস লবণ্যাঙ্ক হলে কী কী অসুবিধা হবে? প্রথমত মিঠা পানিতে বসবাসকারী জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহ মারাত্মক বিপর্যয়ের মুখে পড়বে এবং এক পর্যায়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তার কারণ, পানির তাপমাত্রা বাড়লে যেরকম পানির দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যায়, ঠিক সেরকম লবণ্যাঙ্কতা বাড়লেও দ্রবীভূত অক্সিজেন অনেক কমে যাবে, যার ফলে জলজ প্রাণীরা আর বেঁচে থাকতে পারবে না। জলজ উদ্ভিদের বড় একটি অংশ লবণ্যাঙ্ক পানিতে জন্মাতেও পারে না, বেড়ে উঠতেও পারে না, যে কারণে পানির জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়বে।

### বৃষ্টিপাত

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও ধরনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে পারে। এ সংক্রান্ত কম্পিউটার মডেলিং থেকে ধারণা করা যায়, কোনো কোনো এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে, আবার কোনো কোনো এলাকায়, বিশেষ করে নাতিশীতোষ্ণ এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যাবে। বৃষ্টিপাত কমে গেলে খরা সৃষ্টি হয়, এমনকি বিস্তীর্ণ এলাকা মরুভূমিতেও পরিণত হতে পারে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আর ধরন পরিবর্তন হলে নদ-নদী, খাল-বিলে পানির পরিমাণ এবং প্রবাহ পরিবর্তিত হবে, যা অনেক ক্ষেত্রে মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। কম্পিউটার মডেলিং থেকে এটাও অনুমান করা যায়, কোনো এলাকায় শীতকালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে, যা থেকে অসময়ে বন্যা হতে পারে।

## ২.৬.২ বাংলাদেশে বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব

বাংলাদেশে বৈশ্বিক উষ্ণতার একটি বড় প্রমাণ হলো, এখন গ্রীষ্মকালে অনেক বেশি গরম পড়ে, এমনকি মাঝে মাঝে বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রা  $47^{\circ}$  সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠে যায় যেটি আগে কখনো হয়নি। তাপমাত্রার উপান্ত থেকে এটি অত্যন্ত স্পষ্ট যে গ্রীষ্মকাল ও শীতকাল- দুই সময়েই তাপমাত্রা আগের তুলনায় বেশি

থাকে। অর্ধাং বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব স্পটভাবেই বাংলাদেশে পড়তে শুরু করেছে। বাংলাদেশের মিঠা পানিতে এর প্রভাব কী হবে? তোমরা আপেই জেনেছ যে বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে বাস্তুমণ্ডলীয় তাপমাত্রা বাড়লে পৃথিবীতে সঞ্চিত বরফ গলতে শুরু করবে এবং সমুদ্রে পানির উচ্চতা বেড়ে যাবে। এর প্রভাব বাংলাদেশে অনেক বেশি তীব্র হবে, যার কারণে বঙ্গোপসাগরের পানির উচ্চতা বেড়ে আয়াদের দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ অংশ পানির নিচে চলে যাবে। সাপরের লবণ্যতা পানি মূল সূর্যতে ঢোকার কারণে নদীসৌ, খাল-বিল আর ভূগর্ভের পানি লবণ্যতা হয়ে যাবে। যার ফলে দেশে মিঠা পানি বলতে আর কিছু থাকবে না। তোমরা হয়তো জান যে, সাতক্ষীরাসহ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক জেলায় চিরড়ি চাবের জন্য নালা কেটে লবণ্যতা পানি মূল সূর্যতে আনা হয়। এ কারণে ঐ সকল এলাকার ভূগর্ভের পানিসহ মিঠা পানির অন্যান্য উৎসের লবণ্যতা হয়ে পড়েছে। ফলে খাওয়ার এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহার উপযোগী পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। বলতে গেছে ঐ সকল এলাকার মিঠা পানির একমাত্র উৎস এখন বৃত্তির পানি। এমনও দেখা গেছে যে প্রায় ১০-১৫টি ধানের মানুষ সবাই মিলে একটি পুরুরে বৃত্তির পানি থেরে রাখে এবং সারা বছর সেই পানি ব্যবহার করছে। এক সমীক্ষার দেখা গেছে যে পানি আনার জন্য গৃহবন্ধনের অনেক সময় ৭-৮ কিলোমিটার পথ পাঢ়ি দিয়ে পুরুরে থেরে রাখা পানি আনতে হয়। বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলে সাগরের পানির

উচ্চতা বেড়ে গেলে থাই পুরো বাংলাদেশেই  
এ অবস্থা হতে পারে।

ইতোমধ্যেই করেকটি দেশের অংশ বিশেষ (যেমন: মালবীপ, ভারতের কিছু অংশ) বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলে সাগরের পানির উচ্চতা বেড়ে যাওয়ায় পানির নিচে ঘূর্বে গেছে এবং ঐ সকল দেশের জনসংখ্যার বড় একটি অংশ “জলবায়ু শরণার্থী” পরিষ্কৃত হয়েছে। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলে বৃত্তিশাতের ধরন পাল্টে গিয়ে নদী-নদীতে পানির অবাহ আর গতিগৰ্থন পাল্টে যেতে পারে, যার প্রভাব হবে সুস্মরণস্বরী।



চিত্র ২.০৫

## ২.৭ বাংলাদেশে পানিদূষণ প্রতিরোধের কৌশল এবং নাগরিকের দায়িত্ব

পানি কীভাবে দূষিত হয় আমরা মোটামুটিভাবে সেটা জেনেছি। পানিদূষণ প্রতিরোধ করতে হলে দূষণের কারণগুলো জেনে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করাটাই হবে দূষণ প্রতিরোধের বড় কৌশল। পানিদূষণ প্রতিরোধে কী কী কৌশল অবলম্বন করা যায়, সেগুলো একটি দেখে নিই।

### জলাভূমি রক্ষা

আজকাল আমাদের দেশে জলাভূমি ভরাট করে ঘর-বাড়ি, আবাসন এলাকা, শপিং মল ইত্যাদি তৈরি করা শুরু হয়েছে। তোমরা কি জান যে নিচু জলাভূমি পানি ধারণ করা ছাড়াও যে আরো অনেক শুরুফূর্ণ ভূমিকা পালন করে? জলাভূমি একদিকে পানি ধারণ করে বেমন বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে, অন্যদিকে তেমনি অতিকর পদার্থ শোষণ করে, কৃষকে এবং নদীতে বিশুদ্ধ পানি সংগৃহণ করে এবং বন্যাশালীদের সাহায্য করে। বন্যাভিও কিন্তু কৃষকে পানি সংগৃহণে সাহায্য করে এবং একই সাথে বন্যাশালীদের আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। এগুলো যথস হলে স্বাভাবিকভাবেই নদীর দূষণ বেঞ্চে যায়। জলাভূমি, বন্যাভিও রক্ষা করার ব্যবস্থা নেওয়া হলে পানির দূষণ অনেক খানি কমে যাবে। একেব্যে নাগরিক সমাজও শুরুফূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এখন আমাদের দেশেও স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বৃক্ষরোপণ করে, জলাভূমি, হৃদ ও সমুদ্রের তীরে পরিচালনার কাজ করে পানির দূষণ রোধে জনসচেতনতাযুক্ত কাজ করে যাচ্ছে—সেটি অনেক আশার কথা।



চিত্র ২.০৬

### বৃক্ষির পানি নিয়ন্ত্রণ

শহরাঞ্চলে পানিমূদ্রণের একটি বড় কারণ বৃক্ষির পানির প্রবাহ। তোমরা জান, শহরাঞ্চলের রাস্তাঘাটসহ বেশিরভাগ এলাকা পাকা হওয়ায় বৃক্ষির পানি এখন এর ভেতর দিয়ে কৃষকে ধেতে পারে না। ফলে বৃক্ষির পানি ধাবকীয় যন্ত্র-আবর্জনা আর অন্যান্য অতিকর পদার্থ নিয়ে নর্দমা আর নালা দিয়ে নদী, জলাশয় বা হৃদে পিয়ে দেখানকার পানিকে দূষিত করে। কীভাবে এটি বন্ধ করা যায়?

বাসার ছান্দে বৃক্ষির পানি কি সংগ্রহ করা সম্ভব? অবশ্যই এটি সম্ভব এবং খুব সহজেই তা করা যায়।

এভাবে সংগ্রহ করা পানি আমরা বাগান বা ফুলের টবে ব্যবহার করতে পারি, এমনকি কাপড়-চোপড় ধোয়া বা পায়খানায় শৌচ কাজেও ব্যবহার করতে পারি। এতে একদিকে যেমন পানির দূষণ বন্ধ হবে, অন্যদিকে তেমনি পানি সরবরাহের উপর চাপও কম পড়বে। তোমরা অনেকেই জান যে ঢাকা শহরে গ্রীষ্মকালে অনেক এলাকাতে পানির প্রচণ্ড অভাব থাকে। এমনও দেখা গেছে যে কোনো কোনো এলাকায় ৩-৪ দিন একটানা কোনো পানি পাওয়া যায় না। এরকম অবস্থায় বৃষ্টির পানি ধরে রেখে ব্যবহার করলে পুরো পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় সেটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। এক্ষেত্রে সরকার, সিটি কর্পোরেশন অথবা নাগরিক সমাজ সবাই নিজেদের মতো করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বাসা-বাড়ি ছাড়া অন্যান্য জায়গায় বৃষ্টির পানির দূষণ কীভাবে প্রতিরোধ করা যেতে পারে? আমরা কংক্রিটের বদলে কোনো ধরনের ছিদ্রযুক্ত পদার্থ ব্যবহার করতে পারি, যার ভিতর দিয়ে বৃষ্টির পানি ভূগর্ভে জমা হতে পারে। গ্রাভেল (Gravel) এরকম একটি পদার্থ, যা কংক্রিটের বদলে ব্যবহার করা যায়। আবার সম্ভব হলে বড় গর্ত বা খাল তৈরি করে সেখানেও বৃষ্টির পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করা যায়। পৃথিবীর অনেক বড় শহরেই এ রকম ব্যবস্থা আছে।

### জনসচেতনতা বৃদ্ধি

তোমরা কি বুবতে পারছ যে শহরাঞ্চলে পানিদূষণকারী ক্ষতিকর বর্জ্যগুলোর বড় একটি অংশ আসে আমাদের বাসা-বাড়ি থেকে? আমরা আ্যারোসল, পেইন্টস, পরিষ্কারক, কীটলাশক নানারকম ক্ষতিকারক পদার্থ অহরহ ব্যবহার করি এবং ব্যবহারের পর অবিবেচকের মতো খালি কোটা যেখানে-সেখানে ফেলে দিই বা রেখে দিই, যেগুলো একপর্যায়ে এসে পানি দূষণ করে। এগুলো এভাবে না ফেলে আমরা যদি যথাযথভাবে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলি, তাহলেও কিন্তু পানিদূষণ অনেক কমে যাবে। এসব পদ্ধতিতে দূষণ কমানোর জন্য জনসচেতনতা বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই। এ জন্য রেডিও-টেলিভিশনে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান আর সতর্কবার্তা প্রচার করা যেতে পারে। এমনকি তোমরা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা পানির প্রয়োজনীয়তা, অপ্রতুলতা এবং দূষণ প্রতিরোধ বিষয়ে পোস্টার তৈরি করে মানুষকে সচেতন করতে পার। ইউরোপ আমেরিকার মতো উন্নত দেশেও জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সরকারিভাবে নানা ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

### শিল্প-কারখানার দ্বারা পানির দূষণ প্রতিরোধ

শিল্প-কারখানার সৃষ্টি বর্জ্যপানি নদীর পানিদূষণের প্রধান একটি কারণ। এই দূষণ প্রতিরোধের সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে, সৃষ্টি বর্জ্যপানি পরিশোধন করে তারপর নদীতে ফেলা। এ পরিশোধন কাজের জন্য দরকার বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা (Effluent Treatment Plant: ETP) বা ইটিপি। ইটিপি কীভাবে তৈরি করা হবে, সেটা নির্ভর করে বর্জ্যপানিতে কী ধরনের ক্ষতিকর পদার্থ আছে তার ওপর। যেহেতু একেক ধরনের শিল্প-কারখানা থেকে একেক ধরনের বর্জ্যপানি বের হয়, তাই একটি সাধারণ ইটিপি দিয়ে সব কারখানার বর্জ্যপানি পরিশোধন করা সম্ভব নয়। তবে একই ধরনের শিল্প-কারখানা দিয়ে

একটি শিল্পাধ্যল গড়ে তুলে সব কারখানার বর্জ্যপানি একত্র করে একটি বড় ইটিপিতে পরিশোধন করা যেতে পারে।

### **কৃষিজমি থেকে মাটির ক্ষয়জনিত দূষণ প্রতিরোধ**

একটি জমিতে বছরের পর বছর ফসল চাষ করলে ধীরে ধীরে তার উর্বরতা নষ্ট হয়, আর উর্বরতা নষ্ট হলে মাটির ক্ষয় অনেক বেড়ে যায়। আমরা যদি জৈব সার ব্যবহার করে মাটির উর্বরতা বাড়াই, তাহলে সেটি মাটির ক্ষয়রোধ করতে সাহায্য করে। তোমরা কি বলতে পার এটি কীভাবে সম্ভব?

মাটিতে জৈব সার থেকে আসা জৈব পদার্থ বেশি থাকে বলে সেটি বৃষ্টির পানি ধরে রাখতে সাহায্য করে। ফলে, বৃষ্টি হলে খুব সহজেই সেটি প্রবাহিত হয়ে যায় না বা মাটির কণা সহজে বাতাসে উড়ে গিয়ে নদীর পানি দূষিত করে না। এতে করে মাটির কণা ছাড়াও অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থ যেমন: কীটনাশক, নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের যৌগ ইত্যাদি দ্বারা দূষণও কমে যায়। আবাদি জমির চারপাশে পুকুর খনন করেও পানির দূষণ প্রতিরোধ করা যায়।

তোমরা কি জান ক্ষেত থেকে ফসল কাটার পর ফসলের যে অবশিষ্ট অংশ জমিতে থেকে যায়, সেগুলো পানির দূষণ রোধ করে? ফসলের ধরন পরিবর্তন করেও পানিদূষণ রোধ করা যায়। যখন-তখন সার প্রয়োগ না করে ঠিক সময়ে বিশেষ করে বৃষ্টিপাতের আগ মুহূর্তে সার প্রয়োগ না করে দূষণ প্রতিরোধ করা যায়।

### **উন্নয়ন কার্যক্রমে পানির ভূমিকা**

আমাদের দেশ এখনো কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষির উন্নয়ন ছাড়া দেশের উন্নয়ন অসম্ভব। আর সেই কৃষিকাজে সেচের জন্য দরকার পানি অর্থাৎ পানি ছাড়া কোনোভাবেই উন্নয়ন সম্ভব নয়। ঘর-বাড়ি কি পানি ছাড়া তৈরি হয়? না, অসম্ভব। আবার উন্নত বিশ্বের প্রতিটি দেশ শিল্পে অত্যন্ত উন্নত, এমন কোনো শিল্প কারখানা কি আছে, যেখানে পানির প্রয়োজন নেই? না, নেই। সকল শিল্প-কারখানায় কোনো না কোনো পর্যায়ে পানি ব্যবহার করতেই হয়। তাহলে আমরা বলতে পারি, উন্নয়ন এবং পানি একে অপরের পরিপূরক।

## **২.৮ বাংলাদেশে পানির উৎসে তুমকি**

বাংলাদেশে যে সকল পানির উৎস রয়েছে (নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর, হ্রদ) তোমরা কি মনে কর সেগুলো কোনো ধরনের তুমকির মধ্যে রয়েছে? হ্যাঁ, আমাদের পানির উৎসগুলো নিশ্চিতভাবেই বেশ কয়েকটি তুমকির মুখে রয়েছে। প্রথমেই বলা যায়, জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের ফলে তুমকি। আমরা ইতোমধ্যে

বৈশ্বিক উৎসতার কারণে জলবায়ুর পরিবর্তনে আমাদের দেশে পানির উৎস কীভাবে হুমকির মাঝে পড়তে পারে সেটি আলোচনা করেছি। এখন অন্য কারণগুলো আলোচনা করা যাক।

### বন্যা ও মাটির ক্ষয়জনিত কারণে সৃষ্টি হুমকি

বাংলাদেশ ভৌগোলিক কারণে বন্যাপ্রবণ একটি দেশ। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি নদ-নদীই খরচ্ছোত্তা, যার একটি ফল হলো নদীভাঙ্গন। নদীভাঙ্গনের ফলে সৃষ্টি মাটি কোথায় যায় বলতে পারো? এই মাটি পানির স্তোত্তে মিশে যায় এবং এক পর্যায়ে নদীর তলায় জমা হয় ও ধীরে ধীরে নদী ভরাট হয়ে যায়। এতে একদিকে যেমন নদীর গতিপথ পাল্টে যায়, অন্যদিকে তেমনি নদী শুকিয়ে যেতে পারে বা মরেও যেতে পারে।

তোমরা কি জান, আমাদের দেশের অনেক নদী ইতোমধ্যেই মরে গেছে? করতোয়া, বিবিয়ানা, শাখা বরাক— এসব নদীই এখন মরা নদী। এমনকি একসময়ের খরচ্ছোত্তা পদ্মা নদীর অবস্থাও এখন সংকটাপন্ন। পদ্মা নদীর ওপর নির্মিত পাকশী ব্রিজের নিচে গরুর গাড়ি চলার দৃশ্য তোমরা অনেকেই দেখে থাকবে। এর কারণ হলো, নদী ভরাট হয়ে যাওয়া। নদী শুকিয়ে যাওয়ার অর্থই হলো পানিসংস্কার বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া।

### নদী দখল

আজকাল নদী দখল করে নানা রকম স্থাপনা, এমনকি আবাসিক এলাকা পর্যন্ত গড়ে তোলা হচ্ছে। এর ফলে কী ঘটছে? নদীর গতিপথ সরু হয়ে যাচ্ছে এবং পানি ধারণক্ষমতা কমে যাচ্ছে। যে কারণে একটু ভারী বর্ষণ হলেই বন্যা হয়ে যাচ্ছে। বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যাসহ বেশ কয়েকটি নদী এভাবে দখল হয়ে যাওয়ার ফলে এখন এরা প্রায় মরতে বসেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে অদুর ভবিষ্যতে এগুলোও মরা নদীতে পরিণত হবে।

### নদীতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ

তোমরা কি অনুমান করতে পার যে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধও আমাদের পানিসংস্কারের জন্য একটি হুমকি হতে পারে? হ্যাঁ, আসলেও কিন্তু ঠিক তাই। পদ্মা, যমুনাসহ বেশ কয়েকটি নদীতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ দেওয়ার ফলে এদের শাখা-প্রশাখায় পানির প্রবাহ মারাত্মকভাবে বিস্তৃত হয়েছে। মনোজ, বড়ল এবং কুমার নদ এ কারণে শুকিয়ে মরে গেছে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মরিছাপ, হামকুড়া আর হরিহর নদীও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধের জন্য মরে গেছে। কাজেই বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ আমাদের পানিসংস্কারের জন্য একটি মারাত্মক হুমকি।

### অপরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

তোমরা কি জান, শুধু ঢাকা শহরে দৈনিক কি পরিমাণ কঠিন বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন হয়? এর পরিমাণ দৈনিক প্রায় ৫০০ মেট্রিক টন। এর মাত্র অর্ধেক পরিমাণ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন সংগ্রহ করে ব্যবস্থাপনার

আওতায় নিয়ে আসে এবং বাকি অর্ধেক নর্দমা বা নালা দিয়ে বা অন্য কোনো উপায়ে নদীতে গিয়ে পড়ে।

এছাড়া ঢাকার আশপাশের প্রায় সব শিল্প-কারখানার অপরিশেষিত বর্জ্যও নদীতে ফেলা হয়। এর পরিনাম কী? নদী এসব বর্জ্য দিয়ে ভরে উঠছে, নদীর পানি বিষাক্ত হয়ে পড়ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে শিগগিরই বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্মা ও বালু নদী মরে যাবে। চট্টগ্রাম শহরের আশেপাশের নদীগুলোরও একই অবস্থা।

### পানির গতিপথ পরিবর্তন

১৯৭৫ সালে ভারত সরকার ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে গঙ্গার পানির গতিপথ পরিবর্তন করে। ১৯৭৭ সালে গঙ্গার পানি বন্টন নিয়ে ভারতের সাথে বাংলাদেশের একটি চুক্তি হয়। পরবর্তীকালে পানির ন্যায্য হিস্যা পাওয়ার জন্য ১৯৯৬ সালে আরেকটি চুক্তি হয়। গঙ্গার পানির এই গতিপথ পরিবর্তনের কারণেই বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের অনেক নদী পানিশূন্য হয়ে পড়েছে, যা এই অঞ্চলকে অনেকটা মরুভূমিতে পরিণত করেছে। শুধু তা-ই নয়, ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে ভারতও কাঞ্চিত ফল পায়নি বরং নানা ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখিন হয়েছে। এছাড়া ভারত ব্রহ্মপুত্র নদের পানির গতিপথও পরিবর্তন করে শিলিগুড়ি করিডর দিয়ে পশ্চিমাঞ্চলে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। এটি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের প্রায় ৩০০ বর্গকিলোমিটার হাওর এলাকাসহ পুরো দক্ষিণাঞ্চলে পানিসম্পদে বিপর্যয় নেমে আসবে। সম্প্রতি ভারত টিপাইমুখে বাঁধ নির্মাণের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, তাতেও বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের বিশাল এলাকা পানিশূন্য হয়ে যেতে পারে। অতএব এ কথা বলা যায় যে পানির গতিপথ পরিবর্তন পরিবেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হুমকি।

### পানি একটি মৌলিক অধিকার

পানি প্রাকৃতির এমন একটি দান, যা প্রায় সব জীবের জন্য অপরিহার্য। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানুষ খাওয়া, গোসল, রান্নাসহ অন্যান্য সকল কাজে পানি ব্যবহার করে আসছে। মানুষের পাঁচটি মৌলিক অধিকার হলো খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসা। এর প্রত্যেকটিই পানির ওপর নির্ভরশীল। তাই পানি হচ্ছে মানুষের মৌলিক অধিকার। আর যেহেতু এটি প্রাকৃতিক সম্পদ, কোনো দেশ বা জাতি এটি সৃষ্টি করেনি, তাই পানির প্রতিটি ফোঁটার উপর পৃথিবীর সব মানুষের অধিকার রয়েছে। কাজেই আমরা যখন পানি ব্যবহার করি, তখন মনে রাখতে হবে যে আমরা পৃথিবীর সকল মানুষের একটি সম্পদ ভোগ করছি এবং এটি কোনোমতেই অপচয় করা উচিত হয়। অপচয় করার অর্থই হলো অন্যের অধিকার খর্ব করা, যেটি আমরা কিছুতেই করতে পারি না।

### পানির উৎস সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

আমরা সবাই জানি, আমাদের বিশাল একটি পানিসম্পদ আছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে ব্যবহারযোগ্য পানিসম্পদের পরিমাণ কিন্তু খুবই সীমিত। এ অবস্থায় আমরা যদি পানির উৎস সংরক্ষণে সজাগ না

হই, তাহলে একসময় হয়তো ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করতে হবে। যেকোনো ধরনের উন্নয়নকাজে, সেটি শিল্প-কারখানা, রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি বা নগরায়ণ— যা-ই হোক না কেন সবকিছুতেই পানির প্রয়োজন রয়েছে। আবার এই সকল উন্নয়নের কারণে যদি পানির উৎসগুলোই হুমকির মুখে পড়ে যায়, তাহলে প্রকৃতপক্ষে সব ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডই থমকে যাবে। কাজেই যেখানে-সেখানে শিল্প-কারখানা, নগরায়ণ না করে অত্যন্ত পরিকল্পিত উপায়ে সেগুলো করতে হবে, যেন কোনোভাবেই পানির উৎসগুলো ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।

## ২.৯ পানিপ্রবাহের সর্বজনীনতা এবং আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি

তোমরা কি জান, পৃথিবীর সব সাগর-মহাসাগর একটির সাথে আরেকটির সংযোগ আছে? হ্যাঁ, আমাদের সাগর-মহাসাগর বা সমুদ্র— সবগুলোই একটির সাথে আরেকটি সংযুক্ত। আবার পাহাড়ি ঝর্ণা থেকে সৃষ্ট নদী এক সময়ে সাগরে গিয়ে পড়ে। অর্থাৎ একটি নদী বা সাগর যেখানেই থাকুক না কেন, যে দেশেই এর উৎপত্তি হোক না কেন বা যেখান দিয়েই এটি প্রবাহিত হোক না কেন, আসলে সেগুলো সারা পৃথিবীর সম্পদ। যার অর্থ পানিসম্পদ অবশ্যই একটি সর্বজনীন বিষয়। এটি কোনো জাতি-গোষ্ঠী, দেশ বা মহাদেশের সম্পদ নয়, এটি সবার সম্পদ। বিভিন্ন দেশের মাঝে সৃষ্ট রাজনৈতিক রেষারোধি, উন্নয়ন প্রতিযোগিতা, স্বার্থপর আচরণ এবং অসহিষ্ণু মনোভাবের কারণে পানিসম্পদের এই সর্বজনীনতা অনেক সময়েই মানা হচ্ছে না। তবে জাতিসংঘ ১৯৯৭ সালে বিভিন্ন দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদ-নদীগুলোর ক্ষেত্রে পানির বণ্টন নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সমৰোতা চুক্তি তৈরি করে, যদিও চুক্তিটি এখন পর্যন্ত খুব একটা কার্যকর হয়নি। এছাড়া পানিসম্পদ-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো।

### রামসার কনভেনশন

১৯৭১ সালের ২ ফেব্রুয়ারিতে ইরানের রামসারে ইউনেস্কোর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নেওয়া জলাভূমি-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলো হচ্ছে রামসার কনভেনশন। বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে এই সমৰোতা চুক্তিতে সম্মতি জ্ঞাপন করে স্বাক্ষর করে। পরবর্তী সময়ে ১৯৮২ ও ১৯৮৭ সালে রামসার কনভেনশন সংশোধন এবং পরিমার্জন করা হয়।

### আন্তর্জাতিক নদী কনভেনশন (International Water Course Convention)

আন্তর্জাতিক আইন সমিতি (The International Law Association) ১৯৬৬ সালে হেলসিংকিতে অনুষ্ঠিত তাদের ৫২তম সম্মেলনে আন্তর্জাতিক নদীগুলোর পানির ব্যবহার সম্পর্কে একটি কমিটি রিপোর্ট গ্রহণ করে। এটি হেলসিংকি নিয়ম নামে পরিচিত। পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক

আইন কমিশন আন্তর্জাতিক পানির ব্যবহারের জন্য একটি চুক্তি তৈরি করে, যা ১৯৯৭ সালের ২১ মে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় কলকাতায় হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এই কলকাতায় অনুযায়ী একের অধিক দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীর পানি কোনো দেশই অন্য দেশের অনুমতি ছাড়া একত্রিকভাবে ব্যবহার করতে পারবে না। এই ব্রাতি অনুযায়ী দেশগুলো ন্যায়সভাত এবং সুষ্ঠিসভাভাবে নিজ নিজ দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত অংশের পানি ব্যবহার করতে পারে, তবে অন্য দেশের অংশে পানিথাবাই যাতে কোনো বিষ না ঘটে সেটি অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।

আমরা কী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে এই নিয়মগুলো মেনে চলতে দেখছি?

## অনুশীলনী



### বন্ধনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন উচ্চিদাতি পানিতে এবং স্বল্পে উভয় জারণার অঙ্গে?

- (ক) শ্যাঙ্গা
- (খ) সিংগারা
- (গ) কলমি
- (ঘ) কুদিশা

২. পানির pH-এর বান খুব কমে পেলে অলজ প্রাণীর—

- i. অঙ্গপ্রত্যঙ্গা সঠিকভাবে বিকশিত হবে না
- ii. দেহাঙ্গভরে খনিজ পদার্থ করে বাবে
- iii. রোগব্যাধি সৃষ্টি হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| (ক) i ও ii   | (খ) i ও iii     |
| (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |

### নিচের অনুচ্ছেদটি পঢ় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

অনিক ও তৃষ্ণার দুজনে দুটি পুরুরের মাছ চাষ করে। অনিকের পুরুরের মাছের বৃদ্ধি সম্ভাবজনক। আর তৃষ্ণারের পুরুরের মাছগুলো দুর্বল; এদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো সঠিকভাবে বিকশিত হয়নি। পরীক্ষা করে দেখা গেল অনিকের পুরুরের পানির pH ৭.৫ ও তৃষ্ণারের পুরুরের পানির pH ৫.৫।

### ৩. অনিকের পুরুরের পানি কোন ধরণের?

- |              |                        |
|--------------|------------------------|
| (ক) এসিডিক   | (খ) কার্বনেট           |
| (গ) নিরপেক্ষ | (ঘ) ক্যালসিয়াম-সমৃদ্ধ |

### ৪. তৃষ্ণারের পুরুরের পানিতে নিচের কোনটি থার্মল করা উচিত?

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| (ক) এসিড        | (খ) কার    |
| (গ) ক্যালসিয়াম | (ঘ) ফসফরাস |



### সূজনশীল প্রশ্ন

### ১. পাশের চিত্রটি দেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

- পানিতে মৌলিক কোন গ্যাসের সাথে প্রকোজ বিক্রিয়া করে?
- পানির পুনরাবৃত্তন বলতে কী বোঝায়?
- নদীটি কোন ধরনের নদীতে পরিপন্থ হতে পারে? ব্যাখ্যা কর।
- ভূমি কি মনে কর নদীটিকে ছলজ প্রাণী বসবাসের উপযোগী করা সম্ভব? যুক্তিসহ মতামত দাও।



### ২. জমিলা খাতুন বাড়ির পাশের পুরুরের খেলা পানিকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় রাখার উপযোগী করেন। অপরদিকে রাতল সাহেব তার পানি বোজলজাতকরণ কারখানায় ও উষ্ণ তৈরির কারখানায় পানিকে জীবাণুমুক্ত ও বিশুদ্ধ করে ব্যবহার করেন।

- পানির স্ফুটনামক কাকে বলে?
- জলজ উত্তিদ পানির স্বাতে কেশে বার না কেন?
- জমিলা খাতুন পুরুরের পানিকে কীভাবে রাখার উপযোগী করেন? ব্যাখ্যা কর।
- রাতল সাহেব তার দুই করখানার কাছে ব্যবহার করা পানি কি একইভাবে জীবাণুমুক্ত ও বিশুদ্ধ করেন? যুক্তিসহ মতামত দাও।

# ভূতীয় অধ্যায়

## হৃদ্যত্বের যত কথা



মানুষ ও অন্যান্য উচ্চপেশির প্রাণীদের দেহে যেসব তত্ত্ব আছে, তার মধ্যে রক্ত সংবহনতত্ত্ব উল্লেখযোগ্য। কারণ, এই তত্ত্বের মাধ্যমে দেহের যাবতীয় বিপাকীয় কাজের ইস্ত সারা শরীরে পরিবাহিত হয়। রক্ত সংবহনতত্ত্ব গঠিত হয়েছে রক্ত, হৃৎপিণ্ড ও রক্তবাহিকা নিয়ে। হৃৎপিণ্ড হচ্ছে হৃৎপেশি নিয়ে তৈরি হিকোগাকার কাঁপা থকোঙ্কনুত্ত পাক্ষের ঘটো একটি অংশ। এর সংকোচন এবং প্রসারণের ফলে সারা দেহে রক্ত সরবরাহিত হয়। আকার, আকৃতি ও কাজের ভিত্তিতে রক্তবাহিকা তিনি রূক্ষ— ধৰনি, শিরা ও কৈশিক জালিকা। রক্তকে রক্তবাহিকার ভেতর দিয়ে সঞ্চালনের জন্য হৃৎপিণ্ড মানুষ ও অন্য সকল প্রাণীদেহে পাক্ষের ঘটো কাজ করে। ধৰনি দিয়ে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে সারা দেহে বাহিত হয়। সাধারণত কার্বন ডাই-অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে কিরণে আসে। ধৰনি ও শিরার সংযোগস্থল জালিকাকারে বিন্যস্ত হয়ে কৈশিক জালিকা গঠন করে। আমরা এ অধ্যায়ে রক্ত এবং রক্ত সঞ্চালনের যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে জানতে পারব।



## এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

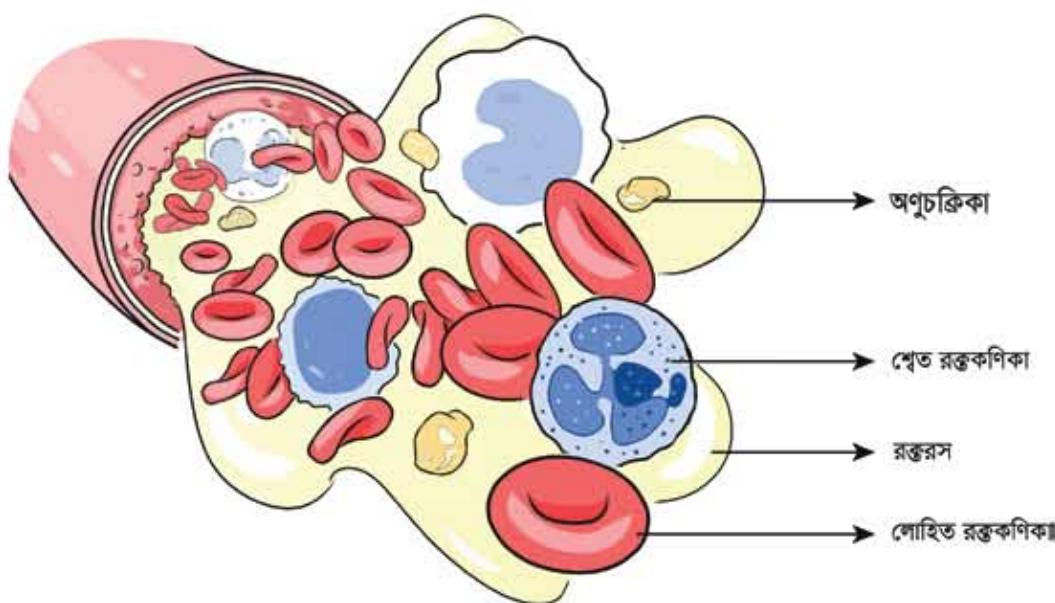
- রক্তের উপাদান এবং এদের কার্ডিওম ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রক্তের ঘুপের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রক্তের স্থানান্তরের নীতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রক্ত এহেণ প্রযোজনীয় সতর্কতা অবলম্বন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রক্ত বিয়তা/বিশৃঙ্খলা সূচিতে কারণ এবং এর ক্লাবল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শরীরে রক্ত সংকালন কার্ডিওম ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আদর্শ রক্তচাপ, হার্টবিট, হার্টরেট এবং গালসরেটের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারব।
- রক্তচাপজনিত শারীরিক সমস্যা সূচিতে কারণ ও প্রতিরোধের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শরীরে রক্ত সংকালনে কোলেস্টেরলের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- কোলেস্টেরলকে প্রত্যাশিত সীমায় রাখার প্রযোজনীয়তা ও উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রক্ত সুগ্রাহের ভাবসাম্যতার কারণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকারে করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কণ্ঠস্বরকে ভালো রাখার উপায় বর্ণনা করতে পারব।

## ୩.୧ ରତ୍ନ (Blood)

ଆଖିଦେହେର ରତ୍ନ ଏକ ସରଳ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ଧାରୀ ଲବଣ୍ୟର ଏବଂ ଖାଲିକଟା କାରାରମ୍ଭୀ ତରଳ ଯୋଜକ ଟିସ୍ୱୁ । ଏକଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣବୟକ୍ତ ସୁନ୍ଦର ମାନୁଷେର ମେହେ ଥାର ୫-୬ ଲିଟର ରତ୍ନ ଥାକେ, ବେଳି ମାନୁଷେର ଦେହେର ମୋଟ ସଙ୍ଗନେର ପ୍ରାୟ ୮% । ମାନୁଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେଲ୍ଲଦିନୀ ଆଖିଦେହେର ରତ୍ନ ଲାଲ ରଙ୍ଗେ । ରତ୍ନର ରଙ୍ଗେ ଲାଲ ରଙ୍ଗେର ହିମୋପ୍ଲୋବିନ ନାମେ ଶୌହ-ଘାଟିତ ପ୍ରୋଟିନ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଥାକାଯି ରଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଲାଲ । ହିମୋପ୍ଲୋବିନ ଅଞ୍ଚିଜେନେର ସାଥେ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ହୁଏ ଅଞ୍ଚିହିମୋପ୍ଲୋବିନ ବୌଗ ପଟ୍ଟନ କରେ ଅଞ୍ଚିଜେନ ପରିବହନ କରେ । କିଛି ପରିମାଣ କାର୍ବନ ଡାଇ-ଆଇଡ ହିମୋପ୍ଲୋବିନେର ସାଥେ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ହୁଏ କୁମରୁସେ ପରିବାହିତ ହୁଏ, ତବେ କାର୍ବନ ଡାଇ-ଆଇଡେର ନିହାତାଗ ବାଇକାର୍ବନେଟ ଆମନ ହିସେବେ ରତ୍ନ ଆଗ୍ରା କୁମରୁସେ ପରିବାହିତ ହୁଏ ।

### ରତ୍ନର ଉପାଦାନ ଓ ଏଦେର କାର୍ଯ୍ୟ:

ରତ୍ନର ଅଧିକ ଉପାଦାନଗୁଲୋ ହୁଲୋ ରତ୍ନରସ ବା ପ୍ଲାଜମା ଏବଂ ରତ୍ନକଣିକା (ଚିତ୍ର ୩.୦୧) । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରତ୍ନର ୫୫% ରତ୍ନରସ ଏବଂ ସାକି ୪୫% ରତ୍ନକଣିକା ରତ୍ନରସକେ ଆଶାଦୀ କରିଲେ ଏତି ହଲୁଦ ବର୍ଣ୍ଣର ଦେଖାଯି ଏବଂ ରତ୍ନକଣିକାଗୁଲୋ ଏହି ରତ୍ନରେ ଭାସମାନ ଥାକେ ।



ଚିତ୍ର ୩.୦୧: ମାନୁଷେର ରତ୍ନର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ

### ৩.১.১ রক্তরস বা প্লাজমা

রক্তের তরল অংশকে প্লাজমা বলে। রক্তরসের প্রায় ৯০% পানি, বাকি ১০% দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে বিভিন্ন রকমের জৈব এবং অজৈব পদার্থ। অজৈব পদার্থগুলোর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের খনিজ পদার্থের আয়ন, যেমন, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ক্লোরিন, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ, আয়োডিন এবং  $O_2$ ,  $CO_2$  এবং  $N_2$  জাতীয় গ্যাসীয় পদার্থ। জৈব পদার্থগুলো হলো:

১. খাদ্যসার: ফুকোজ, অ্যামিনো এসিড, মেহপদার্থ, ভিটামিন ইত্যাদি।
২. রেচন পদার্থ: ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, অ্যামোনিয়া, ক্রিয়েটিনিন ইত্যাদি।
৩. প্রোটিন: ফাইব্রিনোজেন, প্লোবিউলিন, অ্যালবুমিন, প্রোথ্রিমিন ইত্যাদি।
৪. প্রতিরক্ষামূলক দ্রব্যাদি: অ্যান্টিট্রিন, অ্যাম্বুটিনিন ইত্যাদি।
৫. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির নিঃসৃত বিভিন্ন হরমোন।
৬. কোলেস্টেরল, লেসিথিন, বিলিম্বুবিন ইত্যাদি নানা ধরনের ঘোগ।

### রক্তরসের কাজগুলো হচ্ছে:

১. রক্তকণিকাসহ রক্তরসে দ্রবীভূত খাদ্যসার দেহের বিভিন্ন অংশে বাহিত করা।
২. চিস্যু থেকে বর্জ্য পদার্থ নির্গত করে, সেগুলো রেচনের জন্য বৃক্ষে পরিবহন করা।
৩. শ্বসনের ফলে কোষের সৃষ্টি  $CO_2$  কে বাইকার্বনেট হিসেবে ফুসফুসে পরিবহন করা।
৪. রক্ত জমাট বাঁধার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো পরিবহন করা।
৫. হরমোন, এনজাইম, লিপিড প্রভৃতি দেহের বিভিন্ন অংশে বহন করা।
৬. রক্তের অঙ্গ-ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করা।

### সিরাম:

রক্ত থেকে রক্তকণিকা এবং রক্ত জমাট বাঁধার জন্য যে প্রয়োজনীয় প্রোটিন আছে, সেটাকে সরিয়ে নেওয়ার পর যে তরলটি রয়ে যায়, তাকে সিরাম বলে। অন্যভাবে বলা যায়, রক্ত জমাট বাঁধার পর যে হালকা হলুদ রংয়ের স্বচ্ছ রস পাওয়া যায়, তাকে সিরাম বলে। রক্তরস বা প্লাজমা এবং সিরামের মাঝে পার্থক্য হলো রক্তরসে রক্ত জমাট বাঁধার প্রয়োজনীয় প্রোটিন থাকে, সিরামে সেটি থাকে না।

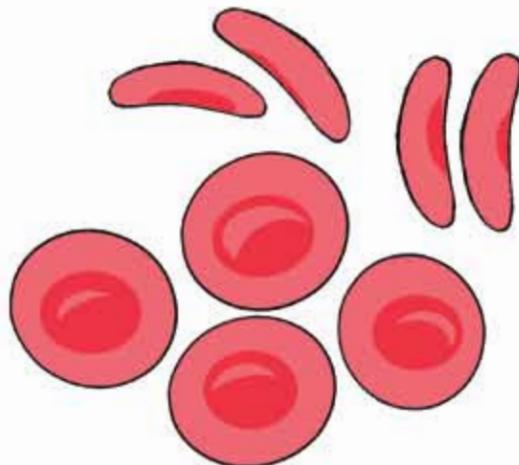
### ৩.১.২ রক্তকণিকা

রক্তরসের মধ্যে ছড়ানো বিভিন্ন রকমের কোষকে রক্তকণিকা বলে। রক্তকণিকাগুলো প্রধানত তিন রকমের, যথা:

- (ক) লোহিত রক্তকণিকা বা এরিথ্রোসাইট
- (খ) শ্বেত রক্তকণিকা বা লিউকোসাইট এবং
- (গ) অণুচক্রিকা বা প্রোসাইট।

### লোহিত রক্তকণিকা

মানবদেহের পরিপন্থ লোহিত রক্তকণিকা ছি-  
অবশ্য এবং চাকতি আকৃতির (চিত্র ৩.০২)। এতে  
হিমোগ্লোবিন নামে রক্তক পদার্থ ধারকার কারণে  
দেখতে লাল বর্ণের হয়। এজন্য এদেরকে Red  
Blood Cell বা RBC বলে। অন্যভাবে বলা বাস্তব,  
লোহিত কণিকা প্রকৃতপক্ষে হিমোগ্লোবিন ভর্তি  
জাপ্ত আকৃতির ভাসমান ব্যাগ। এ কারণে লোহিত  
কণিকা অধিক পরিমাণ অক্সিজেন পরিবহন করতে  
পারে। লোহিত কণিকাগুলোর বিভাজন হয় না। এ  
কণিকাগুলো সর্বকপ্ত অস্থিমস্ত্বার ভিতরে উৎপন্ন



চিত্র ৩.০২: লোহিত রক্ত কণিকা

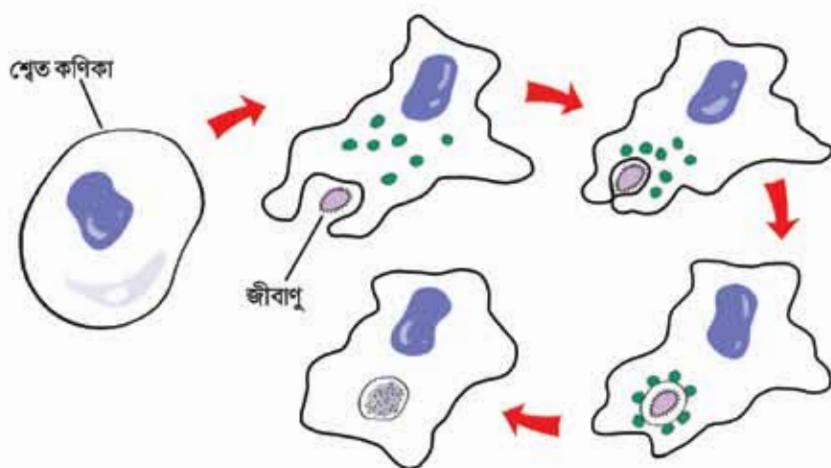
হতে থাকে এবং উৎপন্ন হওয়ার পর রক্তরসে চলে আসে। মানুষের লোহিত কণিকার আয়ু প্রায় চার  
মাস অর্ধে ১২০ দিন। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের লোহিত রক্তকণিকাগুলো উৎপন্ন হওয়ার পর রক্তরসে আসার  
পূর্বে নিউক্লিয়াসবিহীন হয়ে থাকে। অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে এরকম ঘটে না অর্ধে ১২০ এদের লোহিত  
কণিকাগুলোতে নিউক্লিয়াস থাকে। লোহিত কণিকা স্লীহা (Spleen) তে সঞ্চিত থাকে এবং তাঁক্ষণিক  
পরোজনে স্লীহা থেকে লোহিত কণিকা রক্তরসে সরবরাহ হয়।

বিভিন্ন বয়সের মানবদেহে প্রতি ঘনমিলিয়েটার রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা নিম্ন। যেমন খৃণ দেহে:  
৮০-৯০ লাখ; শিশুর দেহে: ৬০-৭০ লাখ; পূর্ববয়স্ক পুরুষ দেহে: ৪.৫-৫.৫ লাখ এবং পূর্ববয়স্ক নারীর  
দেহে: ৪.০-৫.০ লাখ।

### লোহিত কণিকার কাজ

লোহিত রক্তকণিকার প্রধান কাজ হলো:

১. দেহের প্রতিটি কোষে অক্সিজেন সরবরাহ করা।
২. নিষ্কাশনের জন্য কিছু পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইডকে টিস্যু থেকে ফুসফুসে বহন করা।
৩. হিমোগ্লোবিনের সাহায্যে রক্তের অঞ্চল-কারের সমতা বজায় রাখার জন্য বাক্সার হিসেবে কাজ করা।



চিত্র ৩.০৩: শ্বেত কণিকা ব্যাক্সোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণুকে ধ্বন্দে করছে।

### শ্বেত রক্তকণিকা বা লিঙ্গেকোসাইট

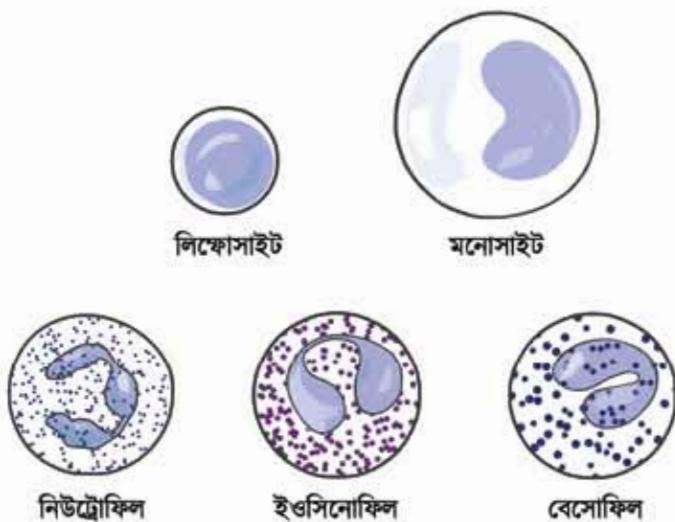
শ্বেত কণিকার নির্দিষ্ট কাজে আকার নেই। এগুলো হিমোপ্লেটিনবিহীন এবং নিউক্লিয়াসমুক্ত বড় আকারের কোষ। শ্বেত কণিকার গড় আয়ু ১-২৫ দিন। হিমোপ্লেটিন না থাকার কারণে এদের শ্বেত রক্তকণিকা, ইংরেজিতে White Blood Cell বা WBC বলে। শ্বেত কণিকার সংখ্যা RBC-এর তুলনায় অনেক কম। এরা আর্থিকার মতো দেহের আকারের পরিবর্তন করে। ব্যাক্সোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় (চিত্র ৩.০৩) এটি জীবাণুকে ধ্বন্দে করে। শ্বেত কণিকাগুলো রক্তরসের মধ্যে দিয়ে নিজেরাই চলতে পারে। রক্ত জপিকার প্রাচীর ভেদ করে চিস্তুর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। সেহে বাইরের জীবাণু বারা আক্রান্ত হলে মুক্ত শ্বেত কণিকার সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। মানবদেহে প্রতি ঘনমিলিমিটার রক্তে ৪-১০ হাজার শ্বেত রক্তকণিকা থাকে। অসুস্থ মানবদেহে এর সংখ্যা বেড়ে যাব। শ্বেত রক্ত কণিকায় DNA থাকে।

**প্রকারভেদ:** গঠনগতভাবে এবং সাইটোপ্লাজমে দানার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি অনুসারে শ্বেত কণিকাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় (চিত্র ৩.০৪), বধা (ক) আর্থানুলোসাইট বা দানাবিহীন এবং (খ) আনুলোসাইট বা দানামুক্ত।

#### (ক) আর্থানুলোসাইট

এ ধরনের শ্বেত কণিকাগুলোর সাইটোপ্লাজম দানাবিহীন ও স্থচ। আর্থানুলোসাইট শ্বেত কণিকা দুই ক্রকমের; যথা-লিঙ্গেকোসাইট ও মনোসাইট। দেহের লিঙ্গমোক্ত, টনসিল, গ্লীহা ইত্যাদি অংশে এরা তৈরি হয়। লিঙ্গেকোসাইটগুলো বড় নিউক্লিয়াসমুক্ত ছোট কণিকা। মনোসাইট ছোট, ডিম্বকার ও বৃক্ষকার নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট বড় কণিকা। লিঙ্গেকোসাইট অ্যান্টিবাচি গঠন করে এবং এই অ্যান্টিবাচির আরা দেহে

ପ୍ରବେଶ କରା ରୋଗ-ଜୀବାଣୁ ଧରେ । ଏତାବେ ଦେହେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରେ । ମନୋସାଇଟ୍ ଫ୍ଯାଗୋସାଇଟୋସିସ ପ୍ରକିଳ୍ପାଯ ରୋଗ-ଜୀବାଣୁକେ ଧରେ ।



ଚିତ୍ର ୩.୦୪: ବିଭିନ୍ନ ଥକାର ହେତୁ କଣିକା

#### (୩) ଶାନୁଲୋସାଇଟ୍

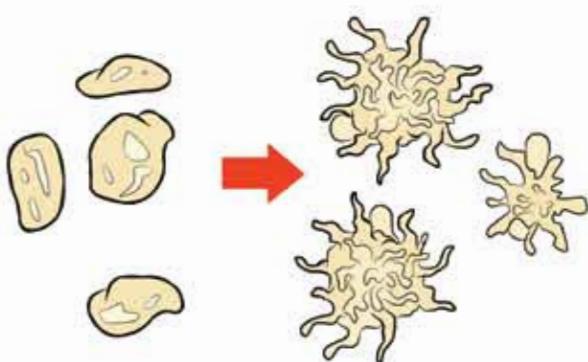
ଏଦେର ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦାନାଧୂନ୍ । ଶାନୁଲୋସାଇଟ୍ ହେତୁ କଣିକାଗୁଣୋ ନିଉକ୍ଲିଆସେର ଆକୃତିର ଡିଜିଟେ ତିନ ଥକାର ସଥା: ନିଉଟ୍ରୋଫିଲ, ଇଓସିନୋଫିଲ ଏବଂ ବେସୋଫିଲ ।

ନିଉଟ୍ରୋଫିଲ ଫ୍ୟାଗୋସାଇଟୋସିସ ପ୍ରକିଳ୍ପାଯ ଜୀବାଣୁ ଭକ୍ଷଣ କରେ । ଇଓସିନୋଫିଲ ଓ ବେସୋଫିଲ ହିସ୍ଟୋମିନ ନାମକ ରାସାଯନିକ ପଦାର୍ଥ ନିଃସୃତ କରେ ଦେହେ ଏଲାଞ୍ଜିର ପ୍ରତିରୋଧ କରେ । ବେସୋଫିଲ ହେପାରିନ ନିଃସୃତ କରେ ରତ୍ନକେ ରତ୍ନବାହିକାର ଭେତରେ ଜ୍ଵାଟ ବାଖତେ ବାଧା ଦେଇ ।

#### ଅଞ୍ଚଳିକ ବା ଶାନୁଲୋସାଇଟ୍

ଇରେଜିଟେ ଏଦେରକେ ପ୍ଲେଇଟ୍‌ଲୋଟ (Platelet) ବଳେ । ଏଗୁଣୋ ପୋଲାକାର, ଡିହାକାର ଅଥବା ରାଢ ଆକାରେ ହତେ ପାରେ । ଏଦେର ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଦାନାଦାର ଏବଂ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମେ କୋଷ ଅଜ୍ଞାନୁ- ମାଇଟୋକଣ୍ଡରୀଆ, ଗଲପି ବନ୍ଦୁ ଥାକେ; କିମ୍ବୁ ନିଉକ୍ଲିଆସ ଥାକେ ନା ।

ଅନେକେର ଯତେ, ଅଞ୍ଚଳିକଗୁଣୋ ସଙ୍କର୍ଣ୍ଣ  
୨୦



ଚିତ୍ର ୩.୦୫: ଅଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ତାର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ

কোষ নম; এগুলো অস্থিমজ্জাৰ বৃহদাকাৰ কোষেৰ হিসেবে আছে। অপুচক্রিকাগুলোৱ গড় আৰু ৫-১০ মিৰ। পরিষ্ঠত মানবদেহে প্ৰতি শনমিলিমিটাৰ রাজ্যে অপুচক্রিকাৰ সংখ্যা প্ৰায় আড়াই লাখ। অসুস্থ দেহেৰ সংখ্যা আৱো বেশি হয়।

অপুচক্রিকাৰ প্ৰধান কাজ হলো রক্ত তক্ষন কৰা বা জ্যাট বাঁধালোতে (blood clotting) সাহায্য কৰা। যখন কোনো রক্তবাহিকা বা কোনো টিস্যু আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়ে কেঠে থাকে, তখন সেৱানকাৰ অপুচক্রিকাগুলো সক্ৰিয় হয়ে উঠে অনিয়মিত আকাৰ ধাৰণ কৰে (তিথি ৩.০৫) এবং থ্ৰোপ্লাস্টিন (Thromboplastin) নামক পদাৰ্থ তৈৰি কৰে। এ পদাৰ্থগুলো রক্তৰ প্ৰোটিন প্ৰোমিনিনকে প্ৰমৰিণী পৰিষ্ঠত কৰে। প্ৰমৰিণী পৰৱৰ্তী কালে রক্তৰসেৰ প্ৰোটিন- ফাইব্ৰিনোজেনকে ফাইব্ৰিন জালকে পৰিষ্ঠত কৰে রক্তকে জ্যাট বাধাৰ কিংবা রক্তৰ তক্ষন ঘটায়। ফাইব্ৰিন একধৰনেৰ অস্তৰণীয় প্ৰোটিন, বা মুক্ত সূতাৰ মতো জালিকা প্ৰস্তুত কৰে। এটি কৃত স্থানে জ্যাট বাঁধে এবং রক্তকৰণ বন্ধ কৰে। তবে রক্ত তক্ষন প্ৰক্ৰিয়াতি আৱণ জটিল, এ প্ৰক্ৰিয়াৰ জন্য আৱণ বিভিন্ন ধৰনেৰ রাসায়নিক পদাৰ্থ এবং ভিটামিন K ও ক্যালসিয়াম আৱণ জড়িত থাকে।



### একক কাজ

**কাজ:** সোহিত কণিকা, শ্ৰেত কণিকা এবং অপুচক্রিকাৰ মধ্যে পাৰ্শ্বক্যগুলো ছকে লিখ।

### ৩.১.৩ রক্তৰ সাধাৰণ কাজ

- শাসকাৰ্ব:** রক্ত অঞ্জিজেনকে ফুসফুস থেকে টিস্যু কোষে এবং টিস্যু কোষ থেকে কাৰ্বন ডাই-অক্সাইডকে ফুসফুসে পৰিবহন কৰে। সোহিত কণিকা ও রক্তৰস প্ৰধানত এ কাজটি কৰে।
- হৰমোল পৰিবহন:** অস্তঞ্জকৰা প্ৰতি থেকে নিঃসৃত হৰমোল দেহেৰ বিভিন্ন অংশে পৰিবহন কৰে।
- খাদ্যসামৰ পৰিবহন:** দেহেৰ সকলৰ আভাৱ থেকে এবং পৰিপাককৃত খাদ্যসামৰ দেহেৰ টিস্যু কোষগুলোতে বহন কৰে।
- বৰ্জ্য পৰিবহন:** নাইট্রোজেনস্টিল বৰ্জ্য পদাৰ্থগুলোকে কিছিনি বা বৃক্ষে পৰিবহন কৰে।
- উক্তা নিৰাজন:** দেহে ভালোৱ কিভূতি অটিয়ে দেহেৰ নিকিট ভাগযাগা নিৰাজন কৰে।
- ৰোগ থতিৰোধ:** দেহে ৰোগজীবাণু প্ৰবেশ কৰলে যনোসাইট ও নিউট্ৰোফিল জাতীয় শ্ৰেত কণিকা ফ্যাশোসাইটেসিস পদ্ধতিতে জীবাণুকে হাস কৰে খৰস কৰে। লিম্ফোসাইট-জাতীয় শ্ৰেত কণিকা অ্যান্টিবডি গঠন কৰে দেহেৰ ভিতৱ্যেৰ জীবাণুকে খৰস কৰে এবং বাহিৱেৰ থেকে জীবাণুৰ আক্ৰমণকে প্ৰতিৰোধ কৰে।

প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষের রক্তের বিভিন্ন উপাদানের স্বাভাবিক মান:

১. লোহিত রক্তকণিকা: (পুরুষ) প্রতি ঘনমিলিমিটারে ৪.৫-৫.৫ লাখ  
(নারী) প্রতি ঘনমিলিমিটারে ৪-৫ লাখ

২. শ্বেত কণিকা: প্রতি ঘনমিলিমিটারে ৪০০০-১০,০০০

- (i) নিউট্রোফিল: ৪০-৭৫%  
(ii) ইওসিনোফিল: ১-৬%  
(iii) মনোসাইট: ২-১০%  
(iv) লিম্ফোসাইট: ২০-৪৫%  
(v) বেসোফিল: ০-১%
- } সর্বমোট স্বাভাবিক WBC  
এর মানের শতকরা হার।

৩. হিমোগ্লোবিন } পুরুষ: ১৪-৪৬ g/dL  
নারী: ১২-১৪ g/dL

৪. অণুচক্রিকা: ১ প্রতি ঘনমিলিমিটার ৫০,০০০-৮,০০,০০০

অন্যান্য জৈব পদার্থ :

- (i) সিরাম ইউরিয়া: ১৫-৪০ mg/dL  
(ii) সিরাম ক্রিয়েটিনিন: ০.৫-১.৫ mg/dL  
(iii) কোলেস্টেরল: ০-২০০ mg/dL  
(iv) বিলিরুবিন: ০.২-১.০ mg/dL  
(v) রক্ত শর্করা (আহারের পূর্বে) স্বাভাবিক সীমা: ৮-৬ mmol/L  
(dL = ডেসিলিটার)

### ৩.১.৪ রক্ত উপাদানের অস্বাভাবিক অবস্থা

মানুষের রক্তের বিভিন্ন উপাদানের তারতম্য ঘটলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে রক্তের অস্বাভাবিক অবস্থা বলা হয়। যেমন:

১. পলিসাইথিমিয়া: লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়া।

২. অ্যানিমিয়া: লোহিত কণিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় কমে যাওয়া অথবা হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় কমে যাওয়া।

**৩. লিউকেমিয়া:** নিউমোনিয়া, প্লেগ, কলেরা প্রভৃতি রোগে শ্বেত কণিকার সংখ্যা বেড়ে যায়। কিন্তু যদি শ্বেত কণিকার সংখ্যা অত্যধিক হারে বেড়ে ৫০,০০০-১,০০০,০০০ হয়, তাহলে তাকে লিউকেমিয়া বা ব্লাড ক্যান্সার বলে।

**৪. লিউকোসাইটোসিস:** শ্বেত কণিকার সংখ্যা স্বাভাবিক অবস্থার মান থেকে বেড়ে যদি ২০,০০০-৩০,০০০ হয়, তাকে লিউকোসাইটোসিস বলে। নিউমোনিয়া, হুপিং কাশি ইত্যাদি রোগে এ অবস্থা হয়।

**৫. থ্রিসোসাইটোসিস:** এ অবস্থায় অগুচক্রিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় বেড়ে যায়। রক্তনালির অভ্যন্তরে রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়াকে থ্রিসোসিস বলে। হৎপিণ্ডের করোনারি রক্তনালির রক্ত জমাট বাঁধলে তাকে সেরিব্রাল থ্রিসোসিস বলে।

**৬. পারপুরা:** ডেঙ্গুজুরে আক্রান্ত হলে এ অবস্থা হতে পারে। এ অবস্থায় অগুচক্রিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় কমে যায়।

**৭. থ্যালাসেমিয়া:** থ্যালাসেমিয়া একধরনের বৎশগত রক্তের রোগ। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তের হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে রক্তশূন্যতা সৃষ্টি হয়। হিমোগ্লোবিনের অস্বাভাবিকতার কারণে লোহিত রক্তকণিকা ভেঙে যায়, ফলে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। এ রোগটি মানুষের অটোজোমে অবস্থিত প্রচলন জিনের দ্বারা ঘটে। যখন মাতা ও পিতা উভয়ের অটোজোমে এ জিনটি প্রচলন অবস্থায় থাকে, তখন তাদের সন্তানদের মধ্যে প্রচলন জিন দুটি একত্রিত হয়ে এই রোগের প্রকাশ ঘটায়। সাধারণত শিশু অবস্থায় থ্যালাসেমিয়া রোগটি শনাক্ত হয়। এ রোগের জন্য রোগীকে প্রতি ৩ মাস অন্তর রক্ত সংগ্রালনের প্রয়োজন হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে রক্তশূন্যতার হার কমে যায়।

## ৩.২ রক্তের গ্রুপ

### ৩.২.১ অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডি

একজনের রক্তের সাথে আরেকজনের রক্ত মেশানো হলে কেন সেটি কখনো কখনো স্বাভাবিকভাবে মিশে যায় আবার কেন কখনো গুচ্ছবন্ধ হয়ে যায় সেটি বুঝতে হলে প্রথমে আমাদের দুটি বিষয় বুঝতে হবে, একটি হচ্ছে অ্যান্টিজেন, অন্যটি হচ্ছে অ্যান্টিবডি। অ্যান্টিজেন হচ্ছে বহিরাগত কোনো বস্তু বা প্রোটিন, যেটি আমাদের রক্তে প্রবেশ করলে আমাদের শরীরের নিরাপত্তাব্যবস্থা (Immune System) সেটাকে শরীরের জন্য ক্ষতিকর মনে করে তাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। অ্যান্টিজেনকে প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের রক্ত যে পদার্থ তৈরি করে, সেটাই হচ্ছে অ্যান্টিবডি। অ্যান্টিজেন এবং তাকে

প্রতিরোধ করার জন্য সৃষ্টি অ্যান্টিবডি যখন একই দ্রবণে থাকে, তখন একটি বিশেষ ধরনের বিক্রিয়া ঘটে। অ্যান্টিজেনকে আক্রমণ করার এই বিক্রিয়াকে অ্যান্টিবডি-অ্যান্টিজেন বিক্রিয়া বলা যায় এবং রন্ধনের মাঝে এই বিক্রিয়ার কারণে রন্ধন কণিকাগুলো গুচ্ছবদ্ধ হয়ে যায়।

১৯০০ সালে ড. কার্ল ল্যান্টস্টেইনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আবিষ্কার করলেন, বিভিন্ন মানুষের রন্ধনের লোহিত কণিকায় দুই ধরনের অ্যান্টিজেন পাওয়া যায়। তাই স্বাভাবিক ভাবেই এই দুইটি অ্যান্টিজেনকে প্রতিরোধ করার জন্য বিভিন্ন মানুষের সিরামে (যে তরলে লোহিত কণিকা ভাসমান থাকে) দুটি অ্যান্টিবডি পাওয়া যায়। লোহিত কণিকায় থাকা এই দুটি অ্যান্টিজেনকে A এবং B নাম দেওয়া হয়েছে। তোমরা নিচ্যই বুঝতে পারছ একজন মানুষের রন্ধনের লোহিত কণিকায় যদি A অ্যান্টিজেন থাকে তাহলে কোনোভাবেই তার রন্ধনে A অ্যান্টিজেনের অ্যান্টিবডি থাকতে পারবে না- যদি থাকে তাহলে এই অ্যান্টিবডি নিজেই নিজের রন্ধনের লোহিত কণিকাকে আক্রমণ করে মৃত্যুর কারণ হয়ে যাবে। A অ্যান্টিজেনের অ্যান্টিবডি না থাকলেও, B অ্যান্টিজেনের অ্যান্টিবডি থাকে। একইভাবে যে রন্ধনের লোহিত কণিকায় B অ্যান্টিজেন আছে সেখানে A অ্যান্টিজেনের অ্যান্টিবডি আছে।

অ্যান্টিজেন এবং তার অ্যান্টিবডির বিষয়টি বুঝে থাকলে আমরা মানুষের রন্ধন কীভাবে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে সেটি বুঝতে পারব।

যদি লোহিত রন্ধন কণিকায় A এবং B এই দুটি অ্যান্টিজেন থাকা সম্ভব হয় তাহলে আমরা রন্ধনকে নিচের চারভাগে ভাগ করতে পারি:

গ্রুপ A	রন্ধনে অ্যান্টিজেন A	সিরামে A অ্যান্টিজেনের অ্যান্টিবডি নেই। B অ্যান্টিজেনের অ্যান্টিবডি আছে।
গ্রুপ B	রন্ধনে অ্যান্টিজেন B	সিরামে B অ্যান্টিজেনের অ্যান্টিবডি নেই, শুধু A অ্যান্টিজেনের অ্যান্টিবডি আছে।
গ্রুপ AB	রন্ধনে অ্যান্টিজেন A এবং B দুটোই আছে।	সিরামে A কিংবা B কারো অ্যান্টিবডি নেই থাকা সম্ভব নয়।
গ্রুপ O	রন্ধনে A কিংবা B কোনো অ্যান্টিজেন নেই।	সিরামে A এবং B দুটো অ্যান্টিজেনেই অ্যান্টিবডি আছে।

এখন তোমরা নিজেরাই বলতে পারবে কোন মানুষের কোন গ্রুপের রন্ধন দেওয়া সম্ভব।

O গ্রুপের রন্ধনের লোহিত কণিকায় যেহেতু কোনো অ্যান্টিজেনই নেই তাকে যেকোনো গ্রুপেই দেওয়া সম্ভব। সেই গ্রুপে যে অ্যান্টিবডি থাকুক, কোনো ক্ষতি করা সম্ভব নয়। এজন্য O গ্রুপকে বলা হয়

### ইউনিভার্সাল ডোনার।

আবার অন্যদিকে AB গ্রুপের রক্ত, নিজের গ্রুপ ছাড়া অন্য কোনো গ্রুপকে দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ অন্য সব গ্রুপেই কোনো না কোনো আস্টিবডি আছে এবং AB গ্রুপ দুটো আস্টিজেনেই থাকার কারণে যে কোনো একটি বা দুটি আস্টিবডি সোহিত কণিকাকে আক্রান্ত করে পুষ্টিবন্ধ করে দেয়।

A গ্রুপ এবং B গ্রুপের রক্ত নিজের গ্রুপ ছাড়া শুধু AB গ্রুপকে দেওয়া ব্যতে পারে, কারণ AB গ্রুপে কোনো আস্টিবডি নেই, তাই A কিংবা B আস্টিজেনকে আক্রান্ত করতে পারবে না।

আবার আমরা বলি প্রথীকার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি তাহলে উল্টোটা দেখতে পাব। O গ্রুপ কাঠো রক্তই নিতে পারবে না, কারণ অন্য কোনো গ্রুপের সিরামে দুই ধরনের আস্টিবডি আছে। অন্যদিকে AB গ্রুপ সবার রক্তই নিতে পারবে কারণ তার সিরামে কোনো ধরনের আস্টিবডি নেই। এজন্য AB কে বলা হয় Universal Acceptor.

চৰকাৰ

দাতা

গ্রুপ	O-	O+	B-	B+	A-	A+	AB-	AB+
AB+								
AB-								
A+								
A-								
B+								
B-								
O+								
O-								

চির ৩.০৬% কোন গ্রুপের রক্ত কাকে দেওয়া যাবে।

### ৩.২.২ Rh ফ্যাস্টের

এতক্ষণ পর্যন্ত যে বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে, সেটি কিন্তু সম্পূর্ণ হয়নি, কারণ এখন পর্যন্ত রন্ধের গ্রুপের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাজনের কথা বলা হয়নি। তোমরা যারা রন্ধ গ্রুপের সাথে পরিচিত, তারা নিচয়ই লক্ষ্য করেছ যে, রন্ধের গ্রুপ বোঝানোর সময় শুধু A, B, AB কিংবা O বলা হয় না, সবসময়েই এর পর একটি প্লাস বা মাইনাস যুক্ত করা হয় (যেমন A+, O- ইত্যাদি)। এই প্লাস বা মাইনাস চিহ্নটি কোথা থেকে আসে?

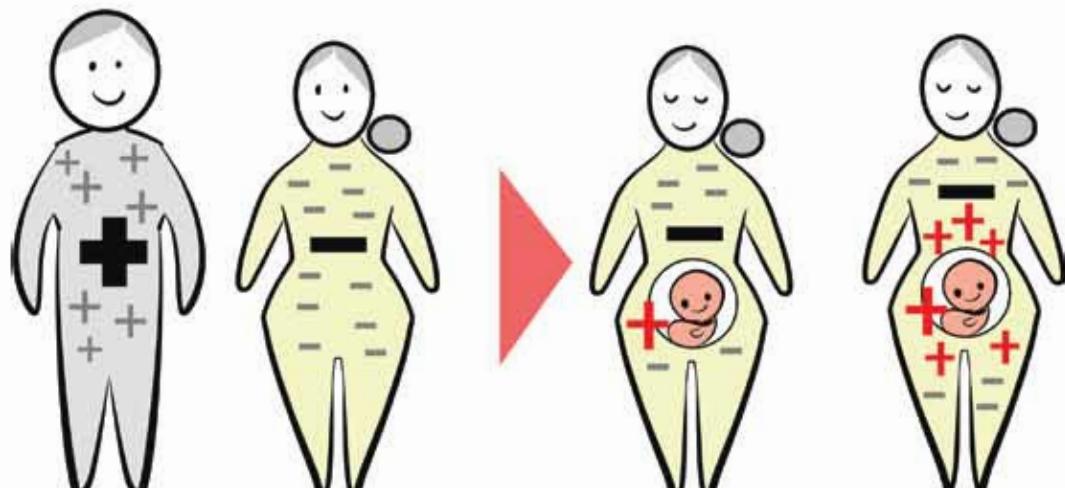
রেসাস নামের বানরের লোহিত রন্ধকণিকায় এক ধরনের অ্যান্টিজেন রয়েছে যেটি অনেক মানুষের রন্ধের লোহিত কণিকায় পাওয়া যায়। এই বানরের নাম অনুসারে এটাকে Rhesus Factor বা সংক্ষেপে Rh ফ্যাস্টের বলে। যাদের শরীরে এই অ্যান্টিজেন পাওয়া যায়, তাদের রন্ধকে Rh+ এবং যাদের শরীরে এটি নেই, তাদের রন্ধকে Rh- বলা হয়। রন্ধের গ্রুপের পিছনে যে প্লাস এবং মাইনাস চিহ্নটি থাকে, সেটি এই Rh ফ্যাস্টের ছাড়া অন্য কিছু নয়।

তোমরা নিচয়ই বুঝতে পারছ Rh- রন্ধ সবসময়ই Rh+ বিশিষ্ট রন্ধের মানুষকে দেওয়া সম্ভব (চিত্র ৩.০৬) কিন্তু উল্টোটা এক ধরনের জটিলতা সৃষ্টি করে। Rh- রন্ধবিশিষ্ট মানুষকে Rh+ বিশিষ্ট রন্ধ দিয়ে প্রথমবার গ্রাহীতার কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না কিন্তু ধীরে ধীরে গ্রাহীতার রন্ধ রসে Rh+ অ্যান্টিজেনের বিপরীত অ্যান্টিবডি তৈরি হবে। কাজেই দ্বিতীয়বার Rh+ বিশিষ্ট রন্ধ দেওয়া হলে এই অ্যান্টিবডি Rh+ রন্ধের লোহিত কণিকার সাথে বিক্রিয়া করে রন্ধকে জমাট বাঁধিয়ে দেবে। তবে একবার Rh+ বিশিষ্ট রন্ধ গ্রহণ করার পর যদি গ্রাহীতা আর ঐ রন্ধ গ্রহণ না করে তাহলে ধীরে ধীরে তার শরীরের Rh+ এর অ্যান্টিবডি নষ্ট হয়ে যায় এবং গ্রাহীতা তার স্বাভাবিক রন্ধ ফিরে পায়।

সন্তানসম্ভবা মায়েদের জন্য এই Rh ফ্যাস্টেরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি মায়ের রন্ধ Rh- এবং বাবার রন্ধ Rh+ হয় তাহলে তাদের সন্তান হবে Rh+ বিশিষ্ট, কারণ Rh+ একটি ‘প্রকট’ বৈশিষ্ট্য (অর্থাৎ এটি Dominant করে)। মাতৃগর্ভে ভূগ প্ল্যাসেন্টা বা ‘অমরা’-এর মাধ্যমে মায়ের জরায়ুর সাথে যুক্ত থাকে। সন্তানের Rh+ রন্ধ প্ল্যাসেন্টার মাধ্যমে মায়ের রন্ধে পৌঁছাবে এবং মায়ের রন্ধরসে Rh+ এর বিপরীত অ্যান্টিবডি তৈরি হবে। যেহেতু এই অ্যান্টিবডি খুব ধীরে ধীরে তৈরি হয়, তাই প্রথম সন্তানের বেলায় মায়ের রন্ধের Rh+ এর অ্যান্টিবডি সন্তানের দেহে পৌঁছে তার রন্ধের কোনো ক্ষতি করতে পারে না এবং একজন সুস্থ সন্তান জন্ম নেয় (চিত্র ৩.০৭)।

তবে দ্বিতীয় সন্তান গর্ভধারণ করার পর মায়ের শরীরের Rh+ এর অ্যান্টিবডি সন্তানের রন্ধে প্রবেশ করতে থাকে এবং ভূগের লোহিত কণিকা ধ্বংস করে, ভূগ বিনষ্ট হয়, অনেক সময় গর্ভপাত হয়। সন্তান জীবিত জন্ম নিলেও তার প্রচল রন্ধবল্পতা থাকে এবং জন্মের পর জড়িস রোগ দেখা দেয়।

এজন্য বিয়ের আগেই হবু বর-কনের রন্ধের গ্রুপ পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত এবং প্রয়োজনে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।



বাবার খ্রান্ত গ্রুপ পজিটিভ। মায়ের খ্রান্ত গ্রুপ নেগেটিভ।

মায়ের পেটে

আসা শিশুটির খ্রান্ত গ্রুপ পজিটিভ। কোন সমস্যা হলো না, কিন্তু-



চিত্র ৩.০৭: মায়ের রক্ত Rh- এবং শাশার রক্ত Rh+ হলে সম্ভাব্য অভিযোগ হতে পারে।



### একক কাজ

**কাজ:** কোন থুপের রক্ত কোন গ্রুপ নিতে পারবে, সেই তথ্য ব্যবহার করে পরের ছকে প্রতীকার  
থুপ বের কর।

	দাতা								
গ্রহীতা	Type	A+	A-	B+	B-	AB+	AB-	O+	O-
		✓	✓					✓	✓
				✓	✓				✓
									✓
			✓		✓		✓		✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
								✓	✓
			✓						✓
									✓

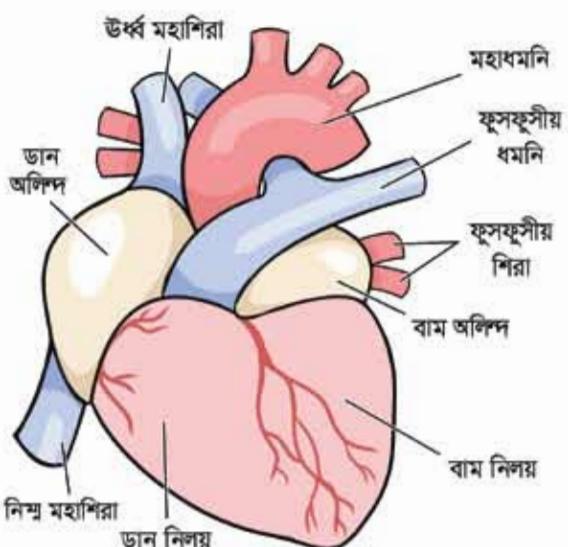
### ৩.২.৩ রন্তের শ্রেণিবিভাগের গুরুত্ব

- কোনো দাতার রন্ত গ্রহীতার দেহে দেওয়ার আগে সবসময়েই দুজনের রন্তের গ্রুপ জানার জন্য পরীক্ষা করে নেওয়া খুব জরুরি। ভুল গ্রুপের রন্ত দেওয়া হলে গ্রহীতার রন্তকে জমাট বাঁধিয়ে প্রাণহানির কারণ হতে পারে। খুবই জরুরি অবস্থায় যদি গ্রহীতার রন্তের গ্রুপ জানা সম্ভব না হয়, তাহলে O এবং Rh নেগেটিভ রন্ত দেয়াই সবচেয়ে নিরাপদ।
- কোনো শিশুর পিতৃত্ব নির্ণয়ে জটিলতা দেখা দিলে রন্তের গ্রুপ পরীক্ষা করে অনেক সময় তার সমাধান করা যায়।
- রন্তের গ্রুপ নির্ণয়ের মাধ্যমে বিশেষ প্রক্রিয়ায় অপরাধীদের শণাক্তকরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

#### রন্ত নীতি

মানুষের অসুস্থিতা কিংবা দুর্ঘটনার জন্য পর্যাপ্ত রন্তের ঘাটতি দেখা দিলে অন্য মানুষের শরীর থেকে রন্ত দেওয়ার বা রন্ত সঞ্চারণের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে অবশ্যই জীবাণুমুক্ত এবং সঠিক গ্রুপের রন্ত নিশ্চিত করে নিতে হয়। রন্ত সঞ্চারণের আগে রন্তে এইডস, জিভিস— এধরনের জটিল রোগের জীবাণু আছে কি না তাও পরীক্ষা করে নিতে হয়। ডাঙ্কার অবশ্য রোগী ও দাতার রন্তে A, B, O ও Rh ব্লাড গ্রুপ পরীক্ষা করে গ্রুপ ম্যাচ করার মাধ্যমে একজনের শরীর থেকে অন্যজনের শরীরে রন্ত সঞ্চারণের উদ্যোগ নেন।

- সঠিকভাবে গ্রুপ ম্যাচ না করে রন্ত সঞ্চারণ করা হলে মানুষের শরীরে বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটতে পারে।



চিত্র ৩.০৮: হৃৎপিণ্ড

### ৩.৩ কন্ত সংরাখণ

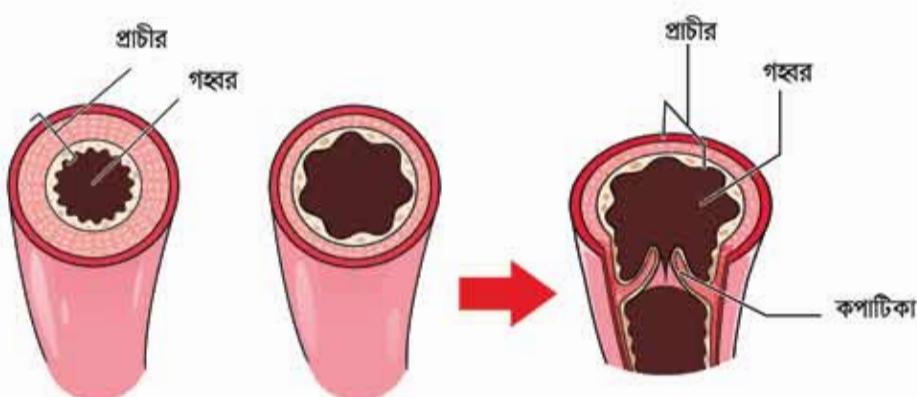
এ অধ্যায়ের শুরুতে আমরা জেনেছি যে কন্তসংবহনতন্ত্রের দ্বারা মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহে কন্ত সংরাখণ হয়। আনবদেহে কন্ত সংবহনতন্ত্রের প্রধান অংশগুলো হলো: হৃৎপিণ্ড, ধমনি, শিরা এবং কৈশিক জালিকা। এগুলোর কাজ সকলকে জানার আগে এগুলোর গঠন সকলকে জানা দরকার, তাই প্রথমে এগুলো সকলকে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক:

#### ৩.৩.১ হৃৎপিণ্ড (Heart)

হৃৎপিণ্ড কন্ত সংবহনতন্ত্রের অন্তর্গত একরকমের পাঞ্চ। হৃৎপিণ্ড অনবদ্রত সংকৃতিত ও ইসারিত হয়ে দ্বারা দেহে কন্ত সংরাখণ ঘটায়।

মানুষের হৃৎপিণ্ড বক্সগ্রহণের কুসকুস দুটির মাঝখানে এবং মখাজ্বার উপরে অবস্থিত। হৃৎপিণ্ডের প্রশংসন প্রান্তটি উপরের দিকে এবং ছুঁচালো প্রান্তটি নিচের দিকে বিন্যস্ত থাকে (চিত্র: ৩.০৮)।

হৃৎপিণ্ডটি বিস্তুরী পেরিকার্ডিয়াম পর্দা দিয়ে বেষ্টিত থাকে। উভয় স্তরের মাঝে পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড থাকে, যেটি হৃৎপিণ্ডকে সংকোচনে সাহায্য করে। মানুষের হৃৎপিণ্ড চারটি প্রকোষ্ঠ নিয়ে গঠিত। উপরের প্রকোষ্ঠ দুটিকে যথাক্রমে ডান এবং বাম অঙ্গিদ (Atrium) এবং নিচের প্রকোষ্ঠ দুটিকে যথাক্রমে ডান ও বাম নিলয় (Ventricles) বলে। দুটি অঙ্গিদের কেন্দ্রকার পাচার পাতলা কিন্তু নিলয় দুটির পাচার পুরু এবং পেশিবহুল। ডান অঙ্গিদের সঙ্গে একটি উত্তর মহাশিরা এবং একটি নিম্ন মহাশিরা মুক্ত থাকে।



ଚିତ୍ର ୩.୦୯: ଧରଣ ଏବଂ ଶିରାର ଅନ୍ତରେତ୍ତିମାନ

ବାମ ଲିଙ୍ଗରେ ସଜେ ଚାରଟି ପାଲମୋଲାରି ଶିରା ଯୁକ୍ତ ଥାକେ । ଡାଳ ଲିଙ୍ଗରେ ଥେବେ ଫୁଲଫୁଲୀର ଧରଣ ଏବଂ ବାମ ଲିଙ୍ଗରେ ଥେବେ ମହାଧରଣି ଉପରେ ଥିଲେ ।

### ଧରଣ

ଯେବେ ରତ୍ନାଳିର ମାଧ୍ୟମେ ରତ୍ନ ହୃଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥେବେ ଦେହର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶେ ବାହିତ ହୁଏ, ତାକେ ଧରଣ ବା ଆର୍ଟର ବଲେ । ଧରଣର ଆଚିର ପୁରୁ ଏବଂ ତିନଟି ମୁହଁରେ ଗଠିତ । ଏଦେର ଗହର ଛୋଟ (ଚିତ୍ର ୩.୦୯) । ଧରଣିତେ କୋନୋ କପାଟିକା ଥାକେ ନା । କିମ୍ବା ଧରଣ ଦିଯେ ରତ୍ନ ବେଗେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ।

ଧରଣର ଲାନ୍ଦନ ଆହେ । ଧରଣ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶେ କୁଞ୍ଚ କୁଞ୍ଚ ଶାଖା-ଶାଖାର ବିଭିନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ଏଦେର ଶାଖା ଧରଣ ଏବଂ ଆର୍ଟରାରିଓଲ ବଲେ । ଏଗୁଳୋ କ୍ରମଶ ଶାଖା-ଶାଖାର ବିଭିନ୍ନ ହୁଏ ଅବଶେଷେ ସ୍କ୍ରାଟିସୁଲ୍ କୈଶିକ ଜାଲିକାର ଶୈଶ ହୁଏ । ଧରଣର ମାଧ୍ୟମେ ହୃଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥେବେ ଦେହର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶେ ଅଞ୍ଜିଜେନ୍ୟୁକ୍ତ ରତ୍ନ ପରିବାହିତ ହୁଏ । ତବେ ଫୁଲଫୁଲୀର ଧରଣ ଏବଂ ବ୍ୟାତିକ୍ରମ, ଏହି ରତ୍ନାଳି ଦିଯେ ହୃଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫୁଲଫୁଲେ ରତ୍ନ ପ୍ରେରଣ କରେ ବଲେ ଏଟିକେ ଧରଣ (Pulmonary Artery) ବଳା ହଜୋର ଏଟି କାରନ ଡାଇ-ଆର୍ଟାଇଡ-ୟୁକ୍ଟ ରତ୍ନ ପରିବହନ କରେ ।

### ଶିରା

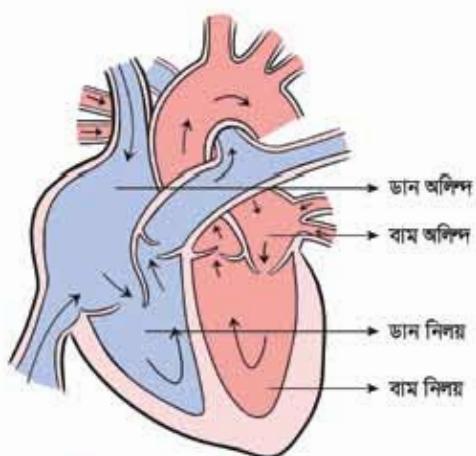
ଯେବେ ରତ୍ନାଳିର ମାଧ୍ୟମେ କାରନ ଡାଇ-ଆର୍ଟାଇଡ-ୟୁକ୍ଟ ରତ୍ନ ଦେହର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶେ ଥେବେ ହୃଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଆସେ, ତାଦେର ଶିରା ବଲେ । ତବେ ପାଲମୋଲାରି ଶିରା ଏବଂ ବ୍ୟାତିକ୍ରମ । ଏବଂ ମାଧ୍ୟମେ ରତ୍ନ ହୃଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଆସେ ବଲେ ଏଟିକେ ଶିରା ବଳା ହୁଏ । ତବେ ଏହି ଶିରା ଫୁଲଫୁଲେ ଥେବେ ଅଞ୍ଜିଜେନ-ସମ୍ବନ୍ଧ ରତ୍ନ



ଚିତ୍ର ୩.୧୦: କୈଶିକ ଜାଲିକା

ହସପିଡେ ନିଯ୍ମେ ଆମେ । ଶିରାର ପ୍ରାଚୀର ଧରନିର ମଧ୍ୟେ ତତ୍ତ୍ଵ ମଧ୍ୟରେ ପଠିତ ହସେଣ ପ୍ରାଚୀର ବେଶ ପାତଳା ଏବଂ ଗର୍ଭରୁଟି ବଡ଼ (ଚିତ୍ର ୩.୦୯) । ଶିରାଯ କପାଟିକା ଥାକାଯ ଶିରା ଦିଯେ ରଙ୍ଗ ଥିଲେ ଥିଲେ ଏକମୁଖେ ପ୍ରବାହିତ ହସି ।

ଧରନି ପ୍ରାଚୀର କୌଣସିକ ଜାଲିକାଗୁଲୋ କ୍ରମଶ ଏକାନ୍ତିତ ହସେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଵର୍ଗ ଶିରା ବା ଉପଶିରା ଗଠନ କରେ । ଉପଶିରାଗୁଲୋ ପରମ୍ପର ଘରିତ ହସେ ପରେ ଶିରା ଗଠନ କରେ । କତଗୁଲୋ ଶିରା ଯିଲେ ଯହାଶିରା ଗଠନ କରେ । ଏତାବେ ଶିରା କୈଶିକ ଜାଲିକା ଥେକେ ଶୁରୁ ହସି ଏବଂ ହସପିଡେ ଶେଷ ହସି ।



ଚିତ୍ର ୩.୧୧: ହସପିଡେର ଶର୍ତ୍ତମ୍ବନ

### କୈଶିକ ଜାଲିକା

ଧରନି ଓ ଶିରାର ମଧ୍ୟୋଗମ୍ବନେ ଅବଶ୍ଵିତ କେବଳ ଏକ ମତ୍ରାବିଶିଷ୍ଟ ଏନ୍ଡୋଥେଲିଆମ ଦିଯେ ପାଠିତ ଯେବେ ସ୍ଵର୍ଗ ରଙ୍ଗଲାଲି ଜାଲକେର ଥାକାରେ ବିଲ୍ଲତ ଥାକେ, ମେଗ୍ନୋକେ କୈଶିକ ଜାଲିକା ବଲେ (ଚିତ୍ର ୩.୧୦) । କୈଶିକ ଜାଲିକାର ରଙ୍ଗ ଓ କୋରେର ଯଥେ ଯାଗନ ଥକ୍ରିଯାର ଥାରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଅଞ୍ଜିଜେଲ, କାରନ ଡାଇ-ଆରିଜ୍, ରେଜନ ପଦାର୍ଥ ଇଭ୍ୟାନ୍ଦିର ଆଦାନ-ପ୍ରାଦାନ ଘଟେ ।

### ୩.୩.୨ ହସପିଡେର କାଙ୍ଗ

ଆମରା ପୂର୍ବେ ଜେନେହି, ମାନୁଷେର ରଙ୍ଗ ସଂବହନତତ୍ତ୍ଵ ହସପିଡେ, ଧରନି, ଶିରା ଏବଂ କୈଶିକ ଜାଲିକା ନିଯେ ପଠିତ । ମାନୁଷେର ହସପିଡେ ଅବିରାମ ସଙ୍କୁଟିତ ଓ ପ୍ରମାରିତ ହସେ ଧରନି ଓ ଶିରାର ମଧ୍ୟୋଗମ୍ବନେ ରଙ୍ଗ ସଂବହନ କରେ । ହସପିଡେ ପାଦେର ଘଟେ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ତାଳେ ଓ ଛନ୍ଦେ ସଙ୍କୁଟିତ ଏବଂ ପ୍ରମାରିତ ହସେ ସାରା ଦେହେ ରଙ୍ଗ ସର୍ବାଦନ ଘଟାଯି (ଚିତ୍ର ୩.୧୧) ।

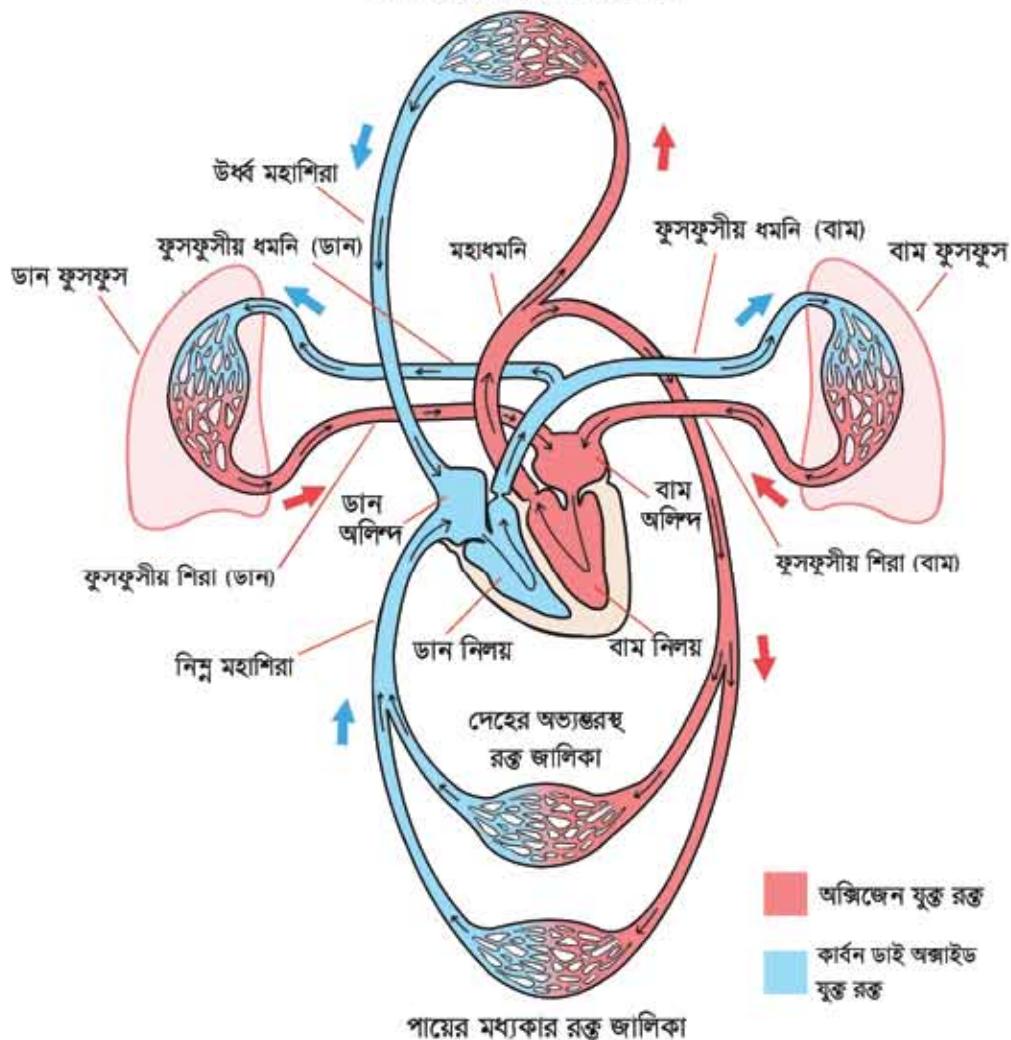
ହସପିଡେର ଅଭିଭୂତ ସହକୋଚନକେ ସିସ୍ଟୋଲ (systole) ଏବଂ ଅଭିଭୂତ ପ୍ରସାରନକେ ଡାଯାସ୍ଟୋଲ (diastole) ବଲେ । ଉତ୍ତରେ, ଅଲିଙ୍ଗେ ଯଥିଲ ସିସ୍ଟୋଲ ହସି, ନିଲାଗ ତଥିଲ ଡାଯାସ୍ଟୋଲ ଅବଶ୍ୱାସ ଥାକେ ।

ମାନୁଷଦେହେର ରଙ୍ଗ ସଂବହନ ୩.୧୨ ଚିତ୍ରେ ଦେଖାଲୋ ହୁଅଛେ ।

### ହାର୍ଟ-ବିଟ୍

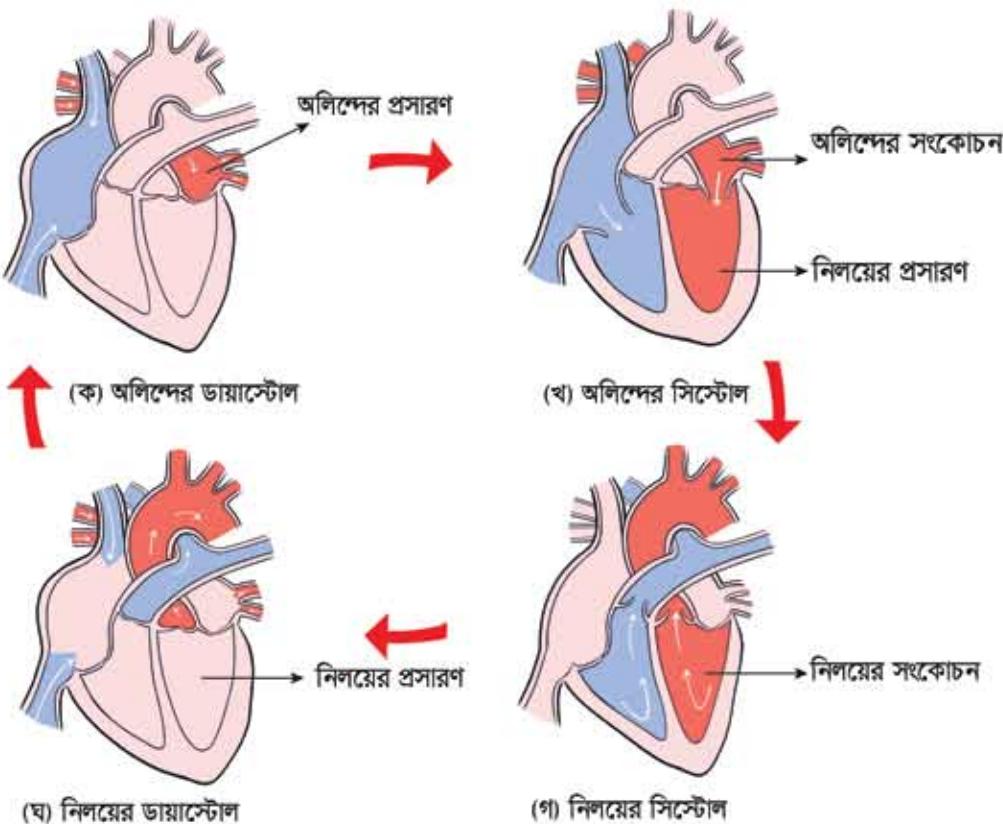
ଆମରା ଆଗେଇ ବଲେହି, ହସପିଡେ ଏକଟି ଅୟାହକ୍ରିୟ ପାଦେର ଘଟେ ଦେହେର ଭିତରେ ସାରାକଥିଲ ଛନ୍ଦେର ତାଳେ ମ୍ପଦିତ ହସି । ହସପିଡେର ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧକେ ହସପିଡେନ ବା ହାର୍ଟ-ବିଟ୍ ବଲେ । ଏଇ ହସପିଡେନ ମଧ୍ୟୋଗମ୍ବନେ ହସପିଡେ ଆମାଦେର ଶରୀରେ ରଙ୍ଗ ପ୍ରବାହିତ କରେ ।

ମାଥା ଓ ହାତେର ମଧ୍ୟକାର ରକ୍ତ ଜାଲିକା



ଚିତ୍ର ୩.୧୨: ମାନ୍ୟଦେହର ରକ୍ତ ସଂବହନ

ହାଟ୍-ବିଟ ବା କ୍ରମ୍ପାଦନ ଏକଟି ଜାତିଲ ବିଧିର । ମାନୁଦେହର କ୍ରମ୍ପିତ ମାରୋଜନିକ (myogenic) ଅର୍ଦ୍ଧ ବାଇରେ କୋଣୋ ଉକ୍ତିପଳା ହାତ୍ତା କ୍ରମପଣି ନିଜେ ଥେବେ ସଂକୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରାବ୍ୟେ ଭାରା କ୍ରମ୍ପାଦନ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏକଟି କ୍ରମ୍ପାଦନ କ୍ରମ୍ପିତେ ପର ପର ସଂଘଟିତ ଘଟନାର ସମ୍ଭାବକେ କାର୍ତ୍ତିକାକ ଚକ୍ର ବଳେ । କ୍ରମ୍ପିତର ସଂକୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରାବ୍ୟେ କରି ରକ୍ତ ଦେହେର ଭେତର ଗତିଶୀଳ ଥାଏ । କାର୍ତ୍ତିକାକ ଚକ୍ର ଚାରାଟି ଥାପେ (ଚିତ୍ର ୩.୧୩: କ, ଖ, ଗ, ଏବଂ ଘ) ସଂକଳନ ହେବ:



### চিত্র ৩.১৩: কার্ডিওক চক্র

(ক) অলিম্পের ডায়াস্টোল: এ সময় অলিম্প দুটি প্রসারিত অবস্থায় থাকে। কলে সারা শরীরের  $\text{CO}_2$  যুক্ত রক্ত উৎর এবং নিম্ন মহাশিয়া দিয়ে ডান অলিম্পে এবং মূসকুস থেকে  $\text{O}_2$  সমৃদ্ধ রক্ত পালমোনারি শিয়া দিয়ে বায় অলিম্পে প্রবেশ করে।

(খ) অলিম্পের সিস্টোল: অলিম্প দুটি রক্তপূর্ণ হলে এ দুটি সংকুচিত হয়। ডান অলিম্প থেকে  $\text{CO}_2$  যুক্ত রক্ত ডান নিলয় এবং বায় অলিম্প থেকে  $\text{O}_2$  সমৃদ্ধ রক্ত বায় নিলয়ে আসে।

(গ) নিলয়ের সিস্টোল: নিলয় দুটি রক্তপূর্ণ অবস্থায় সংকুচিত হয়। এ সময় ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকা বন্ধ থাকে এবং সেবিলুনার কপাটিকা খোলা থাকে। নিলয়ের সিস্টোলের সময় কপাটিকাগুলো বক্ষের সময় ক্রিয়েলন্ডের প্রথম বে শব্দের সূচিত হয়, তাকে ‘শাব’ বলে।

এ সময় বায় নিলয় থেকে বিশুদ্ধ রক্ত ( $\text{O}_2$  যুক্ত রক্ত) যাহাদমনি এবং ডান নিলয় থেকে  $\text{CO}_2$  যুক্ত রক্ত কুসকুসীর ধমনিতে প্রবেশ করে। যাহাদমনি থেকে রক্ত বিভিন্ন ধমনি ও শাখা দিয়ে দেহস্থ

বিজিন জালকে ছড়িয়ে পড়ে এবং কলাকোষকে পৃষ্ঠাহৃত্য ও অঙ্গিজেন সরবরাহ করে। অপরপক্ষে ফুসফুসীয় ধমনি থেকে  $\text{CO}_2$  মুক্ত রক্ত ফুসফুসীয় জালকে প্রবেশ করে। ফুসফুস থেকে রক্ত অঙ্গিজেন প্রহর করে ফুসফুসীয় শিরা দিয়ে বায় অলিন্দে আসে। অপরপক্ষে সারা দেহস্থ রক্ত জালক থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড মুক্ত রক্ত (দূর্ঘিত রক্ত) উপশিরা, শিরা ও মহাশিরা দিয়ে পুনরায় অলিন্দে ফিরে আসে।

(৩) নিলয়ের জায়াস্টোল: নিলয়ে সিস্টোলের পর পরই নিলয়ের জায়াস্টোল শুরু হয়। এই সময় আবার অলিন্দ থেকে রক্ত এসে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার নিলয় পূর্ণ হতে থাকে। এই সময় এখানকার সেমিলুনার জালভ বক্সের সময় যে বিচ্ছীয় পক্ষের সৃষ্টি হয় তাকে ‘ভাব’ বলে।

সূতরাং হৃৎপিণ্ডের শব্দগুলো হলো:

নিলয়ের সিস্টোল = শাব

নিলয়ের জায়াস্টোল = জ্বাব

একটি সিস্টোল ও একটি জায়াস্টোলের সময়ের একটি হৃৎস্পন্দন সম্পন্ন হয় এবং সময় শাবে প্রায় ০.৮ সেকেণ্ড। একজন সুস্থ মানুষের হৃৎস্পন্দন প্রতি মিনিটে ৬০-১০০ বার হয়। এটাকে হার্ট-বিট বলা হয়। আমাদের হাতের কবজিতে রেডিয়াল ধমনিতে এই স্পন্দন গোলা বায় আবার বুকের বায় দিকে নির্দিষ্ট স্থানে স্টেথোস্কোপ বসিয়ে শব্দ শোনা যায়। হাতের কবজিতে হৃৎস্পন্দন অনুভব করাকে পালস বলে। স্টেথোস্কোপের সাহায্যে হৃৎস্পন্দনের যে শব্দ শোনা যায়, তাকে হার্টসাউন্ড বলে। হৃৎস্পন্দন বা হার্ট-বিটকে বখন প্রতি মিনিটে হাতের কবজিতে গলনা করা হয়, তখন তাকে পালস রেট বলে।



চিত্র ৩.১৪: নাড়ি বা পালস দেখা

### ৩.৩.৩ হার্ট-বিট বা পালসরেট গলনার পদ্ধতি

মৌলীর হাতের কবজিতে হাতের তিন আঙুল বেমন: অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জনি দিয়ে চাগ দিলে হৃৎস্পন্দন প্রতি মিনিটে কতবার হয় তা অনুভব করা যায়। হাতের তিন আঙুল এমনভাবে রাখতে হবে যেন তর্জনি থাকে হৃৎপিণ্ডের দিকে, মধ্যমা মাঝখানে এবং অনামিকা হাতের আঙুলের দিকে (চিত্র ৩.১৪)। মধ্যমা আঙুল দিয়ে বোৰা যাবে হাতের রেডিয়াল ধমনি কত বার শুক্রধূক করছে। এক মিনিটে কতোবার সন্দিত হচ্ছে, সেটাই হচ্ছে পালস রেট বা পালসের গতি। পালসকে আমরা সাধাৰণভাৱে নাড়ি বলে থাকি।

 কবজিতে পালস বা পালয়া গেলে কৰ্ত্তনাত্মিৰ পাশে হৃৎস্পন্দন দেখা যেতে পারে অথবা সরাসরি বুকে

কান পেতেও হার্ট সাউন্ড শোনার চেষ্টা করা যেতে পারে। যেকোনো সাধারণ মানুষের পালসের গতি প্রতি মিনিটে কতবার হচ্ছে তা দেখা যায় উপরের বর্ণনা অনুসারে ব্যবস্থা নিলে। ঘড়ি ধরে পালসের গতি দেখতে হয়। সাধারণত পালসের গতি দ্রুত হয় পরিশ্রম করলে, ঘাবড়ে গেলে, ভয় পেলে, তীব্র যন্ত্রণা হলে কিংবা জ্বর হলে। পালসের স্বাভাবিক গতি হলো প্রতি মিনিটে ৬০ থেকে ১০০ বার। শিশুদের জন্য এটি বেশি প্রতি মিনিটে ১০০ থেকে ১৪০ বার। পূর্ণবয়স্ক মানুষের পালস রেট প্রতি মিনিটে ১০০-এর অধিক হয় জ্বর ও শক (অচেতনতা) অথবা থাইরয়েড গ্রন্থির অতি কার্যকারিতার কারণে। ১০ ফারেনহাইট তাপ বৃদ্ধির জন্য পালসের গতি প্রতি মিনিটে ১০ বার করে বাড়ে। পালসের গতি খুব দ্রুত, খুব মন্থর বা অনিয়ন্ত্রিত হলে বুবতে হবে যে হৎপিণ্ডের সমস্যা আছে। প্রতি মিনিটে পালসের গতি ৬০-এর কম হতে পারে হার্ট ব্লকের বা জড়িসের কারণে।

স্বাভাবিকভাবে মানসিক উত্তেজনা, ব্যায়াম, সন্ধ্যার দিকে পালসের গতি বেড়ে যায়। এ অবস্থায় পালসের গতি অধিক হলেও তা স্বাভাবিক ভাবতে হবে। ঘুমানো অবস্থায় এবং রাতে সুনিদ্রার পর সকালে পালসের গতি ৬০-এর কম হতে পারে। এ অবস্থাটিকেও স্বাভাবিক ধরতে হবে।

### ৩.৪ রক্ত চাপ

হৎপিণ্ডের সংকোচন এবং প্রসারণের ফলে হৎপিণ্ড থেকে রক্ত ধমনির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় ধমনিপ্রাচীরে যে পার্শ্বচাপ সৃষ্টি হয়, সেটাকে রক্তচাপ বলে। তাই রক্তচাপ বলতে সাধারণভাবে ধমনির রক্তচাপকেই বুঝায়। রক্তচাপ হৎপিণ্ডের কার্যকারিতা, ধমনির প্রাচীরের স্থিতিস্থাপকতা এবং রক্তের ঘনত্ব এবং পরিমাণের উপর নির্ভর করে। নিলয়ের সিস্টেল অবস্থায় ধমনিতে যে চাপ থাকে, তাকে সিস্টেলিক রক্তচাপ এবং ডায়াস্টেল অবস্থায় যে চাপ থাকে, তাকে ডায়াস্টেলিক রক্তচাপ বলে। স্বাভাবিক এবং সুস্থ একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সিস্টেলিক রক্তচাপ পারদ স্তরের ১১০ - ১৪০ মিলিমিটার (mm Hg) এবং ডায়াস্টেলিক রক্তচাপ পারদ স্তরের ৬০-৯০ মিলিমিটার (mm Hg)। স্বাভাবিক রক্তচাপকে ১২০/৮০ (mm Hg) এভাবে প্রকাশ করা হয়। স্ফিগমোম্যানোমিটার নামক যন্ত্রের সাহায্যে রক্তচাপ নির্ণয় করা যায়।

#### ৩.৪.১ উচ্চ রক্তচাপ

উচ্চ রক্তচাপকে ডাক্তারি ভাষায় হাইপারটেনশন বলে। শরীর আর মনের স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তচাপ যদি বয়সের জন্য নির্ধারিত মাত্রার উপরে অবস্থান করতে থাকে, তবে তাকে উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন বলে। রক্তের চাপ যদি কম থাকে তা হলে তাকে নিম্ন রক্তচাপ বলে। হৎপিণ্ডের সংকোচন আর প্রসারণের ফলে হৎপিণ্ড থেকে ধমনির মাধ্যমে রক্ত প্রবাহকালে ধমনি গায়ে কোনো ব্যক্তির সিস্টেলিক রক্তচাপ যদি সব সময় ১৬০ মিলিমিটার পারদস্ত বা তার বেশি এবং ডায়াস্টেলিক সব সময় ৯৫ মিলিমিটার

পারদস্তত্ব বা তার বেশি থাকে, তবে তার উচ্চ রক্তচাপ আছে বলা যায়। উভেজনা, চিন্তা, বিষগ্রতা, নিদ্রাহীনতা বা অন্য কোনো কারণে যদি রক্তচাপ সাময়িকভাবে নির্দিষ্ট সীমানা অতিক্রম করে, তবে তাকে হাইপারটেনশন বলা যাবে না এবং তার জন্য বিশেষ কোনো গুরুত্বেরও প্রয়োজন হয় না।

হাইপারটেনশন হাওয়ার প্রকৃত কারণ আজও জানা যায়নি। তবে অতিরিক্ত শারীরিক ওজন, মেদবহুল শরীর, অতিরিক্ত লবণ খাওয়া, অপর্যাপ্ত শারীরিক পরিশ্রম, ডায়াবেটিস, অস্থিরচিত্ত এবং মানসিক চাপগ্রস্ত, রক্তে কোলেস্টেরলের আধিক্য— এরকম ব্যক্তিদের মাঝে এ রোগের আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি। হাইপারটেনশন রোগীদের যেসব জটিলতা দেখা দিতে পারে তার মধ্যে রয়েছে স্ট্রোক, প্যারালাইসিস, হৎপিণ্ড বড় হয়ে যাওয়া, হার্ট অ্যাটাক এবং ফেইলিউর, কিডনির কার্যক্ষমতা কমে যাওয়া, দৃষ্টিশক্তির ব্যাঘাত প্রভৃতি। নিম্ন রক্তচাপ উচ্চ রক্তচাপের মতো এত মারাত্মক নয়। তবে রক্তচাপ যথেষ্ট কমে গেলে নানা রকম অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে।

রক্তচাপ প্রতিরোধ করার জন্য কিংবা প্রতিকার হিসেবে নিচের সতর্কতামূলক নিয়মগুলো পালন করলে উপকার পাওয়া যায়:

১. ডায়াবেটিস থাকলে সেটি নিয়ন্ত্রণে রাখা।
২. দেহের ওজন না বাঢ়ানো।
৩. চর্বিযুক্ত খাদ্য বর্জন করা। (যেমন: ঘি, মাখন, গরু ও খাসির মাংস, চিংড়ি ইত্যাদি)
৪. সুষম খাদ্য গ্রহণ করা।
৫. পরিমাণের অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।
৬. ধূমপান থেকে বিরত থাকা।
৭. নিয়মিত ব্যায়াম করা।
৮. দৈনিক ৭/৮ ঘণ্টা ঘুমানো।
৯. মানসিক চাপমুক্ত ও দুর্চিন্তামুক্ত জীবনযাপন করা।
১০. খাবারের সাথে অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।

### ৩.৪.২ কোলেস্টেরল

কোলেস্টেরল এক বিশেষ ধরনের জটিল স্নেহ পদার্থ বা লিপিড এবং স্টেরয়েড-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মানুষের প্রায় প্রত্যেক কোষ ও টিস্যুতে কোলেস্টেরল থাকে। যকৃৎ এবং মগজে এর পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। কোলেস্টেরল অন্যান্য স্নেহ পদার্থের সাথে মিশে রক্তে স্নেহের বাহক হিসেবে কাজ করে। স্নেহ এবং প্রোটিনের যৌগকে লাইপোপ্রোটিন বলে। স্নেহের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে লাইপোপ্রোটিন দুই রকম— উচ্চ ঘনত্ব বিশিষ্ট লাইপোপ্রোটিন (High Density Lipoprotein—HDL) এবং নিম্ন ঘনত্ববিশিষ্ট লাইপোপ্রোটিন (Low Density Lipoprotein— LDL)। রক্তের LDL-এর পরিমাণের

বৃদ্ধির সাথে কোলেস্টেরলের আধিক্যের সম্পর্ক আছে। রক্তে LDL-এর পরিমাণ বেশি থাকা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। রক্তে HDL-এর পরিমাণ বেশি থাকা শরীরের জন্য উপকারী। রক্তে কোলেস্টেরলের স্বাভাবিক পরিমাণ ১০০ - ২০০ mg/dL। রক্তে কোলেস্টেরলের আধিক্য হৃদরোগের আশঙ্কা বাড়ায়। স্বাভাবিক মাত্রা থেকে রক্তে কোলেস্টেরল বেশি হলে রক্তনালি অন্তঃপ্রাচীরের গায়ে কোলেস্টেরল ও ক্যালসিয়াম জমা হয়ে রক্তনালি গহ্বর ছেট হয়ে যায়। এ কারণে ধমনির প্রাচীরের স্থিতিস্থাপকতা কমে যায় এবং শক্ত হয়ে যায়। এ অবস্থাকে ধমনির কাঠিন্য বা arteriosclerosis বলে। আর্টারিওক্লেরোসিসের কারণে ধমনির প্রাচীরে ফাটল দেখা দিতে পারে। ধমনির গায়ে ফাটল দিয়ে রক্তক্ষরণ হয়ে জমাট বেঁধে রক্তপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়। হৎপিণ্ডের করোনারি রক্তনালিকায় রক্ত জমাট বাঁধলে তাকে করোনারি থ্রুহোসিস বলে এবং মস্তিষ্কের রক্তনালিতে রক্ত জমাট বাঁধলে তাকে সেরিব্রাল থ্রুহোসিস বলে। এতে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটতে পারে। রক্তে কোলেস্টেরল বেড়ে গেলে LDL-এর পরিমাণ বেড়ে যায় আর HDL-এর পরিমাণ কমে যায়। LDL-এর পরিমাণ ১৫০ mg/dL থেকে বেশি হলে তাকে ডাঙ্কারের পরামর্শ নেওয়া আবশ্যিক।

### ৩.৫ হৃদ্যন্তকে ভালো রাখার উপায়

আমরা প্রথম অধ্যায় থেকে জেনেছি, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আমাদের প্রয়োজন সুষম খাদ্য এবং শরীরকে সচল রাখার জন্য প্রয়োজন ব্যায়াম ও বিশ্রাম। সুষম খাদ্য গ্রহণ করা যেমন আবশ্যিক, তেমনি খাদ্য গ্রহণ এবং জীবনপ্রণালি সমন্বে কতগুলো সুঅভ্যাস গড়ে তোলাও একান্ত আবশ্যিক। অনেক কারণেই দেহে নানা ধরনের রোগ হতে পারে। তবে সঠিক খাদ্যব্যবস্থা এবং জীবনপ্রণালি অনুসরণ করে হৃদ্যন্তকে ঠিক রাখা যায়। সেগুলো হচ্ছে:

১. দেহের উচ্চতা এবং বয়স অনুসারে কাঞ্চিত ওজন বজায় রাখা আবশ্যিক। দেহের ওজন বেশি হলে হৎপিণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে।
২. প্রাণিজ ও উত্তিজ্জ প্রোটিন মিশ্রিত খাবার খাওয়া উচিত।
৩. শর্করা, মিষ্টি ও মেঝজাতীয় খাদ্যের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। শাক-সবজি ও আঁশযুক্ত খাবার বেশি খেতে হবে। উত্তিজ তেল গ্রহণ করা উচিত, তবে সামুদ্রিক মাছের তেল রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমায় এবং রক্ত জমাট বাঁধার প্রবণতা হ্রাস করে। মাছভোজীদের হৃদরোগের প্রকোপ এ জন্য তুলনামূলকভাবে কম থাকে।
৪. সুষম খাদ্যে ভিটামিন ও খনিজ লবণের চাহিদা যা আছে তা অপরিবর্তিত রাখা উচিত। তবে খাওয়ার লবণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে। রসুন, তেঁতুল, ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল ও অন্যান্য ফল নিয়মিত খেলে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেক কম থাকে।

এগুলো ছাড়া সঠিক ও পরিমিত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ এবং অতিভোজন হতে বিরত থাকতে হবে। অত্যধিক মানসিক চাপ সৃষ্টিকারী পরিস্থিতি এড়ানো, নিয়মিত হালকা ব্যায়াম অথবা হাঁটা এবং সুষ্ঠু জীবনযাপন অর্থাৎ সময়মতো ঘুমানো, ধূমাপান থেকে বিরত থাকলে হৃদ্রোগ বা উচ্চরন্ত চাপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

### ৩.৬ ডায়াবেটিস, বহুমূত্র বা মধুমেহ রোগ

ডায়াবেটিস এক ধরনের বিপাকজনিত রোগ।

আমরা যখন কিছু খাই, এটি গ্লুকোজে পরিণত হয়ে রন্তের মাঝে আসে। প্যানক্রিয়াস থেকে ইনসুলিন নামে এক ধরনের হরমোন নির্গত হয়, যেটি রন্তের এই গ্লুকোজকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে। কারো ডায়াবেটিস হলে প্যানক্রিয়াস যথেষ্ট ইনসুলিন তৈরি করতে পারে না কিংবা শরীর ইনসুলিনকে ব্যবহার করতে পারে না। যে কারণে রন্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়। মানুষের রন্তে গ্লুকোজের স্বাভাবিক মাত্রা হলো  $8.0\text{-}6.0 \text{ mmole/L}$  কিংবা ( $70\text{-}110 \text{ মি.গ্রা/ডেসি.লি.}$ )। ডায়াবেটিস হলে রন্তে এর পরিমাণ দীর্ঘস্থায়ীভাবে অনেক বেড়ে যায়। ডায়াবেটিস ছোঁয়াচে বা সংক্রামক রোগ নয়। ডায়াবেটিস হৃদ্যশ্রেণির রন্তপ্রবাহ রোগের ওপর পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তির রন্তে শর্করার পরিমাণ বেশি থাকায় এটি দেহের বিভিন্ন অঙ্গের, যেমন হৎপিণ্ড, কিডনি, চোখ ইত্যাদির স্বাভাবিক কাজে বাধা সৃষ্টি করে। দেখা গেছে ডায়াবেটিস রোগীদের করোনারি হৃদ্রোগ হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে। এটি হৎপিণ্ডকে অচল করে দেয় এবং রোগী স্ট্রোক হয়ে মারা যেতে পারে। এছাড়া দীর্ঘস্থায়ী ডায়াবেটিস রোগে রস্তচাপ বেড়ে যায় এবং এর থেকে উচ্চ রস্তচাপ বা হাইপারটেনশন হয়। উচ্চ রস্তচাপ করোনারি হৃদ্রোগের পূর্বলক্ষণ। ডায়াবেটিস রোগীদের রন্তে শর্করার মাত্রা দীর্ঘদিন অনিয়ন্ত্রিত থাকলে তাদের করোনারি হৃদ্রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা খুবই বেশি থাকে।

**কোন ব্যক্তির ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা বেশি**

যে কেউ যেকোনো সময়ে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হতে পারে, তবে চার শ্রেণির মানুষের ডায়াবেটিস বেশি হয়ে থাকে:

১. যাদের বংশে, যেমন: মা-বাবা সম্পর্কিত নিকট আঢ়ায়ের ডায়াবেটিস আছে।
২. যাদের ওজন বেশি এবং শরীর মেদবহুল।
৩. যারা ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রমের কোনো কাজ করে না।
৪. দীর্ঘদিন যারা স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ সেবন করে।

**ডায়াবেটিস রোগের লক্ষণ**

১. ঘন ঘন প্রস্তাৱ হওয়া, বিশেষ করে রাতে ঘনঘন প্রস্তাৱ হওয়া।

২. খুব বেশি পিপাসা লাগা।
৩. বেশি ক্ষুধা লাগা এবং অতিমাত্রায় শারীরিক দুর্বলতা অনুভব করা।
৪. যথেষ্ট খাওয়া সত্ত্বেও ওজন কমে যাওয়া এবং শীর্ণতা।
৫. সামান্য পরিশ্রমে ঝাঁকিত ও দুর্বলতা বোধ করা।
৬. চামড়া শুকিয়ে যাওয়া।
৭. চোখে ঝাপসা দেখা।
৮. শরীরের কোথাও ক্ষতের সৃষ্টি হলে, দেরিতে শুকানো।

### ডায়াবেটিস রোগীর পথ্য

ডায়াবেটিস রোগকে দমিয়ে রাখতে খাদ্যের ভূমিকা অসামান্য। ডায়াবেটিস রোগের জন্য ওষুধ সেবন করলেও রোগীকে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। নিয়ন্ত্রিত খাদ্যবস্থা না থাকলে ওষুধ সেবন করেও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। রোগীকে এমন খাদ্যদ্রব্য দিতে হবে, যা তার ন্যূনতম ক্যালরির চাহিদা পূরণ করবে কিন্তু এই খাদ্যের দ্বারা রক্তে ও প্রস্তাবে যাতে শর্করা বেড়ে না যায়।

### ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ

ডায়াবেটিস প্রধানত তিনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যথা: খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, ওষুধ সেবন এবং জীবন-শৃঙ্খলা।

(ক) **খাদ্য নিয়ন্ত্রণ:** মোটা লোকদের ডায়াবেটিস হলে তাদের ওজন স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্য ডান্তারের পরামর্শ অনুযায়ী খেতে হবে। ডায়াবেটিস রোগীদের একটুও চিনি বা মিষ্টি খাওয়া চলবে না। তাদের এমন খাবার খাওয়া উচিত, যা প্রোটিনসমৃদ্ধ (গাঢ় সবুজ রঙের শাক-সবজি, বরবটি, মাশবুম, বাদাম, ডিম, মাছ, চর্বি ছাড়া মাংস ইত্যাদি) এবং যেখানে শ্বেতসার কম থাকে।

(খ) **ওষুধ সেবন:** সব ডায়াবেটিস রোগীকেই খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে বয়স্ক রোগীদের এ দুটি নিয়ম যথাযথভাবে পালন করলে রোগ নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। কিন্তু ইনসুলিননির্ভর রোগীদের ক্ষেত্রে ইনসুলিন ইনজেকশনের দরকার হয়।

(গ) **জীবন শৃঙ্খলা:** শৃঙ্খলা ডায়াবেটিস রোগীর জীবন-কাঠি। তাকে এসব বিষয়ে বিশেষ নজর দিতে হবে:

১. নিয়মিত ও পরিমাণমতো সুষম খাবার খেতে হবে।
২. নিয়মিত ও পরিমাণমতো ব্যায়াম করতে হবে।
৩. নিয়মিত রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ পরিমাপ করে এবং ফলাফল পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
৪. মিষ্টি খাওয়া সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে হবে।



## ଅନୁଶୀଳନୀ



### ବହୁନିର୍ବାଚନୀ ପରୀକ୍ଷା

୧. କଣ ଜମାଟ ବାଁଧାଲୋ କୋନଟିର କାଜ?

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| (କ) ସୋହିତ କଣିକା | (ଘ) ଅନୁଚକ୍ରିକା |
| (ଗ) ଶେତ କଣିକା   | (ଘ) ଲସିକା କୋଷ  |

୨. ଅଭିଯୋଗକୁ କଣ ସମସ୍ତରାହ କରେ—

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| (କ) ଧୟନି ଓ ପାଲମୋଳାରି ଧୟନି | (ଘ) ଶିରା ଓ ପାଲମୋଳାରି ଶିରା |
| (ଗ) ଧୟନି ଓ ପାଲମୋଳାରି ଶିରା | (ଘ) ଶିରା ଓ ଧୟନି           |

ନିଚେର ଅନୁଜ୍ଞାଟି ପଢ଼େ ଓ ୪ ନଂ ପରୀକ୍ଷାର ଉତ୍ତର ଦାତା:

ଅଭିଯୋଗ ଜାକା ଥେବେ ମାନିକଗଙ୍ଗ ଯାତ୍ରାର ପଥେ ଗାଡ଼ି ଦୂର୍ଘଟନାର ପଡ଼େ । ଏତେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତ ମାରାତ୍ମକ ରକ୍ତକରଣ ହୁଏ । ଫଳେ ରକ୍ତର ପ୍ରୋଜନ । ବ୍ୟକ୍ତ କଣ ପରୀକ୍ଷା ଛାଡ଼ାଇ ଅଭିଯୋଗ କଲା, ଆୟି କଣ ଦିତେ ପାରିବ ।

୩. ଅଭିଯୋଗର ରକ୍ତର ଶୂଷ୍କ କୀ ହିଁ?

- |        |       |
|--------|-------|
| (କ) A  | (ଘ) B |
| (ଗ) AB | (ଘ) O |

୪. କଣରୁମେ କୋଣ ଗ୍ରାସିର ପଦାର୍ଥ ନେଇ?

- |            |            |
|------------|------------|
| (କ) $O_2$  | (ଘ) $CO_2$ |
| (ଗ) $Cl_2$ | (ଘ) $N_2$  |

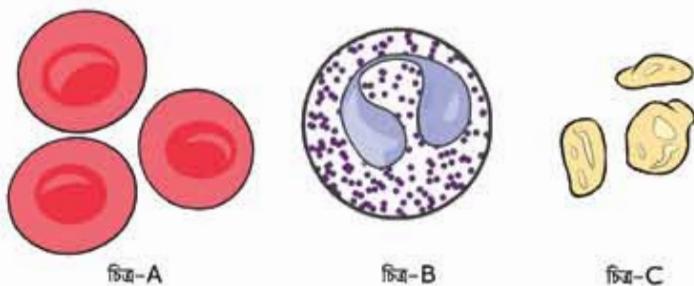


### ସ୍ମରଣୀୟ ପରୀକ୍ଷା

୧. ଗ୍ରାଫିନ୍ ୧୦ୟ ବ୍ୟେନିର ହାତ । ତାର ଆକାର ସୁର୍ତ୍ତାମ ଦେହର ଅଧିକାରୀ । ଗ୍ରାଫିନ୍ ଲକ୍ଷ କରିଛେ, ତାର ଆକାର ଦେହ କିନ୍ତୁ ସୂଚି ହେଲେ ଶୁକାତେ ଦେବି ହଜେ, ତାମଙ୍କା ଶୁକିରେ ଯାହେ, ସାମାନ୍ୟ ପରିବହି ଝାକ୍ଷ ଓ ଦୂର୍ବଳ ହେଲେ ପଡ଼ିଛେ । ଏଥର କାହାଥେ ଗ୍ରାଫିନ୍ର ଆକାର ତାତ୍କାରେର ଶେରପାପର ହିଁ । ତାତ୍କାର ପରୀକ୍ଷା-ନିରୀକ୍ଷା ଥେବେ ସୁମ୍ବ ଥାକାର ଅନ୍ୟ କିମ୍ବା ନିଯମନୂଳ୍ୟରେ ମେଲେ ଚଲାର ଉପଦେଶ ଦିଲେନ ।

- (क) रक्तचाप काके बले?  
 (ख) सिस्टोलिक रक्तचाप बलते की बोधाया?  
 (ग) राकिनेर आवाया की रॉपे आक्रमण होयेहेल? बाख्या कर।  
 (घ) डायुर साहेब राकिनेर आवायाके सुन्ध थाकार अल्य की उपसेष्ठ देन? बाख्या कर।

२. निचेर चित्रां लक्ष कर एवं शब्दशुलोर उत्तर दाओ:



- (क) रक्त काके बले?  
 (ख) कैपिक ज्ञानिका बलते की बुधाया?  
 (ग) मानवदेहे चित्रेर B चिह्नित कोबेर भूमिका बाख्या कर।  
 (घ) “चित्रेर A घ C एकह घोजक कलाय अवस्थित हलेव एदेर काज भिन्न”— उक्ति विझेषण कर।

## চতুর্থ অধ্যায়

# নবজীবনের সূচনা



আজ থেকে প্রায় সাতক কোটি বছর আগে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের উৎপন্নি হয়। পৃথিবীর জলবায়ু এখন শিথিলীল হিসে না। তারপর কয়েক শত কোটি বছর পরে আজ পৃথিবী শান্ত, তার জলবায়ুও মোটামুটি শিথিলীল। পৃথিবীতে এখন বহু প্রজাতির জীবের বসবাস। অর্থাৎ এই দীর্ঘ সময়কালে প্রথম আবির্ভূত অনুভূত জীবকুম পরিবর্তিত হয়ে ধীরে ধীরে বিভিন্ন জীবপ্রজাতি সৃষ্টি করেছে।

মানুষের জীবন শুরু হয় মাতৃগতে মারের ডিম্বাখু এবং বাবার শুক্রাগুর মিলনে সৃষ্টি হওয়া একটি কৌশ থেকে। মানুষ তার জীবনকালে প্রথমে থাকে শিশু। পরবর্তীকালে শিশু থেকে থাপে থাপে কৈশোর-যৌবন পার হয়ে বৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত হয়। জীবনকালের এই পরিবর্তনের একটি থাপ হচ্ছে বয়ঃসন্ধিকাল। বয়ঃসন্ধিকালে সবাইই দৈহিক এবং মানসিক পরিবর্তন ঘটে। আমরা এই অ্যায়ে পৃথিবীতে জীবের উৎপন্নি কীভাবে ঘটেছে এবং মানুষের বয়ঃসন্ধিকালে দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনগুলো কীভাবে ঘটে, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব।



## এই অধ্যার পাঠ শেষে আমরা:

- বয়ঃসন্ধিকাল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বয়ঃসন্ধিকালের মানসিক ও আচরণিক পরিবর্তনে নিজেকে খাগ খাওয়ানোর উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- বয়ঃসন্ধিকালে দেহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বয়ঃসন্ধিকালীন বিবাহে স্বাস্থ্যরূপি এবং এর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- টেস্টিটিউব বেবির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- লিঙ্গ নির্ধারণের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জীবনের উৎপত্তি এবং জীবজগতে বিবর্তনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পৃথিবীতে নতুন প্রজাতির উৎপত্তির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।

## ৪.১ বয়সসম্মিকাল

কোনো বাড়িতে একটি শিশু জন্ম নিলে সেখানে আনন্দের সাথী পঢ়ে যায়। সকলেই শিশুটিকে আসর করতে চায়, কোলে নিতে চায়। শিশুটি থীরে থীরে বড় হতে থাকে, পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত থাকে তাদের শৈশবকাল। হয় খেকে দশ বছর পর্যন্ত বয়সকে আমরা বাল্যকাল বলি, তখন একজন শিশুকে যেরে হলে বালিকা এবং হলে হলে বালক বলা হয়। দশ বছর বয়সের পর একটি মেয়েকে কিশোরী এবং একটি ছেলেকে কিশোর বলা হয়। মানুষের জীবনের এই সময়কে বয়সসম্মিকাল বলে। দশ বছর থেকে উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত কিশোরকালের বিস্তৃতি। অর্থাৎ বয়সসম্মিকাল বাল্যকাল ও বৌবনকালের মধ্যবর্তী সময়। এ সময়কালে বালিকা ও বালিকার শরীর যথাক্রমে পুরুষের এবং নারীর শরীরে পরিষ্কৃত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। সাধারণত মেয়েদের বয়সসম্মিকাল ছেলেদের চেয়ে একটু আগে শুরু হয়। মেয়েদের বয়সসম্মিকাল শুরু হয় আট থেকে তেরো বছর বয়সের মধ্যে। ছেলেদের বয়সসম্মিকাল শুরুর বয়স দশ থেকে পনেরো বছর। কারো কারো ক্ষেত্রে এর চেয়ে একটু আগে বা পরেও বয়সসম্মিকাল শুরু হতে পারে।

### ৪.১.১ বয়সসম্মিকালের পরিবর্তনসমূহ

বয়সসম্মিকালের পরিবর্তনগুলোর মধ্যে দৈহিক বা শারীরিক গরিবর্তনগুলোই অন্ধমে চোখে পড়ে। এই পরিবর্তন দেখলেই বোঝা যায় যে কারো বয়সসম্মিকাল চলছে।

শৈশব থেকে বাল্যকাল পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা থীরে থীরে বেশ সময় নিয়ে বেড়ে গেছে। কিন্তু বয়সসম্মিকালের বেড়ে গুঠা অনেকটা আকস্মিক। ছেলেমেয়েরা হঠাৎ ছুত লাগ হতে থাকে (চিত্র ৪.০১), ঘজনও বাঢ়তে থাকে ছুত। দশ বছর বয়সের পরে তিন থেকে চার বছর ধরে মেয়ে ও ছেলেদের শরীরে নানারকম পরিবর্তন আসে।



চিত্র ৪.০১: বয়সসম্মিকালে ছেলেমেয়েরা ছুত লাগ হয়ে গেছে

ভালো। তাহলে তোমরা ভয় কিংবা লজ্জা না পেয়ে তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে প্রস্তুত থাকতে পারবে।

বয়ঃসন্ধিকালে যেসব পরিবর্তন দেখা দেয়, সেগুলো প্রধানত তিনি রকম:

১. শারীরিক পরিবর্তন
২. মানসিক পরিবর্তন
৩. আচরণগত পরিবর্তন।

### ১. শারীরিক পরিবর্তন

- (ক) দ্রুত লস্বা হয়ে ওঠা এবং দ্রুত ওজন বেড়ে যাওয়া
- (খ) ছেলেদের (১৬/১৭ বছর বয়সে) দাঢ়ি-গোঁফ গজানো এবং মেয়েদের শ্তন বর্ধিত হতে শুরু করা
- (গ) শরীরের বিভিন্ন অংশে লোম গজানো
- (ঘ) ছেলেদের স্বরভঙ্গ হওয়া ও গলার স্বর মোটা হওয়া
- (ঙ) ছেলেদের বীর্যপাত এবং মেয়েদের মাসিক শুরু হওয়া
- (চ) ছেলেদের বুক ও কাঁধ চওড়া হয়ে ওঠা এবং মেয়েদের কোমরের হাড় মোটা হওয়া।

### ২. মানসিক পরিবর্তন

- (ক) অন্যের, বিশেষত নিকটজনের মনোযোগ, যত্ন ও ভালোবাসা পাওয়ার ইচ্ছা তীব্র হওয়া
- (খ) আবেগ দ্বারা চালিত হওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হওয়া
- (গ) ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে কৌতুহল সৃষ্টি হওয়া
- (ঘ) বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়া
- (ঙ) মানসিক পরিপন্থতার পর্যায় শুরু হওয়া
- (চ) পরনির্ভরতার মনোভাব পরিবর্তিত হয়ে আত্মনির্ভর হওয়ার পর্যায় শুরু হওয়া।

### ৩. আচরণগত পরিবর্তন

- (ক) প্রাপ্তবয়স্কদের মতো আচরণ করা
- (খ) সে যে একজন আলাদা ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন আচরণের মাধ্যমে এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা
- (গ) প্রত্যেক বিষয়ে নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা
- (ঘ) দুঃসাহসিক ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে প্রবৃত্ত হওয়া।



## একক কাজ

কাজ: নিচের হক্টি পূরণ কর :

বয়সসম্মিকালের

শারীরিক পরিবর্তন (যেয়েদের)	শারীরিক পরিবর্তন (হলেদের)	মানসিক পরিবর্তন (উভয়ের)

## ৪.১.২ বয়সসম্মিকাল পরিবর্তনের কারণ

সাধারণত হলেদেরের ১১-১৯ বছরের সময়কালকে বয়সসম্মিকাল বলে। তোমরা এর মাঝে জেনে গেছ যে এ সময়ে হলেদেরের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়। তবে আবহাও, স্থান, খাদ্য ইত্যাদির পরিমাণ ও মানের কারণে এক একজনের বয়সসম্মিকালের সময়টা এক এক রূপ হতে পারে। বয়সসম্মিকালে যেসব পরিবর্তন ঘটে, তাৰ জন্য দারী হুমোর নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ, বা অ্যাড্রেনালিন থেকে নিষ্পত্ত হয়। হুমোর শরীরের ভিত্তিৰ স্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়াৰ মাধ্যমে তৈরি হয়। হেলে ও যেয়েদের শরীরেৰ হুমোৰ ভিত্তি। এ কারণে তাদেৱ শরীৰ ও মনে যে পরিবর্তন হয় সেটিও ভিত্তি। যেয়েদেৱ শরীৰে বিভিন্ন পরিবর্তনেৱ জন্য দারী প্রধানত দুটি হুমোৰ। এ হুমোৰ দুটোৱ নাম হলো ইন্ট্ৰোজেন ও প্রজেস্টেৱন।

চিত্র ৪.০২: বয়সসম্মিকালে হলেদেৱ  
দারী-গোক পজাৱচিত্র ৪.০৩: বয়সসম্মিকালে নিজেৰ পরিবর্তনেৱ  
বিষয়ে মেৰোৱা সচেতন হয়ে উঠে।

এসব হরমোনের প্রভাবে কঠুন্ডের পরিবর্তন হয়, মূল সৈহিক বৃদ্ধি হয় এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যক্ষের আকার বৃদ্ধিসহ অন্যান্য পরিবর্তন ঘটে। এ হরমোনের কারণে মেরেদের বাহ্যিকাব বা মাসিক শূরু হয়। বয়স বয়ন ১০-১২ বছর হয়, সাধারণত তখনই মেরেদের বাহ্যিকাব শূরু হয়। নারীর সম্মান ধারণের সক্ষমতার লক্ষণ হলো নিয়মিত বাহ্যিকাব। বাহ্যিকাব শূরু হওয়া সুস্থানের লক্ষণ। বাংলাদেশের নারীদের সাধারণত ৪৫-৫৫ বছর বয়সের মধ্যে বাহ্যিকাব বন্ধ হয়ে যায়। ২৮ দিন পর্যন্ত বা মাসে একবার এই বাহ্যিকাব প্রক্রিয়া চলে এবং সাধারণত এটি ৩-৭ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

বয়সসম্মিকালে ছেলেদের শরীরে বিভিন্ন পরিবর্তনের জন্য যে হরমোন দায়ী, তার নাম হলো টেস্টোস্টেরন। এ হরমোনের প্রভাবে তাদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে। ছেলেদের গোরায় স্বর আয়ী হয়। মুখে দাঢ়ি ও পৌঁক গজায় (চিত্র ৪.০২), মূল সৈহিক বৃদ্ধি পায়। ১৩ থেকে ১৫ বছরের ছেলেদের শরীরে শূল্কশূলু তৈরি হয় এবং যাবে যাবে রাতের বেলা ঘুমের মধ্যে বীর্যগাত ঘটে। ছেলে ও মেয়ে উভয়ের মাঝেই শারীরিক পরিবর্তনের পাশাপাশি মানসিক পরিবর্তন হয়। ছেলে ও মেয়েরা এ বয়সে কল্পনাপ্রবণ হয় এবং আবেগ ঘারা চালিত হয়। তারা পরিপাটি রূপে নিজেকে সাজিয়ে রাখতে চায় (চিত্র ৪.০৩)। এ সময় ছেলেরা মেয়েদের প্রতি এবং মেয়েরা ছেলেদের প্রতি আকর্ষণবোধ করে। এভাবেই ধীরে ধীরে কিশোর-কিশোরীরা আশ্চর্যজনক মানুষে পরিণত হতে শুরু করে।

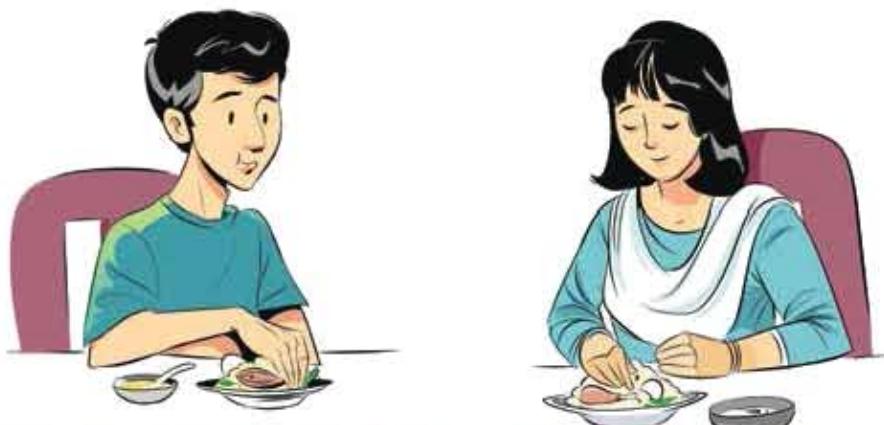


### একক কাজ

কাজ: নিচে বিবৃতি সভ্য হলে ঠিক (✓) চিহ্ন দাও এবং মিথ্যা হলে ক্রস (✗) চিহ্ন দাও।

বিবৃতি	✓ অর্থাৎ ✗
বয়সসম্মিকালের পরিবর্তনগুলো ঘটে হরমোনের কারণে	
বয়সসম্মিকালের পরিবর্তনের কারণ অতিরিক্ত খাদ্য প্রাপ্তি	
মেয়েদের শরীরে ইন্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন হরমোন কাজ করে	
ইন্ট্রোজেন হরমোন ছেলেদের শরীরে তৈরি হয়	
ছেলেদের বয়সসম্মিকালের পরিবর্তনগুলো ঘটে প্রজেস্টেরন হরমোনের প্রভাবে	
ইন্ট্রোজেন খাদ্য হজমে সহায়তা করে	

তোমরা জেনেছ যে ছেলে-মেয়েদের ১১-১৯ বছর বয়সের সময়কালকে বলা হয় বয়ঃসন্ধিকাল। তোমরা এও জেনেছ, এ সময় ছেলে-মেয়েদের দৈহিক ও মানসিক ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনগুলোর সাথে স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়টি জড়িত।



চিত্র ৪.০৪: বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের পুটিকর  
খাদ্য খাওয়ার প্রয়োজন

চিত্র ৪.০৫: বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের  
পুটিকর খাদ্য খাওয়ার প্রয়োজন

### ৪.১.৩ দৈহিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখা

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের মাঝে রাতের বেলা শুমের ঘণ্টে যে বীর্যপাত ঘটে, সেটাকে স্বপ্নদোষ বলা হয়ে থাকে। স্বপ্নদোষ ভয় বা লজ্জার কোনো বিষয় নয়। “স্বপ্নদোষ” কলা হলেও এটি কোনো দোষ নয়। এটা এ বয়সে শরীরের একটি স্বাভাবিক কার্যক্রম। বয়ঃসন্ধিকালে সাধারণ ১৩ থেকে ১৫ বছরের ঘণ্টে ছেলেদের শূল্কাপু তৈরি শুরু হয়। কখনো কখনো শুমের ঘণ্টে বীর্যের মাধ্যমে এ শূল্কাপু দেহের বাইরে বেরিয়ে আসে। শরীরের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই শরীর থেকে বীর্যপাত হয় এবং তা অবিচার তৈরি হতে থাকে। স্বপ্নদোষ হলে শোসল করে পরিকার হওয়া ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে দুর্ভাবনা করার কিছু নেই। এ সময় শরীর মুক্ত বেড়ে উঠে বলে পুটিকর খাবার (চিত্র ৪.০৪, চিত্র ৪.০৫) বিশেষ করে বেশি করে শাক-সবজি খাওয়া ও পানি পান করে স্বাভাবিক জীবনযাপন করা উচিত। বয়ঃসন্ধিকালে স্বাভাবিক শরীরিক পরিবর্তন ছাড়াও নানা রূপ মানসিক পরিবর্তন হয়। প্রয়োজন হলে এ বিষয়ে মা-বাবা ও নিকটারীয়দের সাথে আলাপ-আলোচনা বা পরামর্শ করা বেতে পারে। বয়ঃসন্ধিকালে সবাই খুব আবেগপ্রবণ হয়ে উঠে, সবাইকে বুঝতে হবে এটি হরমোনের ক্রিয়া এবং বয়ঃসন্ধিকাল পার হওয়ার পর সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে। ছেলেদের মতো মেয়েদেরও বয়ঃসন্ধিকালে অনেক পরিবর্তন ঘটে। এ সময় মেয়েদের শরীরের যেসব পরিবর্তন ঘটে, তাৰ ঘণ্টে বাতুস্তোব বা মাসিক এবং সাদা মাব সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

সাধারণত ৯-১৩ বছর বয়সের ঘণ্টে মেয়েদের বাতুস্তোব শুরু হয়। অভ্যন্তর যাসে একবার বাতুস্তোব হয় বলে একে মাসিক বলে। মেয়েদের ক্ষেত্রে বাতুস্তোব শরীরের একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। বাতুস্তোবের সময়

৩-৫ দিন পর্যন্ত রস্তাব হতে পারে। কারো কারো ক্ষেত্রে এ সময় কিছুটা কম-বেশি হতে পারে। কখন ঝুঁতুস্মাব শুরু হবে, সেই সময়টাকু অনুমান করে তার জন্য আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে রাখা দরকার। এ সময় মেয়েদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, নিয়মিত গোসল করা, পুষ্টিকর খাবার খাওয়া এবং বেশি পরিমাণে পানি পান করা প্রয়োজন। এ সময় সাধারণত, একটু বেশি বিশ্রাম নেওয়া দরকার।

যেহেতু মাসিকের সময় শরীর থেকে অনেক রস্ত বেরিয়ে যায়, তাই ক্ষয়পূরণের জন্য মাছ, মাংস, সবজি এবং ফলমূল বেশি পরিমাণে খাওয়া দরকার। মাসিকের সময় তলপেটে ব্যথা হতে পারে। সেক্ষেত্রে গরম পানির সেঁক দিলে আরাম বোধ হবে। এ সময় মাথাব্যথা ও কোমরে ব্যথা হতে পারে। এসব দেখে বিচলিত হওয়া বা ভয় পাবার কিছু নেই। ব্যথা বেশি হলে ডাক্তারের পরামর্শে ঔষধ সেবন করতে হবে।

মাসিকের সময় আজকাল শোষক হিসেবে ব্যবহার করার জন্য প্যাড পাওয়া যায়। প্যাড জোগাড় করা সহজ না হলে পরিষ্কার জীবাণুমুক্ত তুলা বা পরিষ্কার শুকনো কাপড় ব্যবহার করা যেতে পারে। মাসিকের সময় ব্যবহার করা কাপড় শোষক হিসেবে আবার ব্যবহার করতে হলে সাবান দিয়ে গরম পানিতে ধুতে হবে এবং রোদে শুকিয়ে গুছিয়ে রাখতে হবে। এই কাপড় অন্ধকার ও স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় রাখা ঠিক নয়, তাহলে বিভিন্ন রোগ-জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

#### ৪.১.৪ মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখা

বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনের সময়ে অনেকে একা থাকতে পছন্দ করে। অনেকে খানিকটা অস্বাভাবিক আচরণও করতে পারে। বয়ঃসন্ধিকালের শারীরিক পরিবর্তনের চাইতেও অনেক সময় মানসিক পরিবর্তন বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। অনেকে অনেক বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে উঠে এবং এ কারণে পরিবারের সদস্যদের সাথে ভুল বোঝাবুঝি শুরু হতে পারে। এ বয়সে তাদের যে মানসিক পরিবর্তন ঘটে, পরিবারের অন্য সদস্যদের সেই পরিবর্তনের বিষয়গুলো মনে রেখে তাদের সাথে বন্ধসূলভ এবং সহানুভূতিশীল আচরণ করতে হবে। তাদেরকে মানসিক দিকসহ অন্য সকল ব্যাপারে সহযোগিতা প্রদান করতে হবে এবং সাহস যোগাতে হবে।

মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য ছেলেমেয়েরা নিজেরাও সচেষ্ট থাকবে। তাদের প্রথম কাজ হবে বয়ঃসন্ধিকালের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনগুলোর সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করা। এ পরিবর্তনগুলো যে খুবই স্বাভাবিক, এ বিষয়টি খুব স্পষ্ট করে বুঝতে হবে। এটা বুঝতে পারলে অস্বস্তি, লজ্জা বা ভয় করে যাবে। এ বিষয়গুলো নিয়ে খোলা মনে মা-বাবা বা বড় ভাই-বোনের সাথে আলোচনা করতে পারলে সংকোচও কেটে যাবে। তখন একা থাকা বা লোকজন এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা করে যাবে। এছাড়া ভালো গল্পের বই পড়লে, সাথিদের সাথে খেলাধুলা করলে মানসিক প্রফুল্লতা বজায় থাকবে।

বয়ঃসন্ধিকালে বাবা-মা, ভাই-বোন এবং পরিবারের সদস্য কিংবা স্কুলের শিক্ষক সবাইকেই ছেলে-মেয়েদের প্রয়োজনীয় মানসিক সহায়তা কিংবা পরামর্শ দিতে হবে। এতে তারা সুস্থ সবল মানুষ হিসেবে

বেড়ে উঠে সুসম জীবিত গড়তে সক্ষম হবে।



### একটি কাজ

**কাজ:** বয়সসন্ধিকালে হলো ও মেয়েদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া আবশ্যিক, তার একটি ছক তৈরি কর।

স্বাস্থ্যরক্ষার ফেজে	যেসব ব্যবস্থা নিতে হবে
দৈহিক স্বাস্থ্যরক্ষা	
মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা	

### ৪.১.৫ বয়সসন্ধিকালীন বিবাহ ও পর্ণবারণ

বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী বিবের জন্য মেয়েদের বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর এবং ছেলেদের বয়স কমপক্ষে ২১ বছর হতে হয়। কিন্তু এই আইন থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশের অনেক মেয়েকেই ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই তাদের বিয়ে দিয়ে দেন। তোমরা কখনও কি তোবে দেখেছ, উপস্থুত বয়স হওয়ার আগেই মেয়েদের বিয়ে দিলে তারা কোন কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয়? অল্প বয়সের বিবাহিত মেয়েরা নানা ধরনের জটিল পরিস্থিতিতে পড়ে। এর মধ্যে একটি হলো অপরিষ্ট বয়সে পর্ণবারণ।

#### পর্ণবারণ কী?

পুরুষের শূক্রাশু যখন মেয়েদের ডিমাপুর সাথে যোগিত হয়, তখনই একটি মেয়ে পর্ণবারণ করে অর্থাৎ তার শরীরে স্তৰান গড়ে উঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়। মেয়েদের জন্য এটি একটি বিশেষ শারীরিক প্রক্রিয়া এবং শুধু স্তৰান গড়ে এসেই শরীরের এই বিশেষ পরিবর্তনগুলো ঘটে।

পর্ণবারণের প্রথম কয়েক মাস মেয়েদের শরীরে কিছু কিছু অস্বস্তিকর সংক্ষ দেখা যায়।

এ সংক্ষণগুলো হলো:

- বমি বমি আব বা বমি হওয়া (চিত্র ৪.০৬);
- মার্বা ঘোরা;
- বারবার অস্ত্রাব হওয়া;



চিত্র ৪.০৬: পর্ণবর্তী অবস্থার বমি হতে পারে।

### ସମ୍ବଲ୍ୟକି

ସମ୍ଭାନ ଜୟ ଦେଓରୀ ଖୁବଇ ଶାତାବିଦିକ ଏକଟି ହାତିଆ । ତାଇ ପରିଶଳ ବସନ୍ତ ଗର୍ଭାରଣ କରିଲେ ଯାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଜତିଜତ୍ତା ତେମନ ଏକଟା ଦେଖି ଥାଏ ନା । ଏ ସମୟେ ସେବ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ଦେଇ, ଜାନ୍ମାନ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶୁଳୋ ନିର୍ମିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରା ହେଲେ ଦୂର୍ଜ୍ଞବନ୍ଦାରା ଓ କିନ୍ତୁ ଥାକେ ନା ଏବଂ ଏକଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶିଶୁ ଜୟ ନେଇ । ଅପରିଶଳ ବସନ୍ତେ ଏକଟି ଯେତେର ମା ହତ୍ୟାର ମଜ୍ଜା ଯାନସିକ ପରିପକ୍ଷତା କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଅନୁଭବ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥାକେ ନା । ଏକଟି ଯେତେ ସଦି ୨୦ ବର୍ଷର ବସନ୍ତର ଆଶେ ଗର୍ଭବତୀ ହୁଏ, ତଥାନ ତାଦେର ନିଜେଦେଇ ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ଓ ପଢ଼ନ ସକ୍ରମ ହୁଏ ନା ବଲେ ତାର ନାନା ଧରନେର ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ହତେ ପାରେ । ଏ ଛାଡ଼ା ଅପରିଶଳ ବସନ୍ତର ଏକଟି ଯେତେର ସମ୍ଭାନ ଧାରଣ ଏବଂ ସମ୍ଭାନ ଜୟ ଦେଓରୀ ସଫଳକେ ସାଠିକ ଧାରଣା ଥାକେ ନା । କାହାଇ ଦେ ତାର ଗର୍ଭର ସମ୍ଭାନ ଏବଂ ତାର ନିଜେର ଶରୀରକେ ଠିକଭାବେ ରଙ୍ଗା କରାତେ ପାରେ ନା । ଅପରିଶଳ ବସନ୍ତେ ଯଦି କୋଣୋ ଯେତେ ଗର୍ଭାରଣ କରେ, ତବେ ଶୁଦ୍ଧ ସେ ଯେତେରିଇ ଶାରୀରିକ ଓ ଯାନସିକଭାବେ



ଚିତ୍ର ୪.୦୭: ଗର୍ଭାରଣେର ଫଳେ ଯେତେରିଇ  
ବିଦ୍ୟାଲୟର ଶାଓରୀ ବନ୍ଧ ହରେଇ

ଚିତ୍ର ୪.୦୮: ଗର୍ଭାରଣେର ଫଳେ ଶାତାବିଦିକ  
କାଙ୍କରମ କରା ଖୁବ କୁଟକର ହୁଏ

କରିପ୍ରକଟ ହବେ ତା ନାଁ; ଭବିଷ୍ୟତ ଶିଶୁଟିର ଜୀବନର ବୁଝିପୂର୍ଣ୍ଣ ହତେ ପାରେ । ଶୁଦ୍ଧ ତା-ଇ ନାଁ, ଏହି କାରଣେ ପୁରୋ ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜର କରିପ୍ରକଟ ହୁଏ ।

### ସାମ୍ବଲ୍ୟକର ସମସ୍ୟା

ଅପରିଶଳ ବସନ୍ତେ ଗର୍ଭାରଣେର ଫଳେ ଗର୍ଭବନ୍ଧାର କୁଟକରଣ, ଶରୀରେ ପାନି ଆସା, ଖୁବ ବେଳି ବ୍ୟଥା, ଚୋରେ ଆପସା ଦେଖା, ଏବଂ ଗର୍ଭପାତ ପର୍ଯ୍ୟକ୍ତ ଘଟେ ଥାକେ । ତାହାରୀ ଯା ଓ ସମ୍ଭାନେର ମୃଦୁଲୁବୁକିଓ ବେଳି ଥାକେ ।

ଅପରିଶଳ ବସନ୍ତେ ଗର୍ଭ ସମ୍ଭାନ ଏହେ ସମ୍ଭାନେର ବେଢ଼େ ଉଠାଇ ଜୟ ଗର୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟକ୍ତ ଜ୍ଞାନଗା ଥାକେ ନା । ଫଳେ କମ

শব্দনের শিশু জন্ম নেম। এসব শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে। বড় হওয়ার পর এসব শিশু স্বাস্থ্যবান এবং সফল মানুষ হিসেবে বেঢ়ে উঠতে পারে না।

### শিক্ষাগত সমস্যা

বিদ্যালয়ে পড়ার সময় যদি কোনো মেঝে গর্ভধারণ করে, তবে তার সেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাব (চিত্র ৪.০৭)। সে লক্ষণ আর বিদ্যালয়ে যায় না। তার মালিক চাপ বেঢ়ে যাব এবং নানা অস্থিতে ভোগে। শারীরিক দিক থেকেও সে চলাকেরা করতে সমস্যায় (চিত্র ৪.০৮) পড়ে। এসব কারণে সে ঘরে বসেও সেখাপড়া করতে পারে না।

### পরিবারিক সমস্যা

অপরিষিত বয়সে গর্ভধারণের কলে মেঝের সুস্থিতাবে অন্যান্য কাজকর্ম করতে পারে না। অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণে তার পরিবারের অস্থিতি দেখা দেয়। ইস্টেলেশিয়ার বাল্যবিবাহের হার খুব বেশি এবং সেখা পেছে, সেখানে অর্থেকর বেশি ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহের সম্ভাবনা মাঝে বিবাহ বিছেদ হয়ে যাব।

### আর্থিক সমস্যা

স্বাভাবিক গর্ভধারণে চিকিৎসকের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং পরামর্শ হলেই কাজ চলে যাব কিন্তু অপরিষিত বয়সে গর্ভধারণ করলে নয় যাসের পুরো সময় জুড়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হয়। এছাড়া কোনো জটিল স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দিলে বারবার চিকিৎসকের কাছে যেতে হয়। চিকিৎসক এবং গৃহস্থগুলোর জন্য অনেক অর্থের খরচোজন হয়। গর্ভবতী মায়ের জন্য অভিযন্ত পুষ্টিকর খাদ্যেরও ব্যবস্থা করতে হয়। এতেও বেশ অর্থের খরচোজন হয়। সব মিলিয়ে পরিবারের উপর একটি বড় ধরনের আর্থিক চাপ পড়ে (চিত্র ৪.০৯)।



চিত্র ৪.০৯: গর্ভধারণের কলে বারবার চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হয়। কলে সমসার খরচের উপর চাপ পড়ে।

### গর্ভপাত কী এবং গর্ভপাতের জটিলতা

একটি মেঝের গর্ভে যখন সম্ভান আসে, তখন প্রথম ঝুঁত হিসেবে জরায়ুতে তার বৃদ্ধি রাখে। ঝুঁপের বৃদ্ধি অবস্থায় কোনো কারণে সম্ভেদের আগে অতিক্রমুক্তভাবে জরায়ু থেকে ঝুঁত বের হয়ে যাওয়াকে গর্ভপাত বলে। গর্ভের সম্ভানকে নষ্ট করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবেও অনেকে গর্ভপাত রাখায়।

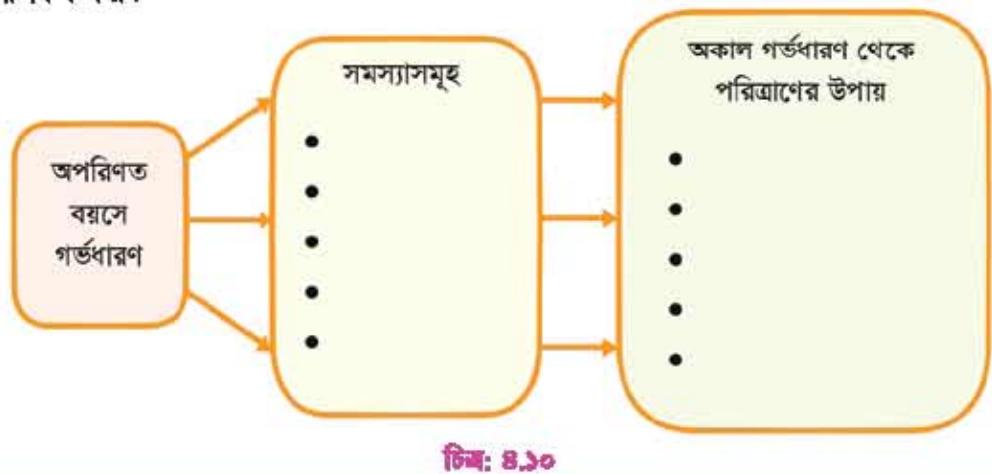
৫ গর্ভধারণের ফলে সঙ্গীর চাপ, অন্যের প্রভাব এবং হতাশার কারণে অনেক মেঝে আনাড়ি গর্ভপাতকারীদের

কাছে যায় এবং অভ্যন্তর ঝুঁকিপূর্ণভাবে পর্যটন ঘটায়। এ ধরনের পর্যটনের ফলে মেঝেদের বড় ধরনের শারীরিক ঝুঁকি হ্যাড়াও ভাসের উপর মানসিক এবং প্রবল আবেগীয় প্রভাব পড়ে। এ ঘাটারে সবাইকে সচেতন করে দ্রুতভাবে হবে।



### একক কাজ

**কাজ :** অপরিষ্ঠ বয়সে গর্ভধারণের সমস্যাসমূহ ও তা থেকে পরিত্রাণের উপায় ৪.১০ চিত্রে লিপিবদ্ধ কর।



### একক কাজ

**কাজ :** পর্যটনের ঝুঁকিসমূহ ৪.১১ চিত্রে উল্লেখ কর।



## ৪.১.৬ টেস্টিউব বেবি

কৃত্রিম উপায়ে দেহের বাইরে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন ঘটিয়ে প্রাথমিক ভূগ সৃষ্টি করে সেটি নারীদের জরায়ুতে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে শিশুর জন্ম হলে তাকে টেস্ট টিউব বেবি বলা হয়। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সন্তানের জন্ম না হলে অনেক বাবা-মা এই প্রক্রিয়ায় সন্তানদের জন্ম দিতে আগ্রহী হন। দেহের বাইরে ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলন ঘটানোকে বলে ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন। ইটালির বিজ্ঞানী ড. পেট্রুসি (Dr. Petrucci) ১৯৫৯ সালে প্রথম টেস্টিউব বেবি জন্ম প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তবে তিনি ততটা সফলতা অর্জন করতে পারেননি, শিশুটি মাত্র ২৯ দিন বেঁচে ছিল। এর প্রায় ১৯ বছর পর ১৯৭৮ সালে ইংল্যান্ডের ড. প্যাট্রিক স্টেপটো ও ড. রবার্ট এডওয়ার্ডের প্রচেষ্টায় লুইস জয় ব্রাউন নামে একটি টেস্টিউব বেবি জন্মায়। পর্যায়ক্রমে কতগুলো প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন ঘটিয়ে টেস্টিউব বেবির জন্ম দেওয়া হয়।

প্রক্রিয়াগুলো হলো (১) সক্ষম দক্ষতি থেকে ডিম্বাণু ও শুক্রাণু সংগ্রহ করে বিশেষ ধরনের পালন মাধ্যমে (Culture medium) এদের মিলন ঘটান। (২) অতঃপর পালন মাধ্যমে প্রাথমিক ভূগ উৎপাদন। (৩) উৎপাদিত ভূগকে স্ত্রী জরায়ুতে প্রতিস্থাপন এবং সরশেষে (৪) প্রসূতির পরিচর্যা ও সন্তান লাভ সম্পন্ন করা। নিঃসন্তান দক্ষতির সন্তান লাভের জন্য আজকাল এই প্রক্রিয়া আমাদের দেশেও বেশ ভালোভাবে চালু হয়েছে।

## ৪.২ সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ

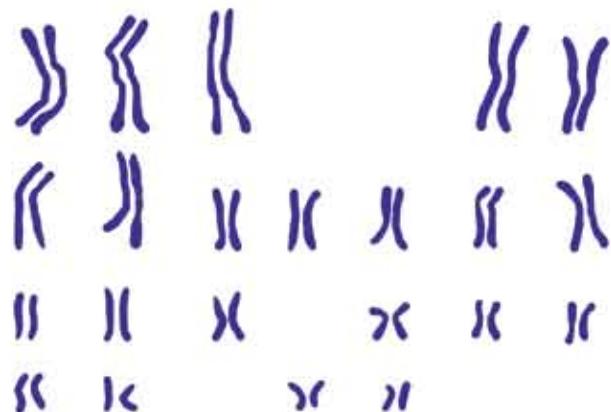
আমরা জানি, কোনো জীবের জীবকোষের নিউক্লিয়াসের ভেতর নির্দিষ্টসংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। মানুষের জীবকোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা ২৩ জোড়া (মোট ৪৬টি)। এই ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের ভেতর এক জোড়া ক্রোমোজোমকে লিঙ্গ নির্ধারক বা সেক্স ক্রোমোজোম বলে। ছেলেদের বেলায় এই এক জোড়া ক্রোমোজোম দুটি ভিন্ন, যার একটিকে X, অন্যটিকে Y নাম দেওয়া হয়েছে। ছবিতে দেখ, X ক্রোমোজোমটি লম্বা এবং Y ক্রোমোজোমটি ছোট। মেয়েদের বেলায় এই এক জোড়া সেক্স ক্রোমোজোমের দুটিই X ক্রোমোজোম। সেক্স ক্রোমোজোম ছাড়া বাকি অন্য সব ক্রোমোজোমকে অটোজোম বলে।

মানুষের শরীরের সব কোষেই ২৩ জোড়া (বা ৪৬টি) ক্রোমোজোম থাকলেও সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য মেয়েদের ডিম্বাণু এবং ছেলেদের শুক্রাণু এর ব্যতিক্রম। এই কোষগুলোতে অর্ধেকসংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের প্রতি জোড়া থেকে একটি ক্রোমোজোম নিয়ে ডিম্বাণু তৈরি হয়, কাজেই সব ডিম্বাণুতেই ২২টি অটোজোম এবং একটি X ক্রোমোজোম থাকে। ছেলেদের সেক্স ক্রোমোজোমে যেহেতু X এবং Y দুটিই আছে, তাই ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের প্রত্যেকটি থেকে একটি করে ক্রোমোজোম দিয়ে শুক্রানু তৈরি করা হলে দুটি ভিন্ন ধরনের শুক্রানু তৈরী করা সম্ভব। একটিতে থাকবে ২২টি

অটোজোম এবং একটি X ক্রোমোজোম, অন্যটিতে থাকবে ২২টি অটোজোম এবং একটি Y ক্রোমোজোম (চিত্র ৪.১২)।

শা	বাবা	সম্ভাল
ডিহান্তুর ২২টি অটোজোম + X	শুক্রান্তুর ২২টি অটোজোম + X	২২ জোড়া অটোজোম + XX (কন্যা)
ডিহান্তুর ২২টি অটোজোম + X	শুক্রান্তুর ২২টি অটোজোম + Y	২২ জোড়া অটোজোম + XY (পুরুষ)

২২ জোড়া অটোজোম



মেয়েদের ক্ষেত্রে  
সেক্স ক্রোমোজম



XX

ছেলেদের ক্ষেত্রে  
সেক্স ক্রোমোজম



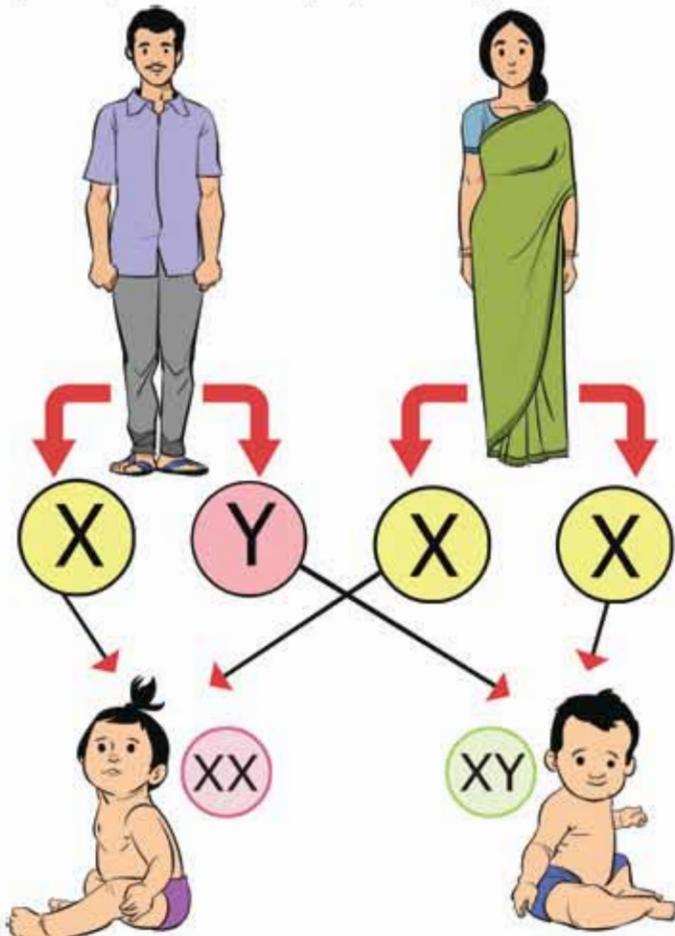
XY

চিত্র ৪.১২: মানুষের ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম

ডিহান্ত ও শুক্রান্ত মিলে গর্ভধারণ হয় এবং তোমরা দেখতে পাই দৃষ্টি ভিজভাবে গর্ভধারণ সম্ভব। অর্থাৎ মিলিত কোবে মানুষের ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম থাকে এবং সেটি ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ মানবসম্ভালে

ଜନ୍ମ ନେଇ । ସବୁ ଏହି ୨୨ ଜୋଡ଼ା ଅଟୋଜୋମ୍ ଏବଂ XX ସେଙ୍ଗ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ନିଃସ୍ଵରୂପ ବେଳେ ଉଠେ ତାହଲେ କନ୍ୟାସମ୍ଭାନ ହିସେବେ ଜନ୍ମ ନେଇ । ସବୁ ଏହି ୨୨ ଜୋଡ଼ା ଅଟୋଜୋମ୍ ଏବଂ XY ସେଙ୍ଗ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ନିଃସ୍ଵରୂପ ଗଢ଼େ ଉଠେ, ତାହଲେ ପୁଣ୍ୟସମ୍ଭାନ ହିସେବେ ଜନ୍ମ ନେଇ (ଚିତ୍ର ୪.୧୩) ।

ଏକଜନ ସୁଧୁ ସମ୍ଭାନ, ଦେ ଛେଲେ ବା ମେ଱େ ସାଇ ହୋଇ ନା କେନ, ମା-ବାବାର ଜନ୍ମ ଅନେକ ବଢ଼ ଥାବାକି



ଚିତ୍ର ୪.୧୩: ସମ୍ଭାନର ଶିଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ

ଆଲୀର୍ଦ୍ଦିଦ, କିମ୍ବୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଜତୀ ଏବଂ କୁସମ୍ଭାନର କାରଣେ ଅନେକେ ଛେଲେ ସମ୍ଭାନକେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ । ଶୁଦ୍ଧ ତା-ଇ ନାହିଁ, ମେଯେର ଜନ୍ମ ହଲେ ମାକେ ଦୋଷାବ୍ଲୋପ କରା ହେଁ । କିମ୍ବୁ ତୋମରା ନିର୍ଭୟାରେ ବୁଝାତେ ପାରନ୍ତି, ସମ୍ଭାନ କୀ ଛେଲେ ସମ୍ଭାନ ହବେ ନା ମେଯେ ସମ୍ଭାନ ହବେ, ତାର ଜନ୍ମ ଯା କୋନୋଭାବେଇ ଦୟାଗୀ ନାହିଁ । ଛେଲେଦେର ଅସଂଖ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧାଶୁର ଡେଜର X କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ବହନକାରୀ ନା ଯୁ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ବହନକାରୀ ଶୁଦ୍ଧାଶୁର ଡିଶାପୁର ସାଥେ ମିଳିତ ହବେ, ସେହି ହେବେ ଥର୍କ୍ୟ କାରଣ ।

## ৪.৩ পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি

বৈচিত্র্যময় এই পৃথিবীতে আমরা যেসব জীবের সঙ্গে পরিচিত, তাদের মধ্যে দশ লাখের বেশি প্রাণী প্রজাতি এবং চার লাখের মতো উক্তিদ-প্রজাতি শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। একসময় মানুষের ধারণা ছিল, পৃথিবী বুঝি অপরিবর্তিত, অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে পৃথিবীর যে আকার বা আয়তন ছিল, এখনো সেরকমই আছে। অর্থাৎ তার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। মানুষ ভাবতো আদি জীবজগতের সঙ্গে বর্তমানকালের জীবজগতের কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে জেনোফেনে (Xenophane) নামের একজন বিজ্ঞানী প্রথম কতকগুলো জীবাশ্ম (fossil) আবিষ্কার করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে অতীত এবং বর্তমান যুগের জীবদেহের গঠনে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। অর্থাৎ জীবদেহের আকার অপরিবর্তনীয় নয়।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (Aristotle) প্রমাণ করেন যে জীবজগতের বিভিন্ন জীবের ভেতর এক শ্রেণির জীব অন্য শ্রেণির জীব থেকে অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং জীবগুলো তাদের পূর্বপুরুষ থেকে উৎপত্তি লাভ করে বিবর্তন বা অভিব্যক্তির মাধ্যমে ক্রমাগত পরিবর্তিত ও বৃপ্তান্তরিত হয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। বিবর্তন একটি মন্ত্র এবং চলমান প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গঠনগতভাবে সরল জীবন থেকে জটিল জীবনের উৎপত্তি ঘটেছে।

বিভিন্ন বিজ্ঞানীর মতানুসারে, প্রায় সাড়ে চারশত কোটি বছর আগে এই পৃথিবী একটি উন্নত গ্যাস-পিণ্ড ছিল। এই উন্নত গ্যাস-পিণ্ড ক্রমাগত তাপ বিকিরণ করায় এবং তার উন্নাপ করে যাওয়ায় ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পরে এই পিণ্ডটি বাইরের দিক থেকে ভেতরের দিকে ক্রমশ কঠিন হতে থাকে এবং উন্নত জলীয় বাক্ষি থেকে মেঘের সৃষ্টি হয়। ওইরকম মেঘ থেকে বৃষ্টি হওয়ায় পৃথিবীর কঠিন বহিঃস্তরে জলভাগ অর্থাৎ সমুদ্রের আবির্ভাব ঘটে। এক সময়ে সমুদ্রের পানিতে প্রাণের আবির্ভাব হয় এবং সমুদ্রের পানিতে সৃষ্টি জীবকূলের ক্রমাগত পরিবর্তনের ফলে বর্তমানের বৈচিত্র্যময় জীবজগতের সৃষ্টি হয়েছে।

গভীর যুক্তিনির্ভর চিন্তাভাবনা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আধুনিক মানুষের ধারণা হয়েছে যে জীব সৃষ্টির মূলেই রয়েছে বিবর্তন। ল্যাটিন শব্দ ‘Evolveri’ থেকে বিবর্তন শব্দটি এসেছে। ইংরেজ দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) প্রথম ইভোলিউশন কথাটি ব্যবহার করেন। যে ধীর, অবিরাম এবং চলমান পরিবর্তন দ্বারা কোনো সরলতর উদবংশীয় জীব পরিবর্তিত হয়ে জটিল ও উন্নততর নতুন প্রজাতির বা জীবের উত্তর ঘটে, তাকে বিবর্তন বা অভিব্যক্তি বা ইভোলিউশন বলে। সময়ের সথে কোনো জীবের পরিবর্তনের ফলে যখন নতুন কোনো প্রজাতি সৃষ্টি হয়, তখন তাকে বলে জৈব বিবর্তন।



চিত্র ৪.১৪: রাসায়নিক এবং জৈব বিবর্তনের ধাপগুলো

### ৪.৩.১ জীবনের আবির্ভাব কোথার, কবে এবং কীভাবে ঘটেছে

পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছিল, সে সম্বর্কে বিভিন্ন মতবাদ বর্তমানে প্রচলিত আছে। তবে জীবনের উৎপত্তি বে শুধুমাত্র পানিতে হয়েছিল এ সম্বর্কে কোনো দ্বিমত নেই। এ সম্বর্কে

বিজ্ঞানীরা যে যুক্তি রেখেছেন, সেগুলো এরকম: প্রথমত, অধিকাংশ জীবকোষ এবং দেহস্থ রস্ত ও অন্যান্য তরলে নানারকম লবণের উপস্থিতি, যার সঙ্গে সমুদ্রের পানির খনিজ লবণের সাদৃশ্য রয়েছে। দ্বিতীয়ত, সমুদ্রের পানিতে এখনো অনেক সরল এবং এককোষী জীব বসবাস করে।

পৃথিবীতে কীভাবে জীব সৃষ্টি হয়েছিল, সে সমস্কর্কে বিজ্ঞানীদের অনুমান এরকম: প্রায় ২৬০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে ঘিথেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড এবং জলীয় বাষ্প, নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ছিল; কিন্তু অক্সিজেন গ্যাস ছিল না। অহরহ আপ্লেয়গিরির অগ্রৃৎপাতের ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটত এবং বজ্রপাতের ফলে ও অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে এই মৌগ পদার্থগুলো মিলিত হয়ে অ্যামাইনো এসিড এবং নিউক্লিক এসিড উৎপন্ন করে। ল্যাবরেটরিতে এই প্রক্রিয়াটি পরীক্ষা করে প্রমাণ করা হয়েছে। পরে অ্যামাইনো এসিড এবং নিউক্লিক এসিড মিলিত হওয়ায় নিউক্লিওপ্রোটিন অণুর সৃষ্টি হয়। নিউক্লিওপ্রোটিন অণুগুলো ক্রমে নিজেদের প্রতিরূপ-গঠনের (replication) ক্ষমতা অর্জন করে এবং জীবনের সূত্রপাত ঘটায়। পৃথিবীর উৎপত্তি ও জীবনের উৎপত্তির ঘটনাপ্রবাহকে বলে রাসায়নিক বিবর্তন বা অভিব্যক্তি।

ধারণা করা হয়, প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিড সহযোগে সৃষ্টি হয় নিউক্লিওপ্রোটিন। এই নিউক্লিওপ্রোটিন থেকেই সৃষ্টি হয় প্রোটোভাইরাস এবং তা থেকে সৃষ্টি হয় ভাইরাস। ভাইরাস এমন একটা অবস্থা নির্দেশ করে যেটি হচ্ছে জীব ও জড়ের মধ্যবর্তী অবস্থা।

### নিউক্লিওপ্রোটিন → প্রোটোভাইরাস → ভাইরাস

এরপর সম্ভবত উত্তর হয় ব্যাকটেরিয়া এবং আরও পরে সৃষ্টি হয় প্রোটোজোয়া। ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিয়াস আদি প্রকৃতির, তাই এদেরকে আদি কোষ বলা হয়। পরে প্রোটোজোয়ানদের দেহে দেখা গেল সুগঠিত নিউক্লিয়াস। কিছু এককোষী জীবদেহে সৃষ্টি হলো ক্লোরোফিল ফলে একদিকে যেমন খাদ্য সংশ্লেষ সম্ভব হলো, তেমনি খাদ্য সংশ্লেষের উপজাত (by product) হিসেবে অক্সিজেন সৃষ্টি হতে শুরু করল। তখন সবাত শুসনকারী জীবদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকল। উত্তর হলো এককোষী থেকে বহুকোষী জীব। এরপর একদিকে উত্তিদ ও অপরদিকে প্রাণী—দুটি ধারায় জীবের অভিব্যক্তি বা বিবর্তন শুরু হলো।

### বিবর্তনের স্বপক্ষে প্রমাণ

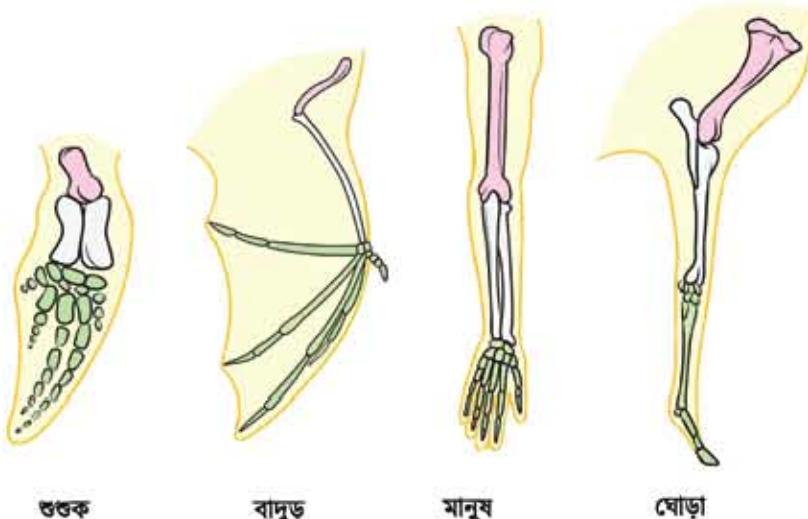
বিবর্তনের আলোচনায় মূলত দুটি বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়। একটি হলো, বিবর্তন যে হয়েছে তার প্রমাণ, অপরটি হলো, বিবর্তনের পদ্ধতি অর্থাৎ কীভাবে জীবজগতে বিবর্তন এসেছে তার বর্ণনা। প্রাণ সৃষ্টির পর থেকে কোটি কোটি বছর ধরে জীবজগতের যে পরিবর্তন বা বিবর্তন ঘটেছে, তার স্বপক্ষে একাধিক প্রমাণ আছে। নিচে সেগুলো আলোচনা করা হলো।

#### ১. অঙ্গসংস্থান সম্পর্কিত প্রমাণ

বিভিন্ন জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাহ্যিক গঠনকে অঙ্গসংস্থান বলে। এদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের

আলোচনাকে তুলনামূলক অঙ্গসম্পদের বলে। সমসম্বন্ধ অঙ্গ, সমবৃত্তীয় অঙ্গ এবং লুপ্তপ্রায় অঙ্গের তুলনামূলক অঙ্গসম্পদের এখানে আলোচিত হলো।

(ক) **সমসম্বন্ধ অঙ্গ:** পাথির ডানা, বাদুড়ের ডানা, তিমির ফিপার, সিলের অগ্রপদ, ঘোড়ার অগ্রপদ, মানুষের হাত—এর সবগুলোই সমসম্বন্ধ অঙ্গ। আগাতদৃষ্টিতে এদের আকৃতিগত পার্শ্বক্য দেখা গেলেও অঙ্গতরীণ কাঠামো পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে এদের অস্থিবিল্যাসের মৌলিক প্রকৃতি একই ধরনের

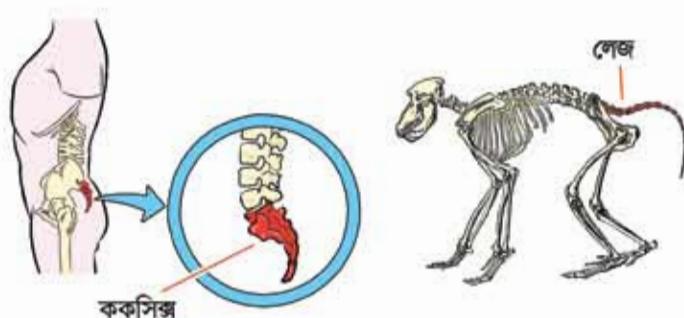
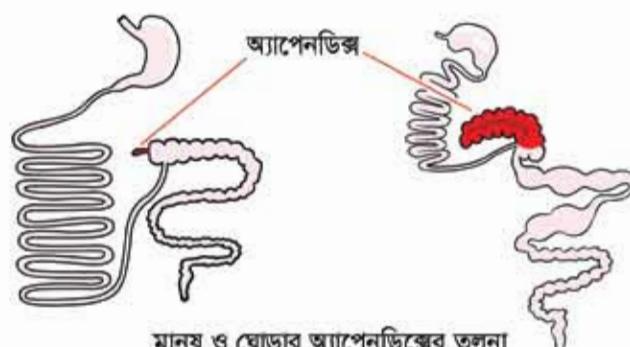


চিত্র ৪.১৫: সমসম্বন্ধ অঙ্গ

(চিত্র ৪.১৫)। অর্ধৎ সকল প্রাণীর জন্যই এখানকার অস্থিগুলো উপর থেকে নিচের দিকে পরশের সাজানো রয়েছে। বাইরে থেকে দেখতে যে কৈসানুশ্য রয়েছে, সেটি তিমির পরিবেশের সাথে অভিযোজিত হওয়ার জন্য ঘটেছে। পাথি ও বাদুড়ের “অগ্রপদ” ঘোড়ার জন্য, তিমির ফিপার সাঁতারের জন্য, ঘোড়ার অগ্রপদ ঘোড়ানোর জন্য ও মানুষের অগ্রপদ কোনো জিনিস ধরা ও অন্যান্য সূজনশীল কাজের জন্য পরিবর্তিত হয়েছে। সমসম্বন্ধ অঙ্গগুলো থেকে বোনা যাব যে সংশ্লিষ্ট অঙ্গ তথা জীবগুলো উৎপত্তিগতভাবে এক, যদিও সময়ের সঙ্গে বিভিন্ন হাকৃতিক পরিবেশে অভিযোজিত হওয়ার ফলে বর্তমানে তাদের গঠন বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। তাই বিবর্তনবিদগণ মনে করেন যে সমসম্বন্ধ অঙ্গবিশিষ্ট জীবগুলোর উৎপত্তি একই পূর্বপুরুষ থেকে ঘটেছে। এই তথ্য জৈব বিবর্তন সমর্থন করে।

(খ) **সমবৃত্তি অঙ্গ:** বিভিন্ন প্রাণীর যে অঙ্গগুলোর উৎপত্তি, বিকাশ এবং গঠন তিনি হলো তারা একই কাজ করে, সেই অঙ্গগুলোকে সমবৃত্তি অঙ্গ বলে। যেমন পতঙ্গ কিংবা বাদুড়ের ডানা উড়ায় জন্য ব্যবহৃত হয়। এদের উৎপত্তি ও গঠন সম্পূর্ণ আলাদা হলেও একই পরিবেশের প্রভাবে তারা একই পুরুষ কাজ করার জন্য অভিযোজিত হয়েছে অর্ধৎ বাদুড় এবং পতঙ্গ সুটিই প্রয়োজনের তাপিদে উড়তে সাহায্য করার উপযোগী অঙ্গ তৈরি করেছে। এরফলে সমবৃত্তি অঙ্গগুলো বিবর্তন সমর্থন করে।

(গ) লুপ্তপ্রায় অঙ্গ: জীবদেহে এমন কল্পগুলো অঙ্গ দেখা বাব, যেগুলো কিছু জীবদেহে সক্রিয় থাকে কিন্তু অপর জীবদেহে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে, এমন অঙ্গগুলোকে লুপ্তপ্রায় অঙ্গ বা নিষ্ক্রিয় অঙ্গ বলে। প্রাণীদেহের মধ্যে বহু লুপ্তপ্রায় অঙ্গ রয়েছে। মানুষের শিকায় এবং সিকায়-সহলত ক্রুম আ্যাপেন্ডিক্স নিষ্ক্রিয়, কিন্তু স্তন্যপায়ীস্তুত ভূগর্ভোজী প্রাণীদের (যেমন ঘোড়া কিংবা গিনিপিঙ্গো) দেহে এগুলো সক্রিয়। মানুষের দেহে লেজ নেই, তবু মেরুদণ্ডের শেষ প্রাচ্ছে ককসিক্স নামক লুপ্তপ্রায় অঙ্গ রয়েছে। এই ককসিক্স মানুষের পূর্বশূরুবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। গরু, ঘোড়া, ছাগল, মানুষ এদের স্বারূপ কানের পাঠনের



চিত্র ৪.১৬: লুপ্তপ্রায় অঙ্গ

বৈশিষ্ট্য একই ধরনের। এ ধরনের আলোচনা থেকে বলা যায় যে শুল্কপ্রায় অঙ্গ বহনকারী প্রাণীটির উৎপত্তি ঘটেছে এমন উদ্বংশীর প্রাণী থেকে, যার দেহে একসময় উচ্চ অঙ্গটি সঞ্চয় হিল (চিত্র ৪.১৬)।

### ২. সূলনাযুলক প্রাণীর প্রাচীন ধরণ

বিভিন্ন প্রাণীর অঙ্গের অন্তর্ভুক্তনের সামগ্র্য ও বৈসামৃত্য-সংক্রান্ত আলোচনাকে সূলনাযুলক প্রাণীর প্রস্থান বলে। বিভিন্ন প্রেরিত যেবুদভী প্রাণীর কোনো কোনো অঙ্গের গঠনের সূলনাযুলক আলোচনা করলে সেখা যাবে যে এদের গঠনে মৌলিক মিল রয়েছে। এই তথ্য জৈব বিবর্তনকে সমর্থন করে। উদাহরণস্বরূপ মেরুদণ্ডী প্রাণীদের হৃৎপিণ্ডের গঠনের উচ্চের করা যায়। মাছের হৃৎপিণ্ড দুটি থকোষ্টসূত্র; উভচরের (ব্যাক্সেল) হৃৎপিণ্ড তিনটি থকোষ্টসূত্র। আবার সরীসূপের হৃৎপিণ্ড দুটি অলিঙ্গ এবং অসমূর্খভাবে বিভিন্ন দুটি নিলয় থাকে। পাখি এবং স্তনুপার্যীর হৃৎপিণ্ড চারটি থকোষ্টসূত্র অর্থাৎ সেখানে রয়েছে দুটি অলিঙ্গ এবং দুটি নিলয়। উপরিউক্ত যেবুদভী প্রাণীগুলোর হৃৎপিণ্ডের মৌলিক গঠন এক, যদিও ধীরে ধীরে সেটি জটিল হয়েছে। অর্থাৎ একটি সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তনের ধারায় ক্রমশ বিভিন্ন জটিল জীবগুলোর উৎপত্তি ঘটেছে।

### ৩. সংযোগকারী জীবন সমর্পিত ধরণ

জীবজগতে এমন জীবের অস্তিত্ব দেখা যায়, যাদের মধ্যে দুটি জীবগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে। এ ধরনের জীবকে সংযোগকারী জীব বা কানেকটিং লিঙ্ক (Connecting link) বলে। উদাহরণ দেওয়ার জন্য প্লাটিপাসের (চিত্র ৪.১৭) নাম উচ্চের করা যায়। প্লাটিপাসের মধ্যে সরীসূপ এবং স্তনুপার্যী দুই ধরনের প্রাণীরই বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্লাটিপাস সরীসূপের মতো ডিম পাঢ়ে। অপরদিকে স্তনুপার্যীর মতো এদের শরীর গোমে ঢাকা, বুকে রয়েছে দুধগ্রাহিতা। শুধু তা-ই নয়, এদের ডিম ফুটে শাবক জ্যামে এরা শাবককে স্তন্য পান করায়। সংযোগকারী প্রাণীদের অধিকাংশই পৃথিবীর পরিবর্তনের সাথে কার্যকরীভাবে অভিযোগ্যিত হতে সক্ষম না হওয়ায় ধীরে ধীরে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

জীবাণুর পরীক্ষা থেকে অন্তর্ভুক্ত উড়িদের অস্তিত্ব বিরল ঘটনা হলেও এমন কিছু কিছু উড়িদের কথা জানা যায়, যাদের মধ্যে পাশাপাশি দুটি গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য বর্তমান। Gnetum (নিটায়) নামক গৃহ্ণিতীজী উড়িদে বজ্রবীজী এবং সুস্তবীজী দুই ধরনের উড়িদের বৈশিষ্ট্যই দেখা যায়।



চিত্র ৪.১৭: প্লাটিপাস

জৈব বিবর্তনের মতবাদ অনুসারে এক গোষ্ঠীর জীব থেকে অপর গোষ্ঠীর জীবের আবির্ভাব ঘটে থাকলে দুই গোষ্ঠীর মাঝামাঝি অন্তর্বর্তী জীবের অস্তিত্ব থাকা উচিত। অর্থাৎ সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ী প্রাণীরা জন্ম হলে মাঝামাঝি এমন প্রাণীর অস্তিত্ব থাকা উচিত যেটি সরীসৃপ এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীর মাঝামাঝি। কাজেই প্রকৃতিতে এই সকল সংযোগকারী জীবের উপস্থিতি জৈব বিবর্তনকে সমর্থন করে।

#### ৪. ভূগতভুঘটিত প্রমাণ

ডিমের ভিতরে অথবা গর্ভের মধ্যে (স্তন্যপায়ীর ক্ষেত্রে) অবস্থিত শিশু প্রাণীকে এবং উত্তিদের বীজের মধ্যে অবস্থিত শিশু উত্তিদেকে ভূগ বলে। বিভিন্ন প্রাণী ও উত্তিদের ভূগের সৃষ্টি এবং তাদের ক্রমবৃদ্ধি পরীক্ষা করা হলে যে তথ্য পাওয়া যায়, সেটি জৈব বিবর্তনের মতবাদকে সমর্থন করে।

মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ, পাখি এবং স্তন্যপায়ীর অন্তর্গত মেরুদণ্ডী প্রাণীগুলোর ভূগ পর্যবেক্ষণ করলে তাদের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। ভূগের প্রাথমিক অবস্থায় কোনটি কোন প্রাণীর তা শনাক্ত করা অসম্ভব। প্রতিটি মেরুদণ্ডী প্রাণীর ভূগে ফুলকা, ফুলকা ছিদ্র এবং লেজ থাকে।

ভূগের একরম সাদৃশ্য লক্ষ করে বিজ্ঞানী হেকেল (Haeckel) এই সিদ্ধান্তে আসেন, যে প্রতিটি জীব তার ভূগের বিকাশের সময় অতি অল্প সময়ের জন্য হলেও উদ্বংশ্যীয় জীব বা তার পূর্বপুরুষের বিবর্তনের বুপের পুনরাবৃত্তি ঘটায়। প্রকৃতির এই নিয়মকেই হেকেল পরে বলেছিলেন, ‘অনটোজেনি রিপিটস্ ফাইলোজেনি’ (Ontogeny repeats phylogeny), অর্থাৎ কোনো জীবের ভূগের ক্রমপরিণাম পর্যবেক্ষণ করলে তার পূর্বপুরুষের ইতিহাস জানা যাবে, যা বিবর্তনের স্বপক্ষে একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

#### ৫. জীবাশ্চাটিত প্রমাণ

বিজ্ঞানের যে শাখা বর্তমান পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া জীব সম্পর্কে অনুসন্ধানে নিয়োজিত, তাকে প্রত্নজীববিদ্যা বলে। বিজ্ঞানের এই শাখা থেকে নানা প্রকারের জীবাশ্চের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন অবলুপ্ত জীব সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যায়।

বিবর্তন সম্পর্কে যেসব প্রমাণ আছে, তাদের মধ্যে জীবাশ্চাটিত প্রমাণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ভূগর্ভের শিলাস্তরে দীর্ঘকাল চাপা পড়ে থাকা জীবের সামগ্রিক বা আংশিক প্রস্তরীভূত দেহ বা দেহচাপকে জীবাশ্চ বলে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত শিলার মধ্যে এগুলো সঞ্চিত রয়েছে। জীবাশ্চের সাহায্যে অকাট্যভাবে প্রমাণ করা যায় যে বিবর্তনের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে এক রকম জীব থেকে অন্য রকম জীবের উৎপত্তি ঘটেছে। জীবাশ্চ আবিষ্কারের আগে ধারাবাহিক বিবর্তনের মধ্যে উপযুক্ত প্রমাণের অভাব থাকায় বিবর্তনের ইতিহাসে বেশ কিছু ফাঁক থেকে গিয়েছিল। অনুমান করা হয় যে ঐ ফাঁকগুলোতে এমন কোনো ধরনের জীব ছিল, যাদের সন্ধান পাওয়া যায়নি। এই রকম খোঁজ না পাওয়া জীবদের মিসিং লিঙ্ক (missing link) বা হত-যোজক বলা হয়। জীবাশ্চ আবিষ্কারের মাধ্যমে ঐ সমস্ত মিসিং লিঙ্কের সন্ধান পাওয়ায় আজকাল বিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাসের অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেছে।



ଚିତ୍ର ୪.୧୮: ଆର୍କିଓପଟେରିକ୍

ଜୀବାଶ୍ଵକେ ପ୍ରାଇଗେଡ଼ିଆସିକ ଯୁଗେର ବା ବିପତ୍ତ ଯୁଗେର ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷି ହିସେବେ ଗଣ୍ୟ କରା ହୁଏ । ଶିଳାସ୍ତର ଥେକେ ଜୀବାଶ୍ଵ ଦେଖେ ଜୀବଟିର ଜୀବିତକାଲେର ତଥ୍ୟ ପାଇବା ଯାଏ । ତାହାର ଏ ଜୀବାଶ୍ଵର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସରେ ବୋଗସ୍ତ୍ର ଝୁଜେ ବେର କରା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ।

ଉଦାହରଣ ଦେଉଥାର ଜନ୍ମ ବଳା ଯାଏ ଯେ, ଲୁଣ୍ଠ ଆର୍କିଓପଟେରିକ୍ (Archaeopteryx) ନାମେ ଏକରକମ ହାଶୀର ଜୀବାଶ୍ଵ (ଚିତ୍ର ୪.୧୮) ପରୀକ୍ଷା କରେ ଦେଖା ଗେଛେ, ଏଦେର ସରୀସ୍ମୃତି ମତୋ ପା ଓ ଦୀତ, ପାଥିର ମତୋ ପାଲକବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଟି ଡାନା, ଏକଟି ଦୀର୍ଘ ଲୋଜ, ଲେଜେର ଶେଷ ଭାବେ ଏକପୂଜ୍ଞ ପାଲକ ଏବଂ ଚକ୍ର ହିଲ । ଏର ଥେକେ ଅନୁମାନ ହୁଏ ଯେ ସରୀସ୍ମୃତ-ଜାତୀୟ ହାଶୀ ଥେକେଇ ବିବରନେର ଯାଥିମେ ପାଥି-ଜାତୀୟ ହାଶୀର ଉତ୍ସପ୍ତି ଘଟିଛେ ।

ଉଡ଼ିଦେର କ୍ଷେତ୍ରେ ବିଲୁଣ୍ଠ ଟେରିଡୋଫର୍ (Pteridosperm) ନାମେ ଏକ ଧରନେର ଉଡ଼ିଦେର ଜୀବାଶ୍ଵେ ଫାର୍ମ ଓ ବକ୍ତ୍ଵୀଜୀ (gymnosperm) ଉଡ଼ିଦେର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖା ଯାଏ- ଏ କାରଣେ ଫାର୍ମ-ଜାତୀୟ ଉଡ଼ିଦି ଥେକେ ଜିମନୋଲାର୍ ଅର୍ଧାଂ ବକ୍ତ୍ଵୀଜୀ ଉଡ଼ିଦେର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛେ ବଲେ ଯଲେ କରା ହୁଏ ।

## ୬. ଜୀବନ୍ତ ଜୀବାଶ୍ଵ

କତଗୁଲୋ ଜୀବ ସୁନ୍ଦର ଅଭ୍ୟାସ ଉତ୍ସପ୍ତି ଲାଭ କରେବ କୋଣୋରକମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାଢ଼ାଇ ଏଥିଲେ ପୃଥିବୀରେ ବୈଚାରିକ ବୈଚାରିକ ଆହେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଦେର ସମ୍ପାଦିତ ଏବଂ ସମ୍ପାଦିତ ଅନେକ ଜୀବଙ୍କେର ବିଲୁଣ୍ଠ ଘଟିଛେ । ଏହି ଜୀବଙ୍କେର ଜୀବନ୍ତ ଜୀବାଶ୍ଵ ବଲେ । ଶିମୁଲାସ ବା ରାଜକାଙ୍କଡ଼ା (ଚିତ୍ର ୪.୧୯) ନାମକ ସମ୍ବିପଦ ହାଶୀ, କ୍ଷୋଲୋଡ଼ନ ନାମକ ସରୀସ୍ମୃତ ହାଶୀ, ପ୍ଲାଟିଗ୍ଲାସ ନାମକ ମନ୍ତନାଶାହୀ ହାଶୀ ଏର ଉଦାହରଣ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟକେ ଇନ୍ଦ୍ରାଜିଟାମ, ନିଟାମ ଓ ଶିଙ୍କେ

বাইসোবা নামের উক্তিদগুলো উক্তিদের  
জীবন্ত জীবাণুর উদাহরণ।

প্রায় ৪০০ মিলিয়ন বছর আগের শিথিডিলাস  
জীবাণু পাওয়া গিয়েছে। এর সমসাময়িক  
অন্যান্য আর্ট্রোগোডাগুলো বিস্তৃত হয়ে  
গিয়েছে, কিন্তু এরা আজও বেঁচে আছে।  
তাই এদের জীবন্ত জীবাণু বলা হয়।



চিত্র ৪.১৬: জীবন্ত জীবাণু-শিথিডিলাস

## ৪.৪ বিবর্তন বা অভিব্যক্তির উপর বিভিন্ন মতবাদ

বিবর্তন বা অভিব্যক্তির ফলে নতুন প্রজাতির অথবা একটি প্রজাতি থেকে অন্য একটি প্রজাতির উৎপত্তি  
হয়। অভিব্যক্তির কৌশল সম্পর্কে যে সকল বিজ্ঞানী বিভিন্ন মতবাদ (theories) প্রতিষ্ঠিত করেছেন,  
তাঁদের মতবাদগুলো আমরা এখন আলোচনা করব।



চিত্র ৪.২০: বিজ্ঞানী ল্যামার্ক

### ৪.৪.১ ল্যামার্কের তত্ত্ব

ল্যামার্ক (চিত্র ৪.২০) 'বায়োলজি' শব্দটির প্রতিষ্ঠাতা এবং  
তিনি প্রথম বিবর্তন বা অভিব্যক্তির ওপর বিশ্লেষণী তত্ত্ব  
প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এ বিষয়টি তিনি ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে  
তাঁর লেখা 'ফিলোসোফিক জুওলজিক' (Philosophic  
Zoologique) নামে একটি বইতে লিপিবদ্ধ করেন।

ল্যামার্কের তত্ত্বকে ল্যামার্কিজন্ম (Lamarckism)  
বা ল্যামার্কবাদ বলে। কয়েকটি প্রধান প্রতিপাদের  
ওপর ভিত্তি করে ল্যামার্কবাদ গঠিত। সেগুলো এখানে  
আলোচনা করা হলো:

#### ১. ব্যবহার ও অব্যবহারের সূত্র

ল্যামার্কের মতে, জীবের প্রয়োজনে জীবদেহে কোনো নতুন অঙ্গের উৎপত্তি অথবা কোনো পুরোনো  
অঙ্গের অবস্থান ঘটতে পারে। তাঁর মতে, যদি কোনো জীবের কোনো অঙ্গ ধারাবাহিকভাবে ক্রমাগত  
ব্যবহৃত হয়, তবে সেই অঙ্গ পরিবেশের প্রয়োজনীয়তার জন্য ধীরে ধীরে সবল ও সুস্থিত হবে।  
অন্যদিকে, জীবের কোনো অঙ্গ পরিবেশের জন্য অপ্রয়োজনীয় হলে এই অঙ্গের আর ব্যবহার থাকে

না। সুতরাং ক্রমাগত অব্যবহারের ফলে অঙ্গাটি নিষ্ক্রিয় অঙ্গে পরিণত হবে এবং অবশেষে অবলুপ্ত হয়ে যাবে। ল্যামার্কের মতে, অঙ্গের ব্যবহার ও অব্যবহার জীবদেহে পরিবর্তন সূচিত করে, যা জীবের বংশপ্রসারায় অর্জিত বৈশিষ্ট্য।

## ২. পরিবেশের প্রভাব

জীব সদা পরিবর্তনশীল পরিবেশে নিজেকে উপযুক্তভাবে মানিয়ে নেওয়ার জন্য সব সময় চেষ্টা করে। এটি জীবের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তনশীল পরিবেশে নিজেকে অভিযোজিত করতে জীবদেহে নানা রকমের পরিবর্তন দেখা যায়। ল্যামার্কের মতে, পরিবেশের পরিবর্তন ঘটলে জীবের স্বভাব এবং দৈহিক পরিবর্তন ঘটে। এটাও একটি জীবের অর্জিত বৈশিষ্ট্য।

## ৩. অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণ ও নতুন প্রজাতির উৎপত্তি

ল্যামার্কের মতে, কোনো জীবের জীবনকালে যে সকল বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয়, সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্য এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হয় অর্থাৎ অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণ ঘটে।

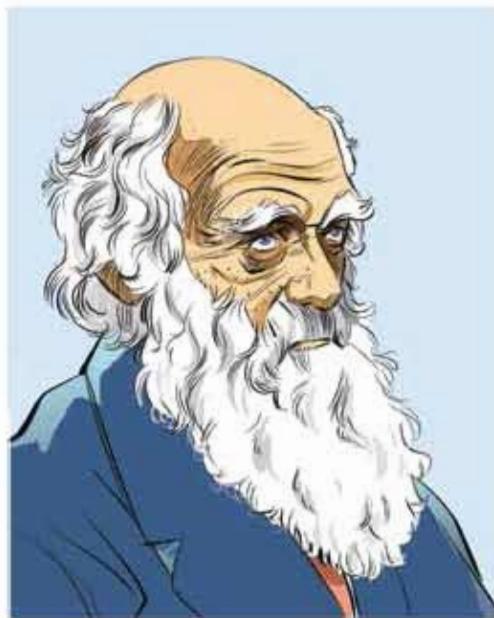
ল্যামার্কের তত্ত্ব অনুযায়ী, অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণের জন্য এবং প্রতিটি প্রজন্মে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জিত হওয়ায় ধীরে ধীরে একটি প্রজাতি থেকে অপর একটি নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়।

ল্যামার্ক কতগুলো পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই তার মতবাদ রচনা করেছিলেন। তার দেওয়া কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে মতবাদটির স্বপক্ষে ব্যাখ্যা দেওয়া হলো:

- ক্রমাগত পানিতে সাঁতার কাটার ফলে জলজ পাখির পায়ের আঙ্গুলের অন্তর্বর্তী স্থানগুলো পাতলা চামড়া দ্বারা সংযুক্ত হওয়ায় লিঙ্গপদে পরিণত হয়েছে।
- সাপের পূর্বপুরুষদের গিরগিটির মতো চারটে পা ছিল, কিন্তু গর্ত ও ফাটলে বাস করার জন্য পায়ের ক্রমাগত অব্যবহারের ফলে বর্তমানে ঐ বৈশিষ্ট্যটি সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়েছে।
- ল্যামার্কের মতে, জিরাফের সুদীর্ঘ গ্রীবা, খুব উঁচু গাছ থেকে পাতা সংগ্রহের জন্য, অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণের ফলেই ঘটেছে।

আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীরা জৈব বিবর্তনে ল্যামার্কের মতবাদ গ্রহণ করতে পারেননি। শুধু সময়ের সাথে প্রজাতির পরিবর্তন হয়েছে, সেটি বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন না। বংশগতিবিদ্যার প্রসারের পর বিজ্ঞানীরা জীবের মধ্যে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুক্রম অনুসন্ধান করেছেন কিন্তু সেটি খুঁজে পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ বাস্তব অর্জিত বৈশিষ্ট্য পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চালিত হয়, এর স্বপক্ষে বর্তমান বংশগতিবিদগণ কোনো প্রমাণ পাননি। সহজভাবে বলা যায়, কোনো মানুষ ব্যায়াম করে এবং ক্রমাগত ব্যবহার করে তার একটি হাতকে শক্তিশালী করে তুললে তার স্ন্তান শক্তিশালী হাত নিয়ে জন্ম নেবে সেটি সত্যি নয়।

**৪.৪.২ ডারউইনবাদ বা ডারউইনের মতবাদ**  
 জ্যামার্ক বিবর্তনের যে মতবাদ দেন, তার ৫০ বছর  
 পর ত্রিটিশ থক্সতিবিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন (চিত্র  
 ৪.২১) একটি বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সৃষ্টি করেন।  
 বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন (Charles Darwin, ১৮০৯-  
 ১৮৮২) ইংল্যান্ডের সাসবেরি শহরে জন্মগ্রহণ করেন।  
 অশাস্ত মহাসাগরে অবস্থিত গ্যালাপাগোস দ্বীপগুৰু  
 পরিবেশকালে তিনি এই অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণিগুলোর  
 বিবরণকর বৈশিষ্ট্য দেখে বিশেষভাবে আকৃত হন এবং  
 সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে  
 প্রত্যাবর্তনের প্রায় ২০ বছর পরে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে  
 ‘প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা প্রজাতির উৎপত্তি’ (Origin  
 of species by means of natural selection)  
 নামে একটি বইয়ে তাঁর মতবাদটি প্রকাশ করেন।



চিত্র ৪.২১: বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন

ডারউইনের দৃষ্টিতে থক্সতিতে সংঘটিত সাধারণ সভ্যগুলো এরকম:

### ১. অত্যধিক হারে বংশবৃদ্ধি

ডারউইনের মতে, অত্যধিক হারে বংশবৃদ্ধি করাই জীবের সহজাত বৈশিষ্ট্য। এর ফলে জ্যামিতিক ও পাশিতিক হারে জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি সরিষা গাছ থেকে বছরে প্রায় ৭৩০,০০০টি বীজ জন্মায়। এই ৭৩০,০০০ বীজ থেকে ৭৩০,০০০ সরিষা গাছের জন্ম হওয়া সম্ভব। আবার একটি ছীঁ স্যামল মাছ প্রজনন ক্ষত্তুতে প্রায় ৩ কোটি তিম পাঢ়ে। ডারউইনের মতে, এক জোড়া হাতি থেকে উত্তৃত সবগুলো হাতি বেঁচে থাকলে ৭৫০ বছরে হাতির সংখ্যা হবে এক কোটি লক্ষই কাঁধ।

### ২. সীমিত খাদ্য ও বাসস্থান

ভূপৃষ্ঠের আরতন সীমাবদ্ধ হওয়ায় জীবের বাসস্থান এবং খাদ্য সীমিত।

### ৩. অস্তিত্বের অন্য সংগ্রাম

জীবেরা জ্যামিতিক ও পাশিতিক হারে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায় এবং খাদ্য ও বাসস্থান সীমিত থাকায় জীবকে বেঁচে থাকার জন্য কঠিন প্রতিবেগিতার সম্মুখীন হতে হয়। ডারউইন এই ধরনের সংগ্রামকে ‘অস্তিত্বের অন্য সংগ্রাম’ বলে অভিহিত করেন। ডারউইন লক্ষ করেন যে জীবকে তিনটি পর্যায়ে এই সংগ্রাম করতে হয়। সেগুলো হচ্ছে:

**(ক) আন্তঃপ্রজাতি সংগ্রাম:** উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ব্যাঙ কীটপতঙ্গ থায়, অন্যদিকে সাপ ব্যাঙদের থায়। আবার ময়ুর সাপ এবং ব্যাঙ দুটোকেই থায়- এভাবে নিতান্ত জৈবিক কারণেই বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্পর্কের একটি নিষ্ঠুর জীবনসংগ্রাম গড়ে ওঠে।

**(খ) অন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম:** একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যের খাদ্য ও বাসস্থান একই রকমের হওয়ায়, এদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে এরা নিজেদের মধ্যেই বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতা শুরু করে; উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে একটি দ্বিপে তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যা বেড়ে গেলে খাদ্য ও বাসস্থান সীমিত থাকায় তারা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম শুরু করে। সবল প্রাণীগুলো দুর্বল প্রাণীদের প্রতিহত করে গ্রাসাচ্ছাদন করে। ফলে দুর্বল প্রাণীগুলো কিছুদিনের মধ্যেই অনাহারে মারা পড়ে।

**(গ) পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম:** বন্যা, খরা, বাড়-ঝঁঝা, বালিবাড়, ভূমিকঙ্গা, অঘ্যৎপাত—এ ধরনের প্রতিকূল পরিবেশ জীবের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে। সুতরাং জীবকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রতিনিয়ত এসব প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। যে প্রাণীগুলো এই পরিবেশে টিকে থাকতে পারে তারা বেঁচে থাকে অন্যরা বিলুপ্ত হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে উত্তর ও মধ্য আমেরিকার কোয়েল পাথি প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও তুষারপাতের ফলে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

#### ৪. প্রকরণ বা জীবদেহে পরিবর্তন

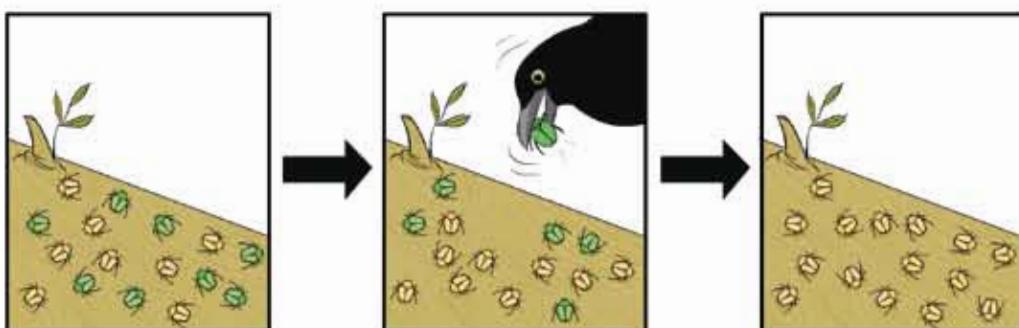
চার্লস ডারউইনের মতে, পৃথিবীতে দুটি জীব কখনোই অবিকল একই ধরনের হয় না। যত কমই হোক এদের মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য থাকে। জীব দুটির মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, তাকে প্রকরণ বা পরিবৃত্তি বলে। অস্তিত্বের জন্য জীবনসংগ্রামে অনুকূল প্রকরণ একটি জীবকে সাহায্য করে।

#### ৫. যোগ্যতমের জয়

ডারউইনের মতে, যেসব প্রকরণ জীবের জীবনসংগ্রামের পক্ষে সহায়ক এবং পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনমূলক, তারাই কেবল বেঁচে থাকে; অন্যরা কালৰূমে পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়ে যায়। মেরু অঞ্চলের ভাল্লুক বা বাঘ বা উদ্ভিদ গ্রীষ্মপ্রধান পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারে না।

#### ৬. প্রাকৃতিক নির্বাচন

ডারউইন তত্ত্বের এই প্রতিপাদ্যটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ‘অনুকূল (বা অভিযোজনমূলক) প্রকরণ সমন্বিত জীবেরা অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে—এই প্রক্রিয়াকে প্রাকৃতিক নির্বাচন বলে।’ অনুকূল প্রকরণ সমন্বিত জীবেরা প্রকৃতির দ্বারা নির্বাচিত হয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি সংখ্যায় বেঁচে থাকে এবং অত্যধিক হারে বংশবিস্তার করে। অপরদিকে, প্রতিকূল প্রকরণসম্পন্ন জীবেরা প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না। ফলে ধীরে ধীরে তারা অবলুপ্ত হয় (চিত্র ৪.২২)।



চিত্র ৪.২২: অনুকূল প্রকরণ সম্বিত জীবের প্রকৃতির দ্বারা নির্বাচিত হয়ে বেশি সংখ্যার বেঁচে থাকে।

ডারউইনের মতবাদ অনুসারে পরিবেশে যে জীবটি খাল খাইয়ে নিবে, সে হবে শোল্য এবং যোগ্য জীবটি পরিবেশে অভিযোগিতায় জয়ী হয়ে বেঁচে থাকার জন্য বংশবৃদ্ধি করবে এবং তিকে থাকবে।

#### ৭. নতুন প্রজাতির উৎপত্তি

যেসব প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে সুবিধাজনক প্রকরণ দেখা যায়, প্রকৃতি তাদের নির্বাচন করে এবং তাদের লালন করে। সুবিধাজনক প্রকরণযুক্ত প্রাণী এবং উদ্ভিদ পরিবেশের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে এবং অবোধনের ভুলনায় বেশি হারে বংশবিস্তার করতে পারে। ফলস্বরূপিকার সূচী এসের বংশধরদের মধ্যে প্রকরণগুলো সঞ্চালিত হয়। এই বংশধরদের মধ্যে আবার যাদের সুবিধাজনক প্রকরণ বেশি থাকে, প্রকৃতি আবার তাদের নির্বাচন করে। এভাবে শুগ-বুগাচ্ছর ধরে নির্বাচিত করে করে প্রকৃতি প্রাণী ও উদ্ভিদের নতুন প্রজাতি সৃষ্টি করে।

বর্তমানে বংশগতিবিদ, কোষতত্ত্ববিদ ও প্রেশিবিদগণ নতুন প্রজাতির উৎপত্তির বিষয়ে যেভেদের বংশগতি মতবাদের এবং ডারউইনের বিবর্তন মতবাদের ভিত্তিতে বলেন, ধীর গতিতে তিনটি তিনি উপর্যোগী নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হতে পারে:

- (ক) মূল প্রজাতির থেকে গৃহক হয়ে (isolation) যাওয়ার ফলে
- (খ) সংকরায়ণের (hybridization) ফলে এবং
- (গ) সংকরায়ণ প্রজাতিতে কোষ বিভাজনের সময় ঘটনাক্রমে কোষে ক্লোমোজোম সংখ্যার বৃদ্ধির (Polyploidy) ফলে। এর ফলে নতুন জীবটির অভিযোগন ঘটবে এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা একটি নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হবে।

চার্লস ডারউইনকে জৈব বিবর্তনের জনক বলা হলেও তার মতবাদের উপর এখনো কিছু অংশ রয়ে গেছে। তার মতবাদের যে বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে, তার উজ্জ্বলের খৌজে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে যাচ্ছেন। পৃথিবীর সব বিজ্ঞানীকে নিয়ে একটা অর্পণ সেওয়া হচ্ছে, অর্পণের বিষয়বস্তু ছিল পৃথিবীর নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ কোনটি। বিজ্ঞানীরা আজ দিয়ে বলেছিলেন, বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব হচ্ছে ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব।

## অনুশীলনী



### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন পানিতে শর্ষস জীবের উৎপত্তি হয়েছিল?

- (ক) নদীর (খ) বায়ুমণ্ডল
- (গ) সমুদ্রের (ঘ) পুরুষের

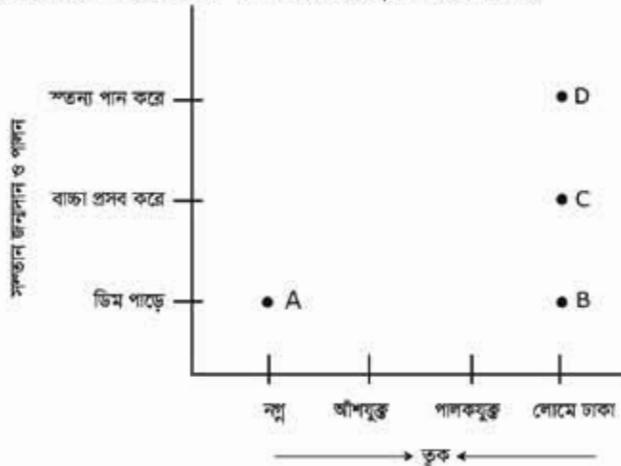
২. প্রোটোভাইরাস সৃষ্টির আগে বায়ুমণ্ডলে যে প্রাচীতি ছিল তা হলো:

- (i) অক্সিজেন
- (ii) হাইড্রোজেন
- (iii) নাইট্রোজেন

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| (ক) I ও II  | (গ) II ও III    |
| (খ) I ও III | (ঘ) I, II ও III |

নিচের ঝাঁকটি থেকে ৩ ও ৪ নং ধর্মের উত্তর দাও:



৩. ধাঁকটে A অবস্থাসে কোন ধার্মীতি থাকবে?

- (ক) মাহ (গ) সাগ
- (খ) বাণ (ঘ) কচ্ছল

৮. প্লাটিপাসের অবস্থান থাকের কোথায়?  
 (ক) A ও B                                  (গ) B ও D  
 (খ) B ও C                                    (ঘ) C ও D



### সূজনশীল প্রশ্ন

১. খিসেস সাম্ভাৱ্যতাৰ অক্ষয় হওয়াৰ বিশেষজ্ঞ ভাস্তুৰেৰ কাছে পেছেন। ভাস্তুৰ এ সমস্যা সমাধানেৰ জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতিতে তাৰ ডিবালুৰ পৰিস্কৃত ঘটনা। অন্যদিকে খিসেস সাম্ভাৱ্য চাচাক বোন খিভা পুজুসম্ভানেৰ আশায় এখন পাঁচ কন্যাসম্ভানেৰ জন্মী।

- (ক) নিউক্লিওপ্রোটিন কাকে বলে?  
 (খ) জীৰ্ণত জীৰ্ণাশ্য বলতে কী বুবায়?  
 (গ) খিসেস সাম্ভাৱ্য কেন্দ্ৰে ভাস্তুৰ কোন বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন কৰালেন? ব্যাখ্যা কৰ।  
 (ঘ) মিতাৱ একই রকম সন্তান হওয়াৰ বিষয়টিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ কৰ।

২. জামান বিবৰ্জন অধ্যাগতি ভালো বুবাতে না পেৱে তাৰ বাবাৰ কাছে থািয়। বাবা সমসম্পৰ্ক বিবৰ্জন সকলকিৰ্তি ধৰ্মাণ্টি বুবিয়ে দিলেন। এন্দৰুন জামান তাৰ বাবাৰ কাছে বিবৰ্জনেৰ মতবাদ সকলকে জানতে চাইলে তিনি জ্যাবাকেৰ মতবাদ ও ডারউইলেৰ মতবাদ বিশ্তাৰিত ব্যাখ্যা কৰিলেন।

- (ক) সেক্স ক্রোমোজোম কাকে বলে?  
 (খ) বিবৰ্জন বলতে কী বুবায়?  
 (গ) বাবা কীভাৱে বিবৰ্জন সকলকিৰ্তি উল্লিখিত ধৰ্মাণ্টি ব্যাখ্যা কৰালেন।  
 (ঘ) বাবাৰ বুবিয়ে দেওয়া মতবাদ দুটিৰ মধ্যে কোনটি অধিকভাৱে অহণযোগ্য? তুলনামূলক আলোচনা কৰে মতামত দাও।

পঞ্চম অধ্যায়

## দেখতে হলে আলো চাই



আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আলোর প্রয়োজনের কথা বলে শেষ করা যাবে না। আমরা চোখ বন্ধ করলে কিছুই দেখি না। আবার পুরোপুরি অস্বকারে চোখ ঝোলা গাথলেও কিছু দেখতে পাই না। আলো হচ্ছে সেই নিখিল, ঘার সাহায্যে আমরা দেখতে পাই। তোমরা আপের খেপিগুলোতে আলোর বিভিন্ন ধর্মের সাথে পরিচিত হয়েছ। এই অধ্যায়ে আমনা বা দর্শনের ব্যবহার ছাড়াও আলোর প্রতিসরণ সম্পর্কে আরও কিছু জানবে। এছাড়া চোখের ক্রিয়া, শৃঙ্খল দর্শনের নিকটতম বিন্দু, লেন্সের ক্ষমতা, চোখের ভূটি এবং লেন ব্যবহার করে চোখ ভালো গাথার উপায় জানতে পারবে।



### এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- দর্শনের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আলোর প্রতিসরণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দৃষ্টি কার্যক্রমে চোখের ক্ষিণী ব্যাখ্যা করতে পারব।
- স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম বিন্দু ব্যাখ্যা করতে পারব।
- লেসের ক্ষমতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- চোখের ত্রুটি সূচিতে কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- লেস ব্যবহার করে চোখের ছুটি সংশোধনের উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- চোখ ভালো রাখার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- চোখের ত্রুটি সূচিতে কারণ অনুসন্ধান করতে পারব।
- চোখের প্রতি যত্ন নেব এবং অন্যদের সচেতন করব।

## ৫.১ আয়না বা দর্পণের ব্যবহার

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আয়না বা দর্পণের নানা রূক্ষ ব্যবহার আছে। বর্তমান পাঠে আমরা আয়না বা দর্পণের দুটি বিশেষ ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব। এ দুটি হলো নিরাপদ ছাইডিং এবং গাড়ির রাস্তার অনুস্থ বাঁক বা পার্কিং সড়কের বিপর্জনক বাঁকে আয়না বা দর্পণের ব্যবহার।

### নিরাপদ ছাইডিং

গাড়ি নিরাপদে ছাইডিং করার অন্যতম শর্ত হলো নিজ গাড়ির আশপাশে কী ঘটছে (চিত্র ৫.০১) সবসময় তা খেয়াল রাখা। সাধারণত গাড়ির ছাইভারের সিটের দরজার সামনের দিকে দুই পাশে সাইড ভিউ মিরর নামে দুটি আয়না বা দর্পণ থাকে। এছাড়া গাড়ির ক্ষিতরে সামনের দিকে যাবাখানেও রিয়ার ভিউ মিরর নামে আরেকটি আয়না বা দর্পণ থাকে। এগুলো গাড়ির দুশাশে এবং পিছনের দিকে দেখার কাজে সাহায্য করে। ফলে ছাইভার শুধু মাঝে চুরিয়েই চারপাশ দেখতে পারে— তার শরীরে কোনো রুক্ষ ঘোড় দিতে হয় না বা নাঢ়াতে হয় না।



চিত্র ৫.০১: অনিরাপদ ছাইডিং

গাড়ির এই আয়নাগুলো ব্যবহার করে ছাইভার তার হাত সর্বসা স্টিম্পারিং রুইলে রেখে সামনে বা পিছনের দিকে নজর রাখতে পারে। গাড়ি চালানো শুরু করার আগে ছাইভার আয়না বা দর্পণগুলোকে (চিত্র ৫.০২)



চিত্র ৫.০২: গাড়ির তিনটি আয়না।

যথাযথ অবস্থানে ঘূরিয়ে নেব যেন ছাইভিং সিটে বসেই শিছন এবং দুশাশ সঠিকভাবে দেখা যাব।

এর পাশাপাশি আয়নাগুলো ঠিক করে পরিষ্কার করে নিতে হয় যেন কোনো ময়লা বা খুলাবালি না থাকে। এজে অন্য গাড়ির অতিবিমের অবস্থান ঠিকভাবে নাও বোঝা যেতে পারে। গাড়ি কোনো কারণে পিছনের দরকার হলে প্রথমে তিনটি দর্শনেই চোখ ঝুলিয়ে নিতে হবে এবং গাড়িটি না আমানো পর্যন্ত সারাঙ্গশ তিনটি দর্শনেই চোখ রাখতে হয়। তাছাড়া চলন্ত অবস্থার গাড়ি সেন পরিবর্তন করার আগে এই তিনটি আয়না বা দর্শনের দিকে দেয়াল রাখতে হবে, যেন পিছনের গাড়ির অবস্থান বুঝা যাব।

### পাহাড়ি রাস্তার অদৃশ্য বাঁক

পাহাড়ি রাস্তা সাধারণত আঁকাৰ্বাঁকা হয়। অনেক সময় এমনও বাঁক থাকে যে রাস্তাটি থায়  $90^{\circ}$  বেঁকে যায়। তখন সামনের রাস্তা নিয়ে কী আসছে বোঝার কোনো উপায় থাকে না— এই কারণে পাহাড়ি রাস্তায় ছাইভিং বিপজ্জনক। ছাইভিংকে নিরাপদ করার জন্য পাহাড়ি রাস্তায় বিভিন্ন বাঁকে বড় সাইজের পোলীয় দর্শন স্ট্যান্ড স্টেড করে রাখা হয় (চিত্র ৫.০৩)। ফলে এর কাছাকাছি এসে দর্শনে তাকালে বাঁকের অন্য পাশ থেকে কোনো গাড়ি আসছে কি না সেটি দেখা যায় এবং ছাইভার সাবধান হয়ে গাড়ির গতি নিরীক্ষণ করে নিরাপদে গাড়ি চালাতে পারে।



চিত্র ৫.০৩: পাহাড়ি রাস্তার অদৃশ্য বাঁক



### একক কাজ

**কাজ:** একটা গাড়ির এই তিনটি আয়না পরীক্ষা করে দেখো। দেখবে এগুলো তোমাদের পরিচিত সমতল আয়না নয়। এর পৃষ্ঠদেশ বাঁকা বা এগুলো পোলীয় আয়না। এ কারণে এই আয়নার সবকিছু একটু ছেট দেখার সঙ্গে কিম্বু এই আয়নায় অনেক বেশি এলাকা দেখা সম্ভব হয়।

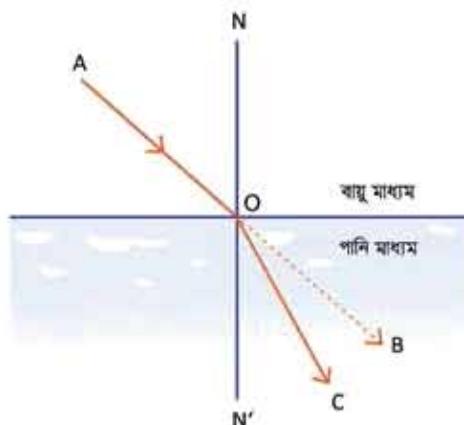
## ৫.২ আলোর প্রতিসরণ

তোমরা অন্তর্য থেকিতে আলোর প্রতিসরণ এবং তার বাস্তব প্রয়োগ দেখছে। আমরা জানি, আলোক রশ্মি কেবলো স্বচ্ছ ও সমসজ্ঞ মাধ্যমে সরবরাহের চলে। আলো বখন একটি স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে লম্বভাবে আপত্তি না হয়ে বাঁকাভাবে আপত্তি হয়, তখন মাধ্যম দূর্তির বিভেদভলে এর গতিপথের দিক পাল্টে যায়। আলোক রশ্মির দিক পরিবর্তন করার এই ঘটনাই হলো আলোর প্রতিসরণ।

৫.০৪ চিত্রটি শুরু কর। এখানে উপরে বাতাস এবং নিচে পানি কল্পনা করা হয়েছে।

আলোকরশ্মি A থেকে শুরু করে O বিন্দুতে পড়েছে অর্থাৎ AO আপত্তি রশ্মি এবং O বিন্দু হলো আপত্তন বিন্দু। O বিন্দুর ভিতর দিয়ে NN' লম্ব আঁকা হয়েছে। অর্থম মাধ্যম বাতাস এবং ছিঁড়ীয় মাধ্যমটি পানি হওয়ায় এবং পানির ঘনত্ব বাতাস থেকে বেশি হওয়ায় আলোকরশ্মি সোজা OB পথে না সিঁড়ে ON'- এর দিকে সরে এসে OC বরাবর যাবে। এখানে OC হচ্ছে প্রতিসরিত রশ্মি।

$\angle AON$  হলো আপত্তন কোণ এবং  $\angle CON'$  হলো প্রতিসরণ কোণ। এখানে উল্লেখ্য, আলোক রশ্মি যদি AO বরাবর আপত্তি না হয়ে NO বরাবর আপত্তি হতো তাহলে কিন্তু এটি সোজা ON' বরাবর চলে যেত।



চিত্র ৫.০৪: আলোর প্রতিসরণ



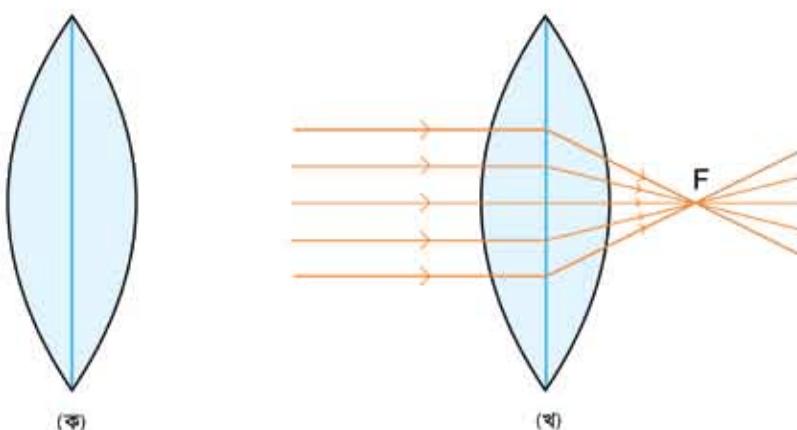
### একক কাজ

**কাজ:** একটি কাপে একটি মুঝা রেখে তুমি তোমার মাথাটা এমনভাবে সরিয়ে নাও যেন মুহূর্ত আর দেখা না যায়। এবারে কাপে পানি ঢালতে থাকো, তুমি এক সময় মুহূর্ত দেখতে পাবে। শূরু কাপে আলো সোজাসুজি তোমার চোখে আসতে না পারলেও পানি থাকার কারণে বাঁকা হয়ে সেটি তোমার চোখে পৌঁছতে পারে।

**প্রতিসরণের সূত্র:** আলোর প্রতিসরণের সময় এবং রশ্মির চলাচলের ধর্মকে দুটি সূত্রে প্রকাশ করা যাব।

১. আপত্তি রশ্মি, আপত্তি বিস্তৃত বিভেদ তলের ওপর আঁকা অভিলম্ব এবং প্রতিসরিত রশ্মি একই সমতলে থাকে।
২. এক জোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম এবং নির্দিষ্ট রঙের আলোর জন্য আপত্তি কোণের সাইন ( $\sin\theta$ ) ও প্রতিসরণ কোণের সাইনের ( $\sin\theta'$ ) অনুপাত সর্বদাই ধূর থাকে। অর্থাৎ  $\sin\theta / (\sin\theta') = n$

বিভীষণ সূত্র মহিসেবে যে ধূর সংখ্যাটির কথা বলা হয়েছে, সেটি হলো নির্দিষ্ট রঙের জন্য প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে বিভীষণ মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক। প্রথম মাধ্যমকে শূন্য থেরে বিভীষণ মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক মাপা হলে সেটাকে বস্তুর প্রতিসরাঙ্ক বলা হয়। পানির প্রতিসরাঙ্ক ১.৩৩, বাতাসের প্রতিসরাঙ্ক ১-এর এত কাছাকাছি যে সেটাকে ১ ধরা হয়ে থাকে। তবে যদে গোবো, আলোর রং ভিত্তি বলে প্রতিসরাঙ্কের মানও একটুখানি ডিম্ব হয়।



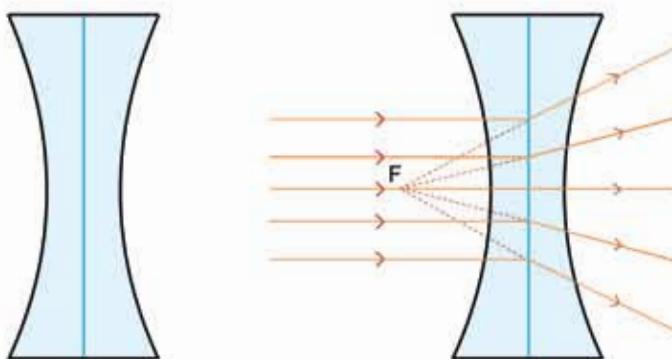
চিত্র ৫.০৫: উভয় দেশ এবং তার কোকাস বিস্তৃতি

### ৫.৩ লেন্স

দুটি শোলীয় পৃষ্ঠ দিয়ে সীমাবদ্ধ কোনো শব্দ প্রতিসারক মাধ্যমকে লেন্স বলে। অধিকাংশ লেন্স কাঠের তৈরি হয়। তবে কোর্টেজ এবং প্লাস্টিক দিয়েও আজকাল লেন্স তৈরি হয় এবং এসের ব্যবহার দিন দিন বাঢ়ছে।

লেন্স সাধারণত দুই ধরনের। (ক) উভল বা অভিসারী লেন্স (Convex lens) এবং (খ) অবভল বা অপসারী লেন্স (Concave lens)। নাম দেখেই বোধ যায়ে উভল বা অভিসারী লেন্সে আলো রশ্মি হচ্ছে

ଅଭିସାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ବିଳୁତେ ମିଳିତ ହୁଏ । ଅନ୍ୟଦିକେ ଅବତଳ ବା ଅପସାରୀ ଲେଜେ ଆଲୋକରଣ୍ୟ ଅପସାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମପର ଥେବେ ଦୂରେ ଥାଏ ।



ଚିତ୍ର ୫.୦୫: ଅବତଳ ଲେଜେ ଏବଂ ତାର ଫୋକାସ ବିଳୁ

ଚିତ୍ର ୫.୦୫ ହଲେ ଉତ୍ତଳ ଲେଜେ । ଏଇ ଲେଜେର ଯାବଧାନେ ମୋଟା ଓ ପ୍ରାକ୍ତ ସର୍ବ, ତାଇ ଏଟିକେ କଥିନୋ କଥିନୋ ଶୃଙ୍ଖଳମଧ୍ୟ ଲେଜେ ବଳା ହୁଏ । ଆଲୋକରଣ୍ୟ ଉତ୍ତଳ ଲେଜେର ଉତ୍ତଳ ପୃଷ୍ଠେ ଆପତିତ ହର । ଏଇ ଲେଜେ ସମାନତାଳ ଏକଗୁଛ ଆଲୋକରଣ୍ୟକେ କେନ୍ତ୍ରୀୟ ବା ଅଭିସାରୀ କରେ କୋଣୋ ଏକଟି ବିଳୁତେ ମିଳିତ କରେ (ଚିତ୍ର ୫.୦୫) । ଏଇ ବିଳୁଟି ହଜେ ଲେଜେର ଫୋକାସ ବିଳୁ ଏବଂ ଲେଜେର କେନ୍ତ୍ର ଥେବେ ଏଇ ବିଳୁର ଦୂରସ୍ଥ ହଜେ ଫୋକାସ ଦୂରସ୍ଥ । ଉତ୍ତଳ ଲେଜେ ଆଲୋ ଏକ ବିଳୁତେ ମିଳିତ ହିଁଦ୍ୟାର ପର ଲେଜେ ଆବାର ଛଡ଼ିଯେ ପଡ଼େ । ଅନ୍ୟଦିକେ ଅବତଳ ଲେଜେର ଯାବଧାନେ ସର୍ବ ଓ ପ୍ରାକ୍ତର ଦିକଟା ମୋଟା (ଚିତ୍ର ୫.୦୬) । ଏଇ ଲେଜେର ଅବତଳ ପୃଷ୍ଠେ ସମାନତାଳ ଆଲୋକ ରଣ୍ୟ ଆପତିତ ହଲେ ଆଲୋକରଣ୍ୟ ଅପସାରୀ ହରେ ଛଡ଼ିଯେ ପଡ଼େ । ସବ୍ଦି ଅପସାରିତ ରଣ୍ୟକୁଛ ସୋଜା ପିଛନେର ଦିକେ ବାଢ଼ିଯେ ନେବାବା ହଜେହେ କଞ୍ଚନା କରେ ନିଲେ ସେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏକଟି ବିଳୁତେ ମିଳିତ ହଜେହ ବଲେ ମନେ ହୁଏ । ଏଇ ବିଳୁଟି ହଜେହ ଅବତଳ ଲେଜେର ଫୋକାସ ବିଳୁ ଏବଂ ଲେଜେର କେନ୍ତ୍ର ଥେବେ ଏଇ ବିଳୁର ଦୂରସ୍ଥ ହଜେହ ଫୋକାସ ଦୂରସ୍ଥ ।

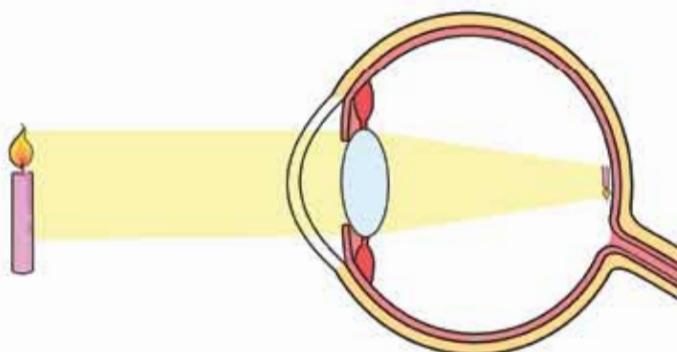
ଯାଥାରାଗତ ଲେଜେର ପୃଷ୍ଠଗୁଲୋ ସେ ପୋଳକେର ଅର୍ଥ, ତାର କେନ୍ତ୍ରକେ ବକ୍ରତାର କେନ୍ତ୍ର ବଲେ ଏବଂ ଲେଜେର ଦୂରେ ପୃଷ୍ଠର ଜଳା ବକ୍ରତାର କେନ୍ତ୍ର ଦୂରି ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଗମନକାରୀ ସରଳରେଖାଇ ହଲୋ ଲେଜେର ପ୍ରଧାନ ଅଳ୍ପ । ଆମରା ଆପେଇ ବଲେଇ ସେ ଲେଜେର ପ୍ରଧାନ ଅଳ୍ପର ସମାନତାଳ ରଣ୍ୟ ପ୍ରତିସରଫେର ପର ପ୍ରଧାନ ଅଳ୍ପର ସେ ବିଳୁତେ ମିଳିତ ହୁଏ (ଉତ୍ତଳ ଲେଜେ) ବା ସେ ବିଳୁ ଥେବେ ଅପସୃତ ହଜେହ ବଲେ ମନେ ହୁଏ (ଅବତଳ ଲେଜେ), ସେଇ ବିଳୁକେ ଲେଜେର ପ୍ରଧାନ ଫୋକାସ ବଲେ । ୫.୦୫ ଏବଂ ୫.୦୬ ଚିତ୍ର ଫ ବିଳୁ ହଲୋ ପ୍ରଧାନ ଫୋକାସ । ଲେଜେର କେନ୍ତ୍ର ଥେବେ ପ୍ରଧାନ ଫୋକାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତ୍ବରେ ହଲୋ ଲେଜେର ଫୋକାସ ଦୂରସ୍ଥ ।

### ৫.৩.১ লেনের ক্ষমতা

আমরা জানি, প্রধান অক্ষের সমান্তরাল এক পুঁজ আলোকরশিকে উভল লেন কেজীভূত বা অভিসারী করে এক বিন্দুতে মিলিত করে। অগ্ররদিকে অবক্ষ লেন একগুচ্ছ সমান্তরাল রশিকে অপসারী করে; ফলে এই রশিগুচ্ছ কোনো একটি বিন্দু থেকে অপসারিত হচ্ছে বা ছড়িয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়। আলোকরশিকে অভিসারী বা অপসারী করার প্রক্রিয়াটি পরিমাণ করার জন্য লেনের “ক্ষমতা” সংজ্ঞাদিত করা হয়েছে। ১-কে লেনের কোকাস দূরত্ব (মিটারে প্রকাশ করে) দিয়ে ভাগ করা হলে লেনের ক্ষমতা বের হয়। অর্থাৎ একটি উভল লেনের কোকাস দূরত্ব ২ মিটার হলে তার ক্ষমতা  $1/2 = 0.5$ । লেনের ক্ষমতার প্রচলিত একক হলো ডায়োপ্টার (diopter)। এর এসআই একক হলো রেডিয়ান/মিটার। লেনের ক্ষমতা ধনাখাক বা ঋণাখাক দুই-ই হতে পারে। কোনো লেনের ক্ষমতা +1D বলতে বোঝায়, লেনটি উভল এবং এটি প্রধান অক্ষের ১ মিটার দূরে আলোকরশিগুচ্ছকে মিলিত করবে।

একইভাবে লেনের ক্ষমতা -2D হলে বুঝতে হবে লেনটি অবক্ষ এবং এটি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল একগুচ্ছ আলোকরশিকে এমনভাবে অপসারিত করে যে, এগুলো কোনো লেন থেকে ৫০ সেমি দূরের কোনো বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয়।

### ৫.৪ চোখের ক্রিয়া



চিত্র ৫.০৭: আমরা কীভাবে দেখি

#### ৫.৪.১ আমরা কীভাবে দেখতে পাই

তোমরা অন্তম শ্রেণিতে চোখের পর্ণন সম্পর্কে জেনেছ। বর্তমান পাঠে চোখের ক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা কীভাবে দেখতে পাই (চিত্র ৫.০৭) সেটি আলোচনা করা হবে।

চোখের উপাদানগুলোর মাঝে রেটিনা, চোখের লেন্স, অ্যাকুয়াস হিউমার এবং কর্ণিয়া। তোমরা লেন্স কীভাবে কাজ করে তার একটি ধারণা পেয়েছ। তাই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ চোখের লেন্সও একটি অভিসারী লেন্সের মতো কাজ করে। আমরা দেখেছি, উন্নল বা অভিসারী লেন্স সবসময় উল্টো প্রতিবিম্ব তৈরি করে। ক্যামেরায় ছবি তোলার জন্য এভাবে প্রতিবিম্ব তৈরি করা হয়। যখনই আমাদের সামনে কোনো বস্তু থাকে, তখন ঐ বস্তু থেকে আলোকরশ্মি এই লেন্স দ্বারা প্রতিসারিত হয় এবং রেটিনার ওপর একটি উল্টো প্রতিবিম্ব তৈরি করে। রেটিনার ওপর আলো পড়লে ম্লায়ুর সাথে সংযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রড এবং কোণ কোষগুলো সেই আলো গ্রহণ করে তাকে তড়িৎ বা বিদ্যুৎ সিগন্যালে পরিণত করে। ম্লায়ু এই বিদ্যুৎ বা তড়িৎ সিগন্যালকে তাৎক্ষণিকভাবে অপটিক নার্ভ বা অক্ষি ম্লায়ুর মাধ্যমে মস্তিক্ষে পাঠায়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, কোণকোষগুলো তীব্র আলোতে সাড়া দেয় এবং রঙের অনুভূতি ও রঙের পার্থক্য বুঝিয়ে দেয়। অন্যদিকে রডকোষগুলো খুব কম আলোতে সংবেদনশীল হয়। এ জন্য জ্যোৎস্নার অল্প আলোতে আমরা “রড” কোষগুলোর কারণে দেখতে পাই কিন্তু কোনো রং বুঝতে পারি না। মস্তিক্ষ রেটিনায় সৃষ্টি উল্টো প্রতিবিম্বকে সোজা করে নেয় বলে আমরা বস্তুটি যে রকম থাকে সেরকমই দেখি।

#### ৫.৪.২ স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্ব

স্বাভাবিক চোখের খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা সীমাহীন নয়। মানুষ তার চোখের লেন্সে ফোকাস দূরত্ব বাড়িয়ে বা কমিয়ে একটা বস্তুকে সব সময় স্পষ্ট দেখার চেষ্টা করে। কিন্তু লক্ষ্যবস্তু চোখের কাছাকাছি একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে বেশি কাছে এলে আর স্পষ্ট দেখা যায় না। চোখের সবচেয়ে কাছে যে বিন্দু পর্যন্ত লক্ষ্যবস্তুকে খালি চোখে স্পষ্ট দেখা যায়, তাকে স্পষ্ট দৃষ্টির নিকট বিন্দু বলে এবং চোখ থেকে ঐ বিন্দুর দূরত্বকে স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্ব ধরে নেওয়া হয়। এই দূরত্ব মানুষের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। একজন শিশুর এই দূরত্ব ৫ সেন্টিমিটারের কাছাকাছি এবং একজন স্বাভাবিক বয়স্ক লোকের এই দূরত্ব ২৫ সেমি পর্যন্ত হতে পারে। দূর বিন্দু চোখ থেকে অসীম দূরত্বে অবস্থান করে। এ কারণে আমরা বহুদূরের নক্ষত্রও খালি চোখে দেখতে পারি।

#### ৫.৪.৩ চোখের ত্রুটি এবং তার প্রতিকার

তোমাদের কি চোখের সমস্যা সম্পর্কে ধারণা আছে? এ পাঠে আমরা চোখের বিভিন্ন ত্রুটি এবং তাদের প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করব।

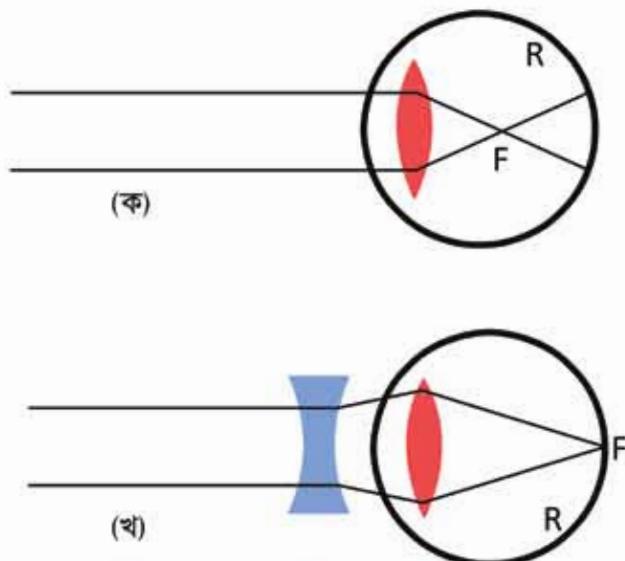
আমরা জানি, সুস্থ এবং স্বাভাবিক চোখ “নিকট বিন্দু” (Near point) থেকে শুরু করে অসীম দূরত্বের দূর বিন্দুর মাঝখানে যে স্থানেই কোনো বস্তু থাকুক না কেন সেটা স্পষ্ট দেখতে পারে। এটাই চোখের স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি। এই স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ব্যাহত হলেই তাকে চোখের দৃষ্টির ত্রুটি বলা হয়।

চোখের দৃষ্টির অনেক ধরনের ত্রুটি থাকলেও আমরা প্রধান দুটি ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করব। সেই দুটি

হচ্ছে;

(ক) হ্রস্বদৃষ্টি বা কীণদৃষ্টি (Myopia or shortsightedness)

(খ) দীর্ঘদৃষ্টি বা দূরদৃষ্টি (Hypermetropia or farsightedness)



চিত্র ৫.০৮: হ্রস্বদৃষ্টি ও তার প্রতিকার

### হ্রস্বদৃষ্টি বা কীণদৃষ্টি (Myopia)

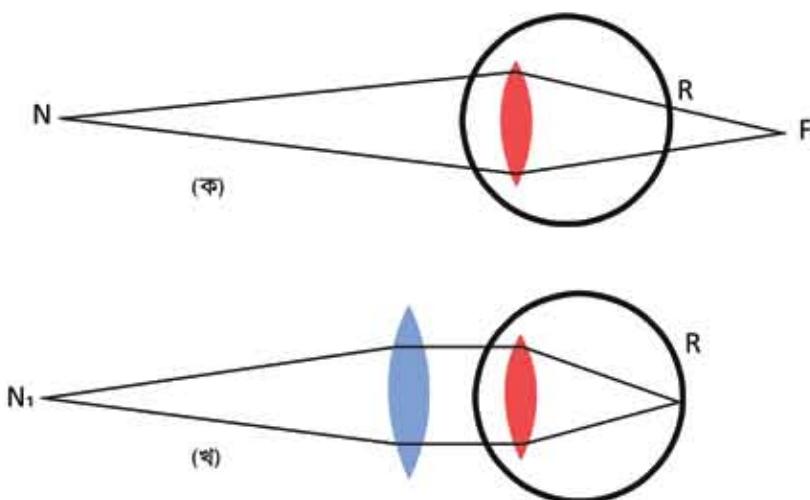
যখন চোখ কাছের বস্তু দেখতে পায় কিন্তু দূরের বস্তু দেখতে পায় না, তখন চোখের এই ভুটিকে হ্রস্বদৃষ্টি বলে। এরূপ চোখের দূর বিদ্যুটি অসীম দূরত্ব অপেক্ষা খানিকটা নিকটে থাকে এবং বস্তুকে স্পষ্ট দৃষ্টির মূলতম দূরত্ব হতে আরও কাছে আনলে অধিকতর স্পষ্ট দেখায়। নিম্নলিখিত দুটি কারণে এই ভুটি হয়ে থাকে।

১. চোখের লেন্সের অপ্সার্পী শক্তি বৃদ্ধি পেলে বা ফোকাস দূরত্ব কমে গেলে ও
২. কোনো কারণে অফিস্পোলকের কাসার্ব বৃদ্ধি পেলে।

এর ফলে দূরের বস্তু থেকে আসা আলোকগুঠি চোখের লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রতিসরণের পর রেটিনার উপরে প্রতিবিষ্ফোট তৈরি না করে একটু সামনে (F) প্রতিবিষ্ফোট তৈরি করে (চিত্র ৫.০৮)। কলে চোখ বস্তুটি স্পষ্ট দেখতে পায় না।

**প্রতিকার :** এই ভুটি দূর করার জন্য এমন একটি অবজ্ঞ লেন্সের চশমা ব্যবহার করতে হবে, যার ফোকাস দূরত্ব হ্রস্বদৃষ্টির দীর্ঘতম দূরত্বের সমান। চশমার এই লেন্সের অপ্সার্পী ক্ষিয়া চোখের উভয়

লেনের অভিসারী ক্রিয়ার বিপরীত কাজেই চোখের ফোকাস দূরত্ব বেড়ে যাবে বলে প্রতিবিষ্টি আরো পিছনে তৈরি হবে। অর্থাৎ অসীম দূরত্বের বন্ধু থেকে আসা সমান্তরাল আলোকরশ্মি চশমার অবস্থল লেন L (চিত্র ৫.০৮) এর মধ্য দিয়ে চোখে পড়ার সময় প্রয়োজনযোগ্যতা অপসারিত হয়। এই অপসারিত রশ্মিগুলো চোখের লেনে প্রতিসারিত হয়ে ঠিক রেটিনা বা অকিপট R-এর ওপর স্পষ্ট প্রতিবিষ্টি তৈরি করে।



চিত্র ৫.০৮: দীর্ঘদৃষ্টি ও তার প্রতিকার

### দীর্ঘদৃষ্টি বা দূরদৃষ্টি (Hypermetropia)

যখন কোনো চোখ দূরের বন্ধু দেখে কিন্তু কাছের বন্ধু দেখতে পায় না, তখন এই ক্ষমিকে দীর্ঘদৃষ্টি বলে। সাধারণত বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে এই ঝুঁতি দেখা যায়। নিম্নলিখিত দুটি কারণে এই ঝুঁতি ঘটে।

১. চোখের লেনের অভিসারী ক্ষমতা হ্রাস পেলে অথবা চোখের লেনের ফোকাস দূরত্ব বেড়ে গেলে।
২. কোনো কারণে অকি-গোলকের ব্যাসার্ধ কমে গেলে।

এর কল্পে দূর থেকে আসা আলো সঠিকভাবে চোখের রেটিনাতে প্রতিবিষ্টি তৈরি করলেও কাছাকাছি বিশুদ্ধ থেকে আসা আলোকরশ্মি চোখের লেনের মধ্য দিয়ে প্রতিসরণের পর রেটিনার ঠিক উপরে না হয়ে পিছনে (F) বিদ্যুতে মিলিত হয় (চিত্র ৫.০৯)। ফলে চোখ কাছের বন্ধু স্পষ্ট দেখতে পায় না।

**প্রতিকার :** এই ঝুঁতি দূর করার জন্য একটি উভ্য লেনের চশমা ব্যবহার করতে হবে। ফলে কাছাকাছি বিশুদ্ধ (চিত্র ৫.০৯) থেকে আসা আলোকরশ্মি চশমার লেনে এবং চোখের লেনে পর পর দূরবার প্রতিসারিত হওয়ার কারণে ফোকাস দূরত্ব কমে যাবে এবং প্রয়োজনযোগ্যতা অভিসারী হয়ে প্রতিবিষ্টি রেটিনা (R)-এর উপরে পড়বে।

#### ৫.৪.৪ চোখ ভালো রাখায় উপায়

আমাদের চোখ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ। এটির যথাযথ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন যেন এটিকে ত্রুটিমুক্ত রাখা যায়। বিভিন্ন উপায়ে আমাদের চোখকে ভালো রাখা যায়। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে:

(ক) সঠিক পৃষ্ঠি গ্রহণ চোখের জন্য খুবই দরকারি। ভিটামিন এ, সি ও ই সমৃদ্ধ খাবার; ফ্যাটি এসিড যুক্ত খাবার, জিংকসমৃদ্ধ খাবার, গাঢ় সবুজ শাকসবজি ও বিভিন্ন ফল চোখের জন্য খুবই ভালো। এ ধরনের খাবার চোখকে রোগমুক্ত রাখতে সহায়তা করে। গাজর, মাছ, ব্রকলি, গম, মিষ্টি কুমড়ো, হলুদ (যেমন, পাকা পেঁপে, আম) ফল ইত্যাদি বেশি করে খেতে হবে।

(খ) চোখের সঠিক যত্নের জন্য সঠিক জীবনধারণ পদ্ধতি মেনে চলা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সারা দিনের পরিশ্রমের পর শরীরের মতো চোখও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। চোখকে পুনরায় সতেজ করতে সারা রাত ঘুমানো প্রয়োজন। তাই এই নির্ধারিত সময় ঘুম নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া গবেষণায় দেখা গেছে, ধূমপানও চোখের ক্ষতি করে। তাই ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে। কেউ যদি রোদ থেকে চোখকে রক্ষা করার জন্য সানগ্লাস ব্যবহার করতে চায় তাহলে অবশ্যই অতিবেগুনি রশ্মি প্রতিহত করতে পারে এমন সানগ্লাস ব্যবহার করতে হবে। তেল দিয়ে রান্না করার সময় কিংবা ঝালাইয়ের কাজ করার সময় যখন উত্তপ্ত কণা ছিটকে আসে, তখন খুব সাবধান থাকতে হবে। তাহাড়া কেমিক্যাল নিয়ে কাজ করার সময় চোখ রক্ষা করার সেফটি গ্লাস পরা বুদ্ধিমানের কাজ।

(গ) আবছা বা অপর্যাপ্ত আলোতে কাজ করলে সবকিছু চোখের খুব কাছে এনে দেখতে হয়, সেটি চোখের জন্য ক্ষতিকর। ঘরের আলো পর্যাপ্ত রাখতে হবে যেন পড়তে অসুবিধা না হয়। চোখকে যখন ক্লান্ত মনে হবে, তখন না পড়ে বিশ্রাম নেওয়া ভাল। আমাদের চোখের স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্ব থেকে কম বা বেশি দূরত্বে রেখে বই পড়লে চোখে চাপ পড়ে। তাই সঠিক দূরত্বে রেখে বই পড়তে হয়। তুমি হয়তো খেয়াল করেছ অনেকক্ষণ ধরে কম্পিউটার ব্যবহার করলে চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। গবেষণায় দেখা গেছে, দীর্ঘক্ষণ টেলিভিশন দেখা বা কম্পিউটার ব্যবহারে চোখের ক্ষতি হয়। তাই এই ক্ষতি থেকে চোখকে রক্ষা করতে নির্দিষ্ট দূরত্বে থেকে এবং বিরতি দিয়ে টেলিভিশন দেখা বা কম্পিউটার ব্যবহার করা উচিত।

## অনুশীলনী



### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. শাখাবিক বয়স্ক লোকের চোখে স্টেট মৃত্তির জ্যুনকম দূরত্ব কত?
- (ক) ৫ সেমি                          (খ) ১০ সেমি  
 (গ) ২৫ সেমি                          (ঘ) ৫০ সেমি

২. উভয় লেনের ক্ষেত্রে অব্যোজ্য হলো:

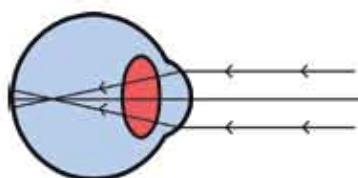
- (i) এটির ক্ষমতা বনাঞ্চক  
 (ii) লেনের মধ্যাগ সরু ও থাণ্ড মোটা  
 (iii) সমান্তরাল রশিপুলোকে একটি বিন্দুতে মিলিত করে

- শিজের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii                          (খ) i ও iii  
 (গ) ii ও iii                          (ঘ) i, ii ও iii

- চিকিৎসা কর এবং ৩ ও ৪ মুখ্যের উভয় দাও:

৩. উচীপকে উচিতভিত্তি চোখের মুটিকে কী বলা হয়?
- (ক) হ্রস্বদৃতি                          (খ) দীর্ঘদৃতি  
 (গ) বার্ধক্য দৃতি                          (ঘ) বিষম দৃতি



৪. উচিতভিত্তি মুটি দূর করতে হলে কোন ধরনের লেন ব্যবহার করতে হবে?
- (ক) উচুল লেন                          (খ) অবচুল লেন  
 (গ) উচুলাবচুল লেন                          (ঘ) সমচুলাবচুল লেন

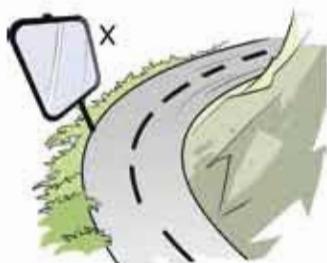


### সূজনশীল প্রশ্ন

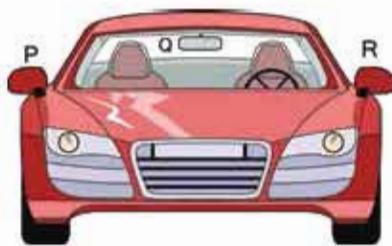
১. সৌভৃত্তি দূর থেকে ড্রাকবোর্ডে শিককের দেখা স্টেট দেখতে পার না। অন্যদিকে সৌভৃত্তির বাবার কাছের জিনিস দেখতে সহস্য হয়। পরবর্তীকালে সৌভৃত্তি ও তার বাবা কাছারের শরণাপন্থ হলে ২০ ডাক্তার সৌভৃত্তির জন্য এক ধরনের লেন এবং তার বাবার জন্য তিনি ধরনের লেন ব্যবহারের প্রয়োগৰ্থ দিশেন।

- (क) आलोंर क्रिसरप काके बड़े?
- (ख) स्पष्ट दृष्टिर नूनतम सूरक्षा बलते की बुधाय?
- (ग) सेंजूटि तोधेर कोन धरनेर खुटिते आक्रान्त? व्याख्या कर।
- (घ) सेंजूटि बाबार जल्य डाक्तारेर भिन्न धरनेर लेस बुबहारेर प्रामाणेर घोषिकता विश्लेषण कर।

२. प्रैवती चित्र-१ ओ चित्र-२ देखे अस्तुलोर उत्तर दाओ।



चित्र-१



चित्र-२

- (क) लेस काके बड़े?
- (ख) लेसेर कमता बलते की बुधाय?
- (ग) १ नं चित्रेर X दर्पणाती बुबहारेर कारण की? व्याख्या कर।
- (घ) २ नं चित्रेर गाढिटिते P, Q, R दर्पणेर भूमिका विश्लेषण कर।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

# পলিমার



আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা কাজে শুতঙ্গোত্তমাবে জড়িয়ে আছে বিভিন্ন রকমের পলিমার। এদের কোনোটি প্রাকৃতিক আবার কোনোটি কৃতিত্ব। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি মূহূর্তও কল্পনা করতে পারব না, যখন আমরা কোনো না কোনো পলিমার ব্যবহার করছি না। কিন্তু কিন্তু পলিমার আছে, যেগুলো পরিবেশবান্ধব, আবার কোনো কোনোটি পরিবেশের জন্য বেশ ক্ষতিকর। এই অধ্যায়ে আমরা পলিমারকে চিনতে শিখব, কোনটি ব্যবহার করব কোনটি থেকে দূরে থাকব সেটিও আমরা বুঝতে শিখব।



## এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- প্রাকৃতিক ও কৃত্তিম পলিমার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পলিমারকরণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাকৃতিক ও কৃত্তিম তন্তু ও বস্ত্রের উৎস, বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহার বর্ণনা করতে পারব।
- তন্তু হতে সূতা তৈরির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার সূতার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রাবার ও প্লাস্টিকের ভোজ ও রাসায়নিক ধর্ম ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টিতে রাবার ও প্লাস্টিকের জূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- তাপ প্রয়োগ করে বিভিন্ন প্রকার সূতার বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারব।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার রাবার ও প্লাস্টিকের ব্যবহার ও সংরক্ষণ সচেতন হব।

## ৬.১ পলিমার (Polymer)

মেলামাইনের থালা-বাসন, বৈদ্যুতিক সুইচ বোর্ড, কাপেট, পিভিসি পাইপ, পলিথিনের ব্যাগ, পাটের ব্যাগ, সিল্কের কাপড়, উলের কাপড়, সুতি কাপড়, নাইলনের সুতা, রাবার— এসব জিনিস আমাদের খুবই পরিচিত, আমরা সবসময়েই এগুলো ব্যবহার করছি। এগুলো সবই পলিমার। পলিমার (Polymer) শব্দটি এসেছে দুটি গ্রিক শব্দ পলি (Poly) ও মেরোস (Meros) থেকে। পলি শব্দের অর্থ হলো অনেক (Many) এবং মেরোস শব্দের অর্থ অংশ (Part)। অর্থাৎ অনেকগুলো একই রকম ছোট ছোট অংশ জোড়া দিয়ে যে একটি বড় জিনিস পাওয়া যায়, সেটি হচ্ছে পলিমার। তোমরা একটা লোহার শিকলের কথা চিন্তা করতে পার। লোহার ছোট ছোট অংশ জোড়া দিয়ে একটি বড় শিকল তৈরি হয়। অর্থাৎ বড় শিকলটি হলো এখানে পলিমার। রসায়ন বিজ্ঞানের ভাষায়, একই ধরনের অনেকগুলো ছোট অণু পর পর যুক্ত হয়ে পলিমার তৈরি করে। যে ছোট অণু থেকে পলিমার তৈরি হয়, তাদেরকে বলে মনোমার (Monomer)।

আমরা যে পলিথিনের ব্যাগ ব্যবহার করি, তা হলো “ইথিলিন” নামের মনোমার থেকে তৈরি পলিমার। একইভাবে আমরা যে পিভিসি পাইপ (PVC) ব্যবহার করি, তা হলো ভিনাইল ক্লোরাইড নামের মনোমার থেকে তৈরি পলিমার। তবে সব সময় একটি মনোমার থেকেই পলিমার তৈরি হবে এমন কোনো কথা নেই, একের অধিক মনোমার থেকেও পলিমার তৈরি হতে পারে। যেমন: বৈদ্যুতিক সুইচ বোর্ড বা বৈদ্যুতিক সুইচ হলো বাকেলাইট নামের একটি পলিমার, যা তৈরি হয় ফেনল ও ফরমালডিহাইড নামের দুটি মনোমার থেকে। আবার মেলামাইনের থালা-বাসন হলো মেলামাইন রেজিন নামের পলিমার, যা তৈরি হয় মেলামাইন ও ফরমালডিহাইড নামের দুটি মনোমার থেকে। শুরুতে আমরা পলিমারের যে উদাহরণগুলো দেখেছি, তাদের মধ্যে কিছু কিছু প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। এদেরকে আমরা বলি প্রাকৃতিক পলিমার।

এখন তোমরা নিজেরাই বল শুরুতে দেওয়া উদাহরণগুলোর মধ্যে কোনগুলো প্রাকৃতিক পলিমার?

পাট, সিল্ক, সুতি কাপড়, রাবার—এগুলো প্রাকৃতিক পলিমার। অন্যদিকে মেলামাইন, রেজিন, বাকেলাইট, পিভিসি, পলিথিন—এগুলো প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না, শিল্প-কারখানায় কৃত্রিমভাবে তৈরি করতে হয়। তাই এরা হলো কৃত্রিম পলিমার।

### ৬.১.১ পলিমারকরণ প্রক্রিয়া

মনোমার থেকে পলিমার তৈরি হয় নির্দিষ্ট একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মনোমার সংযুক্ত করে পলিমার তৈরি হয়, তাকেই বলে পলিমারকরণ প্রক্রিয়া। সাধারণত পলিমারকরণে উচ্চ চাপ

এবং তাপের প্রয়োজন হয়। যদি দুটি মনোমার একসাথে যুক্ত হয় তাহলে উৎপন্ন পদার্থটি কেমন হবে? বুঝতেই পারছ তাহলে উৎপন্ন পদার্থটিতে দুটির বেশি মনোমার থাকতে পারবে না। আমরা এটিকে এভাবে লিখতে পারি:

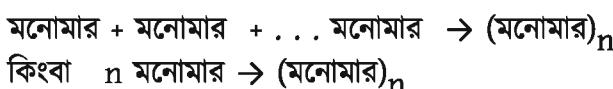


কিংবা এটাকে আমরা অন্যভাবেও লিখতে পারি  $(\text{মনোমার})_2$

তিনটি মনোমার হলে উৎপন্ন পদার্থটিতে তিনটি মনোমার থাকবে অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি:

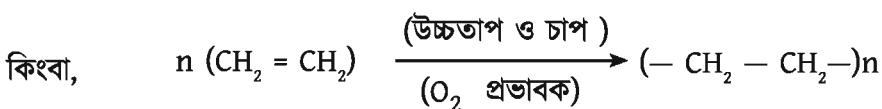
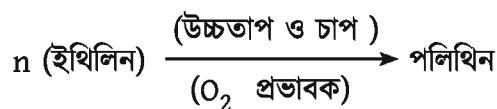


আমরা যদি  $n$  সংখ্যক মনোমার নিয়ে একটি পলিমার বানাতে চাই, তাহলে পলিমারকরণ প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখিত উপায়ে দেখানো যায়:



আমরা পলিথিনের কথা বলেছি, তোমরা কি জান কিভাবে পলিথিন তৈরি হয়?

ইথিলিন গ্যাসকে ১০০০-১২০০ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে ২০০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উন্নত করলে পলিথিন পাওয়া যায়। তবে এক্ষেত্রে পলিমারকরণ দ্রুত করার জন্য প্রভাবক হিসেবে অক্সিজেন গ্যাস ব্যবহার করা হয়।



তবে উচ্চ চাপ পদ্ধতি সহজসাধ্য না হওয়ায় বর্তমানে পদ্ধতিটি তেমন জনপ্রিয় নয়। এখন টাইটেনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড ( $\text{TiCl}_3$ ) নামক প্রভাবক ব্যবহার করে বায়ুমণ্ডলীয় চাপেই পলিথিন তৈরি হয়।

## ৬.২ তন্তু বা সুতা

তোমরা জান যে আমাদের পাঁচটি মৌলিক চাহিদার মধ্যে অন্যতম হলো বন্ত বা কাপড়। এই বন্ত আমাদেরকে শীতের হাত থেকে রক্ষা করে এবং আমরা বন্ত দিয়ে সুন্দর পোশাক তৈরি করি। বন্ত বা কাপড়-চোপড় আধুনিক সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তোমরা কি জান, বন্ত বা কাপড় কিভাবে তৈরি

হয়? সব বন্ধুই তৈরি হয় সুতা থেকে। আবার সুতা তৈরি হয় তন্তু থেকে। তন্তু ক্ষুদ্র আঁশ দিয়ে তৈরি। তাই তন্তু বলতে আমরা আঁশজাতীয় পদার্থকেই বুঝি, তবে বন্ধশিল্পে তন্তু বলতে বুনন এবং বয়নের কাজে ব্যবহৃত আঁশসমূহকেই বুঝায়। তন্তু দিয়ে সুতা আর কাপড় ছাড়াও কার্পেট, ফিল্টার, তড়িৎ নিরোধক দ্রব্য ইত্যাদি বিভিন্ন রকম পদার্থ তৈরি করা হয়।

আমাদের অতিথ্রোজনীয় তন্তু উৎস অনুযায়ী দুই রকম হয়। সুতি কাপড় তৈরির জন্য তুলা (Cotton), পাট, লিনেন, রেশম, পশম, উল, সিল্ক, অ্যাসবেস্টস, ধাতব তন্তু ইত্যাদি যেগুলো প্রকৃতিতে পাওয়া যায়, সেগুলোকে আমরা প্রাকৃতিক তন্তু বলি। অন্যদিকে পলিস্টার, রেয়ন, ডেক্রন, নাইলন ইত্যাদি যেগুলো বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা হয়, সেগুলো হলো কৃত্রিম তন্তু।

প্রাকৃতিক তন্তুগুলোর মধ্যে আবার তুলা, পাট ইত্যাদি পাওয়া যায় উক্তিদ থেকে। তাই এদেরকে উক্তিদ তন্তু বলে। অন্যদিকে রেশম, পশম এগুলো পাওয়া যায় প্রাণী থেকে। তাই এদেরকে প্রাণিজ তন্তু বলে। আবার ধাতব তন্তু পাওয়া যায় প্রাকৃতিক খনিতে। তাই এদেরকে খনিজ তন্তু বলে।

অন্যদিকে কৃত্রিম তন্তু আবার দুরকমের হয়। সেলুলোজিক তন্তু এবং নন সেলুলোজিক তন্তু। তোমরা জান যে সেলুলোজ হলো একধরনের সূক্ষ্ম আঁশযুক্ত পদার্থ, যা দিয়ে উক্তিদ এবং প্রাণী কোষ তৈরি হয়। রেয়ন, এসিটেট রেয়ন, ভিসকোস রেয়ন, কিউপ্রা অ্যামোনিয়াম—রেয়ন, এগুলো সেলুলোজিকে নানাভাবে প্রক্রিয়াজাত করে তৈরি হয় বলে এদেরকে সেলুলোজিক তন্তু বলে।

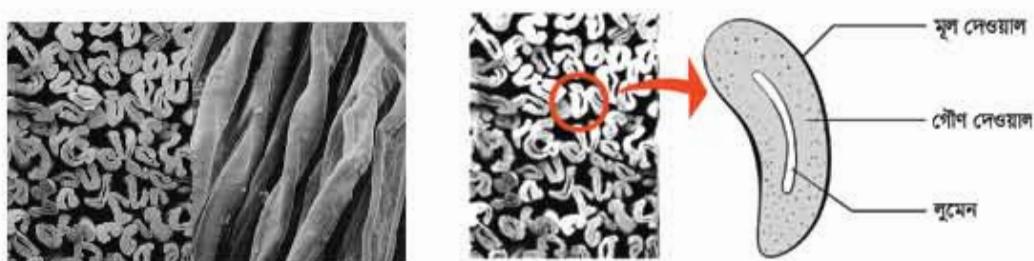
যেসব কৃত্রিম তন্তু সেলুলোজ থেকে তৈরি না করে অন্য পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে তৈরি করা হয়, তারাই হলো নন-সেলুলোজিক তন্তু। নাইলন, পলিস্টার, পলি প্রোপিলিন, ডেক্রন—এগুলো হলো নন সেলুলোজিক কৃত্রিম তন্তু।

### ৬.২.১ তন্তুর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার

একটি পোশাক আরামদায়ক কি না তা নির্ভর করে এটি কী ধরনের কাপড় দিয়ে তৈরি তার ওপর। আবার কাপড় তৈরি হয় সুতা থেকে, যা আসে তন্তু থেকে। কাজেই তন্তুর বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে এখন ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম তন্তুর বৈশিষ্ট্যগুলো জেনে নেওয়া যাক।

#### তুলা

গরমের দিনে আমরা সুতির পোশাক পরতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি কেন? কারণ সুতির তাপ পরিবহন এবং পরিচলন ক্ষমতা বেশি। তুলার আঁশ থেকে সুতা তৈরি হয়। প্রাকৃতিক উক্তিজ তন্তুর মধ্যে প্রধান হলো সুতা। অগুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে (চিত্র ৬.০১) সুতির তন্তুকে অনেকটা নলের মতো দেখায়। নলের মধ্যে যে সরু পদার্থটি থাকে তা প্রথম অবস্থায় ‘লুমেন’ (Lumen) নামক পদার্থে পূর্ণ থাকে। পরে আঁশগুলো ছাড়িয়ে নেওয়ার পর রোদের প্রভাবে শুকিয়ে যায় এবং নলাকৃতি তন্তুটি ধীরে ধীরে চ্যাপ্টা হয়ে ক্রমে



চিত্র ৬.০১: অশুরীকণ্ঠ যত্নের নিচে সুতিতন্ত্র

একটি মোচড়ানো ফিল্টার যত্নে মূল ধারণ করে। এই ফিল্টার যত্নে সুতির আপে ১০০ থেকে ২৫০টি পর্যন্ত পাক বা মোচড় থাকে।

বজ্র বা কাগড় তৈরির সময় এই মোচড়ানো অবশ একে অপরের সাথে সুলভভাবে মিলে যায় বলে সুতি বজ্র টেকসই হয়। আগাতদৃষ্টিতে সুতি তেমন উজ্জ্বল নয়। তবে ময়েশ্টারাইজেশনের (moisturization) মাধ্যমে একে উজ্জ্বল ও চকচকে করে তোলা যায়। সুতি তন্ত্রকে রং করা হলে সেটি পাকা রং হয় এবং তাপ ও খোয়ার ফলে ঝরের তেমন কোনো ক্ষতি হয় না। অজৈব এসিডের সংলগ্নে সুতি তন্ত্র নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু অন্যান্য এসিডের সংলগ্নে তেমন কোনো ক্ষতি হয় না। সুতির বজ্র ব্যবহারের তেমন বিশেষ কোনো ব্যবস্থা প্রয়োজন হয় না বলে এর অনেক ধরনের ব্যবহার রয়েছে। সুতি যত্নের একটি প্রধান সীমাবদ্ধতা হচ্ছে এটি সংকুচিত হবে যাব।

### রেশম (Silk)

আগেকার দিনের রাজা-রানির পোশাক বলতে আমরা সিল্কের বা রেশমি পোশাকই বুঝি। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, বিলাসবহুল বজ্র তৈরিতে রেশম তন্ত্র ব্যবহৃত হয়। রেশমের প্রধান গুণ হচ্ছে এর সৌন্দর্য। তিন শতাব্দিক রঙের রেশম পাওয়া যায়। রেশম বা পলু পোকা নামে এক প্রজাতির পোকার গুটি থেকে বিশেষ প্রক্রিয়া রেশমের তন্ত্র আহরণ করা হয়। রেশম মূলত ফাইব্রোল (Fibroin) নামের এক ধরনের প্রোটিন—জাতীয় পদার্থ দিয়ে তৈরি। প্রাকৃতিক প্রাপ্তি তন্ত্রে মধ্যে রেশম সবচেয়ে শক্ত এবং দীর্ঘ। বিভিন্ন পুরাণের জন্য রেশমকে তন্ত্রের রানি বলা হয়। সুর্যালোকে রেশম দীর্ঘক্ষণ রাখলে এটি তাঢ়াতাঢ়ি নষ্ট হয়। রেশম হালকা কিন্তু অনেক বেশি উজ্জ্বল এবং খুবই অল্প জায়গার রেশমি বা সিল্কের কাগড় রাখা যায়।

### পশম (Wool)

আমরা শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্য যে পোশাকের কথা সবার আগে ভাবি, সেটি হচ্ছে পশম বা উলের পোশাক। তাপ কুপরিবাহী বলে পশমি পোশাক শীতবজ্র হিসেবে বহুল ব্যবহৃত হয়। নমলীকৃতা, স্থিতিস্থাপকতা, কুরুক্ষণ প্রতিরোধের ক্ষমতা, রং ধারণক্ষমতা—এগুলো হচ্ছে উল বা পশমের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই তন্ত্রে মাঝে কাঁকা জায়গা থাকে যেখানে বাতাস আটকে থাকতে পারে। বাতাস তাপ

অপরিবাহী তাই পশম বা উলের কাপড় তাপ কুপরিবাহী। পশমি কাপড় পরে থাকলে শীতের দিনে শরীর থেকে তাপ বেরিয়ে যেতে পারে না, তাই এটি গায়ে দিলে আমরা পরম অনুভব করি। সবু এসিড এবং কারে পশমের তেমন কোনো ক্ষতি হয় না। তবে যথ পোকা খুব সহজে পশম তক্ক নষ্ট করে। এছাড়া কিছু ছাক পশম তক্ককে খুব সহজে আক্রান্ত করে নষ্ট করে দিতে পারে।

পশম একটি অতি হাটীন তক্ক। বিভিন্ন জাতের ভেড়া বা মেবের লোম থেকে পশম উৎপন্ন হয়। প্রায় ৪০ জাতের মেষ থেকে ২০০ খরনের পশম তৈরি করা হয়। জীবন্ত মেষ থেকে লোম সরিয়ে যে পশম তৈরি করা হয়, তাকে বলে 'ফ্লিস উল' (Fleece wool)। মৃত বা জলাহী করা মেষ থেকে যে পশম তৈরি করা হয়, তাকে বলে 'পুক্ত উল' (Pulled wool)। মানুষের চুল ও নখে যে হোটিন থাকে, অর্থাৎ কেরাটিন (Keratin), সেটি দিয়ে পশম তক্ক গঠিত পশমের মধ্যে আলগাকা, মোহেরা, কাশিখ, ডিকুনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

### নাইলন

কৃতিম নম-সেলুলোজিক তন্তুর মাঝে নাইলন সর্বশান্ত। সাধারণত এজিপিক এসিড এবং হেক্সামিণিলিন তাই আয়িন নামক রাসায়নিক পদার্থের পলিয়ারকর্প প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নাইলন তৈরি হয়। নাইলনকে প্রাথমিক দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়— নাইলন ৬৬ এবং নাইলন ৬।

নাইলন খুব হালকা ও শক্ত। তিনিলে এর ব্রিটিস্যাপকতা বিশুণ হয়। এটি আগুনে পোকে না, তবে পল্লে পিয়ে বেরাক্র বিজের Borax Bead এর মতো শব্দে বিজ গঠন করে। কাপেটি, দড়ি, টারার, প্যারাসুটের কাপড় ইত্যাদি তৈরি করতে নাইলন ব্যবহৃত হয়।

### রেয়ল

কৃতিম তন্তুর মধ্যে রেয়ল (চির ৬.০২) হলো অধান এবং প্রথম তন্তু। উত্তিঙ্গ সেলুলোজ ও প্রাপিজ পদার্থ থেকে রেয়ল তৈরি করা হয়। তিন থকাতের অধান রেয়ল হলো (১) ডিসকোস, (২) ফিউচামোলিনিয়াম এবং (৩) আগিটেট। এগুলো শুধু সুস্পর, উজ্জ্বল, মনোরম, অভিজাত এবং আকর্ষণীয় নয়, এগুলো যোটায়ুক্তি টেকসই। সবু এসিডের সাথে তেমন কোনো বিক্রিয়া করে না কিন্তু ধাতব জরণে রেয়ল সহজে বিক্রিয়া করে। অধিক উত্তাপে রেয়ল গলে যায়। তাই রেয়ল কাপড়ে বেশি পরম ইঞ্জি ব্যবহার করা যাব না।



চির ৬.০২: অণ্঵ীক্ষণ যন্ত্রের নিচে রেয়ল তন্তুর রূপ

## ৬.২.২ তন্তু থেকে সুতা তৈরি

তন্তু দিয়ে কি সরাসরি কাপড় বানানো যায়? না, যায় না। তন্তু দিয়ে প্রথমে সুতা তৈরি করা হয়, অতঃপর সেই সুতা দিয়ে কাপড় তৈরি হয়। তন্তু থেকে কোন প্রক্রিয়ায় সুতা তৈরি হবে, সেটা নির্ভর করে তন্তুর বৈশিষ্ট্যের ওপর। একেক রকমের তন্তুর জন্য একেক রকম পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়। তাহলে এখন আমরা সুতা তৈরির বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে জেনে নিই।

### তন্তু সংগ্রহ

যেকোনো ধরনের সুতা তৈরির প্রধান ধাপ হলো তন্তু সংগ্রহ, তন্তুর উৎস অনুযায়ী সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন: তুলার বেলায় গাছ থেকে কার্পাস ফল সংগ্রহ করে বীজ থেকে তুলা আলাদা করে ফেলা হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম হলো জিনিং। জিনিং প্রক্রিয়ায় পাওয়া তন্তুকে বলে কটন লিন্ট। অনেকগুলো কটন লিন্ট একসাথে বেঁধে গাঁট তৈরি করা হয়। এই গাঁট থেকেই স্পিনিং মিলে সুতা কাটা হয়।

তোমরা বল দেখি, পাট বা পাটজাতীয় (যেমন: শণ, তিসি ইত্যাদি) গাছ থেকে কী একই পদ্ধতিতে তন্তু সংগ্রহ করা যাবে? না, যাবে না। কারণ, এক্ষেত্রে বীজ থেকে তন্তু সংগ্রহ করা হয় না, তন্তু সংগ্রহ করা হয় সরাসরি গাছের বাকল থেকে। এর জন্য গাছ কেটে পাতা বরানোর জন্য প্রথমে কয়েক দিন মাঠেই একসাথে জড়ে করে রাখা হয়। এতে সাধারণত ৫-৮ দিন সময় লাগে। এলাকাভেদে জড়ে করে রাখা গাছকে চেঙ্গা বা পিল বলে। এভাবে জড়ে করে রাখার ফলে উদ্ভিদের পাতায় পচন ধরে, তাই একটু ঝাঁকুনি দিলেই সেগুলো গাছ থেকে আলাদা হয়ে যায়। তবে খেয়াল রাখতে হয় গাছের পাতা যেন পুরোপুরি পচে না যায়। তখন পচা পাতা গাছের গায়ের সাথে লেগে যায়, যা সরানো কষ্টসাধ্য। পাতা বরানোর পর গাছগুলো একসাথে আটি বেঁধে ১০-১৫ দিন পানিতে ডুবিয়ে পচানো হয়। পচে গেলে খুব সহজেই গাছ থেকে আঁশ বা তন্তু আলাদা করা যায়। গাছ থেকে আঁশ আলাদা করে পানিতে ধুয়ে সেগুলো রৌদ্রে শুকানো হয়। শুকনো আঁশ একত্রিত করে গাঁট বা বেল বাঁধা হয়। তুলার মতোই এই গাঁট বা বেল সুতা কাটার জন্য স্পিনিং মিলে নেওয়া হয়।

এবার প্রাণিজ তন্তু কীভাবে সংগ্রহ করা হয়, সেটা দেখা যাক। তোমরা আগেই জেনেছ যে রেশমি সুতা তৈরি হয় রেশম তন্তু থেকে। এক্ষেত্রে সরাসরি সুতা উৎপাদিত হয়, অন্য কোনো প্রক্রিয়ার দরকার হয় না। কৃত্রিম তন্তুর বেলাতেও কিন্তু রেশম তন্তুর মতো সরাসরি সুতা তৈরি হয়। কিন্তু উল বা পশমি সুতার জন্য দরকারি প্রাণিজ তন্তু অর্থাৎ প্রাণিজ পশম, লোম বা চুল। এগুলো সংগ্রহ করা হয় বিভিন্ন প্রাণীর শরীর থেকে কেটে নিয়ে। এভাবে প্রাণীর দেহ থেকে লোম, পশম, চুল কেটে নিলে কি তাদের বড় ধরনের ক্ষতি হয়? আসলে তেমন কোনো ক্ষতি হয় না, পশম বা লোম কেটে নেওয়ার পর কিছু দিনের মধ্যে আবার লোম গজায়, যা বড় হলে আবার কেটে সংগ্রহ করা হয়। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে একই পশুর গা থেকে বারবার পশম সংগ্রহ করা যায়। আমরা আগেই বলেছি, এভাবে সংগ্রহ করা পশম, লোম বা চুলকে ফ্লিস উল বলা হয়। এই ফ্লিস উল বস্তায় করে সুতা কাটার জন্য স্পিনিং মিলে আনা হয়।

### সূতা কাটা (Spinning)

সূতা কাটা হল স্পিনিং মিলে (চিত্র ৬.০৩)। সাধারণত একটি মিল বা কারখানার এক ধরনের তন্তু থেকে সূতা কাটা হয়। কারণ সূতা কাটার যে বিভিন্ন ধীর রয়েছে, তা একেক ধরনের তন্তুর জন্য একেক রূকম। এজন্য ডিম্ব ডিম্ব তন্তু থেকে তৈরি সূতার কারখানাও আলাদা। তবে তন্তুভেদে সূতা কাটার পদ্ধতিতে ডিম্বতা থাকলেও কিছু কিছু মিশণ আছে। এখন আমরা তন্তু থেকে সূতা কাটার পদ্ধতিগুলো সকলেকে জেনে নিই।

### ড্রেভিং ও বিভিন্ন

কারখানায় আনা তন্তুর বেল বা গাঁট ড্রেভিং রূমে নিয়ে প্রথম খুলে ফেলা হয়। এরপর বিশেষ ঘরের সাহায্যে এক সাথে গুঁজাকারে থাকা তন্তুকে তেজে ব্যথাসহ্য ছোট ছোট গুঁজে পরিণত করা হয়। এ সময় তন্তুর সাথে থাকা ঘরলার ছোট ছোট টুকরা, বীজ বা পাতার ভাঙ্গা কোনো অংশ ইত্যাদিও দূর করা হয়। এরপর বিভিন্ন রূকম তুলার একটি মিশ্রণ তৈরি করা হয়। এই মিশ্রণ তৈরি করা হয় কেন? তার কারণ হলো, শুধু এবং মানে ঠিক একই রূকম তুলা সব সময় পাওয়া সহজ হয় না। বিভিন্ন রূকম তুলার মিশ্রণ না করলে একেক সময় একেক রূকম সূতা তৈরি হবে, কখনো আলো, কখনো মন অর্থাৎ সূতার মান এক হবে না। আছাড়া বিভিন্ন রূকম তুলা মিশিয়ে সূতা তৈরি করলে উৎপাদন খরচও কম হয়। এটি বাংলাদেশের জন্য বেশি প্রযোজ্ঞ। কারণ এখানে বাধিক্ষিকভাবে তুলার উৎপাদন হয় না বলেই চলে। বেশির ভাগ তুলা বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করতে হয়। একেক দেশের তুলার মানও একেক রূকম হয়। একই রূকম তুলার বোগান পাওয়া বাস্তবে প্রায় অসম্ভব। এজন্য বিভিন্ন রূকম তুলা সংগ্রহ করে সেগুলোর মিশ্রণ তৈরি করা হয়। বেল বা গাঁট থেকে তুলার এই মিশ্রণ তৈরিই হলো ড্রেভিং এবং বিভিন্ন। তবে পাট তন্তুর বেলায় এই প্রক্রিয়াকে ব্যাটিং (Batching) বলে।

### কার্ডিং ও কমিং (Carding & Combing)

সূতা কাটার প্রতীক্রি ধাপ হলো কার্ডিং ও কমিং।

তুলা, লিনেন, পশম—এসব তন্তুর বেলায় এই ধাপটি প্রয়োগ করা হয়। তন্তুর বৈশিষ্ট্য ও দৈর্ঘ্য অনুযায়ী কার্ডিং এবং কমিংয়ের কাছে ব্যবহৃত যত্ন ঠিক করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় ব্যবহার অনুপযোগী অতি ছোট তন্তু বাদ দেওয়া হয় এবং খুলাবালি বা ঘরলার কণা থাকলে সেগুলোও দূর করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুধু কার্ডিং করলেই চলে। তবে মিহি মসৃণ ও সবু সূতা তৈরি করতে হলে কমিং দরকার হয়। লিনেন তন্তুর জন্য বিশেষ



চিত্র ৬.০৩: স্পিনিং মিলে সূতা তৈরি

ধরনের কম্বিং করা হয়, যা হেলকিং নামে পরিচিত। হেলকিং করলে সুতা অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং মিহি হয়। কার্ডিং ও কম্বিং করে প্রাপ্ত তন্তু পাতলা আস্তরের মতো হয় এবং এটিকে স্লাইভার (Sliver) বলে। এ স্লাইভার পাকালেই সুতা তৈরি হয়। পাকানোই হলো মূলত স্পিনিং। এ পর্যায়ে স্লাইভারকে টেনে ক্রমশ অধিকতর সরু করা হয়। একসময় স্লাইভারের শেষ প্রান্তে মাত্র কয়েক গোছা তন্তু বিদ্যমান থাকে। এভাবে পরিবর্তিত স্লাইভারকে মোচড়ানো হয় বা পাক দেওয়া হয়। স্লাইভারকে টেনে সরু করার প্রক্রিয়া হলো রোডিং আর টুইস্টিং (Twisting)। স্লাইভারকে পাক দেওয়া বা মোচড় দেওয়ার ফলে তন্তুগুলো একে অন্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে লেগে যায় এবং সুতায় পরিণত হয়। পাকানো কিংবা মোচড় কর-বেশি করে সুতা শক্ত বা নরম করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই মোচড় বেশি দিলে সুতা বেশি শক্ত হয়, তবে মোচড় অতিরিক্ত হলে সুতা ছিঁড়ে যেতে পারে। পাকানো বা মোচড়ের পরিমাণ নির্ভর করে মূল তন্তুর বৈশিষ্ট্যের উপর। সাধারণত লম্বা তন্তুর বেলায় (যেমন: পাট বা লিনেন) তুলনামূলকভাবে বেশি মোচড় দিতে হয়। টুইস্ট কাউন্টার (Twist Counter) নামের একধরনের যন্ত্রের সাহায্যে এ কাজ করা হয়।

### রেশম তন্তু থেকে রেশম সুতা তৈরি

রেশম পোকা থেকে তৈরি হয় একধরনের গুটি। একে কোকুন (Cocoon) বলে। পরিণত কোকুন বা গুটি সাবান পানিতে লোহার কড়াইয়ে সেদ্ধ করা হয়। এতে কোকুনের ভেতরকার রেশম পোকা মরে যায় এবং গুটি কেটে বের হয়ে রেশমের গুটি নষ্ট করতে পারে না। সিদ্ধ করার কারণে কোকুন নরম হয়ে যায় এবং উপর থেকে খোসা খুব সহজেই আলাদা হয়ে যায়। খোসা উঠে গেলে রেশমি তন্তুর প্রান্ত বা নাল পাওয়া যায়। এই নাল ধরে আস্তে আস্তে টানলে লম্বা সুতা বের হয়ে আসে (চিত্র ৬.০৪)। চিকন বা মিহি সুতার জন্য ৫-৭টি কোকুনের নাল আর মোটা সুতার জন্য ১৫-২০টি কোকুনের নাল একত্রে করে টানা হয়। এ কাজে চরকা ব্যবহার করা হয়। ছবিতে চরকার সাহায্যে কোকুন থেকে সুতা তৈরি দেখানো হয়েছে। নালগুলো একত্রিত করলে এদের গায়ে লেগে থাকা আঠার কারণে একটি আরেকটির সাথে লেগে গিয়ে সুতার গোছা তৈরি হয়।

### কৃত্রিম তন্তু থেকে সুতা তৈরি

কৃত্রিম তন্তু থেকে সুতা তৈরির পদ্ধতি প্রায় সব তন্তুর ক্ষেত্রে একই রকম। একের অধিক ক্ষুদ্র আঁশ ও উপযুক্ত দ্রবকের সাহায্যে ঘন ও আঠালো দ্রবণ তৈরি করা হয়। এই দ্রবণ হলো স্পিনিং দ্রবণ। এই স্পিনিং দ্রবণকে স্পিনারেট (চিত্রে) নামক বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে উচ্চ চাপে প্রবাহিত করা হয়। দ্রবণকে জমাট বাঁধানোর জন্য এর সাথে প্রবাহিত উপযুক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। এতে স্পিনারেট থেকে সুতার দীর্ঘ নাল বের হয়ে আসে, যা সরাসরি ব্যবহারযোগ্য। এই সুতা কাপড় তৈরি বা বয়নের কাজে ব্যবহার করা হয়।



চিত্র ৬.০৪: মেশিন তন্ত্র থেকে সুতা তৈরি

### বিভিন্ন ধরনের সুতার বৈশিষ্ট্য

সব ক্ষেত্রে দেখা সেছে যে সুতার বৈশিষ্ট্য তার তন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অভে। তোমরা যেহেতু তন্ত্র বৈশিষ্ট্য জেনেছ, তাই নিচেরই সুতার বৈশিষ্ট্য কেবল হবে সেটি বুঝতে পারছ।



### অনুসন্ধান

**কাজ:** তাপ প্রয়োগ করে বিভিন্ন পকার সুতার বৈশিষ্ট্য নির্ণয়।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ:** সিল্ক, উল, সুতি কাপড়, পলিস্টার কাপড়, নাইলন ইত্যাদি কাপড় বা সুতা, একটি মোমবাতি ও দিয়াশলাই।

**পদ্ধতি:** দিয়াশলাই দিয়ে মোমবাতি ঢালাও। এবার একে একে কাপড় বা সুতা দিয়ে নিয়ে পুড়িয়ে দেখ কী ধরনের পরিবর্তন ঘটে। সুতি কাপড়ের বেলায় কী ঘটে? কাপড় খুব দ্রুত শুকে পেল। কোনো গুরু পাওয়া গেল কি? হ্যাঁ, কাপড় পোড়ালে যে রকম গুরু পাওয়া যায়, অনেকটা সে রকম গুরু পাওয়া গেল। কারণ হলো, কাপড়ের বেলন সেলুলোজ থাকে, তাহলো দিয়ে তৈরি সুতি কাপড়েও তা থাকে। আর সে কারণেই একই রকম গুরু পাওয়া যায়। নাইলন পুড়িরে কী দেখলো? সুতি

কাপড়ের মতো এটিও কি দ্রুত পুড়ে গেল? না, অতটী দ্রুত পুড়ল না, ধীরে ধীরে পুড়ল। পোড়া শেষে একটি গুটির মতো তৈরি হলো, যা সুতি কাপড়ের বেলায় হয়নি। আবার কাগজ পোড়ানোর মতো গন্ধও পাওয়া গেল না, কারণ নাইলন সেলুলোজ থেকে তৈরি হয় না। এভাবে তোমরা সবগুলো কাপড় ও সুতার বৈশিষ্ট্য টেবিল করে খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

## ৬.৩ রাবার ও প্লাস্টিক

### ৬.৩.১ রাবার

তোমরা পেনসিলের লেখা মোছার জন্য যে ইঁরেজার ব্যবহার কর, সেটি কী ধরনের বস্তু জান? এটি হলো রাবার। সাইকেল, রিস্ক্রা বা অন্যান্য গাড়ির টায়ার, টিউব, জন্মদিনে ব্যবহৃত বেলুন— এসবই রাবারের তৈরি। পানির পাইপ, সার্জিক্যাল মোজা, কনভেয়ার বেল্ট, রাবার ব্যান্ড, বাচ্চাদের দুধ খাওয়ানোর নিপল— এগুলোও রাবারের তৈরি সামগ্রী। তাহলে দেখতেই পাচ্ছ, রাবার এবং রাবারজাত পণ্যসামগ্রী আমাদের জীবনের অনেক কাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এবার তাহলে রাবার সম্পর্কে আরো একটু বিস্তারিতভাবে জেনে নেওয়া যাক।

#### রাবারের ভৌত ধর্ম

প্রাকৃতিক রাবার পানিতে অদ্রবণীয় একটি অদানাদার কঠিন পদার্থ। রাবার কিছু কিছু জৈব দ্রাবক, যেমন: এসিটোন, মিথানল— এগুলোতে অদ্রবণীয় হলেও টারপেন্টাইন, পেট্রোল, ইথার, বেনজিন এগুলোতে সহজেই দ্রবণীয়। রাবার সাধারণত সাদা বা হালকা বাদামি রঙের হয়। রাবার একটি স্থিতিস্থাপক পদার্থ অর্থাৎ একে টানলে লস্বা হয় এবং ছেড়ে দিলে আগের অবস্থায় ফিরে যায়। বেশিরভাগ রাবারই তাপ সংবেদনশীল অর্থাৎ তাপ দিলে গলে যায়। বিশুদ্ধ রাবার বিদ্যুৎ এবং তাপ কুপরিবাহী। তবে আজকাল বিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে তৈরি বিদ্যুৎ পরিবাহী রাবার আবিষ্কার করেছেন।

#### রাবারের রাসায়নিক ধর্ম

তোমরা জান, প্রায় প্রতিটি পদার্থ তাপ দিলে আয়তনে বাড়ে। কিন্তু রাবারের বেলায় ঠিক উল্টোটি ঘটে অর্থাৎ তাপ দিলে রাবারের আয়তন কমে যায়।

রাবারের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক ধর্ম হলো এটি বেশ কিছু রাসায়নিক পদার্থ, যেমন- দুর্বল ক্ষার, এসিড, পানি এগুলোর সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে না। যে কারণে কোনো কিছু রক্ষা করার জন্য প্রলেপ দেওয়ার কাজে এটি ব্যবহৃত হয়।

তোমরা কি খেয়াল করে দেখেছ, রাবার দীর্ঘদিন রেখে দিলে কী ঘটে? সেটি ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়।

এর কারণ হলো, রাবার বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে। অক্সিজেন ছাড়াও আরও কিছু রাসায়নিক পদার্থ, বিশেষ করে ওজোন ( $O_3$ ) প্রাকৃতিক রাবারের সাথে বিক্রিয়া করে, যার কারণে রাবার ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়।

### ৬.৩.২ প্লাস্টিক

প্লাস্টিক শব্দের অর্থ হলো সহজেই ছাঁচযোগ্য। নরম অবস্থায় প্লাস্টিক ইচ্ছামতো ছাঁচে ফেলে সেটা থেকে নির্দিষ্ট আকার-আকৃতি বিশিষ্ট পদার্থ তৈরি করা যায়। আমরা বাসাবাড়িতে নানা রকম প্লাস্টিক সামগ্রী ব্যবহার করছি। মগ, বালতি, জগ, মেলামাইনের থালা-বাসন, পিভিসি পাইপ, বাচ্চাদের খেলনা, গাড়ির সিটবেল্ট, এমনকি আসবাবপত্র সবকিছুই প্লাস্টিকের তৈরি। তোমরা জান যে এগুলো সবই পলিমার পদার্থ। এবাবে প্লাস্টিকের ধর্ম সমর্কে একটুখানি জেনে নেওয়া যাক।

#### প্লাস্টিকের ভৌত ধর্ম

প্লাস্টিক কি পানিতে দ্রবীভূত হয়? না, হয় না। বেশির ভাগ প্লাস্টিকই পানিতে অন্দরবণীয়। প্লাস্টিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম হলো এরা বিদ্যুৎ এবং তাপ পরিবহন করে না। তাই বিদ্যুৎ এবং তাপ নিরোধক হিসেবে এদের বহুল ব্যবহার রয়েছে। প্লাস্টিকের সবচেয়ে বড় ধর্ম হলো গলিত অবস্থায় এদেরকে যেকোনো আকার দেওয়া যায়। এই সুবিধার কারণেই এটি নানাবিধি কাজে ব্যবহৃত হয়। তাপ দিলে প্লাস্টিকে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটে? পলিথিন, পিভিসি পাইপ, পলিস্টার কাপড়, বাচ্চাদের খেলনা—এসব প্লাস্টিক তাপ দিলে নরম হয়ে যায় এবং গলিত প্লাস্টিক ঠাণ্ডা করলে শক্ত হয়ে যায়। এভাবে যতবারই এদেরকে তাপ দেওয়া যায়, এরা নরম হয় ও ঠাণ্ডা করলে শক্ত হয়। এগুলোকে থার্মোপ্লাস্টিকস (Thermoplastics) বলে।

অন্যদিকে মেলামাইন, বাকেলাইট (যা ফ্রাইং প্যানের হাতলে এবং বৈদ্যুতিক সকেটে ব্যবহার করা হয়) এগুলো তাপ দিলে নরম হয় না বরং পুড়ে শক্ত হয়ে যায়। এদেরকে একবাবের বেশি ছাঁচে ফেলে নির্দিষ্ট আকার দেওয়া যায় না। এই সকল প্লাস্টিককে থার্মোসেটিং প্লাস্টিকস (Thermosetting Plastics) বলে।

#### প্লাস্টিকের রাসায়নিক ধর্ম

বেশির ভাগ প্লাস্টিক রাসায়নিকভাবে যথেষ্ট নিষ্ক্রিয়। তাই বাতাসের জলীয় বাষ্প ও অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে না এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। এমনকি পাতলা এসিড বা ক্ষারের সাথেও প্লাস্টিক বিক্রিয়া করে না। তবে শক্তিশালী ও ঘনমাত্রার এসিডে কিছু কিছু প্লাস্টিক দ্রবীভূত হয়ে যায়। প্লাস্টিক সাধারণত দাহ্য হয় অর্থাৎ এদেরকে আগুন ধরালে পুড়তে থাকে এবং প্রচুর তাপশক্তি উৎপন্ন করে।

প্লাস্টিক কি পচনশীল? না, প্লাস্টিক পচনশীল নয়। দীর্ঘদিন মাটি বা পানিতে পড়ে থাকলেও এসব পচে না। অবশ্য বর্তমানে বিজ্ঞানীরা পচনশীল প্লাস্টিক আবিষ্কার করেছেন, সেগুলো বিশেষ কাজে ব্যবহৃত হয়। হাত-পা কেটে গেলে বা মেডিক্যাল অপারেশনে সেলাইয়ের কাজে যে সুতা ব্যবহৃত হয়। সেগুলো এক ধরনের পচনশীল প্লাস্টিক।

প্লাস্টিক পোড়ালে অনেক ক্ষতিকর পদার্থ তৈরি হয়। যেমন: পিভিসি পোড়ালে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl) নিঃসৃত হয়। আবার পলিইউরেথেন (Polyurethane) প্লাস্টিক (যা আসবাবপত্র, যেমন: চেয়ার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়) পোড়ালে কার্বন মনোআইড গ্যাস এবং হাইড্রোজেন সায়ানাইডের মতো বিষাক্ত গ্যাস তৈরি হয়।

### ৬.৩.৩ পরিবেশের ভারসাম্যহীনতায় রাবার ও প্লাস্টিক

তোমরা জেনেছ যে বেশির ভাগ প্লাস্টিক এবং কৃত্রিম রাবার পচনশীল নয়। এর ফলে পুর্ববর্ধন না করে বর্জ্য হিসেবে ফেলে দিলে এগুলো পরিবেশে জমা হতে থাকে এবং নানা রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তোমরা কি খেয়াল করে দেখেছ ঢাকা বা অন্যান্য শহরের বেশির ভাগ নর্দমার নালায় প্রচুর প্লাস্টিক বা রাবার জাতীয় জিনিস পড়ে থাকে? এগুলো জমতে জমতে একপর্যায়ে নালা নর্দমা বন্ধ হয়ে পানির প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে দেখা যায়, সামান্য বৃষ্টিপাত হলেই রাস্তায় পানি জমে জলাবন্ধতা সৃষ্টি হয়, যা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে। একইভাবে প্লাস্টিক এবং বর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে ব্যবস্থাপনা না করায় এর বড় একটি অংশ নদ-নদী, হ্রদ বা জলাশয়ে গিয়ে পড়ে। এভাবে জমতে থাকলে একসময় নদীর গভীরতা কমে যায়, যা নাব্যতার জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। আবার ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক বা রাবারের বর্জ্য অনেক সময় মাটিতে থাকলে তা মাটির উর্বরতা নষ্ট করতে পারে। ফেলে দেওয়া এসব বর্জ্য অনেক সময় গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি পশুর খাবারের সাথে মিশে তাদের পাকস্থলীতে যায় এবং এক পর্যায়ে সেগুলো মাংস ও চর্বিতে জমতে থাকে। এমনকি নদ-নদী, খাল-বিলে ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক/রাবার বর্জ্য খাবার গ্রহণের সময় মাছের দেহেও প্রবেশ করতে পারে এবং সেখানে জমা হতে থাকে। আমরা সেই মাছ, মাংস খেলে শেষ পর্যন্ত সেগুলো আমাদের দেহে প্রবেশ করে, যা ক্যান্সারের মতো মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

তাহলে এটি স্পষ্ট যে প্লাস্টিক ও রাবার সামগ্রী সঠিক ব্যবস্থাপনা না করলে তা মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয় ঘটিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে। তাই প্লাস্টিক আর রাবার সামগ্রী যতবার সম্ভব নিজেরা পুনরায় ব্যবহার করতে হবে এবং অন্যদেরও ব্যবহারে উদ্বৃদ্ধ করতে হবে। ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়লে যেখানে-সেখানে ফেলে না দিয়ে একসাথে জড়ে করে রাখতে হবে। এভাবে জড়ে করা সামগ্রী বিক্রি করা যায়। এতে একদিকে যেমন পরিবেশ সংরক্ষিত হবে, অন্যদিকে তেমনি অর্থনৈতিকভাবেও লাভবান হওয়া যায়। বিক্রি করার সুযোগ না থাকলে— এটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

## অনুশীলনী



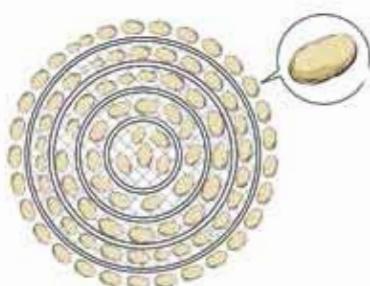
### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন বয়সের তন্ত্র জন্য হেলকিং করা অনুমতি?

- (ক) পাট
- (খ) পলম
- (গ) রেশম
- (ঘ) শিলেন

২. পাশের চিত্রে উৎপাদিত তন্ত্রটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি

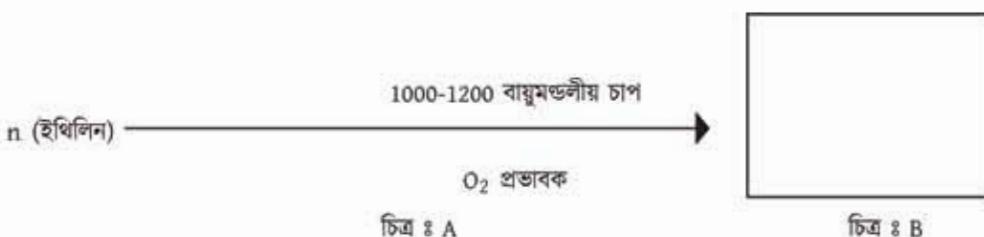
- (ই) বেশ যিহি
- (উ) খুব সম্ভা
- (ঢ) ভুত গরম হয়



নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) I ও II
- (খ) I ও III
- (গ) II ও III
- (ঘ) I, II ও III

পরের চিত্রটি থেকে ৩ ও ৪ মং অঞ্জের উন্তৰ সাথে:



৩. B চিত্রে উৎপাদিত তন্ত্রটি কী?

- (ক) রেজিন
- (খ) পলিথিন
- (গ) মেলামাইন
- (ঘ) আসবেস্টিস

৪. B চিত্রে উৎপাদিত তন্ত্রটির সাথে কোনটির সাদৃশ্য রয়েছে?

- (ক) সিলিকের
- (খ) পশমের
- (গ) উলের
- (ঘ) পলিস্টারের



## স্মজনশীল প্রশ্ন

১. আরএছ জানুয়ারি মাসের এক সকালে স্কুলে যাচ্ছিল। শৈতান নিরাবরণের জন্য সে একটি সূতি শার্টের উপর আর একটি সূতি শার্ট পরল। সে শক করল তাতেও তার বেশ ঠাঢ়া আগছে। কিন্তু তার মনে হলো তিনি আস আপে সে যখন শুধু একটি শার্ট পরেই স্কুলে যেত, তখন এ ধরনের কোনো সমস্যা হতো না।

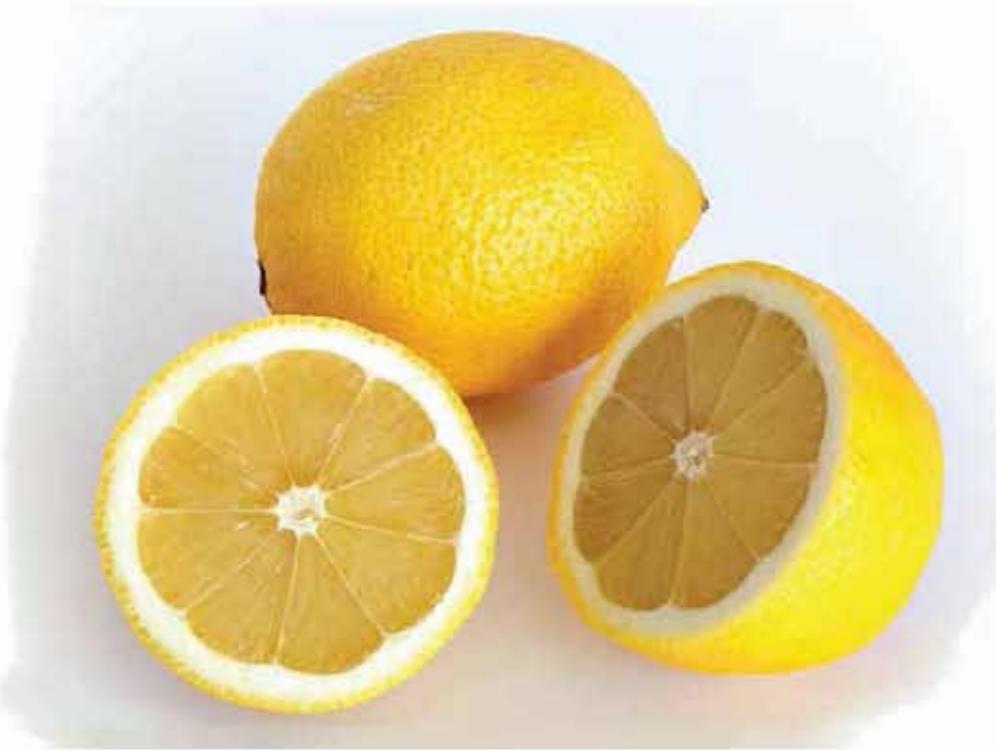
- (ক) নল সেলুলোজিক ডগ্রু কাকে বলে?
- (খ) পিলেনকে কেন প্রাকৃতিক তন্তু বলা হয়?
- (গ) আরএছ কোন ধরনের কাপড় পরা দরকার হিল? ব্যাখ্যা কর।
- (ঘ) একই কাপড়ে দুই সময় দুই ধরনের অনুভূতি দাগার কারণ বিশ্লেষণ কর।

২. মিলন সাহেবের একটি পিভিসি পাইপ তৈরির কারখানা আছে। তিনি ইমল ও মাঝুনকে কাঁচামাল সরবরাহ করতে বললেন। ইমল মে কাঁচামাল সরবরাহ করল সেতি প্রিভিস্কুপক এবং অলিঙ্গেন ও অলীর বাল্পের সাথে বিক্রি করে। আবার মাঝুনের সরবরাহকৃত কাঁচামালের কৌতু পুর হচ্ছে পলিত অবস্থায় এটিকে বেকোনো আকার দেওয়া যায়। আসারনিকভাবে এটি নিষ্ক্রিয়। তবে সূতি কাঁচামালই আটিকে অগ্রচলনী।

- (ক) মনোমারী কী?
- (খ) মেলামাইনকে কেন পলিমার বলা হয়?
- (গ) ইমল ও মাঝুনের সরবরাহকৃত কাঁচামালগুলো কীভাবে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে? ব্যাখ্যা কর।
- (ঘ) পিভিসি পাইপ তৈরিতে মিলন সাহেবের কোন কাঁচামালটি ব্যবহার করা উচিত বলে ফুমি মনে কর?

## সপ্তম অধ্যায়

# অম্ল, ক্ষারক ও লবণের ব্যবহার



অষ্টম প্রেশিতে তোমরা অম্ল, ক্ষার ও লবণ কী ধরনের রাসায়নিক পদার্থ তার একটা আধিক ধারণা পেয়েছ। এই অধ্যায়ে আমরা অম্ল বা এসিড, ক্ষার ও লবণ সম্পর্কে আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা করব। এগুলো কীভাবে আমাদের দেহাদিন কিংবা কর্মজীবনে ব্যবহার হয়, সেটার একটা ধারণা দেওয়া হবে। অম্ল ও ক্ষারের পরিমাপের ছল্য pH বলে একটি শুলুম্পূর্ণ বিষয় আছে, এই অধ্যায় শেষে আমরা সেটি সম্পর্কেও ধারণা পেয়ে যাব।



### এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- পদ্ধতিগতি ও দুর্বল এসিডের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব।
- প্রাত্যহিক জীবনে এসিডের ব্যবহার এবং সাবধানতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- এসিড অণ্যবস্থারের সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- নির্মলক ব্যবহার করে বিভিন্ন বস্তুর অঙ্গস্ত ও ক্ষারস্ত চিহ্নিত করতে পারব (লিটুমাস, পুরো প্রেসিটে তেরিকৃত ফুল, সবজির নির্ধারণের সাহায্যে)।
- পাকস্বলীতে এসিডিটির কারণ এবং সঠিক খাদ্য নির্বাচন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পদার্থের pH -এর মান জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ক্ষারফের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাত্যহিক জীবনে ক্ষারের প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যবহারের সাবধানতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রশমনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাত্যহিক জীবনে প্রশমনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- লবণের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাত্যহিক জীবনে লবণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরীক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার লবণ তৈরি করতে পারব।  
(খাদ্য + এসিড, খাদ্য অক্সাইড+এসিড)
- আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অম, ক্ষার ও লবণের অবদানকে প্রশংসন করব।

## ৭.১ এসিড

### ৭.১.১ শক্তিশালী ও দুর্বল এসিড

অট্টয় প্রেগিতে তোমরা বেশ কিছু জৈব এসিডের নাম জেনেছ। তোমরা এটাও জেনে গোছ যে এসিডগুলো পানিতে হাইড্রোজেন আয়ন ( $H^+$ ) তৈরি করে। তবে মজার ব্যাপার হলো, কিছু কিছু এসিড, বিশেষ করে জৈব এসিডগুলো কিন্তু পানিতে পুরোপুরিভাবে বিয়োজিত না হয়ে আঁশিকভাবে বিয়োজিত হয়। অর্থাৎ যতগুলো এসিডের অনু ধাকে তার সবগুলো হাইড্রোজেন আয়ন ( $H^+$ ) তৈরি করে না। সে জন্য এই এসিডগুলোকে দুর্বল এসিড বলে (চিত্র ৭.০১)। পক্ষান্তরে, বিনাই এসিডগুলো পানিতে পুরোপুরি বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন ( $H^+$ ) তৈরি করে। অর্থাৎ যতগুলো এসিডের অনু ধাকে, তার সবগুলোই বিয়োজিত হয়।

তবে কিছু এসিড আছে, যেমন: কার্বনিক এসিড ( $H_2CO_3$ ), যেটি জৈব এসিড না হলেও দুর্বল এসিড।



চিত্র ৭.০১: দুর্বল ও শক্তিশালী এসিড

দুর্বল এসিড	শক্তিশালী এসিড
এসিটিক এসিড ( $CH_3COOH$ )	সালফিউরিক এসিড ( $H_2SO_4$ )
সাইট্রিক এসিড ( $C_6H_8O_7$ )	নাইট্রিক এসিড ( $HNO_3$ )
অক্সালিক এসিড ( $HOOC-COOH$ )	হাইড্রোক্লোরিক এসিড ( $HCl$ )

## ৭.৩.২ প্রাক্তনিক জীবনে এসিডের ব্যবহার ও সাবধানতা

তোমরা কি জান, বোলতা বা বিজ্ঞু হুল কুটালে প্রচন্ড ঝালা  
করে কেন? এর কারণ হলো বোলতা এবং বিজ্ঞুর হুলে থাকে  
হিস্টামিন (Histamine) নামে এক ধরনের ক্ষারক পদার্থ।  
তাই এসব ক্ষেত্রে ঝালা নিবারণের অন্য যে মাত্র ব্যবহার  
করা হয়, তাতে থাকে ভিনেগার অথবা বেকিং সোজা, যেগুলো  
এসিড কিংবা এসিড—জাতীয়। এগুলো এই ক্ষারকের সাথে  
বিক্রিয়া করে সেগুলো নিষ্কাশ করে; ফলে ঝালা আর থাকে না।

আবার আমরা প্রায় সবাই সাধারণত মাংস, পোকাও, বিরিয়ানি  
এ ধরনের খাবার খাওয়ার পর কোনো ধরনের কোমল পানীয়  
পান করি। এটা কি আমাদের কোনো কাজে আসে? আসলে খাবার রকম করার জন্য আমাদের  
পাকস্থলীতে নির্দিষ্ট মাঝারি হাইড্রোক্সেরিক এসিডের প্রয়োজন হয়। এই মাঝারি হেরফের হলে আমাদের  
পরিপাকে অসুবিধা হয়। কোমল পানীয়গুলো অস্পন্দিত এসিডিক, তাই গুরুপাক খাবার পর কোমল  
পানীয় আমাদের পরিপাকে সাহায্য করে।

অটম প্রেশিতে তোমরা জেনেছ যে সেবু, কমলা, আপেল, পেরারা, আমলকী ইত্যাদি নানা রকম ফলের  
মাঝে আছে নানা রকমের জৈব এসিড, যেগুলো আমাদের খুবই প্রয়োজনীয়। আবার কিছু কিছু এসিড  
আছে, যে গুলো গোগ প্রতিরোধ করে। যেমন ভিটামিন সি বা এসক্রিবিক এসিড। তোমরা কি জান,  
ভিটামিন সি ক্ষত সারাতে খুবই সহায়ক হিসেবে কাজ করে এবং আমাদের শরীরে এর অভাবে ক্ষার্তি  
গোগ হয়?



চিত্র ৭.৩.৩: বোরহানি বা দই খেল  
এতে বিস্তৰান শ্যাকটিক এসিড  
হলে নহায়তা করে।



চিত্র ৭.৩.৪: আচার সংরক্ষণে  
ভিনেগার ব্যবহার করা হয়

আম, জলপাই ইত্যাদি নানা রকম আচার (চিত্র ৭.৩.২)  
সংরক্ষণে কী এসিড ব্যবহার করা হয় সেটি কি  
তোমরা জান? এটি হলো ভিনেগার বা এসিটিক এসিড  
( $\text{CH}_3\text{COOH}$ )। বিরেবাড়িতে দাওয়াত খাওয়ার পর  
বোরহানি বা দই খেলে কোনো সাড হব কি? হ্যাঁ, সাড  
হব। কোমল পানীয়ের মতো বোরহানি (চিত্র ৭.৩.৩)  
বা দই খেলে এতে বিস্তৰান শ্যাকটিক এসিড হজমে  
সহায়তা করে।

তোমরা কি জান, কেক, বিস্কুট বা পাউরুটি কোলানো  
হব কীভাবে? এটি করা হয় বেকিং সোজা ব্যবহার করে।



তাপ নিলে বেকিৎ সোজা ভেঁড়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়, যেটি কেক বা পাটভূটিকে ফুলিয়ে তোলে।

আমরা ট্যালেট পরিষ্কার করার জন্য বেসর পরিষ্কারক ব্যবহার করি, তার মূল উপাদান কী তোমরা জান? এর মূল উপাদান হলো শক্তিশালী এসিড, যেমন  $\text{HCl}$ ,  $\text{HNO}_3$  কিংবা  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ।

সৌর শান্তিলে তৈরি সৌরবিদ্যুৎ সংরক্ষণের জন্য, বা বাসাৰডিতে আইপিএস (IPS) চালানের জন্য এবং গাড়িতে থেক্টারি ব্যবহার করা হয়, তার অত্যাৰশ্যকীয় একটি উপাদান হলো সালফিউনিক এসিড।

তোমরা জান বে, কমল উৎপাদনের জন্য সার হলো অতি শক্তিশালী একটি জিনিস। সার হিসেবে আমরা যেগুলো ব্যবহার করি তার অন্তর্মান হলো অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ( $\text{NH}_4\text{NO}_3$ ), অ্যামোনিয়াম সালফেট ( $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ ) ও অ্যামোনিয়াম ফসফেট ( $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$ ), আর সার কারখানার এগুলো তৈরি করা হয় ব্যাক্সেমে নাইট্রিক এসিড ( $\text{HNO}_3$ ), সালফিউনিক এসিড ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) এবং ফসফরিক এসিড ( $\text{H}_3\text{PO}_4$ ) দিয়ে।

তাহলে দেখা যাচ্ছ, আমাদের প্রাণ্যাতিক জীবনের সাথে প্রত্যোজ্ঞাবে জড়িয়ে আছে নানা রুকম এসিড। তাই আমাদের জীবনে এসিডের ভূমিকা অপরিসীম ও অনন্বীক্ষণ। তবে কিছু কিছু এসিড, বিশেষ করে শক্তিশালী এসিডগুলো (যেমন  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{HNO}_3$ ,  $\text{HCl}$ ) মানবদেহের জন্য যেমন আর্দ্ধাত্মক ক্ষতিকর, তেমনি আমাদের অনেক প্রয়োজনীয় এবং নিজস্বব্যবহার জিনিসগুলোও অনেক ক্ষতি করে। আমাদের শরীরে কোথাও শাগলে সেই স্থান পুড়ে যাব এবং সেখানে মার্দাত্মক ক্ষতি সৃষ্টি করে। তোমরা হয়তো এসিড ছুঁড়লে মানুষের শরীর কীভাবে বলতে যাব সেগুলো পরিকায় বা টেলিভিশনের খবরে দেখেছ। অন্যদিকে এসিড কাপড়ে শাগলে কাপড়ও পুড়ে যাব কিন্বা ছিঁড় হয়ে যায়। একইভাবে ধাতব গোর্জসমূহ এসিডের সংশর্পণে এলে তাও ক্ষতি হয়ে যাব। অতএব এসিডের ব্যবহারে আমাদের খুবই সাবধান হতে হবে। কোনো কারণে পারে এসিড পড়লে সাথে থাকুন পানি দিয়ে সেই জায়গাটা খুঁয়ে ফেলতে হবে।



### সমগ্র কাজ

**কাজ:** মাটির অম্লক বা ক্ষারক দেখা (চিত্র ৭.০৪)।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ:** ১টি বিকার কিংবা কাচের বোতল, কিছু মাটি, জাল ও নীল লিটমাস ফাগজ, ফুলের নির্যাস, নাড়িনি, পানি, চিমটা।

**পদ্ধতি:** বিকারে বা কাচের বোতলে কিছু মাটি নিয়ে (১০০ গ্রাম) ১০-২০ মিলিলিটার (কয়েক চামচ) পানি ঘোল কর। নাড়িনি দিয়ে খুব ভালোভাবে নাড়া দাও। চিমটা দিয়ে প্রথমে নীল

লিটোমাস কাগজ বিকারের মিশ্রণে ছুবাও। কিছু সময় অপেক্ষা কর। তালানি জমা হলে লিটোমাস কাগজের রং পরিবর্তন খাতার লিখে রাখ।

যদি লিটোমাস পেপার সংগ্রহ করতে না পার তাহলে মূলের নির্যাস দিয়েও এই পরীক্ষাটি করতে পার। এবার তোমরা আসের প্রস্তিতে তৈরি করা নির্যাস থেকে একে টেস্টচিউবে নিয়ে বিকারের মিশ্রণে যোগ করে দেখ নির্যাসের রং কীভাবে পরিবর্তন হয়। মাটি অঢ়ীয়, কাঁচীয় বা নিরশেক—তিনি রকমেরই হতে পারে এবং এটি মূলত নির্ণয় করে এতে কী ধরনের রাসায়নিক পদার্থ বিদ্যমান তার উপর।



চিত্র ৭.০৪: মাটির অস্ত্র বা কারছ মেথো।

### ৭.১.৩ এসিডের অপ্রযুক্তির, আইনকানুন ও সামাজিক প্রভাব

পৃষ্ঠিবীর সকল সমাজেই এক-দুইজন খারাপ/নিষ্ঠুর চরিত্রের মানুষ (চিত্র ৭.০৫) থাকে—আমাদের সমাজেও আছে। তারা নিজের প্রতিহিস্তা যোটাতে অন্য মানুষের শরীরে এসিড ছুড়ে মারার মতো ভয়ানক অপরাধ করতে পারে। এসিড ছুড়ে মারার ফলে মানুষের শরীর সক্রূর্প বলসে যাব। মুখমণ্ডলে এসিড ছুড়লে সেটি বিকৃত আকার ধারণ করে। এ কারণে যারা এসিড-সজ্বাসের শিকার হল, তারা তাদের বিকৃত চেহারা নিয়ে জনসমূহে আসতে চায় না, এমনকি অনেক হেয়ে তারা আস্থাহ্যার পথে বেছে নেয়। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, যারা এসিড-সজ্বাসের শিকার হয়, তাদের বেশির ভাগই স্কুল—কলেজের ছাত্রী বা পৃথিবী। এসিড-সজ্বাসের কারণে এই সম্পর্কনাময় ও মেধাবী ছাত্রীদের পড়াশোনা সক্রূর্প বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আবার পৃথিবীর এর শিকার হলে পুরো পরিবারে নেমে আসছে সুর্বিধ জীবন। তাই এসিড-সজ্বাসের বিরুদ্ধে আমাদের সোচার হতে হবে এবং মানুষকেও এ ব্যাপারে সচেতন করতে হবে।

### ৭.১.৪ এসিড ছুড়লে শান্তি

এসিড ছোঢ়া একটি মারুচক অপরাধ। বাংলাদেশ নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ১৯৯৫ অনুযায়ী এসিড ছোঢ়ার শান্তি ঘাবজীবন কারাদণ্ড থেকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। যে এসিড ছোঢ়ে, সে একদিকে যেহেন অন্তের জীবনটি খাস করে দিছে, অন্যদিকে



চিত্র ৭.০৫: নিষ্ঠুর চরিত্রের মানুষ অন্যের শরীরে এসিড ছুড়ে মারার মতো ভয়ানক অপরাধ করতে পারে।



নিজেও কঠোর শাস্তির হাত থেকে বাঁচতে পারছে না। হয়তো বাকি জীবন জেলখানায় বসী জীবন কাটাতে হচ্ছে। তাই আমাদের সব মানুষকে এসিড ছোড়ার সন্দৰ্ভতার কথা বোঝাতে হবে। যারা সাধারণ মানুষের কাছে এত সহজে এসিড বিক্রি করে তাদেরকেও সতর্ক করতে হবে কিংবা শাস্তি দিতে হবে। একই সাথে কেট এসিড দিয়ে আক্রান্ত হলে তাকে কীভাবে প্রতিরক্ষা করতে হবে (যেমন পানি দিয়ে ধূঃ ফেলা), সে ব্যাপারটিও সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে।

### ৭.১.৫ নির্দেশক ব্যবহার করে বিভিন্ন অস্তুর অস্তু ও কারকস্তু শনাক্তকরণ

আপের প্রেগিতে তোমরা বেশ করেকটি ফুলের নির্যাস তৈরি করেছ এবং এদেরকে নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করে এসিড ও কারক শনাক্ত করেছ। এখন এসব নির্দেশক দিয়ে আমাদের জীবনের সাথে অভ্যন্তরীনভাবে জড়িত কিছু জিনিসের অস্তু ও কারকস্তু পরীক্ষা করতে পারি।



#### দলগত কাজ

**কাজ:** টুথপেস্টের অস্তু ও কারক দেখা (চিত্র ৭.০৬)।

**ধ্রয়োজনীয় উপকরণ:** টুথপেস্ট, লিটোস্  
কাগজ, বিকার বা কাচের বোতল বা প্লাস,  
ফুলের নির্যাস, নাড়ানি, পানি, চিমটা।

**পদ্ধতি:** বিকারে ৪-৫ টাম টুথপেস্ট  
নাও। ৫-১০ সিসি বিশুল্প পানি যোগ  
করে ভালোভাবে নাড়ানি দিয়ে নাড়া দাও।  
মিশ্রণটি কিছুক্ষণ ঝেঁকে দাও। এবার চিমটা  
দিয়ে প্রথমে নীল লিটোস্ কাগজ বিকারের  
মিশ্রণে ঢুবাও। এ সময় এর বর্ণ পরিবর্তন  
লক্ষ কর। একইভাবে লাল লিটোস্ কাগজ



**চিত্র ৭.০৬: টুথপেস্টের অস্তু ও কারক দেখা**

ডুবিয়ে বর্ণ পরিবর্তন লক্ষ কর (চিত্র ৭.০৬)। তোমরা কী দেখতে পেলো? লাল লিটোস্ কাগজের  
ব্যাং পরিবর্তিত হয়ে নীল হয়ে আর নীল লিটোস্ের কেনো পরিবর্তন হয়ে না। অর্থাৎ টুথপেস্ট  
হলো কারীয় পদার্থ। এবার একটি টেস্টটিউবে টুথপেস্টের ১-২ মিলিলিটার পরিমাণ নিয়ে ভাতে  
সবজি ও ফুলের নির্যাস যোগ করে দেখ কী ঘরনের বর্ণ পরিবর্তন হয়।

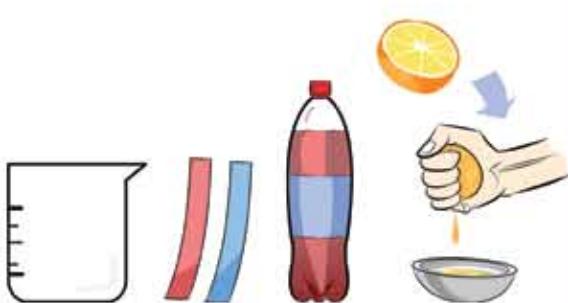


## দলগত কাজ

**কাজ:** বিভিন্ন রকম পানীয় ও ফলের রসের অজ্ঞ ও কার্যকৃত শনাক্তকরণ (চিত্র ৭.০৭)।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ:** নানা রকম পানীয় (সেকট ড্রিংকস) ও ফলের জুস (আম, শিচু, কমলা ইত্যাদি), বিকার, লিটিমাস কাগজ, ফুলের নির্ধাস।

**পদ্ধতি:** বিকারে বা কাঠের বোতলে একে একে পানীয় নাও এবং সাল ও মীল লিটিমাস কাগজ ঢুবাও। কী ধরনের পরিবর্তন সক্ষ করলে? সাল লিটিমাস কাগজের রঙে কোনো পরিবর্তন হলো না, কিন্তু মীল লিটিমাস কাগজের রং পরিবর্তিত হয়ে লাল হয়ে পেল। এ থেকে কী বুঝা পেল? আমরা সাধারণত যেসব পানীয় ও ফলের রস পান করে থাকি, সেগুলো অঞ্চল পদার্থ। এবার প্রতিটি পানীয় ও ফলের রসে তোমাদের আগের তৈরি ফুলের নির্ধাস একে একে খোল করে দেখ কী ধরনের রং পরিবর্তন হয়।

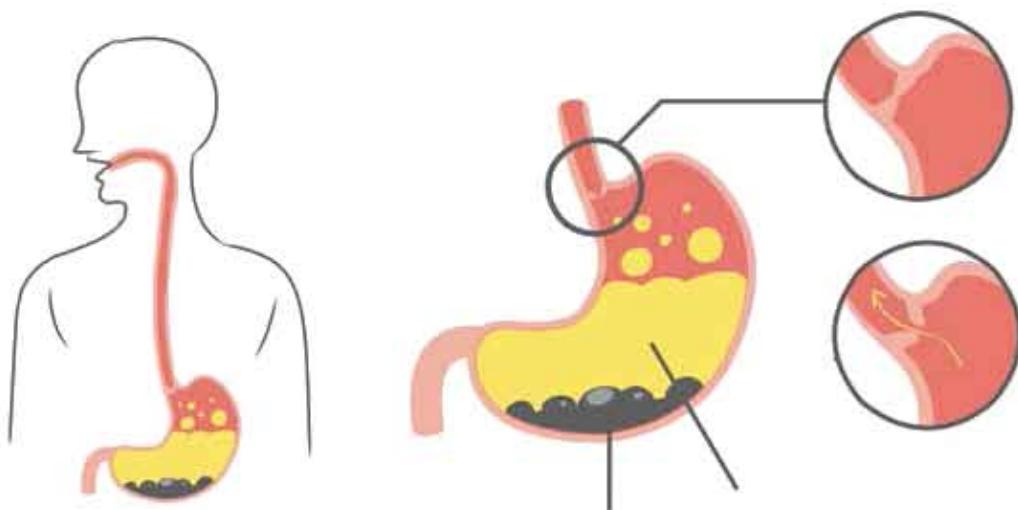


চিত্র ৭.০৭: বিভিন্ন রকম পানীয় ও ফলের রসের অজ্ঞ ও কার্যকৃত শনাক্তকরণ

### ৭.১.৬ পাকস্থলীতে এসিডিটির কারণ ও সঠিক খাদ্য নির্বাচন

তোমরা জান, পাকস্থলীতে খাদ্য হজম করার জন্য আমাদের সবার হাইড্রোক্সেরিক এসিডের প্রয়োজন হয় এবং সেটি নিজে থেকে আমাদের পাকস্থলীতে তৈরি হয়। কোনো কারণে যদি এই এসিডের মাত্রা বেড়ে যায়, তখন সেই অবস্থাকেই আমরা পাকস্থলীর এসিডিটি বলি। এখন প্রশ্ন হলো, কখন এবং কী কী কারণে পাকস্থলীতে এসিডের পরিমাণ বেড়ে যাব? নানা কারণে পাকস্থলীতে এসিডের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে (চিত্র ৭.০৮), যার মাঝে অন্যতম হচ্ছে খাদ্যব্য। তোমরা নিজেরা কর করতে পাইয়ে দেখেছ যে আমরা যেসব পানীয় আর ফলের রস পান করি, তাৰ ধোয় সবই অঞ্চল। কাজেই এসব পানীয় বেশি মাত্রায় পান করলে বা খালি পেটে পান করলে সেটা এসিডিটি সূচি করতে পারে। অন্যান্য পানীয়, বিশেষ করে মাঝাতিক্রিক চা, কফি-জাতীয় পানীয়গুলোও পাকস্থলীতে এসিডিটি বাঢ়ায়। বেশি ভাজা, ফেলবুন্ত এবং চর্বিজাতীর খাবারও পাকস্থলীতে এসিডিটি বাঢ়িয়ে দেয়। বিশেষজ্ঞদের দেওয়া তথ্য অনুমানী পেঁয়াজ, রসুন, মরিচ এবং অন্যান্য অতিরিক্ত মসলা দেওয়া খাবার, চকলেট— এগুলোও এসিডিটি তৈরির কারণ।





চিত্র ৭.০৮: নালা কারণে পাকস্থলীতে এসিডের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে

শান্ত ছাড়াও আরো কিছু কারণে এসিডিটি বেড়ে যেতে পারে। এর মধ্যে একটি হলো দুটিকা। নিয়মিত সময়তো খাবার না খাওয়া, কিংবা প্রয়োজন মাঝে মাঝে না হচ্ছেও এসিডিটি হতে পারে। আবার কখনো কখনো ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণও এসিডিটির কারণ হতে পারে।

এখন শঙ্খ হলো, কীভাবে উপরুক্ত খাদ্য নির্বাচন করে এসিডিটির হাত থেকে রেহাঁই পাওয়া যায়?

**প্রথমত:** যেসব খাদ্যসমূহ বা পানীয়ের কারণে এসিডিটি হয়, যেগুলো অতিরিক্ত শ্রেণি না করে পরিমিত পরিমাণে শ্রেণি করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে সামগ্রিকভাবে ঐ শান্ত শ্রেণি থেকে বিরত থাকতে হবে।

**দ্বিতীয়ত:** বেশ কিছু খাদ্যসমূহ আছে যেগুলো কিছুটা ক্ষারধর্মী এবং ফলে এসিডিটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ঐ সব শান্ত শ্রেণি করে আমরা এসিডিটির হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি। এসব খাদ্যের মধ্যে রয়েছে বেশির ভাগ শাকসবজি। যেমন: ভাজি, পুরিশাক, পালহাশাক, গাজুর, শিম, বিট, সেটুসপাতা, মালুম, ফুটা, আলু, কুলকপি ইত্যাদি।

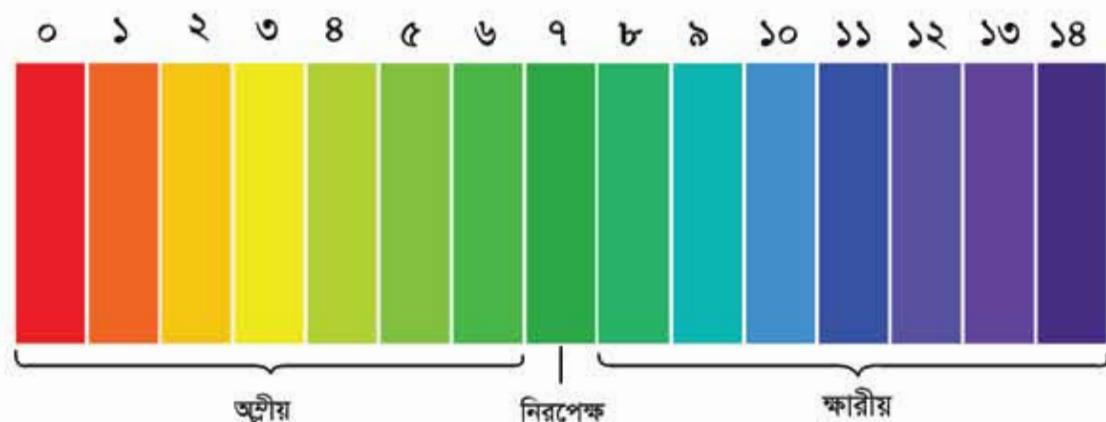
আবার কিছু কিছু খাদ্যশস্য আছে (যেমন: ভাজ, মিঠি ফুটা), যেগুলো এসিডিটি কমাতে সাহায্য করে। দুষজ্ঞাতীয় খাবারের মধ্যে সব্বা মাখন, ছাঁচলের দুধ থেকে তৈরি করা মাখন, সব্বা দুধ, বাদাম দুধ— এগুলোও ক্ষারধর্মী, বা এসিডিটি কমাতে পারে।

নালা রকমের বাদাম, হারবাল চা, সবুজ চা, আদা চা থেরেও অতিরিক্ত এসিড কমানো যাব।

## ৭.২ pH এব় মান জ্ঞান ও প্রয়োজনীয়তা

তেমনো জ্ঞান, কোনো একটি পদাৰ্থ এসিড, ক্ষার না নিরপেক্ষ তা নির্দেশক ব্যবহার কৰে জ্ঞান থাব। কিন্তু তাতে কী পরিমাণ এসিড বা ক্ষার আছে, সেটি কীভাৱে বুঝা থাবে? সেটি বুঝা থাব pH-এর মান পরিমাপ কৰে। তাহলে এবাৰ আমোৱা এই pH দিয়ে কী বোঝাব তা জেনে নিই।

নিরপেক্ষ জলীয় দ্রবণ বা বিশুদ্ধ পানি বেখানে কোনো এসিড বা ক্ষার থাকে না, তাৰ pH হয় ৭। আৰু যদি এতে এসিড যোগ কৰা হয় তাহলে pH-এর মান কমে থাব। যত বেশি এসিড যোগ কৰা থাব, pH-এর মান ততই কমে থাব। পক্ষান্তৰে যদি বিশুদ্ধ পানি বা নিরপেক্ষ জলীয় দ্রবণে ক্ষার যোগ কৰা হয়, তাহলে এর pH বাঢ়তে থাকে। যত বেশি ক্ষার যোগ কৰা হয়, pH-এর মান ততই বাঢ়তে থাকে।



চিত্ৰ ৭.০৯: ইউনিভার্সিল নির্দেশক কালার চার্ট

### সূতৰাং বলা থাব:

কোনো দ্রবণের pH = ৭ হলে তা নিরপেক্ষ জলীয় দ্রবণ বা বিশুদ্ধ পানি হবে।

কোনো দ্রবণের pH < ৭ হলে (৭ থেকে কম হলে) তা অক্ষীয় বা এসিডীয় দ্রবণ হবে।

কোনো দ্রবণের pH > ৭ হলে (৭ থেকে বেশি হলে) তা ক্ষারীয় দ্রবণ হবে।

pH-এর মান ৭ থেকে যত বেশি কম হবে, এসিডটি তত শক্তিশালী, আবাৰ pH-এর মান ৭ থেকে যত বেশি হবে, ক্ষারকৃতি তত বেশি শক্তিশালী হবে।

মানবদেহ থেকে শুধু কৰে আমাদেৱ দৈনন্দিন জীবনেৰ অনেক ব্যবহাৰ্য মৰ্যাদাবলী কৃতিকাজেৰ ক্ষেত্ৰে এমনকি রাসায়নিক শিল্পে pH-এর মান জ্ঞান আবাৰ নিৰৱৃত্ত কৰা খুবই গুরুত্বপূৰ্ণ।

তোমরা কি জান আমাদের ধমনির রন্ধের pH কত? আমাদের ধমনির রন্ধের pH হলো প্রায় ৭.৪। অর্থাৎ এটি সামান্য ক্ষারধর্মী। এর সামান্য হেরফের হলে ( $\pm 0.8$ ) মারাত্মক বিপর্যয়, এমনকি মৃত্যুর কারণও হতে পারে। আবার আমাদের জিহ্বার লালার pH-এর মান ৬.৬-এর কাছাকাছি থাকলে তখন তা সবচেয়ে বেশি কার্য্যকর ভূমিকা রাখে। আমাদের পাকস্থলীতে খাদ্য হজম করার জন্য দরকারি pH-এর মান হলো ২। এটি যথেষ্ট শক্তিশালী এসিডের পরিমাণ, তবে অবাক হওয়ার কিছু নেই কারণ খাবার হজম করার জন্য আমাদের পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের মতো শক্তিশালী এসিড থাকে। এই মান ০.৫-এর মতো হেরফের হলেই তা বদহজম সৃষ্টি করে। আমাদের প্রস্তাবের pH-এর মান ৭-এর কম থাকা স্বাভাবিক।

মাটির pH সাধারণত ৪ থেকে ৮-এর ভেতর থাকে। অর্থাৎ এটি এসিডিক থেকে শুরু করে ক্ষারীয় হতে পারে। মাটির pH-এর মান ৩-এর কম অর্থাৎ বেশি অল্পীয় (Acidic) হলে মাটির অনেক দরকারি উপাদান যেমন: ক্যালসিয়াম (Ca), ম্যাগনেসিয়াম (Mg) মাটি থেকে চলে যায়। তার ফলে মাটির উর্বরতা কমে যায়। এসিডিক মাটির জন্য ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম যুক্ত সার ব্যবহার করে pH-এর মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অন্যদিকে মাটির খুব ক্ষারীয় হলে অর্থাৎ pH-এর মান ৯.৫-এর বেশি হলেও মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়। এক্ষেত্রে  $Al^{3+}$  (অ্যালুমিনিয়াম আয়ন) সহজেই মাটি থেকে গাছের মূলে চলে যায় এবং এতে গাছের মারাত্মক ক্ষতি হয়। ক্ষারীয় মাটির জন্য নাইট্রেট ও ফসফেট-জাতীয় সার ব্যবহার করে pH-এর মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অতিরিক্ত এসিড বা ক্ষার অর্থাৎ pH খুব কমে গেলে বা বেড়ে গেলে মাটিতে থাকা উপকারী অনেক অণুজীব মারা যায়, ফলে গাছপালার স্বাভাবিক জৈবিক কার্যকলাপ ব্যাহত হয়।

বাজারে মুখ ধোয়ার জন্য যেসব প্রসাধন সামগ্রী পাওয়া যায়, তাতে লেখা থাকে pH-এর মান ৫.৫, এর কারণ কী? এর কারণ আমাদের ত্বক সাধারণত এসিডিক হয় এবং এর pH ৪-৬ এর মধ্যে থাকে। তবে নবজন্ম নেওয়া শিশুদের ত্বকের pH-এর মান ৭ এর কাছাকাছি থাকে। তাই বড়দের জন্য যেসব প্রসাধনী ব্যবহৃত হয়, তা শিশুদের জন্য প্রযোজ্য নয়। এতে শিশুদের ত্বকের ক্ষতি হতে পারে।

বিভিন্ন শিল্প রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় pH নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নানা রকম ঔষধ, কলমের কালি, বেকারিতে, লজেস জাতীয় মিষ্ঠি খাদ্যদ্রব্য, চামড়া প্রস্তুতি ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে pH-এর মান নিয়ন্ত্রণ খুব গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া আলোকচিত্র-সংক্রান্ত রাসায়নিক বিক্রিয়ায়, রং তৈরি ও ব্যবহারে, ধাতব পদার্থের ইলেকট্রোপ্লেটিং এরকম হাজারো ক্ষেত্রে pH-এর মান নিয়ন্ত্রণ করে কাজ করা হয়।

কোন মানের pH দ্রবণে কোন বর্ণ ধারণ করবে, তা বোঝার জন্য একটি চার্ট রয়েছে (চিত্র ৭.০৯)। একে ইউনিভার্সাল নির্দেশক কালার চার্ট বলে। কোনো দ্রবণে কয়েক ফোটা ইউনিভার্সাল নির্দেশক যোগ করলে দ্রবণ যে বর্ণ ধারণ করে, সেই বর্ণ ইউনিভার্সাল নির্দেশক কালার চার্টের বর্ণের সাথে মিলিয়ে দ্রবণের pH পরিমাপ করা হয়।

## ৭.৩ ক্ষার

### ৭.৩.১ ক্ষারকের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য

অটোম প্রেসিডে তোমরা ক্ষারক ও ক্ষার কী তা জেনেছ। এখন এ অধ্যায়ে এদের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য জানা যাক।

নির্দেশকের সাথে বিক্রিয়ার মাধ্যমে রং পরিবর্তন: তোমরা সবাই জান সকল ক্ষারক সাল লিটিমাস কাগজের রং পরিবর্তন করে নীল করে। এছাড়া আরো কিছু নির্দেশক আছে, যেগুলো নিরায়িতভাবে পরীক্ষাগুরু ব্যবহৃত হয়। (বেমন- মিথাইল অরেজ, মিথাইল রেড, ফেনলফথেলিন) এগুলোও রং পরিবর্তন করে।  
টেবিল: ৭.০১ এ কোন ক্ষারক নির্দেশকের কী ধরনের রং পরিবর্তন করে তা দেখানো হলো।

টেবিল ৭.০১: ক্ষারক ও নির্দেশকের বিক্রিয়ার ফলে রং পরিবর্তন

নির্দেশক	নির্দেশকের রং	ক্ষারকের ধারণকৃত রং
সাল লিটিমাস কাগজ	সাল	নীল
মিথাইল অরেজ	কমলা	হলুদ
মিথাইল রেড	সাল	হলুদ
ফেনলফথেলিন	ব্রাউন	গোলাপি

পানিতে জ্বরীয় ক্ষারক অর্ধাত ক্ষারসমূহ পানিতে হাইড্রօক্সাইড আরন ( $\text{OH}^-$ ) উৎপন্ন করে।



ক্ষারক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে সবগ উৎপন্ন করে। ক্ষারক ও এসিড পরম্পর বিপরীতধর্মী পদার্থ এবং বিক্রিয়া করে একে অপরকে নিষ্পত্তি করে নিরপেক্ষ পদার্থ সবগ ও পানি তৈরি করে। পরে তোমরা আরো বিস্তারিতভাবে এই বিক্রিয়া শিখবে।



#### দলগত কাজ

কাজ: ক্ষারকের রাসায়নিক ধর্ম সম্পর্কে জানা (চিত্র ৭.১০)।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ:** কারক (চূল বা  $\text{Ca(OH)}_2$ ), এসিড (ডিনেগার) এবং একটি নির্দেশক (লাল লিটুয়াস কাগজ বা ফেনলফথেচিন), বিকার বা কাচের বোতল।

**পদ্ধতি:** বিকারে বা কাচের বোতলে ৫০ মিলিলিটার চূলের জ্বরণ নাও। লাল লিটুয়াস কাগজ হবলে ছুবাও। লিটুয়াস কাগজটি নীল হয়ে পেল, তাইতো? এতে থামাপিত হলো যে কারক লাল লিটুয়াসকে নীল করে। এবার জ্বপার দিয়ে আস্তে আস্তে ডিনেগার বিকারে নেওয়া  $\text{Ca(OH)}_2$  হবলে ঘোগ কর এবং নাড়াতে থাকো। নীল লিটুয়াস কাগজটি হবলে ছুবিয়ে কোনো পরিবর্তন হয় কি না দেখ। প্রথম দিকে দেখবে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। ক্রমাগত ডিনেগার ঘোগ করতে থাক আর লিটুয়াস কাগজ দিয়ে রং পরিবর্তন হয় কি না খেয়াল করো। এক পর্যায়ে দেখবে নীল লিটুয়াস কাগজের রং পরিবর্তিত হয়ে লাল হয়ে পেল। কেন এমন হলো? কারণ হলো, এসিড ঘোগ করাতে তা আস্তে আস্তে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্ষাইডের সাথে বিক্রিয়া করছে। এভাবে যখন সমস্ত  $\text{Ca(OH)}_2$  বিক্রিয়া করে ফেলেছে, তখন এসিড ঘোগ করার ফলে হবলটির এসিডিক হয়ে গেছে আর সে কারণেই নীল লিটুয়াস লাল হয়ে গেছে।



চিত্ৰ ৭.১০: কারকের রাসায়নিক ধৰ্ম সম্বলকে জানা

### ৭.৩.২. প্রাক্তনিক জীবনে কারের ব্যবহার ও সাবধানতা

তোমরা কি জান, মৌমাছি ঝুল ঝুটালে বা লিপড়া কামড় দিলে ঝুলে কেল, ঝুলে ঘার কেল? কারণ হলো, লিপড়ার কামড়ের মাঝমে মূলত ক্রান্তিক এসিড নিঃসৃত হয়, যা আমাদের শরীরে ঝালাপোড়া সৃষ্টি করে। আর মৌমাছি ঝুল ঝুটালে ক্রান্তিক এসিড, মেলিটিন (Melittin) এবং আপামিন (Apamin) নামক এসিডিক পদার্থ নিঃসৃত



চিত্ৰ ৭.১১: সাবানের কারক হ'ল পরীক্ষা

হয়, যার কারণে জ্বালাপোড়াও হয় আবার আক্রান্ত স্থান ফুলেও যায়।

এখন প্রশ্ন হলো পিপড়া কামড়ালে বা মৌমাছি হুল ফুটালে করণীয় কী?

যেহেতু এসব ক্ষেত্রে জ্বালাপোড়ার কারণ হচ্ছে এসিড, তাই আমরা এসিডকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে এরকম মলম, লোশন (যেমন চুন) ব্যবহার করতে পারি। এরকম আরো একটি লোশন হলো ক্যালামিন (Calamine), যা মূলত জিংক কার্বনেট ( $ZnCO_3$ )। বেকিং সোডা ব্যবহার করেও ভালো ফল পাওয়া যায়।

মাটির এসিডিটি দূর করতে ক্ষার: তোমরা আগেই জেনেছ, মাটিতে এসিডিটি বাড়লে মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়। তখন ক্ষারক ব্যবহার করে এসিডিটিকে প্রশমিত করা যায় এবং উর্বরতা ফিরিয়ে আনা যায়। এক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত ক্ষারক হলো চুন ( $CaO$ ) এবং মি঳ক অব লাইম ( $Ca(OH)_2$ )। অবশ্য এ কাজে চুনাপাথরও ( $CaCO_3$ ) ব্যবহার করা হয়।

বাসাবাড়িতে পরিষ্কারক হিসেবে প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ব্যবহৃত হয়। টুথপেস্ট বা টুথ পাউডার আমাদের নিত্যদিনের একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু, যা ক্ষারীয়। খাওয়ার পরে সাধারণত আমাদের মুখে এসিডিয় অবস্থা তৈরি হয়। আর টুথপেস্ট বা পাউডার দিয়ে ব্রাশ করলে একদিকে যেমন দাঁত পরিষ্কার হয়, অন্যদিকে তেমনি পেস্ট বা পাউডারের ক্ষার সৃষ্টি এসিডকে নিষ্ক্রিয় করে। ফলে দাঁতের ক্ষয় রোধ হয়।

আবার থালা-বাসন পরিষ্কার করার জন্য যে শৃঙ্খলা সাবান বা তরল সাবান ব্যবহার করা হয়, সেগুলোতেও ক্ষারক থাকে (চিত্র ৭.১১)। এমনকি আমরা যে কাপড় কাচার সাবান ব্যবহার করি, তা—ও তৈরি করা হয় সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও চর্বি বা তেল থেকে। একইভাবে শেভিং ফোম বা নরম সাবান তৈরি করা হয় পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও চর্বি বা তেল থেকে।

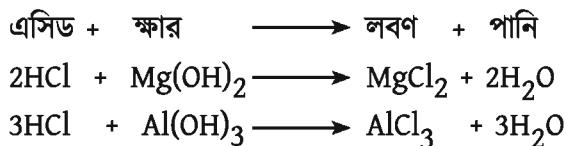
তোমরা জান যে গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা বা এসিডিটির কারণে আমরা যে এন্টাসিড খাই তা হলো ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ( $Mg(OH)_2$ ) ও অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ( $Al(OH)_3$ ) নামের ক্ষার।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ক্ষারক বা ক্ষারসমূহ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অনেক কাজে লাগে।

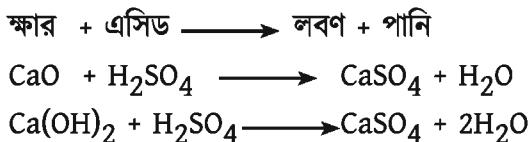
ক্ষার ও ক্ষারক ব্যবহারে সাবধানতা: তোমরা নিজের হাতে কখনো নিজেদের জামাকাপড় পরিষ্কার করে দেখেছ কী ঘটে? একটু বেশি কাপড় একসাথে পরিষ্কার করলে দেখা যায়, হাতের তালু থেকে একটু একটু চামড়া উঠে যায়। এর জন্য দায়ী হলো সাবানে থাকা ক্ষার। এসিড যেমন মানুষের শরীরের ক্ষতি করতে পারে, তেমনি ক্ষারও শরীরের ক্ষতি করতে পারে। তাই শক্তিশালী ক্ষারীয় দ্রব্যাদি নিয়ে কাজ করার সময় হাতে রাবারের মোজা এবং গায়ে অ্যাপ্রোন পরা উচিত।

### ৭.৩.৩ প্রশমন এবং এর প্রয়োজনীয়তা

পাকস্থলীর এসিডিতির জন্য পেটের ব্যথা হলে ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড নামক এন্টাসিড খেলে ব্যথা সেরে যায় কেন? কারণ হলো, এসিডিতির জন্য দায়ী হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সাথে ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের প্রশমন বিক্রিয়া ঘটে, যার ফলে অতিরিক্ত হাইড্রোক্লোরিক এসিড নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এবং ব্যথা আর থাকে না। বিক্রিয়াটি নিচে দেখানো হলো:



আবার চুন ( $\text{CaO}$ ) ও স্ল্যাক লাইম  $[\text{Ca}(\text{OH})_2]$  দিয়ে মাটির যে এসিডিটি দূর করে উর্বরতা বৃদ্ধি করা হয়, সেটিও হয় প্রশমন বিক্রিয়ার মাধ্যমে, যা নিচে দেখানো হলো:



তোমরা ইতোমধ্যেই জেনেছ, খাওয়ার পর আমাদের মুখে এসিড তৈরি হয় আর টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত ব্রাশ করলে এসিডের কারণে দাঁতের ক্ষয়রোধ হয়। এখানেও কিন্তু একধরনের প্রশমন বিক্রিয়াই ঘটে। টুথপেস্টের pH সাধারণত ৯-১১ এর মধ্যে হয় অর্থাৎ এরা ক্ষারীয় এবং এতে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড, বেকিং সোডা, টেট্রাসোডিয়াম পাইরোফসফেট জাতীয় পদার্থ থাকে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রশমন বিক্রিয়া আমাদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

## ৭.৪ লবণ

### ৭.৪.১ লবণের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য

এর আগে তোমরা জেনেছ যে লবণ হলো এসিড ও ক্ষারকের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থ। এখন তোমরা এর রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য জানবে।



## সমস্যাত কাজ

**কাজ:** সবপের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা (চিত্র ৭.১২)।

**ঋয়োজনীয় উপকরণ:** ১টি পাত্র, খাবার লবণ, বিশুদ্ধ পানি, লাল ও নীল লিটমাস কাগজ, নাড়ানি।

**পদ্ধতি:** পাত্রে ৫-১০ গ্রাম লবণ নিয়ে ৫০ মিলিলিটার বিশুদ্ধ পানি ঘোল কর। নাড়ানি দিয়ে তালোভাবে নাড়া দিয়ে সবপের অবস্থা তৈরি কর। এবার একে একে লাল ও নীল লিটমাস কাগজ যোগ করে দেখ এসের রং পরিবর্তন হয় কি না।



চিত্র ৭.১২: সবপের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা

লিটমাস কাগজের রং কি পরিবর্তন হলো? না, হলো না। এতে প্রমাণিত হলো যে সবগুলি নিরাপদ পদার্থ। তবে কিছু কিছু সবপের জলীয় মুবণ অঞ্চল বা ক্ষারীয় হতে পারে। যেমন: বেকিং সোডা ( $\text{NaHCO}_3$ ) বা খাবার সোডা। এটিও একটি লবণ, কিন্তু এর জলীয় মুবণ এসিডিক এবং এটি নীল লিটমাসকে লাল করে। এর কারণ হলো, যদিও এটি একটি লবণ কিন্তু পানিতে এটি হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করে।



আবার সোডিয়াম কার্বনেটের ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ) জলীয় মুবণ ক্ষারীয় এবং সেটি লাল লিটমাসকে নীল করে। এর কারণ হলো, পানিতে সোডিয়াম কার্বনেট, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও কার্বনিক এসিড তৈরি করে।



কিন্তু উৎপন্ন কার্বনিক এসিড দুর্বল এসিড হওয়ায় তা পুরোপুরি বিয়োজিত হয় না, আধিক্যভাবে বিয়োজিত হয়। পক্ষান্তরে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটি শক্তিশালী ক্ষার বলে তা পুরোপুরি বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোক্সাইড আয়ন তৈরি করে। ফলে সবপের হাইড্রোক্সাইড আয়নের আধিক্য থাকে আবার সে কারণেই মুবণটি ক্ষারীয় হয় এবং লাল লিটমাসকে নীল করে।

কার্বনেট লবণগুলো এসিডের সাথে বিহিন্ন করে অন্য একটি লবণ, কার্বন ডাই-অক্সাইড পাস ও পানি তৈরি করে।



প্ৰায় সব লবণই কঠিন এবং গলনাক ও স্ফুটনাক তাপমাত্ৰা অনেক বেশি হয়। বেশিৰ অপৰ লবণই পানিতে ছ্ৰুতিৰীয়, তবে কিছু কিছু লবণ আছে যাৱা পানিতে ছ্ৰীভূত হয় না। যেমন: ক্যালসিয়াম কাৰ্বনেট ( $\text{CaCO}_3$ ), সিলভাৰ সালফেট ( $\text{Ag}_2\text{SO}_4$ ), সিলভাৰ ক্লোরাইড ( $\text{AgCl}$ )।



### একক কাজ

**কাজ:** ডিমেৰ খোসা মূলত  $\text{CaCO}_3$  এবং এসিজ দিয়ে এটাকে ছ্ৰীভূত কৰা সম্ভব। একটি ডিম ডিনেগাৰে ঘূৰিয়ে রাখো এবং মাৰো মাৰো পৰিকাৰ কৰে নতুন ডিনেগাৰ দাও। দেখব ডিমেৰ শক্ত খোসা ছ্ৰীভূত হয়ে নৰম ঘূলতুলে একটি ডিমে পৱিষ্ঠ হয়েছে।

## ৭.৪.২ লবণেৰ ব্যবহাৰ

লবণেৰ ব্যবহাৰেৰ কথা বলা হলো সবাৰ আগে আমাদেৱ খীৰাবৈৰেৰ কথা চলে আসে। আমৰা আমাদেৱ খীৰাবৈৰে সব সময় লবণ ব্যবহাৰ কৰিব। লবণ হাড়া তৱকারি ঝাঙা কৰলে সেটি স্বাদহীন হবে এবং আমৰা অনেকেই তা খেতে পাৰিব না। যে লবণ আমাদেৱ খাদ্যেৰ স্বাদ বাঢ়িয়ে খোওয়াৰ উপযোগী কৰে তোলে, তা হলো সোডিয়াম ক্লোরাইড ( $\text{NaCl}$ ), যা সাধাৰণ লবণ বা টেবিল লবণ নামেও পৱিষ্ঠ। তৱকারি ছাড়াও আৱো অনেক খীৰাৰ, যেমন: পাউটুটি, আচাৰ, চানাচুৰ ইত্যাদিতে খীৰাৰ লবণ ব্যবহাৰ কৰা হয়। খীৰাবৈৰে স্বাদ বৃদ্ধি কৰার জন্য আৱেকটি লবণ— সোডিয়াম ফ্লুটামেট ব্যবহাৰ কৰা হয়, যেটি ‘টেক্সটুই সল্ট’ নামে পৱিষ্ঠ।

আমৰা কাগড় কাচাৰ যে সাৰান ব্যবহাৰ কৰি তা হলো মূলত সোডিয়াম স্টিয়ারেট ( $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COONa}$ ) আৰ শেভিং কোৰ বা জেলে থাকে পটাসিয়াম স্টিয়ারেট ( $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOK}$ )। কাগড় কাচাৰ সোডা হিসেবে আমৰা যে সোডিয়াম কাৰ্বনেট ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ) ব্যবহাৰ কৰি তাও একটি লবণ। আবাৰ আমৰা জীৱাণুনাশক হিসেবে যে ভূঁতে ( $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ) বা কিটকিৰি  $[\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24\text{H}_2\text{O}]$  ব্যবহাৰ কৰি, সেগুলোও লবণ।

### কৃষিতে লবণেৰ ব্যবহাৰ

তোমৰা জ্ঞান যে মাটিৰ এসিডিটি নিষ্ক্ৰিয় কৰাৰ জন্য আমৰা যে চূনাপোধৰ ব্যবহাৰ কৰি, এই চূনাপোধৰ একটি লবণ। আবাৰ আমৰা মাটিৰ উৰ্বৰতা বৃদ্ধিৰ জন্য যে সাৰ ব্যবহাৰ কৰে থাকি, তাদেৱ বেশিৰ ভাগই হলো লবণ। যেমন: অ্যামোনিয়াম নাইট্ৰেট ( $\text{NH}_4\text{NO}_3$ ), অ্যামোনিয়াম ফসফেট ( $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$ ), পটাশিয়াম নাইট্ৰেট ( $\text{KNO}_3$ ) ইত্যাদি।

সুঁতে বা কপার সালফেট ( $CuSO_4$ ) কৃষিজমিতে খাকটেরিয়া ও ভাইরাস প্রতিরোধে বহুল ব্যবহৃত একটি সবথ। এটি শৈবালের উৎপাদন বন্ধে খুব কার্যকরী।

### শিল্প-কারখানার সবথ

শিল্প-কারখানার নানা কাজে খাবার সবথ অপরিহার্য। যেমন: চামড়শিল্পে চামড়ার ট্যানিং করতে, আখন ও পনিরের শিল্পে পাদনে, কাশফ কাচার সোডা ও খাবার সোডা তৈরি করতে, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের তত্ত্ব বিজ্ঞেশণ ইত্যাদি কাজে খাবার সবথ ব্যবহৃত হয়। বেশ কিছু সবথ যেমন: সুঁতে ( $CuSO_4$ ), মারকিউরিক সালফেট ( $HgSO_4$ ), সিলভার সালফেট ( $Ag_2SO_4$ ) শিল্প-কারখানায় প্রভাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

টেক্সটাইল ও রং তৈরির কারখানার রং ফিল্ট্র করার কাজে সবথ প্রয়োজন হয়। ধীত্ব বিশুদ্ধকরণে সবথ সাপে। খাবার প্রস্তুতিতে সবথ ব্যবহার করে রাবারকে (গ্যাটেক্স) খাবার গাছের নির্বাস থেকে আলাদা করা হয়। উব্ধব কারখানায় স্যালাইন এবং অন্যান্য উব্ধবেও সবথ ব্যবহৃত হয়। ডিটারেজেন্ট তৈরিতেও ফিলার হিসেবে সবথ খুবই প্রয়োজনীয়।

কাজেই দেখা যাচ্ছ যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কৃষিতে, শিল্প-কারখানায় সবথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কূমিকা পালন করে।



### দলগত কাজ

**কাজ:** ধাতু ও এসিড থেকে সবথ তৈরি (চিত্র ৭.১৩)।

এই পরীক্ষাটি তোমাদের স্কুলের শ্যাবরেটেরিতে শিককের উপর্যুক্তিতে করা বাহ্যনীয়।

**অয়োজনীয় উপকরণ:** একটি ধাতু (যেমন: Mg), পাতলা হাইড্রোক্সাইড এসিড, একটি বিকার, চামচ, ফালেল, ১টি পাত, ত্রিপদী স্ট্যান্ড, পিপরিট ল্যাঙ্ক বা বার্নার, অ্যাথেন।

**পদ্ধতি:** অ্যাথেন পরে নাও। বিকারে ৫০ মিলিলিটার পাতলা হাইড্রোক্সাইড এসিড নাও। এবার ৫-১০ গ্রাম ম্যালেসিয়াম রিবল (স্বরূপ তার) বা তার গুড়া চামচ দিয়ে বিকারে বোঝ করে। কোনো বুদবুদ উঠছে কি? না উঠলে হাসকা তাপ দাও। দেখবে বুদবুদ উঠতে শুরু করবে। বুদবুদ উঠা পেষ হলে আরো কিছু



চিত্র ৭.১৩: ধাতু ও এসিড থেকে সবথ তৈরি

ম্যাগনেসিয়াম যোগ কর। তাপ দেয়ার পরও বুদ্ধুদ না উঠলে বুঝতে হবে এসিড পুরোপুরি বিক্রিয়া করে ফেলেছে এবং আর কোনো এসিড বিকারে অবশিষ্ট নেই। এভাবে সমস্ত এসিড বিক্রিয়া না করা পর্যবেক্ষণ অল্প অল্প করে ম্যাগনেসিয়াম রিবন (সেৱু ভার) বা গুঁড়া যোগ করতে থাক। এবাবে ফালেল ও ফিল্টার কাশজের সাহায্যে অতিরিক্ত ম্যাগনেসিয়াম পিণ্ডখ থেকে আলাদা কর। প্রাপ্ত ছবিতেকে ত্রিপলী স্ট্যাভের উপর বসিয়ে শিপিট স্যাক্স দিয়ে তাপ দিতে থাক, যতক্ষণ পর্যবেক্ষণ না পাওয়ার পায়ে লবণের ছোট ছোট দানা দেখা যায়। এবাবে তাপ দেওয়া বন্ধ করে পাইপটিকে ঠাণ্ডা কর। পাইপের ঠলায় বা গায়ে দানাদার বন্ধু কী পেরেছে? এটি হলো ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড লবণ। এখানে ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্লারিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে  $MgCl_2$  ও  $H_2$  গ্যাস উৎপন্ন করেছে। এই হাইড্রোক্লেন গ্যাসের কারণেই আমরা বিকার থেকে বুদ্ধুদ উঠতে দেখি।  $MgCl_2$  পানিতে ছবীভূত হিল পানি বাস্তীভূত করে আমরা লবণটি আলাদা করতে পেরেছি।

## অনুশীলনী



### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি মুর্বি এসিড?

- (ক) HCl                          (খ) HNO<sub>3</sub>  
 (গ) H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>                          (ঘ) H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>

২. একটি বর্ষীন ছবিতে NaOH খিশালে ছবটি পোলাপি হয়ে গেল। ছবটি কী?

- (ক) মিথাইল রেড                          (খ) মিথাইল অরেজ  
 (গ) ফেনক্ষ্যালিন                                  (ঘ) লিটগ্যাস ছবণ

নিচের অনুজ্ঞাটি পক্ষে ৩ ও ৪ নং ধাপের উত্তর দাও:

রাজির পায়ে শিপড়া কামড় দেওয়ায় তার পায়ে বজ্ঞা হয় এবং পাণ্টি কুলে যায়। তার মা পায়ে একটু কেরাইল লোশন লাগিয়ে দেন। এতে রাজির পায়ের জ্বালা কমে যাব।

৩. রাজির পা কুলে যাওয়ার কারণ কোনটি?

- (ক) ফরমিক এসিড                          (খ) অজ্ঞালিক এসিড  
 (গ) এসিটিক এসিড                                  (ঘ) নাইট্রিক এসিড

**৪. পারে আগোনো লোশনটি:**

- (i) এসিডকে প্রশংসিত করে
- (ii) জিংক কার্বনেট জাতীয় সবথ
- (iii) মেলিটিন ও অ্যাপারিন নামক এসিডিক পদার্থ

**নিচের কোনটি সঠিক?**

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| (ক) i ও ii   | (খ) i ও iii     |
| (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |



**সূজনশীল প্রশ্ন**

১. অন্ত সবগুলুর মাঝে, তৈলান্ত খাবার ও চকলেট খাই। একমিন্দ অন্তুর বিবিয়ানি খাওয়ার পর তার বদহজস হয়। তার মা তাকে কোমল পানীয় খাওয়ালে সে সুস্থ হয়ে থাঁচে। অন্যদিকে তার বোন শৈলী সরাসূখ, সরায়াখন এবং কলমূল বেশি পছন্দ করে।

- (ক) আচার সহরক্ষণে কেন এসিড ব্যবহার করা হয়?
- (খ) দুর্বল এসিড বলতে কী বুঝায়?
- (গ) অন্ত কীভাবে সুস্থ হলো? ব্যাখ্যা কর।
- (ঘ) অন্ত ও শৈলীর খাবারের মধ্যে কোনটি এসিডিটির কারণ বিশ্লেষণ কর।

২. ভূহিন সাহেবের পেটে থাই বিড়ির সমস্যা হয়। ভাস্তুরের কাছে গেলে তিনি কিছু গরীব্যা করাতে বলেন। গরীব্যার রিপোর্ট দেখা গেল, তার পাকল্যজীতে pH ১.৬ এবং ধূমনির রক্তে pH ৭.৫। রিপোর্ট নিয়ে বাসার কেলার সবজ সে তার দুই মাসের বাজার অন্ত একটি লোশন কিনতে চাইলো, যার pH ৫.৫। কিন্তু দোকানি তাকে বাজার জন্য অন্যটি নিতে বললেন।

- (ক) আয়োনিয়াম সালফেটের সংকেত লেখ?
  - (খ) ভিনেগারকে কেন দুর্বল এসিড বলা হয়?
  - (গ) দোকানি তাকে বাজার লোশনটি নিতে নিষেধ করলেন কেন? ব্যাখ্যা কর।
  - (ঘ) ভূহিন সাহেবের পাকল্যজীতে এবং রক্তে এসিড ও ক্ষারের পরিমাণ যথার্থ আছে কি?
- মন্তব্য দাও।

## অট্টম অধ্যায়

# আমাদের সম্পদ



মাটি আমাদের অতি প্রয়োজনীয় একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। মাটিতে পাহাড়া জলার, ফসল উৎপন্ন হয়। আমাদের দায়িত্ব এই প্রাকৃতিক সম্পদকে নানা ধরনের দুষ্পদ থেকে রক্ষা করা। একই সাথে মাটি আমাদের তেল, গ্যাস, কয়লাসহ নানা রকম খনিজ পদার্থের উৎস। তাই আমরা একদিকে বেরক্ষণ এই খনিজ উৎসেলন করে দেশকে সমৃদ্ধ করা, অন্যদিকে সক রাখব এই প্রক্রিয়ার আমাদের মূলত্বান্ব সম্পদটির যেন অপচয় না হয়।



### এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- মাটি ও ভূমির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার মাটির মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।
- মাটির গঠন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মাটির pH শান জানার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মাটি দূষণের কারণ, ফলাফল এবং মাটি সংরক্ষণের কৌশল বর্ণনা করতে পারব।
- মাটিতে অবস্থিত খনিজের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খনিজের ব্যবহার এবং সংরক্ষণের কৌশল বর্ণনা করতে পারব।
- প্রাকৃতিক জ্বালানির গঠন, প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবহার এবং সংরক্ষণের কৌশল বর্ণনা করতে পারব।
- শিক্ষার্থীর এসাকায় মাটিদূষণের কারণ ও ফলাফল অনুসন্ধান করতে পারব।
- pH পেপার দিয়ে মাটির pH নির্ণয় অথবা লিটিয়াস পেপার দিয়ে মাটির অম্লতা ও ক্ষারতা নির্ণয় করতে পারব।
- সকল সংরক্ষণে যত্নবান হব ও অন্যদের সচেতন করব।

## ৮.১ মাটি

### ৮.১.১ মাটির গঠন

তোমরা কি বলতে পার মাটি আমাদের কী কী কাজে লাগে?

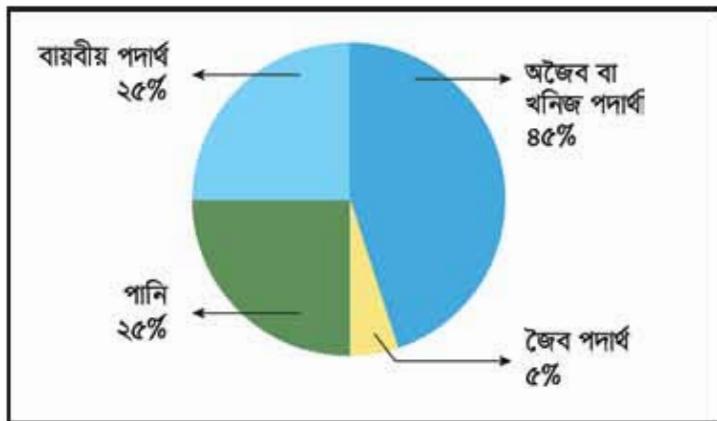
**প্রথমত:** মাটিতে গাছপালা জন্মায়, আর সেই গাছপালা থেকেই আমরা খাদ্যশস্য পাই। অক্সিজেন ছাড়া আমরা এক মিনিটও বেঁচে থাকতে পারব না, সেই অত্যাবশ্যকীয় অক্সিজেন গ্যাসও আমরা পাই সেই গাছপালা থেকে। মাটি না থাকলে গাছপালা জন্মাতে পারত না, আমরা খাদ্যশস্য আর অক্সিজেন পেতাম না। **দ্বিতীয়ত:** মাটিতেই আমরা ঘরবাড়ি, অফিস, রাস্তাঘাট তৈরি করি। শুধু তা-ই নয়, মাটির নিচ থেকে জীবনধারণের জন্য দরকারি পানির বড় একটি অংশ আসে। এছাড়াও আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অতি প্রয়োজনীয় জ্বালানির (যেমন: তেল, গ্যাস, কয়লা) সিংহভাগ আমরা আহরণ করি মাটির নিচ থেকে। একইভাবে সোনা, বুপা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, লোহাসহ নানা রকম খনিজ পদার্থ এই মাটিরই অংশ। এখন আমরা আমাদের অতি প্রয়োজনীয় এই মাটির গঠন সম্পর্কে জেনে নিই।

মাটি হলো নানারকম জৈব আর অজৈব রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ। বিভিন্ন এলাকার মাটির গঠন ভিন্ন হয়। মাটিতে বিদ্যমান পদার্থগুলোকে সাধারণত চার ভাগে ভাগ করা হয়। এরা হলো খনিজ পদার্থ, জৈব পদার্থ, বায়বীয় পদার্থ আর পানি। তবে এসব পদার্থ বেশিরভাগ সময়েই একটি আরেকটির সাথে মিশে একধরনের জটিল মিশ্রণ তৈরি করে। তাই একটিকে আরেকটি থেকে সহজে পৃথক করা যায় না। মাটিতে বিদ্যমান খনিজ পদার্থগুলো অজৈব ঘোগ হয়।

মাটিতে বিদ্যমান প্রধান খনিজ পদার্থ বা অজৈব পদার্থগুলো হলো ক্যালসিয়াম (Ca), অ্যালুমিনিয়াম (Al), ম্যাগনেসিয়াম (Mg), লোহা (Fe), সিলিকন (Si), পটাশিয়াম (K) ও সোডিয়াম (Na), অল্প পরিমাণে ম্যাংগানিজ (Mn), কপার (Cu), জিঙ্ক (Zn), কোবাল্ট (Co), বোরন (B), আয়োডিন (I) এবং ফ্লোরিন (F)। এছাড়া মাটিতে কার্বোনেট, সালফেট, ক্লোরাইড, নাইট্রেট এবং ক্যালসিয়াম (Ca), ম্যাগনেসিয়াম (Mg), পটাসিয়াম (K), সোডিয়াম (Na) ইত্যাদি ধাতুর জৈব লবণও পাওয়া যায়।

মাটিতে বিদ্যমান জৈব পদার্থ হিউমাস (Humus) নামে পরিচিত। হিউমাস আসলে অ্যামিনো এসিড, প্রোটিন, চিনি, অ্যালকোহল, চর্বি, তেল, লিগনিন, ট্যানিন এবং অন্যান্য অ্যারোমেটিক ঘোগ নিয়ে গঠিত একটি বিশেষ জটিল পদার্থ। এটি দেখতে অনেকটা কালচে রঙের হয়। এই হিউমাস তৈরি হয় মৃত গাছপালা আর প্রাণীর দেহাবশেষ থেকে।

আমেরিকা অনুসারে মাটিতে বিদ্যমান পদার্থগুলো ৮.০১ চিহ্নে সেখানে হলো:



চিত্র ৮.০১: মাটির পর্ণম

মাটিতে বিদ্যমান পানির ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে গাছপালার জন্য। তোমাদের কি মনে থাক জেনেছে যে মাটিতে পানি কোথায় আর কীভাবে থাকে? মাটিতে পানি থাকে মাটির কণার মাঝে থাকা কাঁকা ছাইগুগুলোতে বা রাখ্তে। এই রাখ্তের আকার-আকৃতির উপর নির্ভর করে মাটির পানি ধরে রাখার ক্ষমতা। তোমরা বল দেখি বালি আর কাদামাটির মধ্যে কোনটির পানি ধরে রাখার ক্ষমতা বেশি? নিঃসন্দেহে কাদা মাটির। এর কারণ হলো, কাদামাটির বেলায় মাটির কণাগুলোর কাঁকে কাঁকে থাকা রাখ্ত খুব সূক্ষ্ম, বা পানি ধরে রাখ্তে। অন্যদিকে বালি মাটির বেলায় রাখ্তগুলো বড় বড়, এর কারণে পানি আটকে থাকে না বা ধরে রাখতে পারে না।

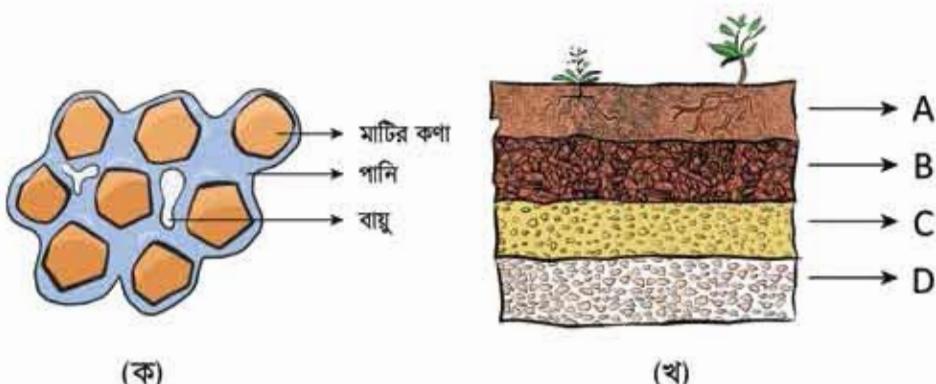
কাঁকা স্থান বা রাখ্ত ছাইগুগুলো মাটির কণার শোষিত অবস্থায়ও পানি থাকতে পারে। মাটিতে থাকা হিউমাস পানি শোষণ করে রাখতে পারে। হিউমাসে শোষিত পানি সহজে গাছপালায় স্থানান্তরিত হয় না।

মাটিতে পানি না থাকলে কী সমস্যা হতো? মাটিতে পানি না থাকলে কী সমস্যা হতো তার বড় প্রয়োগ হলো মরুভূমি যেখানে দু-একটি বিশেষ প্রজাতির গাছ ছাই আর কিছুই জন্মায় না। অর্থাৎ মাটিতে পানি না থাকলে গাছপালা জন্মাতে পারত না এবং জন্মালেও বেড়ে উঠতে পারত না। তোমরা জান যে উত্তিদক্ষতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো প্রোটোপ্লাজম, আর এই প্রোটোপ্লাজমের শক্তিরা ৮৫-৯৫ ভাগই হলো পানি, বা আসে মাটি থেকে। গাছ পাতায় থাকা স্টোমাটা (Stomata) দিয়ে কিছু পানি প্রাপ্ত করলেও বেশির ভাগই গাছের মূলের মাঝায়ে মাটি থেকে আসে। মাটি থেকে গাছরা পানির সাহায্যেই গাছপালা সালোকসংক্রান্তের মাঝায়ে নিজেদের খাবার তৈরি করে আর আমাদেরকে অফেরিজেন দেয়। গাছপালা তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি (বেষ্টন: খনিজ পদার্থ, নাইট্রোজেন, ফসফরাস ইত্যাদি) মাটি থেকে সরাসরি প্রাপ্ত করতে পারে না। এগুলো প্রাপ্ত করে মূলের মাঝায়ে এবং একেজো পানি মাঝায় হিসেবে কাজ করে। কাজেই পানি না থাকলে উত্তিদ মাটি থেকে এসব পুষ্টির প্রাপ্ত করতে পারত না, ফলে

এদের বেড়ে ওঠাও সম্ভব হচ্ছে না।

এবাবে আসা থাক মাটিতে থাকা বায়বীয় পদার্থের অসঙ্গে। মাটির কণার মধ্যকার ফোকা স্থান বা অস্ত্রে যেমন পানি থাকতে পারে, তেমনি বায়বীয় পদার্থ বা বাতাসও থাকতে পারে। মাটিতে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন আর কার্বন জাই-অক্সাইড গ্যাস থাকে।

মজার আপোর হলো, মাটিতে থাকা প্যাসের সাথে কিছু সবসময় বায়ুমণ্ডলে থাকা প্যাসের বিনিয়য় হতে থাকে। অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের প্যাস মাটিতে থাক এবং মাটিতে থাকা প্যাস বায়ুমণ্ডলে চলে আসে। এই থক্কিয়াকে মাটির বায়বায়ন (Soil Aeration) বলে। এখন থগ হলো, মাটিতে থাকা প্যাস কি কোনো কাজে লাগে? হ্যাঁ, অবশ্যই এটি কাজে লাগে। মাটিতে নালারকম উপকারী অণুজীব (Microorganism) থাকে। এর মধ্যে কিছু অণুজীবের জন্য আর বেড়ে ওঠার জন্য অক্সিজেন অভ্যবশ্যক, অক্সিজেন না থাকলে এরা বাঁচতে পারে না। আবার অক্সিজেন পানিতে অক্ষুণ্ণীয় অনেক খনিজ পদার্থকে তেওঁে হৃষণীয়



চিত্র ৮.০২: মাটির গঠন (ক) ও মাটির বিভিন্ন স্তর (খ)

পদার্থে পরিষ্কৃত করে, বা শরে মাটিতে থাকা পানিতে ঝর্বীভূত হয় এবং শরে উড়িদে স্থানান্তরিত হয়। ৮.০২ চিত্রে মাটির কণা, পানি আর বাতাস কীভাবে থাকে সেটি দেখানো হলো।

আমরা যদি কোনো একটি স্থানের মাটির গভীরে যেতে থাকি, তাহলে কী পাব? সব জ্ঞানগার কি মাটির গঠন একই হবে, নাকি ভিন্ন হবে? নিচের দিকে মাটির গঠন পরীক্ষা করে দেখা যায় যে মাটি পাঁচি সমান্তরাল স্তরে বিভক্ত। প্রতিটি স্তরকে দিলবলয় বা হরাইজন (Horizon) বলে। সবার উপরে যে স্তরটি থাকে, তাকে বলে হরাইজন A (Horizon A) বা টপ সরোল (Top Soil)। এই স্তরেই উড়িদ আর প্রাণীর মরা দেহে পচন শুরু হয় এবং উৎপাদিত পদার্থ, বিশেষ করে হিউমাসক অন্যান্য জৈব পদার্থ এই স্তরেই থাকে। এই স্তরে সাধারণত খনিজ পদার্থ থাকে না, সেগুলো পানির সাথে প্রবাহিত হয়ে নিচের স্তরে চলে যায়। প্রথম স্তরের মাটি সাধারণত বায়ুময় হয়। মাটির দ্বিতীয় স্তরটিকে সাবসরোল (Sub Soil) বা হরাইজন B (Horizon B) বলে। এ স্তরে সাধারণ পরিমাপ হিউমাস থাকে। তবে কৰ্ণা-২২, বিজ্ঞান, ১৪-১০ বছৰি

এই স্তর ওপরের স্তর থেকে আসা বনিজ পদার্থে ভরা থাকে। মাটির তৃতীয় স্তরটিকে হরাইজন C (Horizon C) বলে। মাটি তৈরি হয় শিলা থেকে, যেখানে জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়া অঙ্গুত। মূল শিলা আস্তে আস্তে নরম হয়ে এক পর্যায়ে মাটির কণার পরিষ্ঠত হয়। মূল শিলা থেকে পরিবর্তিত হয়ে প্রথমে যে নরম শিলা তৈরি হয়, সেগুলো হরাইজন C- তে থাকে। এই নরম শিলা মূল শিলা থেকে নরম কিন্তু মাটির কণা থেকে অনেক গুণ শূন্য। এই নরম শিলাই পরবর্তীতে পরিবর্তিত হয়ে মাটির কণার পরিষ্ঠত হয়। এই স্তরের নিচে থাকে Horizon D বা মূল শিলা যা খুবই শূন্য। ৮.০৩ টিন্ডে মাটির এই উভয় পঠন দেখানো হলো।

## ৮.১.২ মাটির প্রকারভেদ

তোমরা বলতো, সব জায়গার মাটি কি এক রকম? না, একেক জায়গার মাটি একেক রকম। মাটির পঠন, বর্ণ, পানি ধারণক্ষমতা— এসব বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে মাটিকে মূলত চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো বালু মাটি, পলি মাটি, কাদামাটি এবং দো-আংশ মাটি। এবার আমরা বিভিন্ন প্রকার মাটির বৈশিষ্ট্যগুলো জেনে নিই।

### বালু মাটি

বালু মাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো যে এসের পানি ধারণক্ষমতা খুবই কম। এটি তোমরা নিজেরাই পরীক্ষা করে দেখতে পারবে।



### একক কাজ

**কাজ:** অল্প পরিমাণ বালু মাটি নিয়ে তাতে একটু পানি দাও। এবার হাতের তালুতে নিয়ে এই বালু মাটি দিয়ে পোল পোল ছোট মাটির বলের মতো বানাতে পার কি না দেখ। পারবে না, কারণ বালুতে মাটির পানি ধরে রাখার ক্ষমতা নেই বলে পানি বোগ করলেও বালু মাটি তা শোষণ করতে পারে না। যদি পারত তাহলে পানি মাটির কণার গাঁথে সেগে থাকত আর তোমরা খুব সহজেই বলের মতো মাটির গুঁড়ি বানাতে পারতে।

বালু মাটির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো যে এতে বিদ্যমান মাটির কণার আকার স্বচ্ছের বড়, যার ফলে কণাগুলোর মাঝে কাঁকা জায়গা অনেক বেশি থাকে, তাই অনেক বেশি বায়বায়ন হয়। বালু মাটি তোমরা হাতে নিলে দেখবে যে এরা দানাযুক্ত। বালু মাটিতে খুব ছোট ছোট শিলা আর বনিজ পদার্থও থাকে। বালু মাটিতে হিউমাস থাকলে এটি চাষাবাদের জন্য সহজসাধ্য, কিন্তু বেহেতু এই মাটির পানি ধারণক্ষমতা কম, তাই পানি দিলে তা ছুত নিষ্কাশিত হয়ে যাব এবং ছীঁঅকালে, বিশেষ করে উঠিদে পানির স্বচ্ছতা

দেখা যায়। তাই যে সকল ফসলাদিতে অনেক বেশি পানি লাগে, সেগুলো বালু মাটিতে ভালো হয় না। তবে যখন প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়, যার কারণে জমিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়, সে সকল ক্ষেত্রে বালু মাটি চাষাবাদের জন্য উপযোগী হয়ে উঠতে পারে। কারণ, বালু মাটিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় না, যার ফলে গাছের শিকড় পঁচে না। জলাবদ্ধতার সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে যে এতে গাছের শিকড়ে পঁচন ধরে, যার ফলে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়।

### পলি মাটি

পলি মাটির পানি ধারণক্ষমতা বালু মাটির চেয়ে বেশি। পলি মাটি চেনার উপায় কী? সামান্য পানিযুক্ত মাটি নিয়ে আঙুল দিয়ে ঘষলে যদি মসৃণ অনুভূত হয়, তাহলে বুঝতে হবে এটি পলি মাটি। পলি মাটিতে উপস্থিত পানির জন্য এটি হাতের সাথে লেগে থাকবে, যা বালু মাটির বেলায় ঘটে না। পলি মাটি খুবই উর্বর হয় আর মাটির কণাগুলো বালু মাটির কণার তুলনায় আকারেও ছোট হয়। জমিতে পলি পড়ার কথা তোমরা সবাই জান। পলি মাটির কণাগুলো ছোট হওয়ায় এরা পানিতে ভাসমান আকারে থাকে এবং একপর্যায়ে পানির নিচে থাকা জমিতে পলির আকারে জমা পড়ে। পলি মাটিতে জৈব পদার্থ ও খনিজ পদার্থ (যেমন: কোয়ার্টজ) থাকে। বালু মাটির মতো পলি মাটির কণাগুলোও দানাদার হয় এবং এতে উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উৎপাদন বেশি থাকে।

### কাদা মাটি

তোমরা কাদা মাটি দেখেছ? এই মাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এরা প্রচুর পানি ধারণ করতে পারে। এরা অনেকটা আঠালো ধরনের হয় এবং হাত দিয়ে ধরলে হাতে লেগে থাকে। এই মাটিতে মাটির কণাগুলো খুব সূক্ষ্ম হয়, ফলে কণাগুলোর মধ্যকার রন্ধ্র খুব ছোট আর সরু হয়। কাদা মাটি থেকে সহজে পানি নিষ্কাশিত হয় না। এই জাতীয় মাটিতে সামান্য বৃষ্টিপাত হলেই জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়, তাই ফসলাদি বা উদ্ভিদের মূলে পচন সৃষ্টি করে। কাদা মাটিতে ফসল চাষের জন্য জৈব সার দেওয়া অত্যাবশ্যকীয় হয়ে থাকে। এই মাটিতে খনিজ পদার্থের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে। এই মাটি দিয়ে ঘর সাজানোর তৈজসপত্র, এমনকি গহনাও তৈরি করা হয়।

### দো-আঁশ মাটি

এই মাটি বালু, পলি আর কাদা মাটির সমন্বয়েই তৈরি হয়। দো-আঁশ মাটিতে থাকা বালু, পলি আর কাদা মাটির অনুপাতের উপর নির্ভর করে দো-আঁশ মাটির ধরন কেমন হবে। দো-আঁশ মাটির একদিকে যেমন পানি ধারণক্ষমতা ভালো আবার প্রয়োজনের সময় পানি দ্রুত নিষ্কাশনও হতে পারে। তাই ফসল চাষাবাদের জন্য দো-আঁশ মাটি খুবই উপযোগী।

২০ উপরে উল্লেখিত চার প্রকার ছাড়াও আরো দুই প্রকারের মাটি পাওয়া যায়। একটি হলো পিটি মাটি (Peaty Soil), অন্যটি খড়িমাটি (Chalky Soil)। পিটি মাটি তৈরি হয় মূলত জৈব পদার্থ থেকে; আর

সে কারণে এতে অন্য সব মাটি থেকে জৈব পদার্থের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে। সাধারণত ডোবা আৱ আৰ্দ্ধ এলাকায় এই মাটি পাওয়া যায়। এই মাটিতে পুষ্টিকর উপাদান কম থাকে, তাই ফসল উৎপাদনের জন্য এটি তেমন উপযোগী নয়। অন্যদিকে খড়মাটি ক্ষারীয় হয় এবং এতে অনেক পাথর থাকে। এই মাটি সাধারণত দুট শুকিয়ে যায় এবং সে কারণে ফসল উৎপাদনের জন্য খুব একটা উপযোগী নয় বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে। এছাড়া খড়মাটিতে গাছপালার জন্য অত্যাবশ্যকীয় আয়রন আৱ ম্যাগনেসিয়াম সরবরাহে ঘাটতি থাকে।

### ৮.১.৩ মাটিৰ pH

ফসল উৎপাদনের জন্য মাটিৰ অত্যন্ত গুরুত্বপূৰ্ণ একটি মানদণ্ড হলো এৱ pH। মাটিৰ pH মান জানা থাকলে এটি এসিডিক, ক্ষারীয় না নিৰপেক্ষ সেটি বোৱা যায়। বেশিৰ ভাগ ফসলেৰ বেলাতেই মাটিৰ pH নিৰপেক্ষ হলে অৰ্থাৎ এৱ মান ৭ বা তাৰ খুব কাছাকাছি হলে সৰ্বোচ্চ উৎপাদন পাওয়া যায়। তাই কোনো একটি জমিৰ মাটি পৱীক্ষা করে যদি দেখা যায় এৱ pH ৭-এৱ চেয়ে বেশ কম বা অনেক বেশি তাহলে এৱ pH ৭ কৱাৱ জন্য প্ৰয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্ৰহণ কৱতে হয়। তবে কিছু কিছু ফসল আছে, যেমন: আলু— এবং গম— এৱ মাটিৰ pH ৫-৬ হলে সৰ্বোচ্চ উৎপাদন দেয়। অন্যদিকে কিছু ফসল যেমন: যব, মাটিৰ pH ৮ হলে ভালো উৎপাদন হয়। তাহলে বুঝতেই পাৰছ ভালো ফলনেৰ জন্য মাটিৰ pH অত্যন্ত গুরুত্বপূৰ্ণ এবং মাটিৰ pH অনুযায়ী ফসল নিৰ্বাচন কৱা বেশ জৰুৱি।

### ৮.১.৪ মাটিৰ দূষণেৰ কাৱণ ও ফলাফল

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তোমৰা পানিদূষণ সম্পর্কে জেনেছ। মাটিদূষণ আৱ পানিদূষণ একটিৰ সাথে আৱেকতি সম্পৰ্কযুক্ত অৰ্থাৎ পানিদূষণেৰ জন্য যেসব কাৱণ দায়ী, সেগুলো বেশিৰ ভাগ ক্ষেত্ৰেই মাটি দূষণেৰও কাৱণ। এখন তাহলে আমৰা মাটিদূষণেৰ নিৰ্দিষ্ট কিছু কাৱণ জেনে নিই।

#### শিল্প-কাৱখানা ও গৃহস্থালিৰ বৰ্জ্য

তোমৰা কি জান, আমাদেৱ দেশে শিল্প-কাৱখানা ও গৃহস্থালিৰ বৰ্জ্য কী কৱা হয়? বেশিৰ ভাগ সময় শিল্প-কাৱখানা ও শহৱাঞ্চলেৰ গৃহস্থালিৰ বৰ্জ্য মাটিৰ নিচে গৰ্ত কৱে পুঁতে ফেলা হয় বা কখনো কখনো একটি খোলা জায়গা বা ডাস্টবিনে জড়ো কৱে রাখা হয়। গ্ৰামাঞ্চলে প্ৰায় সব সময়েই বাড়িৰ আশপাশেই জঞ্জাল ফেলা হয়। এসব বৰ্জ্যেৰ পচনশীল দ্ৰব্যগুলো জৈব রাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ মাধ্যমে পচতে থাকে এবং জৈব সাৱে পৱিণত হয়।

তোমৰা কি ধাৰণা কৱতে পাৱ এই জাতীয় দূষণেৰ ফলাফল কেমন হতে পাৱে?

যেহেতু শিল্প-কাৱখানাৰ বৰ্জ্য মাৱকাৱি, জিংক, আৰ্সেনিক ইত্যাদি থেকে শুৱু কৱে এসিড, ক্ষার, লবণ, কীটনাশক—এ ধৰনেৰ হাজাৰো রকমেৰ মাৱাঞ্চক ক্ষতিকৰ পদাৰ্থ থাকে, তাই এই জাতীয়

দূষণের প্রভাবও হয় বহুমাত্রিক। যেমন: মারকারি আর অন্যান্য খাতের পদার্থ মাটিতে বিদ্যমান উপকারী অগুজীবগুলোকে মেরে ফেলে, যার ফলে মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়। আবার মাঝাভিন্ন লবণ, এসিড বা কার গাছগুলো আর ফসলের ক্ষতি করে। এই জাতীয় বর্ণ্য খাকা প্রোটিন বা অ্যামিনো এসিড ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা তেজে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস, সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস কিংবা ফসফরাসের অক্সাইড তৈরি করে, যার কারণে মাটি দূষিত হয়ে পড়ে। সবচেয়ে বড় চিন্তার কারণ হচ্ছে, এ ধরনের দূষণের ফলে ক্ষতিকর পদার্থ মাটি থেকে খাদ্য এবং খাল থেকে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীদেহে প্রবেশ করে যাবাক ব্যাখ্যাবুঝিত কারণ হতে পারে। শুধু তা-ই নয়, এই জাতীয় দূষণের ফলে মাটির জৈব রাসায়নিক ধর্মের পরিবর্তন ঘটতে পারে, যেটি ফসল উৎপাদনে বিবৃত প্রভাব ফেলে।

### তেজক্ষিক পদার্থের নিষ্ঠস্বরূপ

পারমাণবিক বিস্তৃত উৎপাদন কেজ বা পারমাণবিক অজ্ঞ তৈরির কারখালা থেকে দুর্ঘটনা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে বের হয়ে আসা তেজক্ষিক পদার্থ দিয়ে মাটির মারাত্মক দূষণ হতে পারে। রেডন (Rn), গ্রেডিয়াম (Rg), থোরিয়াম (Th), লিভিয়াম (Cs), ইউরেনিয়াম (U) ইত্যাদি তেজক্ষিক পদার্থ শুধু যে মাটির উর্বরতাই নষ্ট করে তা নয়, এরা প্রাণীদেহের কুক ও মুসকুসের ক্যালারের কারণ হতে পারে। উচ্চমাত্রার তেজক্ষিকার ফলে গাছগুলোও মরে যায়। এছাড়া অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থের মতো এরাও খাদ্যশূখলের মাধ্যমে প্রাণীদেহে প্রবেশ করে ভয়াবহ গোগ সৃষ্টি করে।

তোমরা কি চেরোনোবিল দুর্ঘটনার কথা জান?



### সঙ্গত কাজ

**কাজ:** চেরোনোবিল দুর্ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করে এবং ভয়াবহতা নিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

### অতিরিক্ত পলি থেকে মাটিদূষণ

নদীভাণ্ডনের কথা তোমরা সবাই জান। নদী ভাণ্ডনের ফলে নদীর পাঢ় জল্প মাটি বা অন্য কোনোভাবে সৃষ্টি কিংবা পানিতে অভ্যর্তীয় পদার্থ পানির সাথে প্রবাহিত হয়ে একপর্যায়ে কোথাও না কোথাও তলানি আকারে জমা পড়ে। এগুলো কখনো নদ-নদী, খাল-বিল ইত্যাদির তলদেশে জমা হতে পারে আবার কখনো ফসলি জমির উপর জমা হতে পারে। পুরুষপূর্ণ বিষর হলো, এই সমস্ত তলানিতে নানারকম ক্ষতিকর পদার্থ থাকতে পারে। এই জাতীয় তলানি ফসলি জমির ওপর পড়লে সেটি জমির উপরিভাগ, যা ফসল উৎপাদনে মূল ভূমিকা পালন করে, তার ওপর একটা আস্তরণ তৈরি করে। ফলে এই জমির ফসল উৎপাদন ক্ষমতা কমে যাব। এসব পদার্থ নদীগতে জমা হলে কী হয় তা তোমরা বিজীয় অধ্যায়ে ইতিমধ্যে জেনে গেছ।

### খনিজ পদাৰ্থ আহৱণেৰ দ্বাৰা মাটিৰ দূষণ

খনি থেকে মূল্যবান খনিজ পদাৰ্থ বা তেল, গ্যাস ও কয়লার মতো প্ৰয়োজনীয় সম্পদ আহৱণেৰ সময় প্ৰচুৰ মাটি খনন কৰে সৱিয়ে ফেলতে হয়। এতে যেমন বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলেৰ ফসলহানি ঘটে, ঠিক তেমনি মাটিদূষণেৰ ফলে মাটিৰ উৰ্বৱতাৰ নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি অনেক সময় এৱে ফলে সৃষ্টি কৰিবলৈ কারণে তা আশপাশেৰ জলাভূমি ভৱাট কৰে মারাত্মক পৱিষণ্য ঘটাতে পাৰে।

অনেক খনিই বন এলাকায় থাকে, যে কাৰণে খনি খননেৰ কাৰণে বনজ সম্পদ ধৰংস হওয়াৰ পাশাপাশি পৱিষণ্য ঘটে। যাৰ ফলে ঐ সকল স্থানে মাটিদূষণ ঘটে। এছাড়া খনিতে অগ্ৰিকান্ডেৰ ঘটনা (যা সচৰাচৰ ঘটেই চলেছে) ঘটলে তা আশপাশেৰ বিস্তীৰ্ণ এলাকাৰ মাটিৰ উৎপাদনশীলতা নষ্ট কৰে দিতে পাৰে।

এছাড়া অতিৰিক্ত সার, কীটনাশক, আগাছা ধৰংসকাৰী দ্ৰব্যাদি, গাছপালাৰ অবশিষ্টাংশ, প্ৰাণিজ বৰ্জ্য, মাটিৰ ক্ষয় এমনকি কৃষিকাজে উন্নত প্ৰযুক্তিৰ মাত্ৰাতিৰিক্ত ব্যবহাৱেৰ ফলেও মাটিদূষণ হয় এবং মাটিৰ উৰ্বৱতা নষ্ট হয়।

মানুষেৰ মলমূত্ৰ, পাখিৰ বিষ্ঠা বা অন্যান্য প্ৰাণীৰ মলমূত্ৰ থেকে কি মাটিদূষণ হতে পাৰে? হাঁ, অবশ্যই পাৰে। কাৰণ, এসব মলমূত্ৰে রোগ সৃষ্টিকাৰী নানাৱকম জীবাণু থাকে, যাৱা মাটিতে বেড়ে উঠে এবং পৱৰত্তী সময়ে মানুষেৰ শৰীৰে ছড়িয়ে পড়ে রোগ সৃষ্টি কৰে।

### ৮.১.৫ মাটি সংৰক্ষণ কৌশল

মাটি আমাদেৱ একটি অতি মূল্যবান প্ৰাকৃতিক সম্পদ। আমাদেৱ অন্ন, বন্ধু, বাসস্থান এবং চিকিৎসাসহ অন্যান্য যে সকল চাহিদা রয়েছে, তাৰ সবগুলোই প্ৰত্যক্ষ কিংবা পৱৰোক্ষভাৱে মাটিৰ উপৰ নিৰ্ভৰশীল। আমাদেৱ বেঁচে থাকাৰ জন্য অত্যাৰ্থ্যকীয় এই সম্পদটি নানাভাৱে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে এবং এৱে উৰ্বৱতা নষ্ট হচ্ছে। ঝোড়ো বাতাস মাটি উড়িয়ে নেয়, ভাৱী বৃষ্টিপাত, নদীৰ পানিৰ স্রোত বা নদীৰ ভাঙন ইত্যাদি নানা কাৰণে মাটি ক্ষয়প্ৰাপ্ত হয়। মাটি ক্ষয় হলে এৱে উৰ্বৱতা ধৰংসেৰ পাশাপাশি মাটিৰ ধৰংসপ্ৰাপ্ত হয়। আমৰা গাছপালা ও বনজগুল কেটে, পাহাড় কেটে শিল্প-কাৰখনা স্থাপন কৰে (যেমন: ইটভাটা) প্ৰতিনিয়ত মাটিৰ ক্ষয়সাধন কৰে চলেছি। তোমৰা সবাই জান যে সামৰ্থ্যিক কালে পাহাড়ধসে চুটগাম এলাকায় অনেক প্ৰাণহানি ঘটছে, যাৰ মূল কাৰণ পাহাড় কেটে মাটিৰ ক্ষয়সাধন। এই ক্ষয় বন্ধ না হলে এটি আমাদেৱ জন্য মারাত্মক হুমকিৰ কাৰণ হতে পাৰে।

### ক্ষয়রোধ কৰে মাটি সংৰক্ষণ

মাটি সংৰক্ষণেৰ সবচেয়ে কাৰ্য্যকৰ এবং সহজ কৌশল হলো মাটিতে বেশি কৰে গাছ লাগানো। মাটিতে তৃণগুলু ও দুৰ্বা কিংবা অন্য যেকোনো ঘাসজাতীয় উত্তিদ এবং অন্যান্য গাছপালা থাকলে ভাৱী বৃষ্টিপাতও

মাটির ক্ষয়সাধন করতে পারে না। গাছের শিকড় মাটির ভিতরে থাকায় সেটি মাটিকে দৃঢ়ভাবে আটকে রাখে এবং সরে যেতে দেয় না। জমিতে ফসল তোলার পর গোড়া উপড়ে না তুলে জমিতে রেখে দিলে একদিকে যেমন জমির উর্বরতা বাড়ে, অন্যদিকে তেমনি জমির ক্ষয়ও কমে যায়।

বৃষ্টি হলে সাধারণত ঢালু জায়গায় মাটির ক্ষয় বেশি হয়। কাজেই ঢালু জায়গা দিয়ে যেন পানি প্রবাহিত না হতে পারে, তার ব্যবস্থা করা, তবে এই কাজ সবসময় খুব সহজ নয়। এরকম ক্ষেত্রে ঢালু জায়গায় ঘাস, ধনচে বা কলমিজাতীয় গাছ লাগিয়ে মাটির ক্ষয়রোধ করা যায়। গ্রাম এলাকায় অনেকেই ঘাস কেটে বা তুলে গবাদিপশুকে খাওয়ায়। এক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যে ঘাস মাটি থেকে তুলে ফেললে সেটি মাটির ক্ষয়সাধন করে। তাই ঘাস কাটার সময় একেবারে মাটি ধেঁয়ে কাটা উচিত নয়। এ ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় গরু, ছাগল, ভেড়া—এগুলো মাঠে ছেড়ে দেওয়া হয় ঘাস খাওয়ার জন্য। এরা যেন মাটির উপরে থাকা ঘাসের আচ্ছাদন সমূলে ধেঁয়ে না ফেলে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। বনের গাছ কাটার ফলে অনেক সময় বিস্তীর্ণ এলাকা গাছশূন্য এবং অনাচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। কাজেই নতুন গাছ লাগানোর ব্যবস্থা না করে বনের গাছ কখনোই কাটা ঠিক নয়। অন্যথায় কোনোভাবে মাটির ক্ষয়সাধন রোধ করা যাবে না।

রাসায়নিক সারের পরিবর্তে যতটুকু সম্ভব জৈব সার ব্যবহার করা উচিত, কারণ জৈব সারে থাকা উপাদান ও হিউমাস পানি শোষণ করতে পারে। ফলে অল্প বৃষ্টিপাতে মাটির ক্ষয় হয় না। এছাড়া রাসায়নিক সার মাটিতে বসবাসকারী অনেক উপকারী পোকামাকড় অণুজীব ধর্মস করে দেয়, যার ফলে মাটির উর্বরতাও নষ্ট হয়ে যায়। একই জমিতে বারবার একই ফসল চাষ করলেও উর্বরতা নষ্ট হয়। তাই একই জমিতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের ফসল চাষ করা উচিত।

### নদীভাঙ্গনের মাধ্যমে মাটির ক্ষয় বন্ধ করা

নদীর পাড়ে কলমি, ধনচে ইত্যাদি গাছ লাগানো যায়। নদী অত্যধিক খরস্ন্মোত্তা হলে নদীর পাড়ে বালুর বস্তা ফেলে বা কংক্রিটের তৈরি ব্লক দিয়ে ভাঙ্গন ঠেকানো ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না।

## ৮.২ মাটিতে অবস্থিত সাধারণ খনিজ

আমরা যে নানারকম খনিজ লবণ, পেসিলের সিস, ট্যালকম পাউডার, চীনা মাটির থালা-বাসন এরকম হাজারো জিনিস ব্যবহার করি, তার অধিকাংশই মাটি কিংবা শিলা থেকে পাওয়া খনিজ পদার্থ। বেশির ভাগ খনিজ পদার্থই কঠিন অবস্থায় পাওয়া যায়। এদের নির্দিষ্ট রাসায়নিক সংযুক্তি থাকে। এখন পর্যন্ত প্রকৃতিতে প্রায় ২৫০০ রকমের খনিজ পদার্থ পাওয়া গেছে। খনিজ পদার্থ ধাতব কিংবা অধাতব দুটোই হতে পারে। ধাতব খনিজ পদার্থের মাঝে অন্যতম হলো লোহা (Fe), তামা (Cu), সোনা (Au) কিংবা বুপা (Ag)। অধাতব খনিজ পদার্থের মধ্যে রয়েছে কোয়ার্টজ (Quartz), মাইকা (Mica) কিংবা খনিজ লবণ।

কয়লা, গ্যাস, পেট্রোল এসব কী খনিজ পদার্থ? হ্যাঁ, অবশ্যই এগুলোও খনিজ পদার্থ। তবে এদেরকে জৈব খনিজ পদার্থ বলে। এদের সম্পর্কে তোমরা পরবর্তী পাঠে বিস্তারিত জানতে পারবে।

### টেবিল ৮.১: কয়েকটি সাধারণ খনিজ পদার্থের ব্যবহার

ক্রমিক নং	খনিজ পদার্থ	ব্যবহার
০১	ম্যাগনেটাইট ( $\text{Fe}_3\text{O}_4$ )	লোহা তৈরিতে
০২	চুনাপাথর ( $\text{CaCO}_3$ )	ঘরবাড়ি তৈরিতে এবং সিমেন্ট, সোডা, প্লাস, লোহা ও স্টিল উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া মাটি এসিডিক হলেও এটি ব্যবহার করে মাটিকে প্রশমন করা হয়।
০৩	কোয়ার্টজ ( $\text{SiO}_2$ )	কাচ, সিরিচ কাগজ, রেডিও বা ঘড়ি তৈরিতে।
০৪	সিলভার বা রুপা (Ag)	গহনা ও ধাতব মুদ্রা তৈরিতে।
০৫	মাইকা (Mica)	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে বিদ্যুৎ নিরোধক হিসেবে।
০৬	জিপসাম ( $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ )	সিমেন্ট ও প্লাস্টার অব প্যারিস তৈরির কাঁচামাল।
০৭	ধাতব পাইরাইটস	সালফার এবং নানা রকম ধাতু তৈরিতে।
০৮	সোনা ও হীরা	গহনা তৈরিতে।
০৯	গ্যাস, কয়লা, পেট্রোল	জ্বালানি হিসেবে, রান্নার কাজে, গাড়ি ও শিল্পকারখানায়।

### খনিজ পদার্থের ভৌত ধর্ম

খনিজ পদার্থগুলো সাধারণত দানাদার বা কেলাসাকার হয়। অনেক খনিজ পদার্থ আছে, যাদের রাসায়নিক সংযুক্তি একই কিন্তু তাদের কেলাস গঠন ভিন্ন যে কারণে তাদের ভৌত ধর্মও ভিন্ন। যেমন- গ্রাফাইট ও ডায়মন্ড। যদিও দুটি পদার্থই কার্বন দিয়ে গঠিত, কিন্তু গঠনের ভিন্নতার কারণে গ্রাফাইট (যা আমরা পেপিলে ব্যবহার করি) নরম হয় কিন্তু ডায়মন্ড বা হীরা এখন পর্যন্ত জানা খনিজের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন খনিজ পদার্থ।

খনিজ পদার্থগুলো সাধারণত কঠিন হয় এবং একেকটি খনিজের কাঠিন্য একেক রকম। বেশি কঠিন খনিজ খুব সহজেই কম কঠিন খনিজে দাগ কাটতে পারে; কিন্তু কম কঠিন খনিজ বেশি কঠিন খনিজে দাগ কাটতে পারে না। কাঠিন্য অনুযায়ী সবচেয়ে নরম খনিজ হলো ট্যালক (Talc), যা দিয়ে ট্যালকাম পাউডার তৈরি হয় এবং আগেই বলা হয়েছে, সবচেয়ে কঠিন খনিজ হলো হীরা বা ডায়মন্ড। খনিজ পদার্থের নির্দিষ্ট দৃতি থাকে। ধাতব খনিজ যেমন: পাইরাইটস ধাতুর মতোই দৃতি প্রদর্শন করে অর্থাৎ অনেকটা ধাতুর মতোই চকচক করে। খনিজ হীরা অধাতু এবং এটিকে দেখে সাধারণ কাচের মতো মনে

হতে পারে কিন্তু এটি কাটার পর এর দ্যুতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কিছু কিছু খনিজ পদার্থ আছে, যেগুলো খুব স্বচ্ছ এবং এর মধ্যে আলো প্রবেশ করতে পারে। যেমন: কোয়ার্টজ বা সিলিকা, আবার কিছু কিছু খনিজ পদার্থ আছে, যার মধ্য দিয়ে আলো প্রবেশ করলেও এর মধ্য দিয়ে কোনো বস্তু দেখা যায় না, যেমন: অ্যারাগনাইট। অন্যদিকে এমন খনিজও আছে, যার মধ্য দিয়ে মোটেই আলো প্রবেশ করতে পারে না, যেমন: ক্যালসাইট (Calcite) বা চুনাপাথর। সাধারণত প্রতিটি খনিজ পদার্থেই একটা নির্দিষ্ট বর্ণ আছে, যা দিয়ে একটি থেকে আরেকটিকে আলাদা করা যায়।

বেশির ভাগ খনিজ পদার্থে ফাটল থাকে, যা দেখে অনুমান করা যায় এটি ভাঙলে কী ধরনের আকার-আকৃতিবিশিষ্ট ছোট ছোট টুকরা পাওয়া যাবে। বেশির ভাগ খনিজ পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব  $2.5-3.5$ -এর মধ্যে হয়, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হতে পারে।

**রাসায়নিক ধর্ম:** খনিজ পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম নির্ভর করে এতে বিদ্যমান উপাদানের উপর।

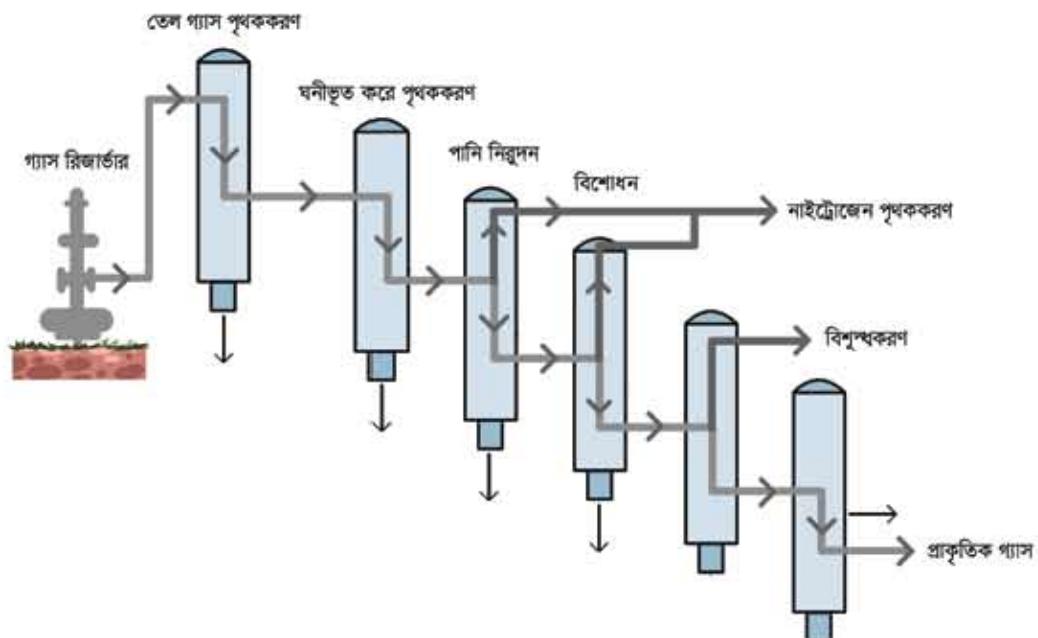
## ৮.৩ বাংলাদেশে প্রাকৃতিক জ্বালানির উৎস

বাংলাদেশে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক জ্বালানির মধ্যে অন্যতম হলো প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা এবং পেট্রোলিয়াম। এছাড়া রান্নার কাজে ব্যবহৃত কাঠের খড়ি, গাছের পাতা, পাটকাঠি, ধানের গুঁড়া এবং খড় বা গোবর দিয়ে তৈরি লাকড়ি, এগুলোকেও প্রাকৃতিক জ্বালানি হিসেবে গণ্য করা যায়। এখন আমাদের দেশে বহুল ব্যবহৃত গ্যাস, কয়লা ও পেট্রোলিয়াম সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক।

### ৮.৩.১ প্রাকৃতিক গ্যাস

তোমরা কি জান আমরা বাসায় গ্যাসের চুলায় বা সিএনজি (CNG) পাম্প স্টেশন থেকে গাড়িতে যে গ্যাস নিই, তাতে আসলে কী গ্যাস থাকে? এতে থাকে প্রাকৃতিক গ্যাস, যা মূলত মিথেন ( $\text{CH}_4$ ) গ্যাস, তবে সামান্য পরিমাণে অন্যান্য পদার্থ যেমন: ইথেন, প্রোপেন এবং বিউটেনও থাকে। এছাড়া এতে অতি সামান্য পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন সালফাইড, হাইড্রোজেন, আর্গন এবং হিলিয়াম থাকে।

এখন প্রশ্ন হলো, কীভাবে প্রাকৃতিক গ্যাস তৈরি হয়? প্রাকৃতিক গ্যাস কীভাবে তৈরি হয় তা নিয়ে কিছুটা ভিন্ন মত আছে। সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী, প্রাকৃতিক গ্যাস তৈরি হয় মৃত গাছপালা ও প্রাণীদেহ থেকে। লক্ষ লক্ষ বছর আগে মরে যাওয়া গাছপালা ও প্রাণীর পচা দেহাবশেষ কাদা ও পানির সাথে ভূগর্ভে জমা হয়। সময়ের সাথে সাথে এগুলো বিভিন্ন রকম শিলা স্তরে ঢাকা পড়ে। শিলা স্তরের চাপে পচা দেহাবশেষ ঘনীভূত হয় এবং প্রচল্প চাপে ও তাপে দেহাবশেষে বিদ্যমান জৈব পদার্থ প্রাকৃতিক গ্যাসে ও পেট্রোলিয়ামে পরিণত হয়। প্রকৃতিতে এভাবে উৎপন্ন গ্যাসের খনিকে আমরা গ্যাসকূপ বলি।



চিত্র ৮.০৩: প্রাকৃতিক গ্যাস প্রক্রিয়াজাতকরণ

### প্রাকৃতিক গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ

প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রক্রিয়াকরণ একটি জটিল প্রক্রিয়া, যেটি কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয় (চিত্র ৮.০৩)। সাধারণত বেখালে গ্যাসকূপ পাওয়া থার, সেখালেই এর প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। প্রক্রিয়াকরণ অনেকাংশে নির্ভর করে গ্যাসের গঠন অর্থাৎ এতে বিদ্যমান অন্যান্য পদার্থের উপর। সাধারণত গ্যাসকূপে গ্যাস ও ভেল একসাথে থাকে। তাই প্রথমেই ভেলকে গ্যাস থেকে আলাদা করা হয়। এরপর প্রাকৃতিক গ্যাসে থাকা বেলজিল ও বিটুটেল ঘনীভূত করে আলাদা করা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাসে থাকা পানি দূর করার জন্য নিয়ন্ত্রকের মধ্যে দিয়ে চালনা করা হয়। অতঃপর গ্যাসে থাকা দূষকগুলো ( $H_2S$ ,  $CO_2$ ) পৃথক করা হয়। এরপর প্রাপ্ত গ্যাসের মিশ্রণ থেকে নাইট্রোজেন আলাদা করা হয়। এই অবস্থায় প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাস বিশুদ্ধ মিথেন গ্যাস, যেটি পাইপলাইনের মাধ্যমে সঞ্চালন করা হয়।

### ব্যবহার

প্রাকৃতিক গ্যাস আমরা নানা কাজে ব্যবহার করি। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ইউরিয়া সার উৎপাদন। শতকরা প্রায় ২১ ভাগ প্রাকৃতিক গ্যাস ইউরিয়া সারের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে বেশির ভাগ বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় প্রাকৃতিক গ্যাস দিয়ে। শতকরা প্রায় ৫১ ভাগ প্রাকৃতিক গ্যাসই বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। প্রায় শতকরা ২২ ভাগ প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয় শিল্প-কারখানায়, ১১ ভাগ বাসা-বাড়িতে এবং ১১ ভাগ জ্বালানি হিসেবে। এছাড়া প্রায় শতকরা ১ ভাগ প্রাকৃতিক গ্যাস

বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে জ্বালানির কাজে ব্যবহৃত হয়। বাকি শতকরা ৫ ভাগ অপচয় (System Loss) হয়। আমাদের দেশে ২০০৩ সাল থেকে যানবাহনে জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা শুরু হয়েছে।

### সীমাবদ্ধতা ও সংরক্ষণ

তোমাদের কি মনে হয় আমাদের যে প্রাকৃতিক গ্যাস মজুত আছে তা অফুরন্ট? না, মোটেও তা নয়। মজুত প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিমাণ নির্দিষ্ট এবং সীমিত। ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে একসময় তা শেষ হয়ে যাবে। তাই এই মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে আমাদের অত্যন্ত সচেতন হতে হবে, কোনোভাবেই এটিকে অপচয় করা যাবে না। অনেকে বাসায় বিনা প্রয়োজনে গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখে এবং এতে অতি মূল্যবান এই সম্পদের অপচয় করে, যা কোনোমতেই সমীচীন নয়। এসব বিষয় নিয়ে সবাইকে যার যার নিজের বাসায় এবং এলাকার সবাইকে সচেতন করতে হবে।

### ৮.৩.২ পেট্রোলিয়াম

পেট্রোলিয়াম হলো খনিতে পাওয়া তরল জ্বালানি পদার্থ। সাধারণত প্রাকৃতিক গ্যাসের সাথে খনিতে পেট্রোলিয়ামও থাকে। প্রোপেন ও বিউটেন স্বাভাবিক চাপ ও তাপমাত্রায় ( $25^{\circ}$  সেলসিয়াস) গ্যাসীয় হলেও উচ্চ চাপে তরল অবস্থায় থাকে বলে এরাও পেট্রোলিয়ামের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া গ্যাসোলিন, কেরোসিন, ডিজেল— এগুলো সবই পেট্রোলিয়াম।

### পেট্রোলিয়াম প্রক্রিয়াকরণ

খনি থেকে প্রাপ্ত তেল মূলত নানারকম হাইড্রোকার্বন এবং অন্যান্য পদার্থের (যেমন- সনালফার) মিশ্রণ, তাই বেশিরভাগ সময়েই তা সরাসরি ব্যবহারের উপযোগী হয় না। সেজন্য অপরিশোধিত তেল পরিশোধন করে নিতে হয়। প্রায়  $800^{\circ}$  সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আংশিক পাতন করে/ আংশিক পাতনের মাধ্যমে অপরিশোধিত তেলের উপাদানগুলোকে আলাদা করা হয়।

### পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার

পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থের বড় একটি অংশ ব্যবহৃত হয় যানবাহনে জ্বালানি হিসেবে। কৃষিজমিতে সেচকাজে, ডিজেলচালিত ইঞ্জিনে জ্বালানি হিসেবে প্রচুর পরিমাণে পেট্রোলিয়াম ব্যবহৃত হয়। এছাড়া শিল্প-কারখানায় সার, কীটনাশক, মোম, আলকাতরা, লুব্রিকেন্ট, গ্রিজ ইত্যাদি তৈরিতেও পেট্রোলিয়াম ব্যবহৃত হয়।

### ৮.৩.৩ কয়লা

কয়লা হলো কালো বা কালচে বাদামি রঙের একধরনের পাললিক শিলা। এতে বিদ্যমান মূল উপাদান হচ্ছে কার্বন। তবে স্থানভেদে এতে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে হাইড্রোজেন ( $H_2$ ), সালফার (S), অক্সিজেন

(O<sub>2</sub>) কিংবা নাইট্রোজেন (N<sub>2</sub>) থাকে। কয়লা একটি দাহ্য পদার্থ, তাই জ্বালানি হিসেবে এর বহুল ব্যবহার রয়েছে।

প্রাকৃতিক গ্যাস আর খনিজ তেলের মতো কয়লা একটি জীবাশ্ম জ্বালানি (Fossil Fuel) হলেও এর গঠন প্রক্রিয়া আলাদা। প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন বছর আগে জলাভূমিতে জন্মানো প্রচুর ফার্ন, শৈবাল, গুল্ম ও অন্যান্য গাছপালা মরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কয়লা তৈরি হয়েছে। গাছপালায় বিদ্যমান জৈব পদার্থে থাকা কার্বন প্রথমে জলাভূমির তলদেশে জমা হয়। এভাবে জমা হওয়া কার্বনের স্তর আস্তে আস্তে পলি বা কাদার নিচে চাপা পড়ে যায় এবং বাতাসের সংস্পর্শ থেকে পুরোপুরি বিছিন্ন হয়ে যায়। এরকম অবস্থায় কার্বনের স্তর আরো ক্ষয় হয়ে পানিযুক্ত, স্পঞ্জের মতো ছিদ্রযুক্ত জৈব পদার্থে পরিণত হয়, যাকে বলা হয় পিট (Peat)। পিট অনেকটা হিউমাসের মতো পদার্থ। পরবর্তীতে উচ্চ চাপে ও তাপে এই পিট পরিবর্তিত হয়ে কার্বনসমৃদ্ধ কয়লায় পরিণত হয়। কয়লা তিনি রকমের হয়। যেমন: অ্যানথ্রাসাইট, বিটুমিনাস এবং লিগনাইট। অ্যানথ্রাসাইট হলো সবচেয়ে পুরোনো ও শক্ত কয়লা, যা প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন বছর আগে তৈরি এবং এতে শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ কার্বন থাকে। বিটুমিনাস কয়লা প্রায় ৩০০ মিলিয়ন বছরের পুরোনো এবং এতে শতকরা ৫০-৮০ ভাগ কার্বন থাকে। লিগনাইট কয়লা ১৫০ মিলিয়ন বছরের পুরোনো আর এতে সর্বোচ্চ শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত কার্বন থাকে।

### প্রক্রিয়াকরণ

ভূগর্ভের কয়লার খনি থেকে মেশিনের সাহায্যে কয়লা উত্তোলন করা হয়। কয়লা উত্তোলনের জন্য দুটি পদ্ধতি আছে। একটি হলো ওপেন পিট মাইনিং (Open Pit Mining) আর অন্যটি হলো ভূগর্ভস্থ মাইনিং (Underground Mining)। সাধারণত কয়লার স্তর ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি থাকে বলে ওপেন পিট মাইনিং পদ্ধতি বেশি ব্যবহৃত হয়। মেশিন দিয়ে ভূগর্ভ থেকে কয়লা তোলার পর কনভেয়ার বেল্ট দিয়ে সেগুলো প্রক্রিয়াকরণ প্লান্টে নেওয়া হয়। সেখানে কয়লায় থাকা অন্যান্য পদার্থ যেমন : ময়লা, শিলা কণা, ছাই, সালফার— এগুলোকে পৃথক করে ফেলা হয়।

### ব্যবহার

তোমরা কি জান, কোন কোন কাজে কয়লা ব্যবহার করা হয়? বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি কয়লা ব্যবহৃত হয় ইটের ভাটায়। জ্বালানি হিসেবে শিল্প-কারখানায় এবং বাসা-বাড়িতে জ্বালানি হিসেবেও সামান্য কিছু কয়লা ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে এখনো কয়লা ব্যবহৃত না হলেও পৃথিবীর সব দেশেই বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার ব্যবহার খুবই বেশি। এছাড়া হোটেল-রেস্তোরাঁয় কাবাব-জাতীয় খাবার তৈরিতে এবং কর্মকার ও স্বর্ণকারণ বিভিন্ন সামগ্রী এবং অলংকার তৈরির সময় কয়লা ব্যবহার করে থাকেন।

প্রাকৃতিক জ্ঞানান্বিত সংরক্ষণে নবায়নযোগ্য শব্দ; আলোচিত প্রাকৃতিক জ্ঞানান্বিত সবগুলোই এক সমস্যা নিষ্ঠারে হয়ে যেতে পারে। তাই এগুলোর ব্যবহার করানো ও সংরক্ষণের জন্য আমরা নবায়নযোগ্য শব্দের ব্যবহার বাঢ়াতে পারি। সৌরশংস্কৃত, বায়ুপ্রবাহ, পানির হ্রোত— এগুলোকে কাজে লাগিয়ে আমরা প্রাকৃতিক জ্ঞানান্বিত উপর চাপ করাতে পারি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্ম শব্দ সংরক্ষণ করতে পারি।

## অনুশীলনী



### ব্যুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সবচেয়ে নবব খনিজ কোনটি?

- |            |              |
|------------|--------------|
| (ক) হীরা   | (খ) ট্যাঙ্ক  |
| (গ) সিলিকা | (ঘ) চুনাপাথর |

২. সাবস্বারেল স্বতন্ত্রের মাটি:

- (i) শিলাচূর্ণে ভরপুর
- (ii) খনিজ পদার্থসমূহ
- (iii) জৈব পদার্থসমূহ

নিচের কোনটি সঠিক?

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| (ক) i ও ii   | (খ) i ও iii     |
| (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |

নিচের অনুবোধটি পঢ়ে শ ও ষ নং পঞ্জের উপর দাখ:

টোকিও শহরে গারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাছাকাছি মাটিতে কোনো উড্ডিদ জন্মে না কেবল মাঝরুম ভালো জন্মে।

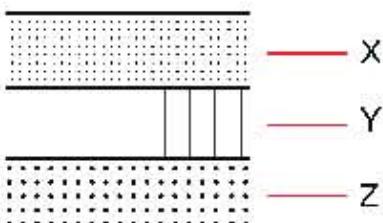
৩. এই মাটিতে কোনটির আধিক্য রয়েছে?

- (ক) শিলা
- (খ) খনিজ পদার্থ
- (গ) জৈব পদার্থ
- (ঘ) তেজস্বিয় পদার্থ

৪. কোন মাটিতে ভালো ফসল হলো?

- (ক) বালু ও খনিজ মিশ্রিত মাটিতে
- (খ) খনিজ ও খনিজ পদার্থ মিশ্রিত মাটিতে
- (গ) বালি ও পলি মিশ্রিত মাটিতে
- (ঘ) বালি, পলি ও কাদা মিশ্রিত মাটিতে

পরবর্তী চিত্রটি থেকে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৫. কোন স্তরে শিলাগূর্ণ থাকে?

- (ক) X স্তরে
- (খ) Y স্তরে
- (গ) Z স্তরে
- (ঘ) Z স্তরের নিচে

৬. সবচেয়ে উপরের স্তরের মাটিতে ভালো ফসল হওয়ার কারণ হলো, এ মাটিতে:

- (ক) জৈব পদার্থ থাকে
- (খ) শিলাচূর্ণ বিদ্যমান
- (গ) খনিজ উপাদান থাকে
- (ঘ) অগুজীব থাকে

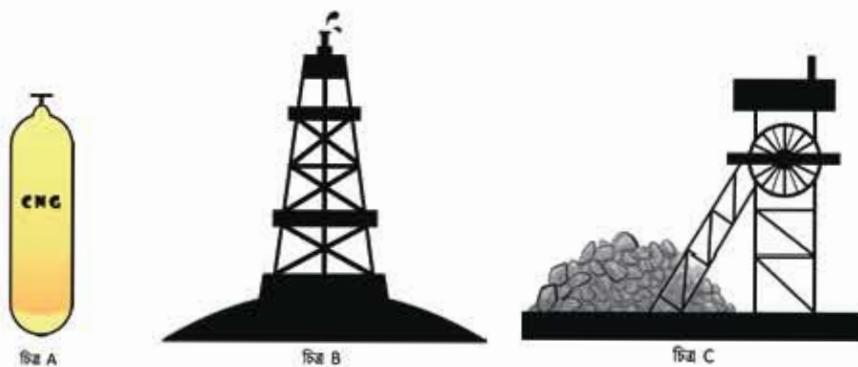


### সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বকুলদের এলাকার মাটি শিলা ও খনিজ পদার্থ মিশ্রিত। এ মাটির কথাগুলো আকারে বড়। পানি ঝুর কাঢ়াতাক্ষি সরে যায়। অপরদিকে শাহীনদের এলাকার মাটির কথাগুলো আকারে ছোট এবং জৈব ও খনিজ পদার্থসমূহ।

- (ক) বায়বায়ন কাকে বলে?
- (খ) হরাইজন কীভাবে তৈরি হয়?
- (গ) বকুলদের এলাকার মাটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর।
- (ঘ) বকুল ও শাহীনদের এলাকার মধ্যে কোনটিতে বেশি ফসল ফলবে? যুক্তিসহ তোমার মতামত দাও।

୨. ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ର ତିନାଟି ଲଙ୍ଘ କର ଏବଂ ଶାଖାଗୁଡ଼ୋର ଉତ୍ତର ଦାଓ ।



(କ) ପେଟ୍ରୋଲିଆମ କୀ?

(ଖ) ଜୀବାଶ୍ମ ଜ୍ଵାଳାନି ବଣାତେ କୀ ବୁଝାଯା?

(ଗ) A ଚିତ୍ରର ଜ୍ଵାଳାନିଟି ଥିଲି ଥେବେ ଫୁଲେ କୌଣସି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରା ହସି? ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।

(ଘ) ଚିତ୍ର B-ଏର ଶକ୍ତି ଉତ୍ସାଦନେର ଜଳ୍ୟ A ଓ C ଜ୍ଵାଳାନିଟିର ମଧ୍ୟ କୋଣଟି ବେଳି ସାଫ୍ଟର୍ କାମକାରୀ? ଯୁଦ୍ଧିଷ୍ଠିର ଅଭିଭାବକ ଦାଓ ।

নবম অধ্যায়

## দুর্ঘেগের সাথে বসবাস



বন্যা, শূর্পিবড়, খরা ইত্যাদি নানারকম প্রাকৃতিক দুর্ঘেগ বাংলাদেশে লেগেই আছে। এসব দুর্ঘেগে জানমাজের অশুরপীর ক্ষরক্ষণি আমাদের অধিনেতৃক সমৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে বড় অস্তরায়। পরিবেশের উপর মানুষের নানারকম ইস্তকেপের ফলে এসব প্রাকৃতিক দুর্ঘেগ সাহস্রাত্মক কালে মারাত্মক আকার ধারণ করেছে।



### এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- পরিবেশগত সমস্যা সূচির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দুর্যোগ সূচির কারণ, প্রতিরোধ, মোকাবেলার কৌশল এবং তাঁক্ষণিক কর্মশীল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সুন্ধ জীববাসনে মানসম্মত ও উন্নত পরিবেশের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারব।
- প্রকৃতির সংরক্ষণশীলতার বিভিন্ন কৌশল বর্ণনা করতে পারব।
- নিজ এলাকার মানসম্মত ও উন্নত পরিবেশ সূচির সমস্যা ও চাঙেজ মোকাবিলায় একটি অনুসম্মানযুক্ত কাজ সম্পর্ক করতে পারব।
- দুর্যোগ প্রতিরোধ এবং দুর্বোগের কর্মশীল বিষয়ে সমাজকে সচেতন করার বিষয়ে পোস্টার অঙ্কন করতে পারব।
- প্রকৃতির সংরক্ষণশীলতার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সূচি বিষয়ে পোস্টার অঙ্কন করতে পারব।
- পরিবেশ সংরক্ষণে সমাজে সচেতনতা সূচির উদ্দোগ প্রস্তুত করব।

## ৯.১ জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব

### ৯.১.১ বাংলাদেশ প্রকাগট

তোমরা ইতোমধ্যে আবহাওয়া, জলবায়ু এবং তাদের পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে জেনেছ। এখন আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলাফল আর তার প্রভাব সম্পর্কে জেনে নিই।

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং মাঝেই সর্কৃপীয় পর্যায়ে চলে এসেছে। নিচে এগুলো তুলে ধরা হলো।

### খাতুর পরিবর্তন

বাংলাদেশ ছয় খাতুর দেশ এবং একসময় প্রতিটি খাতুর নিষ্পত্তি বিস্মান ছিল। জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে এ খাতুচক্রের উচ্চের্খণ্ডে পরিবর্তন হতে দেখা যাচ্ছে। আবাঢ় ও শ্রাবণ, দুই মাস বর্ষাকাল হলেও দেখা যাচ্ছে যে আশ্রিত মাসেও জারী বৃষ্টিগাত হচ্ছে, শুধু তা-ই নয়, তা অসময়ে বন্যার কারণ হিসেবে দেখা দিচ্ছে। অন্যদিকে শীতকাল থীরে থীরে সংকৃতিত হয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি সর্কৃপীয় যে গ্রীষ্মকালে অনেক বেশি গরম পড়ছে এবং মাঝে মাঝে দেশের কোনো কোনো এলাকার দিনের তাপমাত্রা  $45-48^{\circ}$  সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠে যাচ্ছে। অন্যদিকে শীতের সময় কখনো কখনো তাপমাত্রা অনেক বেশি করে যাচ্ছে। অস্বাভাবিক এই গরম আর শীতের কারণে কোথাও কোথাও প্রাণহানি পর্যন্ত ঘটছে।

### বন্যা

নদীমাত্রক বাংলাদেশে বন্যা একটি স্থানান্বিক ব্যাপার এবং অনেকাংশেই দরকারি। বন্যার ফলে জমিতে পলি পড়ে, বা জমির উর্বরতা বাঢ়ায়, এতে ফসল উৎপাদন জালো হয়। কিন্তু সাম্প্রতিককালে জলবায়ুজ্বন্ধন পরিবর্তনের ফলে ঘন ঘন এবং অসময়ে প্রলংয়করী বন্যা লক্ষ করা যাচ্ছে। আগের দিনে এ ধরনের বন্যা যে হয়নি তা নয়, তবে এত ঘন ঘন হয়নি। ১৯৮৮, ১৯৯৫, ১৯৯৮, ২০০৫ সালে বাংলাদেশে প্রলংয়করী বন্যার জানালের অপূর্বীয় ক্ষতি হয়েছে।

এ কারণে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির উপর বিবৃপ প্রভাব পড়ছে। বাংলাদেশের যে সকল অঞ্চল বন্যাধৰণ নয়, যেমন: যশোর, ঢাকা সে সকল অঞ্চলও মাঝে মাঝে এখন বন্যার প্রাবিত হয়ে যাচ্ছে।



চিত্র ৯.০১: নদীভাঙ্গন

### নদীমাত্রক

নদীমাত্রক বাংলাদেশে নদীভাঙ্গন (চিত্র ৯.০১)

একটি স্বাভাবিক ঘটনা হলেও সাম্প্রতিককালে তা অনেক বেড়ে গিয়েছে। এতে একদিকে যেমন বিপুল জনগোষ্ঠী ঘর-বাড়ি হারিয়ে গৃহহীন হয়ে পড়ছে, অন্যদিকে আবাদি জমিও নদীগর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে। আমাদের বিশাল জনসংখ্যার দেশটির জন্য এটি মারাত্মক একটি সমস্যা। নদীভাঙ্গনের ফলে গৃহহারা লোকজন যায়াবরের মতো বা শহর অঞ্চলের বস্তিতে অমানবিক জীবনযাপন করছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বিগত তিন দশকে প্রায় ১৮০,০০০ হেক্টার জমি শুধু পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা এই তিন নদীগর্ভে হারিয়ে গেছে।

### খরা

কৃষিপ্রধান দেশ হওয়ায় খরা বাংলাদেশের জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের অন্যতম কারণ হলো বৈশ্বিক উষ্ণতা। এর ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে, যা বৃষ্টিপাত্রে উপর প্রচণ্ড প্রভাব ফেলছে। কোনো কোনো অঞ্চলে বৃষ্টিপাত্র একেবারেই কমে গিয়ে খরার সৃষ্টি করছে। জলবায়ুজনিত সৃষ্টি খরায় বাংলাদেশে ফসল উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে পারে।

### পানির লবণাক্ততা

জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রে পানির উচ্চতা বেড়ে গেলে বাংলাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড পানির নিচে তলিয়ে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি মূল ভূখণ্ডে ঢুকে নদ-নদী, ভূগর্ভের পানি এবং আবাদি জমিও লবণাক্ত হয়ে পড়বে। তখন একদিকে যেমন খাওয়ার পানির প্রচণ্ড অভাব দেখা যাবে, অন্যদিকে তেমনি জমিতে লবণাক্ততার জন্য ফসল উৎপাদনও ব্যাহত হবে। অতি সাম্প্রতিককালের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় ৮৩০,০০০ হেক্টার জমি লবণাক্ততার কারণে কৃষি অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। কাজেই জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে লবণাক্ত পানির কারণে বাংলাদেশে ভয়াবহ খাদ্যবুাকিতে পড়তে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি কোনো উদ্যোগ নেওয়া না হয় তাহলে জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত কারণে ২১০০ সালের মধ্যে ৩০% খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পাবে। ২০৫০ সাল নাগাদ চাল আর গমের উৎপাদন যথাক্রমে ৮.৮% এবং ৩২% হ্রাস পাবে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় উপকূলীয় বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার প্রায় ১৩% কৃষিজমি এর মাঝেই লবণাক্ততার শিকার হয়ে গেছে। ২০৫০ সাল নাগাদ তা ১৬% এবং ২১০০ সাল নাগাদ সেটি ১৮% এ পৌঁছাবে।

### সামুদ্রিক প্রবাল বুকি

সামুদ্রিক প্রবাল তাপমাত্রার প্রতি খুব সংবেদনশীল। সাধারণত  $22-28^{\circ}$  সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রবালের জীবনযাপনের জন্য উপযোগী। এই তাপমাত্রার  $1-2^{\circ}$  বেড়ে গেলেই তা প্রবালের জন্য মারাত্মক হুমকি

হিসেবে কাজ করে। এক গবেষণায় পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১৯৬০ সালে সেন্টমার্টিন দ্বীপে যে পরিমাণ প্রবাল ছিল, ২০১০ সালে তার প্রায় ৭০% বিলীন হয়ে গেছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এক্ষেত্রে পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি ছাড়াও পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা না থাকাও এর অন্যতম কারণ।

### বনাঞ্চল

বাংলাদেশের একমাত্র ম্যানগ্রোভ বন হলো সুন্দরবন, যা শুধু যে জীববৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ এক বন তা নয়, এটি আমাদের মহামূল্যবান সম্পদ। আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এছাড়া এই অঞ্চলে সাইক্লোন, হ্যারিকেন প্রতিরোধে এই সুন্দরবন রক্ষাকৰ্চ হিসেবে কাজ করে। সাম্প্রতিককালের বাড়ে এর বড় একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে সমুদ্রের পানির উচ্চতা যদি ৪৫ সেন্টিমিটার বাড়ে, তাহলে আমাদের একমাত্র এই ম্যানগ্রোভ বনের ৭৫% পানির নিচে তলিয়ে যাবে। আর যদি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বাড়ে, তাহলে প্রায় পুরো সুন্দরবন এবং এর জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে যাবে।

### মৎস্যসম্পদ

এক সময় বাংলাদেশের নদ-নদী, পুরুর কিংবা বিলে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। নদীমাত্রক বাংলাদেশের অনেক নদীতে এখন আর আগের মতো পর্যাপ্ত মাছ পাওয়া যায় না। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মাছের বাসস্থান, খাদ্য সংগ্রহ এবং জৈবিক নানা প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে, এমনকি মাঝে মাঝে মাছ মারাও যায়। অনেক মাছ এবং মাছের পোনা পানির তাপমাত্রা  $32^{\circ}$  সেলসিয়াসের বেশি হলে মরে যায়। যেহেতু উচ্চ তাপমাত্রা ( $35^{\circ}$  সেলসিয়াস) রোগজীবাণু জন্মাতে সাহায্য করে, তাই তাপমাত্রা বেড়ে গেলে মাছে রোগ সংক্রমণ বেশি হয় এবং মাছের মড়ক লাগে। এছাড়া লবণাক্ত পানি মূল ভুখণ্ডের মিঠা পানিতে চুকে পড়লে মিঠা পানির মাছও আর বাঁচতে পারবে না।

### স্বাস্থ্যবুঝি

জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের ফলে ঘন ঘন প্রলয়ংকরী বন্যায় মারাত্মক পানিদূষণ হয় এবং পানিবাহিত নানা ধরনের রোগ, বিশেষ করে কলেরা ও ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব ঘটে। অসময়ে বন্যা-খরার কারণে ফসলের ক্ষতি হয়, খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হয়, যা খাদ্যঘাটতি সৃষ্টি করে। পানির মতো বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রা বাড়লে রোগজীবাণু বেশি জন্মাবে এবং নানারকম রোগ সংক্রমণ বেড়ে যাবে। আগে আমরা বাংলাদেশে কখনো অ্যানথ্রাক্স রোগের কথা শুনিনি। কিন্তু গত ৩-৪ বছর ধারে বর্ষার মৌসুমে বাংলাদেশে, বিশেষ করে সিরাজগঞ্জ জেলায় এ রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। এতে গবাদিপশু ও মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। এ এলাকার পশু চিকিৎসক ও খামারিদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, অ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত হলে মানুষ উপর্যুক্ত চিকিৎসায় ভালো হয়ে গেলেও গবাদিপশুর জন্য মৃত্যু অবধারিত। জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের ফলে অ্যানথ্রাক্সের মতো আরো অনেক প্রাণঘাতী রোগ-জীবাণু সৃষ্টি হতে পারে।

### জীববৈচিত্র্য

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য জীববৈচিত্র্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক উদ্যোগে নেওয়া না হলে জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে ৩০% জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

### সাইক্লোন

সাইক্লোনের মতো ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ আরো ঘন ঘন এবং অনেক বেশি ধ্বংসাত্মক আকার ধারণ করবে। এ বিষয়ে এই অধ্যায়েই তোমরা আরো বিস্তারিত জানবে।

## ৯.১.২ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

জলবায়ু পরিবর্তন-সংক্রান্ত প্রভাব মূল্যায়নের জন্য গঠিত Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)-এর চতুর্থ মূল্যায়ন রিপোর্ট (AR4) অনুযায়ী, জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের প্রভাব অনেক মারাত্মক এবং তা ধীরে ধীরে বেড়েই চলছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা গত ১০০ বছরে প্রায়  $0.7^{\circ}$  সেলসিয়াস বেড়েছে। ১৯৬১-২০০৩ সালের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা গড়ে প্রতিবছরে ১.৮ সেন্টিমিটার করে বেড়েছে। ইতোমধ্যেই পাহাড় পর্বতে জমে থাকা বরফের পরিমাণ অনেক কমে গেছে। ১৯৯৫-২০০৬ পর্যন্ত ১২ বছরের মধ্যে ১১ বছরই প্রচণ্ড গরম পড়েছে। এই রিপোর্ট অনুযায়ী পরবর্তী দুই দশকে বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রা প্রতি দশ বছরে গড়ে  $0.2\text{--}0.3^{\circ}$  সেলসিয়াস পর্যন্ত বেড়ে যাবে। অনুমান করা হচ্ছে, ২১০০ সালের মধ্যে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা  $1.1\text{--}6.8^{\circ}$  সেলসিয়াস পর্যন্ত বাঢ়তে পারে। তখন নাতিশীতোষ্ণ ও বিশুবরেখা থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে পানির প্রাপ্যতা বেড়ে যাবে কিন্তু বিশুবরেখার নিকটবর্তী ও মাঝামাঝি স্থানে পানির প্রাপ্যতা কমে যাবে। অর্থাৎ কোনো কোনো অঞ্চলে প্রলংয়করী বন্যার আশঙ্কা বেড়ে যাবে, আর কোনো কোনো অঞ্চল তয়াবহ খরার কবলে পড়বে। ২০৮০ সালের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৩৪ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। সত্যি যদি তা-ই হয়, তাহলে বাংলাদেশের মতো অনেক দেশের বেশির ভাগ পানির নিচে তলিয়ে যাবে। তোমরা কি জান, মালদ্বীপ ও ভারতের কিছু অংশ ইতিমধ্যেই পানিতে ডুবে গেছে? বিগত কয়েক বছরে সাইক্লোন, টাইফুন, হ্যারিকেন এরকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ অনেক বেড়েছে, ভবিষ্যতে তা আরো প্রকট হওয়ার আশংকা আছে। প্রলংয়করী ঘূর্ণিবাড়, আইলা, সিডর, নার্গিস, ক্যাটরিনার কথা আমরা সবাই জানি। এ ধরনের ভয়াবহ দুর্যোগ আরো ঘন ঘন হবে এবং তার মাত্রা আরো ভয়ানক হতে পারে।

## ৯.২ পরিবেশগত সমস্যা

বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রতিটি স্থান এখন নানা রকম পরিবেশগত সমস্যায় জর্জরিত। তোমরা কি এরকম সমস্যাগুলো অনুধাবন করতে পারছ? নানা রকম পরিবেশগত সমস্যার মধ্যে অন্যতম হলো ১০<sup>৯</sup> জনসংখ্যা বৃদ্ধি (Population Growth)। এটি একদিকে যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আবার অনেক

পরিবেশগত সমস্যার মূল কারণও এটি। তোমরা কি জান, বর্তমানে সারা বিশ্বে জনসংখ্যা কত? প্রায় সাত মিলিয়ন। বর্তমানে যে হারে জনসংখ্যা বাঢ়ছে তাতে করে আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের জনসংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ১০ মিলিয়ন। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১৯৫০ সালের পর থেকে শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ বনভূমি উজাড় হয়ে গেছে। সাথে সাথে হাজার হাজার বনজ গাছপালা এবং জীবজন্মুর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে খোদ বাংলাদেশেই হাজার হাজার একর আবাদি জমি নষ্ট হচ্ছে। এটিই স্বাভাবিক, কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্য, বন্দু, বাসস্থান ইত্যাদি সব রকমের চাহিদা বেড়ে যায় এবং কর্মসংস্থানের উপর চাপ সৃষ্টি হয়। কর্মসংস্থানের চাপ সামলানোর জন্য নতুন নতুন শিল্প-কারখানা তৈরি করতে গিয়ে আবাদি জমি এবং বনভূমি পর্যন্ত উজাড় হয়ে যাচ্ছে। বিপুল জনসংখ্যার জন্য চাহিদার ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ায় আজ নদ-নদীতে মাছের যেন রীতিমত আকাল পড়ে গেছে। বাংলাদেশ মাছ চাষে পৃথিবীর চতুর্থতম দেশ এবং “মাছে ভাতে বাঙালি” এই কথাটি ধরে রাখার জন্যে প্রাকৃতিক মাছের উপর ভরসা না করে এখন চাষ করা মাছের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে।

১৯৯১-৯২ সালে বাংলাদেশে উৎপাদিত মোট খাদ্যশস্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৯.৩২ মিলিয়ন মেট্রিক টন, যা ২০০৭-২০০৮ সালে দাঁড়ায় প্রায় ৩০ মিলিয়ন মেট্রিক টন এবং ২০১০-১১ সালে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪০ মিলিয়ন মেট্রিক টন। প্রায় ২০ বছর সময়ের ব্যবধানে খাদ্যশস্য উৎপাদন প্রায় দিগুণ হয়ে বাংলাদেশ আজ খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগে মাঝে মাঝেই ফসল নষ্ট হওয়ার কারণে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়। তোমরা কি জান, ১৯৯১-৯২ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা কত ছিল? বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১০ কোটির মতো, যেটি এখন প্রায় ১৬ কোটি। আমাদের এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যদি কম হতো তাহলে আজ বাংলাদেশে খাদ্যশস্য অনেক বেশি উদ্বৃত্ত থাকত, সেগুলো রফতানি করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করা যেত যা দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা যেত। কাজেই জনসংখ্যার এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে এবং অন্যদেরকেও সচেতন করতে হবে।

এখন প্রশ্ন হলো, জনসংখ্যা কেন এভাবে বৃদ্ধি পায়?

তোমরা জান যে একটি এলাকায় একদিকে যেমন শিশুর জন্ম হয়, অন্যদিকে তেমনি নানা বয়সের লোক মৃত্যুবরণ করে। কোনো এলাকায় শিশু জন্মহার এবং মৃত্যুহার সমান হলে ঐ এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে না। কিন্তু একটি এলাকায় যে কয়জন লোক মৃত্যুবরণ করে, তার চেয়ে শিশুর জন্মের সংখ্যা যদি বেশি হয়, তা হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া না পাওয়া অবশ্য আরো দুটি অবস্থার ওপর নির্ভর করে আর সে দুটি হলো বহির্গমন এবং বহিরাগমন। বহির্গমনের ফলে একটি দেশের জনসংখ্যা কমে যায় আর বহিরাগমন বা বাইরে থেকে আগমনের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হলো এখানে জন্মহার মৃত্যুহারের চেয়ে অনেক বেশি।

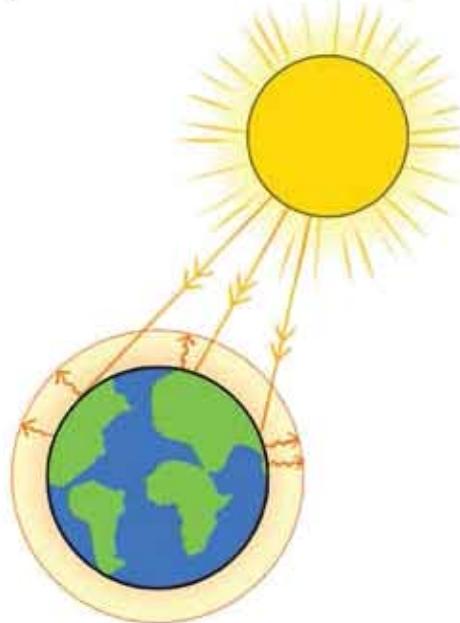
ଆରେକଟି ପରିବେଳଗତ ପୁରୁଷପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ହଲୋ ନଗରାୟତ୍ର (Urbanization) । ଏଟିଏ ଆସିଲେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ସାଥେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣେ କର୍ମସଂଖ୍ୟାନେର ଜଳ୍ୟ ପ୍ରାଚୀର ଜନସଂଖ୍ୟାର ବଢ଼ ଏକଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶହରମୁଦ୍ରି ହୁଏ ପଡ଼େଛେ । ଏକଇ ସାଥେ ଶହରାଧିକଲେଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ହାର ଯେ ଖୁବ ଏକଟା କମ ଭାବେ ନାହିଁ । ପ୍ରାଚୀର ଜନପଦେର ଶହରମୁଦ୍ରିତା ଏବଂ ଶହରାଧିକଲେଙ୍କ ବୃଦ୍ଧିର ଜଳ୍ୟ ଶହର ଏକାକାର ଆବାସନ-ସଂକଟ ଥିବାକାର ଧାରଣ କରେଛେ ଏବଂ ଏର ଫଳେ ଆଶପାଶେର ଆବାସି ଜୟି ଧରନେ କରେ ବା ଜ୍ଞାନ୍ୟମ୍ବିତ ଭରାଟ କରେ ନଗରାୟତ୍ର କରା ହେବେ । ନାହିଁ ନଗରାୟତ୍ରେ ବେଳୋର ପ୍ରାୟ ସମୟେଇ ଭାଲୋ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନା, ପାଣି ସରବରାହସ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାଗରିକ ସୁବିଧା ନା ଥାକାଯ ଜୀବନବାପନେ ନାନାରକମ ସମସ୍ୟା ତୈରି ହେବେ ।

### ୯.୨.୧ ବୈଶିକ ଉକ୍ତତା (Global Warming)

ଏଇ ଆଗେର ଶ୍ରେଣିତ ତୋମରା ବୈଶିକ ଉକ୍ତତା କୀ ଭା ହେବେ । ଏଇ ମୂଳ କାରଣ କାରନ ଡାଇ-ଅକ୍ଲାଇଡସହ ଘର୍ଜୋନ, ମିଥେନ, ସିଆକସି, ଲାଇଟ୍‌ର୍ସ ଅକ୍ଲାଇଡ ଏବଂ ଜଳୀଯ ବାଷ୍ପ, ଯେଗୁଲୋ ତିନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସ ନାମେ ପରିଚିତ, ମେଘୁଲୋର ପରିମାଣ ବେଢ଼େ ଯାଇଥା । ତିନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସଗୁଲୋ ବାଢ଼ାର କାରଣ କୀ? ଏହି ଗ୍ୟାସଗୁଲୋର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହଲୋ ଯାନବାହନ, ଶିଳ୍ପ-କାରଖାନା, ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ସପଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଥେକେ ସୃତ ଥୋଇବା, ଗ୍ରେଫିଜାରେଟର କିମ୍ବା ଶୀତାତପ ନିୟକ୍ଷାପ ଯତ୍ରେ ବ୍ୟବହରିତ ଗ୍ୟାସ । ଏହାହା କିଛୁ କିଛୁ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ (ସେମନ: ଆପ୍ଲେରସିରିର ଅଧ୍ୟୁତ୍ୟାତ, ଦାବାନଳ, ଗବାଦିଲଶୁର ଯଳମୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରାକୃତିକଭାବେ ପାଇସାଲାର କ୍ଷର) ଇତ୍ୟାଦି ଦାଖିବା । ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ଫଳେ ଯାନବାହନ, ଶିଳ୍ପ-କାରଖାନା, ବିଦ୍ୟୁତେର ଚାହିଦା ବେଢ଼େ ଯାଇଛେ, ଫଳେ ତିନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସର ନିଃସରଣ ବେଢ଼େ ଯାଇଛେ । ଆବାର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ଫଳେ ବନ୍ଧୁମ୍ବି ଧରନେ ହୁଏ ଯାଇଛେ । ଏ କାରଣେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସାଧ୍ୟ ପାଇସାଲାର ଯାଇବା କାରନ ଡାଇ-ଅକ୍ଲାଇଡେର ଶୋବଳ କମେ ଯାଇଛେ, ଯାଇ ଫଳେ ବାବୁମଣ୍ଡଳେ ଏଇ ପରିମାଣ କ୍ରମଗତ ବେଢ଼େଇ ଚଲେଛେ । ବୈଶିକ ଉକ୍ତତାର କାରଣ ଏହି ତିନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସର ନିଃସରଣ ନା କମାଇବା, ବାବୁମଣ୍ଡଳେର ଭାପମାର୍ଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ବେଢ଼େ ଯାବେ (ଚିତ୍ର ୯.୦୨) ଯାର ଫଳେ ଜଳବାୟୁଜନିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ଟଟ୍‌ବେ । ଜଳବାୟୁଜନିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ଟଟ୍‌ବେ ପରିବେଶେ କୀ ଧରନେର ବିରୂପ ପତାବ ପଡ଼ିବେ, ମେଟି ତୋମରା ଏହି ଅଧ୍ୟାତ୍ମର ଶୁଭୁଡ଼େଇ ହେବେ ।

### ୯.୨.୨ କାରନ ଦୂର୍ଗ (Carbon Pollution)

ବାବୁମଣ୍ଡଳେ କାରନ ଡାଇ-ଅକ୍ଲାଇଡେର ପରିମାଣ ବେଢ଼େ ଯାଇଗାକେଇ କାରନ ଦୂର୍ଗ ବଲେ । ବାତାମେ କାରନ ଡାଇ-ଅକ୍ଲାଇଡେର ପରିମାଣ କେନ ବେଢ଼େ ଯାଇ ମେଟା ତୋମରା ଆଗେର ପାଠେ ହେବେ ।



ଚିତ୍ର ୯.୦୨: ତିନ ହାଉସ ଏବେଷ୍ଟ

### ৯.২.৩ বনশূন্য করা (Deforestation)

বনশূন্য করা একটি মারাত্মক পরিবেশগত সমস্যা। তোমরা ইতোমধ্যেই জেনেছ যে বনশূন্য করা বা বনভূমির উজাড় হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ঘর-বাড়ি, রাস্তাঘাট, অঞ্চ, বন্দ ইত্যাদি সব রকম চাহিদা বৃদ্ধি পায়। আর প্রতিটি চাহিদাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বনশূন্য করার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

## ৯.৩ দুর্যোগ সৃষ্টির কারণ, প্রতিরোধ, মোকাবিলার কৌশল এবং তাৎক্ষণিক করণীয়

### ৯.৩.১ বন্যা

নদীমাতৃক বাংলাদেশের জন্য বন্যা (চিত্র ৯.০৩) একটি নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় প্রতিবছরই বন্যায় দেশের কোনো না কোনো অঞ্চলে ফসল, গবাদিপশু এবং অন্যান্য সম্পদের মারাত্মক ক্ষতি হয়, যা মাঝে মাঝে ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ১৯৭৪, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯০, ১৯৯৫, ২০০৪ এবং ২০০৭ সালের প্রলয়ংকরী বন্যায় দেশের অনেক ক্ষতি হয়েছে। ১৯৭৪ সালে এই ক্ষতির মাত্রা এত বেশি ছিল যে সেটি বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এখন প্রশ্ন হলো কেন বন্যা হয়, এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ কী? বন্যা হওয়ার পিছনে বেশ কিছু জিতিল কারণ আছে। যার মাঝে অন্যতম কারণটি হচ্ছে নদ-নদীগুলোর পানি ধারণক্ষমতা কমে যাওয়া। নদীভাঙ্গ, বর্জ্য অব্যবস্থাপনাসহ নানা কারণে নদ-নদী ভরাট হয়ে যাওয়ায় নদ-নদীগুলোর পানি ধারণক্ষমতা কমে গেছে। যে কারণে তারী বর্ষণ বা উজানের অববাহিকা থেকে আসা পানি খুব সহজে সাগরে যেতে পারে না এবং নদী ভরে দুর্কুল ছাপিয়ে বন্যা সৃষ্টি করে। এছাড়া মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বঙ্গোপসাগরের সৃষ্ট জোয়ারের কারণে উজানের পানি অনেক সময় নদ-নদীর মাধ্যমে সাগরে যেতে পারে না। ফলে নদ-নদীর আশপাশের এলাকায় বন্যা সৃষ্টি হয়। আবার বাংলাদেশের বেশির ভাগ এলাকা সমতল হওয়ায় বৃষ্টির পানি সহজে নদ-নদীতে গিয়ে পড়তে পারে না। কাজেই বিস্তীর্ণ এলাকা, বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকা প্লাবিত হয়ে যায়। সাম্প্রতিক কালে ঘূর্ণিবড় আইলা ও সিডর এবং এদের প্রভাবে সৃষ্ট বন্যার কথা আমরা সবাই জানি।

এখন আমরা এই বন্যা প্রতিরোধ, মোকাবিলার কৌশল, করণীয় ও উপায় সম্পর্কে জেনে নেই। যেহেতু বন্যা সৃষ্টির একটি অন্যতম কারণ হলো নদ-নদীসমূহের সীমিত পানি ধারণক্ষমতা। তাই বন্যার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে নদী খনন করে এদের পানি ধারণক্ষমতা বাড়াতে হবে যেন, তারী বর্ষণ বা উজানের পানি এলেও বন্যা না হয়। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা

হচ্ছে। ১৯৬০ সালের পর থেকে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত প্রায় ৮০০০ কিলোমিটার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। তবে আরও অতিবছরই অনেক জায়গায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধে ভাঙ্গনের ফলে (বিশেষ করে সিরাজগঞ্জ জেলায়) বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা দেখা দেয়। অনেক সময়েই এটি ষষ্ঠে সংলিপ্ত বিভাগ কিংবা বাস্তিদের অসুস্থিরতা বা অব্যবস্থাপনার কারণে।



চিত্র ৯.০৩: বন্যা

নদী শাশন করেও বন্যা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর তৃমিকা নেওয়া যায়। নদী শাশন হচ্ছে, নদীর পাড়ে পার্শ্ব, সিমেটের ব্লক, বালির বস্তা, কাঠ বা বাঁশের তিবি তৈরি করে এগুলোর মাধ্যমে বন্যা প্রতিরোধ করা। এছাড়া নদীর পাড়ে গাছ লাগানো, পানিথাবাহের জন্য স্লুইস গেট নির্মাণ— এগুলোও নদী শাশনেরই অংশ।

### বন্যার পূর্ণাঙ্গ ও সজ্ঞকর্ত্তব্য

বন্যা সম্পর্কে আগাম পূর্ণাঙ্গ এবং সজ্ঞকর্ত্তব্য প্রচার করে বন্যাজনিত ক্ষতির পরিমাণ অনেকখানিই কমানো যেতে পারে। বাংলাদেশের ৪৮টি নদীর উৎপন্নসম্পদ হচ্ছে ভারত, নেপাল ও ভুটান। তাই সঠিক পূর্ণাঙ্গ অনেক সময়েই সম্ভব হয় না। কাজেই আগামের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথে আঞ্চলিক সহযোগিতা গড়ে তুলতে হবে, যেন আগে থেকেই এ সংক্রান্ত সব তথ্য পাওয়া যায় এবং তার উপর ভিত্তি করে একটা ফলপ্রসূ ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

এছাড়া নিচু এবং বন্যাপ্রবণ এলাকায় যেন জনবসতি গড়ে উঠতে না পারে, সেজন্য তৃমি ব্যবহার এবং নিয়ন্ত্রণে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হেতে পারে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং কর্মীর সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি করা বন্যা মোকাবেলার অনেক বড় তৃমিকা পাশন করে। তাই এ ব্যাপারে যথোচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ভগ্নাবহ বন্যা হলে সরকারি উচ্চ ভবন কিংবা স্থাপনা বেন ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ সাময়িক আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার করতে পারে তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। আবার উচ্চ স্থানে আপ্রস্কেন্স বা মালামাল সংরক্ষণ কেন্দ্র, উচ্চ রাস্তাঘাট, উচ্চ স্থানে বাজার কিংবা স্কুল ইত্যাদি তৈরি করে বন্যা যোকাবেলা করা যায়। বন্যার সময় বেশির ভাগ রাস্তাঘাট পানিতে ফুটে যায়। তখন চলাচলের জন্য পিড়বোট এবং নৌকার ব্যবস্থা রাখাও বন্যা যোকাবেলায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

বন্যার আগাম প্রস্তুতিও বন্যা যোকাবিলার একটি কৌশল হিসেবে পর্য করা হয়। বিশুল অনসংখ্যা ভগ্নাবহ বন্যার কবলে পড়লে এবং আপে থেকে পর্যাপ্ত ধানমুক্ত, পানি, ঔষধপত্র ইত্যাদির ব্যবস্থা করে না রাখলে তা ভগ্নাবহ বিপর্যর ঘটে যেতে পারে। কোনো একটি এলাকা বন্যাক্ষণিত হলে তখন সেখানকার মানুষের কর্মসংবাদের কোনো ব্যবস্থা থাকে না। বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জীবন যাপন করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই জাদের পুনর্বাসনের জন্য ব্যথেট ব্যবস্থা রাখতে হবে।

### ৯.৩.২ খরা (Drought)

খরা একটি মানবিক প্রাকৃতিক দুর্বোগ। খরার সময় মাটিতে পানির পরিমাণ কমতে কমতে মাটি পানিশূন্য হয়ে যায় এবং এর ফলে মাটিতে গাছপালা বা শস্য জন্মাতে পারে না। ভিত্তিশরা একটানা দুই সপ্তাহ  $0.25$  মিলিমিটারের কম বৃক্ষিপাত হলে তাকে খরা (Absolute Drought) আর একটানা  $8$  সপ্তাহ  $0.25$  মিলিমিটারের বেশি বৃক্ষিপাত না হলে তাকে আংশিক খরা (Partial Drought) বলে। গ্রামিয়াতে একটানা  $10$  দিন মোট  $5$  মিলিমিটারের বেশি বৃক্ষি না হলে তাকে খরা বলে আর আমেরিকাতে একটানা  $30$  দিন বা তার বেশি সময়ের মধ্যে যেকোনো  $24$  সপ্তাহ  $6.25$  মিলিমিটার বৃক্ষি না হলে তারা এই অবস্থাকে খরা হিসেবে ধরে নেয়।



চিত্র ৯.০৪: খরা

খরা একটি ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ (চিত্র ১.০৪)। খরা হলে ফসল উৎপাদন কমে যায় এবং এটি দুর্ভিক্ষের কারণও হতে পারে। খরার ফলে শুধু মানুষ নয়, গবাদিপশুর জন্যও খাদ্যসংকট দেখা দেয়। কৃষিনির্ভর শিল্প-কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হয়, যেটি কর্মসংস্থানের জন্য একটি বড় ত্বুমকি হয়ে দাঁড়ায়। খরার কারণে মাটির উর্বরতা কমে যায়। দীর্ঘস্থায়ী খরার কারণে দেশে সামাজিক এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বেশ কয়েকটি জেলা (রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, দিনাজপুর, বগুড়া, কুষ্টিয়া, যশোর) খরার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। বাংলাদেশে ১৯৭৮-৭৯ সালে ভয়াবহ খরা হয়েছিল। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, এই খরায় ক্ষতির পরিমাণ ১৯৭৮ সালের ভয়াবহ বন্যার চেয়েও বেশি ছিল।

কেন খরা হয়? খরা হওয়ার বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে, যার মাঝে অন্যতম হচ্ছে দীর্ঘদিন শুক্র আবহাওয়া থাকা এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টিপাত না হওয়া। বাস্তীভবন এবং প্রবেদনের পরিমাণ বৃষ্টিপাতের চেয়ে বেশি হলেও এমনটি ঘটতে পারে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে অপরিকল্পিত উন্নয়ন, বৃক্ষনিধন এবং গ্রিন হাউস গ্যাসের প্রভাবে বায়ুমণ্ডল ধীরে ধীরে বৃক্ষ ও শুক্র হয়ে উঠেছে, ফলে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যাচ্ছে, যেটি খরা সৃষ্টির মূল কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে বৃষ্টিপাত কমে খরা সৃষ্টি হওয়ার জন্য পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের মেরু অঞ্চলে সৃষ্টি এল-নিনো (El-Nino) নামে জলবায়ুর পরিবর্তনচক্রকে দায়ী করা হচ্ছে।

খরার জন্য দায়ী একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে গভীর নলকুপের সাহায্যে ভূগর্ভের পানির মাত্রাতিরিন্ত উভোলনের ফলে পানির স্তর অস্বাভাবিকভাবে নিচে নেমে যাওয়া। এছাড়া নদীর গতিপথ পরিবর্তন, উজান থেকে পানি সরিয়ে নেওয়া, পানি সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার অভাব, ওজোন স্তরের ক্ষয়— এগুলোও খরা সৃষ্টির জন্য দায়ী।

এখন প্রশ্ন হলো, খরা প্রতিরোধে বা খরা মোকাবিলার জন্য কী করা যেতে পারে? যেহেতু খরার মূল কারণ হলো পানির অপর্যাপ্ততা, তাই পানির সরবরাহ বাড়ানোই হচ্ছে খরা মোকাবিলার সবচেয়ে কার্যকর উপায়। বাংলাদেশের প্রায় ৫৫টি নদীর উৎসস্থল ভারত। শুক্র মৌসুমে ভারতের ঐ সকল নদ-নদীর পানির গতিপথ পরিবর্তন এবং পানি প্রত্যাহার বাংলাদেশে খরার অন্যতম কারণ। এর আগে গঙ্গা নদীর পানি ভারত একত্রফাভাবে ব্যবহার করত। ১৯৯৬ সালে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে পানি বণ্টন চুক্তির কারণে বাংলাদেশ এখন শুক্র মৌসুমে পানির ন্যায্য হিস্যা পাচ্ছে। গঙ্গার পানির চুক্তির মতো তিস্তাসহ অন্যান্য নদীর পানি বণ্টনের জন্য ভারতের সাথে পানি বণ্টন চুক্তি করার চেষ্টা চলছে, যেন শুক্র মৌসুমে ভারত একত্রফাভাবে উজান থেকে পানি সরিয়ে নিতে না পারে।

কিছু ফসল আছে যেগুলো মাটিতে পানি কম থাকলেও জন্মাতে পারে। যেমন: গম, পিঁয়াজ, কাউন ইত্যাদি। খরা পীড়িত এলাকার মানুষকে এ জাতীয় ফসল চাষ করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। সেই সাথে সাথে যে সমস্ত ফসল উৎপাদনে অনেক বেশি পানির প্রয়োজন হয়, যেমন: ইরি ধান, সেগুলো

ঠাণ্ডে খরাশীভিত্তি এলাকার মানুষদের নিরুৎসাহিত করা যেতে পারে।

খরা মোকাবেলা করার জন্য পুরুর, নদ-নদী, ধান-বিল খনন করে পানি থেরে রেখে তা খরার সময় ব্যবহার করার জন্য সরাইকে উন্মুক্ত করতে হবে।

কৃতিমঙ্গলে বৃটি সৃষ্টি করে কিছু কিছু দেশ খরা মোকাবেলার চেষ্টা করেছে কিন্তু সেটি খুব একটা কার্যকর হয়নি।

### ১.৩.৩ সাইক্লোন বা ঘূর্ণিষক (Cyclone)

সাইক্লোন শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ "Kykllos" থেকে, যার অর্থ হলো Coil of Snakes বা সাপের কুকুলী। সাইক্লোনের স্যাটেলাইট ছবি থেকে দেখা যায়, প্রচণ্ড গতিবেগসম্পন্ন বাতাস কুকুলীয় আকাশে ঘূরণাক থাকে (চিত্র ১.০৫)। অর্ধাং নিম্নচাপের কারণে যখন বাতাস প্রচণ্ড গতিবেগে ঘূরতে থাকে, তখন সেটাকে সাইক্লোন বা ঘূর্ণিষক বলে। দক্ষিণ এশিয়াতে আমরা বেটাকে সাইক্লোন বলি, আমেরিকাতে সেটাকে হারিকেন (Hurricane) এবং দূরপ্রাচ্যের দেশগুলোতে টাইফুন (Typhoon) বলে।

বাংলাদেশের উভয়ে হিমালয় পর্বত, দক্ষিণে  
বঙ্গোপসাগর এবং মাঝখানে ফানেল আকৃতির  
উপকূলীয় এলাকা বিদ্যমান। ভৌগোলিক  
অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ সাইক্লোনের  
জন্য খুব ঝুকিপূর্ণ দেশ। ১৯৬০ সাল থেকে  
২০১২ সাল পর্যন্ত আর ৫০ বার বাংলাদেশে  
সাইক্লোন আঘাত ঘনেছে। এর মধ্যে ১৯৬০,  
১৯৬১, ১৯৬৩, ১৯৬৫, ১৯৭০, ১৯৮৫,  
১৯৯১, ২০০৭ ও ২০০৯ সালের সাইক্লোন  
ছিল প্রশংসকীয়। তবে ১৯৭০ সালের  
সাইক্লোনটি সর্বকালের সবচেয়ে প্রশংসকীয়  
সাইক্লোন হিসেবে পৃথিবীর ইতিহাসে চিহ্নিত  
হয়েছে। এ ঘড়ে প্রায় ৫ লক্ষ প্রাণহনি  
ঘটেছিল। ১৯৯১ সালে ঘূর্ণিষকে প্রায় ১ লক্ষ  
৪০ হাজার প্রাণহনি ঘটেছে। ২০০৭ ও  
২০০৯ সালের সাইক্লোন সিঙ্গর (চিত্র ১.০৬)  
ও আইলাতে যথাক্রমে ১০ হাজার ও ৭ হাজার লোকের প্রাণহনি ঘটেছে। এছাড়া এই সাইক্লোনে লক্ষ  
লক্ষ মানুষ শৃঙ্খলীন হয়ে পড়েছিল। এ দৃটি সাইক্লোনে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে প্রায় ১.৭  
বিলিয়ন ও ৬০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।



চিত্র ১.০৫: ঘূর্ণিষক



চিত্র ৯.০৬: ঘূর্ণিঝড়ের ফলে

### সাইক্রোন সৃষ্টির কারণ ও করণীয়

যেহেতু সাইক্রোন সৃষ্টি হয় গভীর সমুদ্রে, তাই এ সম্পর্কে বিশ্লেষিত জানা সহজসাধ্য নয়। তবে যে দুটি কারণ মূলত সাইক্রোন সৃষ্টিতে পুরুষপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা হলো নিম্নচাপ এবং ষাঢ় তাপমাত্রা। সাধারণত সাইক্রোন তৈরি হতে সাগরের তাপমাত্রা  $27^{\circ}$  সেলসিয়াসের বেশি হতে হয়। সূর্যোদ্ধূলের ক্ষেত্রে উপরে উঠে যাবল জল কণায় পরিষ্কত হয় তখন বাল্কীভবনের সূপ্ত ভাগটি বাতাসে ছেড়ে দেয়। সে কারণে বাতাস উৎপন্ন হয় এবং বাল্কীভবন আরো বেড়ে যায়, যালে বায়ুমণ্ডল অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে নিম্নচাপের সৃষ্টি করে। নিম্নচাপ সৃষ্টি হলে আশপাশের বাতাস সেখানে ছুটে আসে, যা বাড়িতি তাপমাত্রার কারণে ঘূরতে ঘূরতে উপরে উঠতে থাকে এবং সাইক্রোন সৃষ্টি করে। এই প্রক্রিয়ায় সূর্য হওয়া ঘূর্ণিঝড়ের বাতাসের বেগ অনেক বেশি হয়। তবে বাতাসের বেগ ঘন্টায় ৬৩ কিলোমিটার বা তার চাইতে বেশি হলে সেটাকে সাইক্রোন হিসেবে গণ্য করা হয়। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে সবচেয়ে শক্তিশালী সাইক্রোন হয়েছিল ১৯৯১ সালে। তখন বাতাসের বেগ ছিল ঘন্টায় ২২৫ কিলোমিটার।

এখন প্রশ্ন হলো, সাইক্রোনের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কি কোনো উপায় আছে? আর সাইক্রোন হলে আমাদের করণীয়ই বা কী? সাইক্রোন অজ্ঞত শক্তিশালী। একটি দুর্বল সাইক্রোনও শক্তিতে মেগাটন শক্তির কয়েক হাজার পারমাণবিক বোমার সমান। তাছাড়া যেহেতু সাইক্রোন একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, তাই এটি প্রতিরোধ করা প্রায় অসাধ্য। সম্পত্তি আয়োজন করে বাঢ়ের সময় সিলভার আগ্রাইড (AgI) নামক জ্বাস্যানিক হ্রব্য বাতাসে ছড়িয়ে পানিকে শীতল করে ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ কমানোর চেষ্টা করা হলেও নানা ধরনের সীমাবদ্ধতার কারণে এটি ঠিকভাবে কাজ করেনি। এছাড়া সাগরে তেল বা অন্যান্য

রাসায়নিক দ্রব্য ছিটিয়ে বাস্পীভবন কমিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার চিন্তাভাবনা করা হয়। তবে প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করা কখনোই বাস্তবভিত্তিক নয়। তাহলে কী করা যেতে পারে?

আমাদের ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস প্রক্রিয়া জোরদার করে মানুষের প্রাণ বাঁচানোর এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড়ের আরেকটি মারাত্মক দিক হলো জলোচ্ছস। তাই ঘূর্ণিঝড় প্রবন্ধ এলাকায় উঁচু করে মজবুত আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করতে হবে। ঘূর্ণিঝড়ের সময় নিচু এলাকায় বসবাস করা মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়স্থলে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। জলোচ্ছস ঠেকানোর জন্য উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ তৈরি করা যেতে পারে। সাথে সাথে সেখানে প্রাচুর গাছপালা লাগিয়েও ক্ষতির পরিমাণ কমানো সম্ভব।

ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলার জন্য যথাযথ পূর্বপ্রস্তুতি নিতে হবে। বাংলাদেশ ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশে রেড ক্রিসেন্টের যৌথ উদ্যোগে ইতোমধ্যেই সাইক্লোন প্রস্তুতি কার্যক্রম চালু আছে। এর আওতায় প্রায় ৩২০০০ স্বেচ্ছাসেবী উপকূলীয় এলাকায় জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ অন্যান্য কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৭ সালে সাইক্লোন ‘মোরা’ বাংলাদেশকে আঘাত করেছিল, সময়মতো যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ায় তখন মাত্র ৭ জনের প্রাণহানি ঘটেছিল।

আমাদের অতিপরিচিত একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলো কালবৈশাখী। সাধারণত এপ্রিল থেকে মে মাসের ভেতর আমাদের দেশে কালবৈশাখী বড় হয়। সাধারণত উত্তর উপকূল কোণে (North) মেঘ জমা হয়ে কিছুক্ষণের মাঝে আকাশ মেঘে ঢেকে গিয়ে কালবৈশাখী বড় শুরু হয়। এই বড়ে বাতাসের বেগ ঘণ্টায় ৫৫ থেকে ৮০ কিলোমিটারের মতো হতে পারে। বড়ের বেগ ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটারের বেশি হলে এটাকে টর্নেডো বলা হয়। বাংলাদেশ ছাড়াও আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও রাশিয়াসহ বিশ্বের অনেক দেশেই টর্নেডো আঘাত হানে। টর্নেডোর সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এটি হঠাতে করে অল্প সময়ের মধ্যে প্রচণ্ড ধ্বংসযজ্ঞ করে ফেলতে পারে। টর্নেডো শব্দটি এসেছে স্প্যানিশ শব্দ ‘Tonada’ থেকে, যার অর্থ হলো Thunder storm বা বজ্রঝড়। সাইক্লোনের মতো টর্নেডোর বেলাতেও প্রচণ্ড বেগে বাতাস ঘূর্ণির আকারে প্রবাহিত হয় এবং এর যাত্রাপথে যা পড়ে তার সবই ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়। টর্নেডোর বিস্তার মাত্র কয়েক মিটার এবং দৈর্ঘ্য ৫-৩০ কিলোমিটার হতে পারে। সাইক্লোনের সাথে টর্নেডোর মূল পার্থক্য হচ্ছে যে, সাইক্লোন সৃষ্টি হয় সাগরে এবং এটি উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হানে আর টর্নেডো যে কোনো স্থানেই সৃষ্টি হতে পারে কিংবা আঘাত হানতে পারে। সাইক্লোনের মতো টর্নেডোর জন্যও লঘু বা নিম্নচাপ সৃষ্টি হতে হয়। এর ফলে উষ্ণ বাতাস উপরে উঠে যায় এবং ঐ শূন্য জায়গা পূরণের জন্যই শীতল বাতাস ছুটে এসে টর্নেডোর সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে একটি প্রলয়ংকরী টর্নেডো আঘাত হানে ১৯৮৯ সালে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়াতে। ঐ আঘাতের ফলে টর্নেডোর গতিপথের মধ্যে প্রায় সরকিছু ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ১৯৭৫ সাল থেকে এখন পর্যন্ত শতাধিক টর্নেডো বাংলাদেশে আঘাত হেনেছে।

স্মরণকালের ভয়াবহ টর্নেডোর মধ্যে একটি হলো ১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা জেলার ডেমরা থানায়। ঐ টর্নেডোতে বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় প্রায় ৬৪৪ কিলোমিটার। যেহেতু টর্নেডোর বেলায়

পূর্বাভাস কিংবা সতর্কবাণী প্রচার করা সম্ভব হয় না, তাই এক্ষেত্রে আগাম প্রস্তুতি নেওয়া যায় না। তাই দুর্গত এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে দ্রুত ত্রাণ সরবরাহ এবং পুনর্বাসন কাজ করাই হচ্ছে একমাত্র সমাধান। এরকম সময় সরকারি এবং বেসরকারি সব সংগঠনের মধ্যে সমন্বয় করে কাজ করা খুবই জরুরি।

### ৯.৩.৪ সুনামি (Tsunami)

Tsunami জাপানি শব্দ। ‘সু’ অর্থ বন্দর এবং ‘নামি’ অর্থ টেউ। সুতরাং সুনামি অর্থ হলো বন্দরের টেউ। এটি একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সমুদ্রতলদেশে ভূমিকম্প, আমেরিগিরির অগ্ন্যৎপাত, ভূমিধস এবং নভোজাগতিক ঘটনা সুনামি সৃষ্টি করতে পারে। সুনামিকে পৃথিবীর তৃতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। মহাসাগর এবং সাগরের তলদেশের প্লেট যখন একটির সাথে আরেকটির সংংর্ঘ হয়ে বিচ্যুত হয়, তখন সেখানে প্রচণ্ড ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়। সেই ভূমিকম্পের কারণে লক্ষ লক্ষ টনের সমুদ্রের পানি বিশাল টেউ তৈরি করে (চিত্র ৯.০৭)। এই টেউ ধাবমান হয়ে যত বেশি তীরভূমির কাছাকাছি যায়, তত দীর্ঘ হয়ে ভয়ঙ্কর জলোচ্ছাসে রূপ নেয়। এই টেউয়ের গতিবেগ ঘটায় ৫০০ থেকে ৮০০ মাইল পর্যন্ত হতে পারে। খোলা সমুদ্রে এই টেউয়ের উচ্চতা মাত্র দুই থেকে তিন ফুট পর্যন্ত থাকে। কিন্তু টেউ যতই তীরের দিকে এগিয়ে যায়, ততই তার উচ্চতা বাঢ়তে থাকে। তখন টেউয়ের এক মাথা থেকে আরেক মাথার দূরত্ব ১০০ মাইল পর্যন্ত হতে পারে, অগভীর পানিতে সুনামি একটি ধৰংসাত্মক জলোচ্ছাসে রূপ নেয়। অগ্রসরমাণ জলরাশি ভয়ঙ্কর স্তোত সৃষ্টি করে নেমে যাওয়ার আগে ১০০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। একটি সুনামি উপকূলের ব্যাপক এলাকা প্লাবিত করতে পারে।

সাধারণত সমুদ্রের তলদেশে একটা ভূমিকম্প হলে সুনামি তৈরি হয়। ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে শুরু করে সমুদ্র অতিক্রম করে সুনামিকে উপকূলে পৌঁছাতে খানিকটা সময়ের প্রয়োজন। এই সময়টুকুর ভেতরে সাধারণত উপকূল এলাকায় সতর্কবাণী প্রচার করা হয়। ২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর স্মরণকালের ভয়ঙ্কর একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে। ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের কাছাকাছি ভারত মহাসাগরের তলদেশে সৃষ্টি হয়েছিল ট্রান্স্নিক ভূমিকম্প। ইউরেশিয়ান প্লেট ও অস্ট্রেলিয়ান প্লেটের সংঘর্ষে সৃষ্টি হওয়া এই মারাত্মক ভূকম্পনটি ছিল রিখটার স্কেলে নয় মাত্রার। এই ভূকম্পনের ফলে ভারত মহাসাগরের একাংশ সুমাত্রার অন্য একটি অংশকে সজোরে চাপ দেয়। এই প্রবল চাপে সমুদ্রতলের ৬০০ মাইলব্যাপী এলাকায় ভাঙনের সৃষ্টি হয়। এই ভাঙনের ফলে স্থানচ্যুতি ঘটে লক্ষ লক্ষ টন জলরাশির। বিশাল জলরাশি ভয়ানক বেগে সমুদ্রপৃষ্ঠের দিকে ধেয়ে আসে এবং বিশাল টেউয়ের আকারে চারদিকে ছাড়িয়ে পড়ে। এই টেউ মহাপ্লাবনে রূপ নিয়ে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ভারত, থাইল্যান্ড, মালদ্বীপ প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়া ছাড়িয়ে কেনিয়া, সোমালিয়াসহ ১২টি আফ্রিকান দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। জলোচ্ছাসে তিন লাখের মতো মানুষ নিহত হয়। শুধু ইন্দোনেশিয়ায় সুমাত্রার আচেহ প্রদেশেই নিহত হয়েছে এক লাখ মানুষ। তারপর বেশি লোক নিহত হয়েছে শ্রীলঙ্কায়। সুনামির জলোচ্ছাসে ভারত মহাসাগরের বহু ছোট ছোট দ্বীপ সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এসব দ্বীপে বসবাসকারী বহু আদিবাসী গোষ্ঠী প্রায় নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। জলোচ্ছাসের তাঙ্গবে সবচেয়ে বেশি নিহত হয়েছে শিশু ও

নারী, মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে হাজার হাজার মানুষ। স্ফূর্তির বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এই সূনামির তীক্ষ্ণতা এতটাই শ্রদ্ধল ছিল যে পৃথিবী তার অক্ষে ঘূরতে ঘূরতে ক্ষিটো নড়ে আয়। এছাড়া স্ফূর্তিসহের কলে যে বিপুল পরিমাণ শক্তির বিকিরণ হয় সেটি ছিল সাড়ে নয় হাজার পারমাণবিক বোমার সমান ক্ষমতাসম্পর্ক। সমুজ্জ তলদেশে ব্যাপক ভাঁজনের ফলে এতদিনকার ভারত মহাসাগরের সমুদ্রপথের দিকনির্দেশনার মানচিত্রটি পর্যন্ত এলোমেলো হয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, নতুন করে ভারত মহাসাগরে সৌচালাচলের মানচিত্র তৈরি করতে হবে; নইলে ভবিষ্যতে জাহাজ চলাচলে বিষ খটকে পারে।



চিত্র ১.০৭: সূনামি

২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বরের সূনামিতে বাংলাদেশের কোনো ক্ষতি হয়নি। অগভীর পানিতে যাওয়ার সময় সূনামি তার শক্তি হারায়। বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরে ১৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত অগভীর পানি এবং এই অগভীর পানি বাংলাদেশকে সূনামির কবল থেকে রক্ষা করে থাকে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর চেয়ে সূনামিতে বাংলাদেশের ক্ষতি সামান্য। শুধুমাত্র কুম্ভকাটার সমুজ্জ উপকূলে সে সময় মাছ ধরা টেলার ছুবে দুজন জেলে মারা গিয়েছিল।

১৯৬২ সালের ২ এপ্রিল বঙ্গোপসাগরের আরাকান অঞ্চলে সংঘটিত একটি স্ফূর্তিকল থেকে সৃষ্টি সূনামি বাংলাদেশে আঘাত হেলেছিল। তখন কর্তৃব্যাজার এবং পার্শ্ববর্তী ঝীপসমূহে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। এর প্রভাবে ঢাকার বুড়িগঙ্গায় পানি হঠাত বেড়ে যাওয়ার যে চেউরের সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে শত শত নৌকা ছুবে বহু লোক প্রাণ হারিয়েছিল।

### ১.৩.৫ এসিড বৃষ্টি (Acid Rain)

সাধারণত বৃষ্টিপাত এমনিতেই খালিকটা এসিডিক। তবে যখন বৃষ্টিতে অনেক বেশি পরিমাণ এসিড বিদ্যমান থাকে, তখন তাকে এসিড বৃষ্টি বলে। তোমরা কি জান, এসিড বৃষ্টিতে কী কী এসিড

থাকে? এসিড বৃষ্টিতে সালফিউরিক এসিড ও নাইট্রিক এসিড বেশি থাকে এবং অল্প পরিমাণে হাইড্রোক্সেরিক এসিড থাকে। এসিড বৃষ্টি পরিবেশে মাঝারীক ক্ষতিসাধন করে। এসিড বৃষ্টিতে এসিডের প্রতি সহবেদনশীল অনেক গাছ মরে যায়। এছাড়া কিছু প্রতি হায়োজনীয় উপাদান (যেমন: Ca, Mg) এসিড বৃষ্টিতে জ্বীভূত হয়ে যাও থেকে সরে যায়, যা ফসল উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব ফেলে। এসিড বৃষ্টি হলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিহস্ত হয় পানিসংকরণ এবং জলজ প্রাণীগুলোর। তোমরা জান যে, পানিতে এসিড থাকলে pH ৭-এর কম হয়। pH-এর ধান ৫-এর কম হলে বেশির ভাগ মাছের ডিম নষ্ট হয়ে যায়। তখন মাছ উৎপাদন ব্যাহত হয়। মাছের রেপু বা পোনা এসিডের প্রতি অস্বীকৃত সহবেদনশীল। এসিডের মাঝা বেশি হলে পুরো জীববৈচিত্র্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। মানুষের শরীরের জ্বাও এসিড বৃষ্টি ক্ষতিকর। এসিড বৃষ্টি মানবদেহে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের সমস্যা, আজর্যা ও ব্রহ্মাইটিসের মতো মাঝারীক রোগের সৃষ্টি করতে পারে।

### এসিড বৃষ্টি কেন হয়?

এসিড বৃষ্টির জন্য প্রাকৃতিক ও মনুষ্য-সৃষ্টি দুই কারণই জড়িত। প্রাকৃতিক কারণগুলোর মাঝে রয়েছে আঞ্চেলিকার অঘৃত-গাত, দাবানল, বজ্রপাত, পাহাড়ের পচল ইত্যাদি। এই প্রক্রিয়ার মাঝে নাইট্রোজেন অক্সাইড এবং সালফার ডাই-অক্সাইড প্যাস বের হয়, যা পরে বাতাসের অক্সিজেন আব বৃষ্টির পানির সাথে বিক্রিয়া করে যথক্ষণে নাইট্রিক এসিড এবং সালফিউরিক এসিড তৈরি করে। একইভাবে বিজ্ঞ শিল্প-কারখানা বিশেষ করে কয়লা বা গ্যাসজ্বিঞ্চিক বিনোদ উৎপাদন কেজে, ইটের ভাটা (চির ৯.০৮), যানবাহন, পৃষ্ঠাপিত চূলা ইত্যাদি উৎস থেকেও সালফার ডাই-অক্সাইড বের হয়, যা এসিডে পরিণত হয় এবং বৃষ্টির পানির সাথে মিলে এসিড বৃষ্টি তৈরি করে।

এখন দেখা যাক এসিড বৃষ্টি হলে আমাদের কী কী ক্রমীয় আছে? সেহেতু বিনোদ উৎপাদন কেজে ব্যবহৃত কয়লা থেকে নাইট্রোজেন অক্সাইড ও সালফার ডাই-অক্সাইড প্যাস তৈরি হয়, সেহেতু ব্যবহারের আগে কয়লা পরিশোধন করে সালফার ও নাইট্রোজেন মুক্ত করে নিতে হবে। পরিবেশ সচেতন অনেক দেশেই ইতোমধ্যেই এই ব্যক্তি চালু আছে। পরিশোধন ব্যক্তি না থাকলে কয়লার পরিবর্তে বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার করা যেতে পারে।



চির ৯.০৮: ইটের ভাটা

এসিড বৃষ্টি হলে মাটির pH কমে যাব এবং সেকেতে লাইমস্টোন বা চুনাগাঁথর ব্যবহার করে এসিডিটি কয়ালো যাব।

এছাড়া শিল্প-কারখানা এবং ধানবাহন থেকে নির্গত খোয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য যথোদয় আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। শিল্প-কারখানায় দুষ্পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অবশ্যই বাস্তুতামূলক করে নিতে হবে। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে এসিড বৃষ্টি খুব একটা হয় না। যেসব দেশে শিল্প-কারখানা অনেক বেশি, সেখানে এর আপর্যবেক্ষণ অনেক বেশি। পূর্ব ইউরোপের অনেক দেশ, আমেরিকা, কানাড়া এবং চীনের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে ও তাইশুয়ানে ঘন ঘন এসিড বৃষ্টি হয়।

### ৯.৩.৬ ভূমিকল্প (Earthquake)

পৃথিবীর ভেতরে হাঁচাঁচ সৃষ্টি কোনো কক্ষান বখন ভূগৃহে আকস্মিক আনন্দালন সৃষ্টি করে, সেটাকেই ভূমিকল্প বলে। ভূমিকল্প কয়েক সেকেন্ড থেকে মিনিট থানেক পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে এবং পর্যাঙ্কনমে একাধিকবার ঘটতে পারে। যদু ভূমিকল্প আমরা অনেক সময় অনুভব করতে পারি না, কিন্তু শক্তিশালী বা প্রবল ভূমিকল্প সহজেই অনুভব করা যাব।

ভূমিকল্প কি প্রাকৃতিক দুর্বোগ? হ্যাঁ, এটি অবশ্যই একটি প্রাকৃতিক দুর্বোগ, যা যাজ কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কোনো একটি দেশ বা অঞ্চল পুরোপুরি ধ্বংস করে দিতে পারে (চিত্র ৯.০৯)। এমনকি



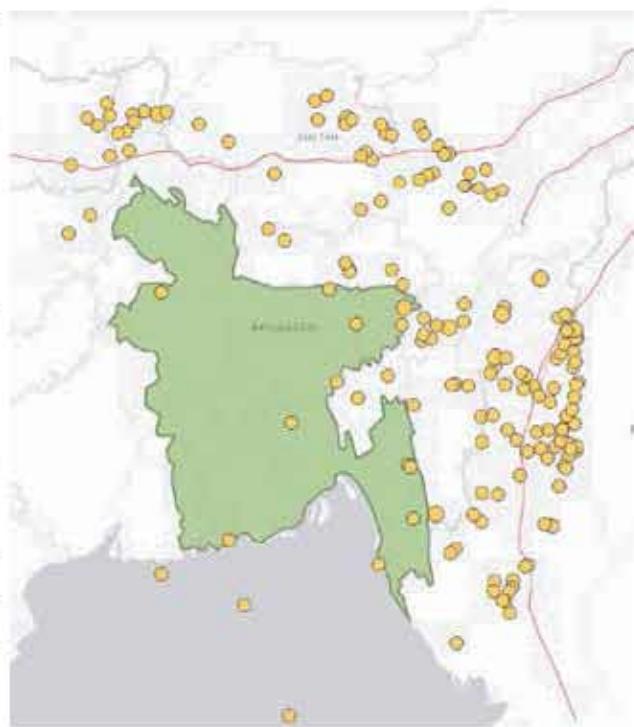
চিত্র ৯.০৯: ভূমিকল্পে বিশ্বস্ত একটি বিজ্ঞিঃ

বড় ভূমিকক্ষ নদীর গতিপথে পরিবর্তন করতে পারে। ভূমিকক্ষের ফলে আমাদের অন্যতম প্রধান নদী বৃক্ষগুলোর গতিপথ বদলে গিয়েছে। আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত বড় ধরনের ভূমিকক্ষ না হলেও বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশ বড় ধরনের ভূমিকক্ষ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। পৃথিবীর মাঝে জাপান এবং চুক্তান্ত্রের কালিকোনিয়া ভূমিকক্ষপ্রবণ এলাকা বলে ঠিক্কি। তোমরা নিশ্চয়ই ২০১০ সালে হাইডিতে ঘটে বাংলা ভূমিকক্ষ, ২০১১ সালে জাপানের ভূমিকক্ষ এবং ২০১৫ সালে নেপালের ভূমিকক্ষের ধ্বনসম্বরণের কথা শুনেছ। জাপানের ভূমিকক্ষের পর সেখানে সৃষ্টি সুনামি নিউজিল্যান্ডের শক্তি কেবলে আঘাত করে একটি নিউজিল্যান্ড দুর্ঘটনা ঘটিয়েছিল।

এখন এগুলো, কীভাবে এই ভূমিকক্ষ হয়? আমাদের ভূগর্ভ (Earth's Crust) কতগুলো ভাগে বিভক্ত, যাদেরকে টেকটনিক প্লেট (Tectonic Plate) বলে। এই টেকটনিক প্লেট কিন্তু স্থিতিশীল নয়, এগুলো চলমান। চলমান একটি প্লেট আরেকটি প্লেটে চাপ দেওয়ার কারণে সেখানে শক্তি সঞ্চিত হয়। কখন হঠাতে করে প্লেটগুলো সরে যায়, তখন সঞ্চিত শক্তি বের হয়ে ভূমিকক্ষ সৃষ্টি করে। ভূমিকক্ষের মাঝা পরিমাপ করা হয় রিখটার স্কেলে। রিখটার স্কেলে ৫ মাঝাৰ বেশি ভূমিকক্ষ আমরা অনুভব করতে পারি। রিখটার স্কেলে এক মাঝা বেড়ে বাংলা অর্ধাং তার শক্তি তিনিশ পুঁশ বেড়ে যাওয়া। একটি ভূমিকক্ষ যত বড় হয় তত দূর থেকে সেটি অনুভব করা যাব।

১.১০ তিথে বাংলাদেশ এবং তার আশেপাশে ঘটে বাংলা ভূমিকক্ষগুলো দেখানো হয়েছে। ছবিতে নিশ্চয়ই দেখছ বাংলাদেশের ভেতরে সামুত্তিক কালো কোনো বড় ভূমিকক্ষ হয়নি, কিন্তু আশেপাশে ঘটে বাংলা ভূমিকক্ষ অনুভূত হয়েছে। ১৮৮৪ সালে মানিকগঞ্জ এলাকায় রিখটার স্কেলে ৭ মাঝাৰ বড় একটি ভূমিকক্ষ হয়েছিল। ১৮৯১ সালে শিলহরে ৮.৭ মাঝাৰ একটি বড় ভূমিকক্ষ হয়েছিল। যেহেতু অভীতে এই অঞ্চলে বড় ভূমিকক্ষ হয়েছে, তাই আমাদের ধৰে নিতে হয় ভবিষ্যতেও হতে পারে। সেটি কখন হবে যেহেতু আমাদের জানা নেই, তাই সব সময়েই অস্তুত থাকতে হবে।

১.১১ ভূমিকক্ষ হলে কৰণীয় কী? এর হাত থেকে কৃকা পাণ্ডীর কোনো উপায় আছে কি?

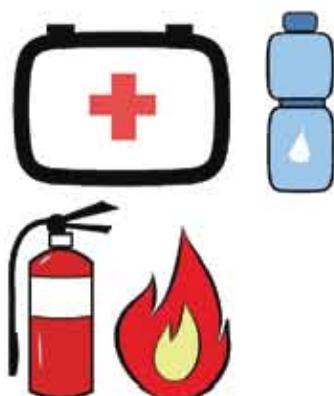


চিত্র ১.১০: ১৮৭১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ এবং তার আশেপাশে ঘটে বাংলা ৫ মাঝা থেকে বড় ভূমিকক্ষ

ভূমিকলের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় নেই, তবে এতে জ্বালমঙ্গের ক্ষমতাক্ষমতি কমানো যাব। সেক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নিরাম মেনে ঘর-বাড়ি ও অন্যান্য স্থাপনা তৈরি করা। আমাদের দেশে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে যে সকল বড় বড় দালান-কোঠা তৈরি করা হয়, সেখানে অবশ্যই ভূমিকল প্রতিরোধক ব্যবস্থা ধাকতে হবে। তা না হলে বড় ধরনের ভূমিকল হলে তা ভয়াবহ পরিপাম ডেকে আনতে পারে। ২০১০ সালে হাইকোর্টে রিখটার কেলে ৭ মাত্রার একটি ভূমিকলে তিন লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল। অর্থাৎ তার থেকে যিশ পুণ থেকে বেশি শক্তিশালী ৮.২ রিখটার ক্ষেত্রের একটি ভূমিকলে ২০১৪ সালে চিলিতে মাত্র ছয়জন মানুষ মারা গিয়েছিল। তার কারণ ভূমিকল প্রবল চিলি নিরাম করে তাদের দেশে ভূমিকল সহনীয় বিস্তৃত তৈরি করতে শুরু করেছে। এছাড়া ভূমিকল হলে জ্বুরি ডিভিতে সরকারি ও অন্যান্য সংস্থার সমর্থনে দ্রুত ঝাপ তৎপরতা ও উদ্ধারকাজ নিশ্চিত করতে হবে এবং তার জন্য আগাম প্রস্তুতি ধাকতে হবে। বেশ কয়েকটি বিষয় সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখতে হবে।

### ভূমিকলের আগে করণীয়

১. সড়ব হলে সব বাসাতেই অগ্নিবির্যক প্রস্তুতি ধাকা দরকার। এর সাথে প্রাথমিক টিকিংসা কিট, ব্যাটারি চালিত গ্রেডিও, টর্চ লাইট কিছু বাড়তি ব্যাটারি, শুকনো খাবার এবং পানি রাখার ব্যবস্থা করা।
২. কীভাবে ফাস্ট এইড বা প্রাথমিক টিকিংসা দিতে হয় সেটি শিখে নাও।
৩. বাসায় গ্যাস, ইলেক্ট্রিসিটি এবং পানির সরবরাহ কীভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটি জেনে নাও।
৪. ভূমিকলের পর প্রয়োজনে কোথায় কীভাবে পরিবারের সদস্যদের সাথে মিলিত হতে হবে, সেটি আগে থেকে সবার সঙ্গে কথা বলে ঠিক করে নাও।
৫. উচু শেলকে ভাসী জিনিস রাখা যাবে না, ভূমিকলের সময় সেগুলো নিচে পড়ে লোকজনকে আহত করতে পারে।
৬. ভূমিকলের সময় কী করতে হবে, সেটি স্কুল কলেজ বা কর্মক্ষেত্রে "ছিল" করে শিখে নাও।

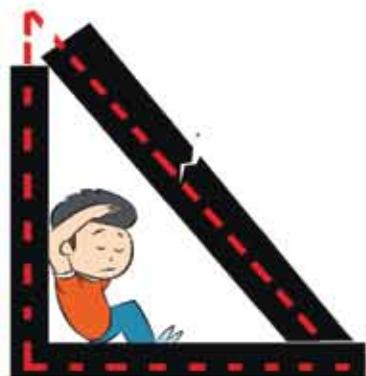


### ভূমিকলের সময় করণীয়

১. ভূমিকলের সময় ভয়ে এবং আতঙ্কে দিষ্টিনিক জ্বালশূণ্য হওয়া যাবে না। নিজেকে বোর্ডাঙ পৃথিবীর মানুষ ভূমিকলের সাথে জড় থেকে বসবাস করে আসছে এবং মাধ্য ঠাড়া রাখলে বড়



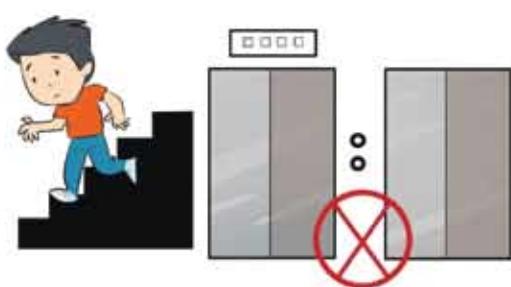
শক্ত টেবিলের নীচে আশ্রয় নাও



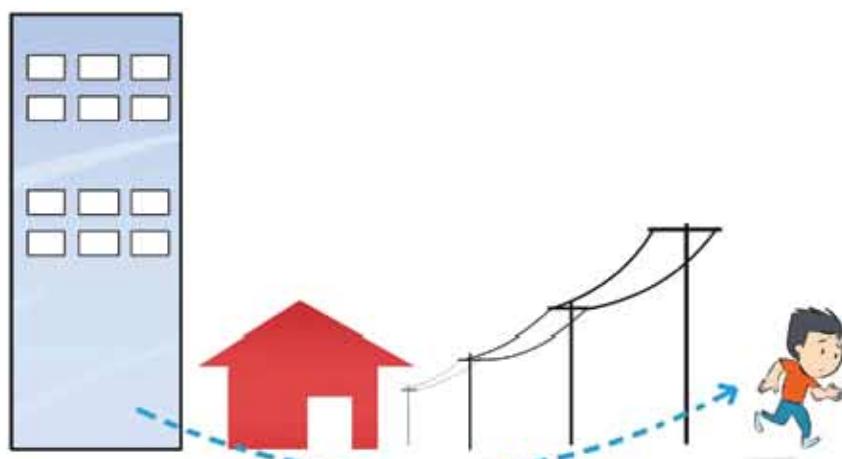
অথবা ঘরের কোণায় চলে যাও যাতে কিছু ভেঙ্গে  
পড়লেও সরাসরি গায়ের ওপরে না পড়ে একটা  
ত্রিভুজাকৃতির জায়গা থেকে যায় তোমার ওপর।



বাইরে ধাকলে আতঙ্কিত না হয়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে।



বিল্ডিং থেকে একাশত নামতে চাইলে সিডি দিয়ে নামাই নিরাপদ



উচু কাঠামো, বৈদ্যুতিক ধাম- ইত্যাদি থেকে যতদূর সম্ভব দূরে সরে যেতে হবে।

চিত্র ৯.১১: ঝুঁটিক্ষেপের সময় করণীয়

ভূমিকঙ্গের বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব।

২. তুমি যদি ঘরের ভেতরে থাকো তাহলে ভিতরেই থাকা, হুড়োহুড়ি করে বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করো না। দেয়ালের পাশে দাঁড়াও। কাচের জানালা থেকে দূরে থাকো। প্রয়োজনে শক্ত টেবিলের নিচে আশ্রয় নাও। কখনোই লিফট দিয়ে নামার চেষ্টা করো না।

৩. তুমি যদি ঘরের বাইরে থাকো তাহলে বাইরেই থাকো, ঘরের ভেতরে তোকার চেষ্টা করো না। ইলেক্ট্রিক পোল কিংবা বড় বিল্ডিং থেকে দূরে সরে যাও, উপর থেকে মাথার উপর কিছু পড়তে পারে।

৪. কোনোভাবেই ম্যাচ জ্বালিও না, গ্যাসপাইপ ভেঙে বাতাসে গ্যাসের মিশ্রণ আগুনের জন্য খুবই বিপজ্জনক।

### ভূমিকঙ্গের পরে করণীয়

১. বড় ভূমিকঙ্গ হয়ে থাকলে নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের পরীক্ষা করে দেখো কেউ আহত হয়েছে কি না। আহত হলে প্রাথমিক চিকিৎসা দাও। গুরুতর আহত হলে হাসপাতালে নাও, মনে রেখো সত্যিকারের বড় ভূমিকঙ্গ হলে হাসপাতালে অসংখ্য মানুষকে জরুরি চিকিৎসা দিতে হয়। কাজেই যার প্রয়োজন বেশি তাকে আগে চিকিৎসা দেওয়া হবে।

২. পানি, ইলেক্ট্রিসিটি, গ্যাসলাইন পরীক্ষা করো, যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে সরবরাহ বন্ধ করে দাও। বাসায় গ্যাসের গন্ধ পেলে ঘরের দরজা-জানালা খুলে ঘরের বাইরে যাও।

৩. রেডিওতে খবর শোনার চেষ্টা কর। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে টেলিফোন ব্যবহার করে নেটওয়ার্ক অচল করে দিও না, জরুরি কাজের জন্য ত্রাণ বাহিনীকে টেলিফোন ব্যবহার করতে দাও। বড় ভূমিকঙ্গের পর টেলিফোন অচল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকতে পারে।

৪. ক্ষতিগ্রস্ত বিল্ডিংয়ের বাইরে থেকো। ভাঙ্গা কাচ ইত্যাদিতে যেন পা কেটে না যায়, সেজন্য খালি পায়ে হাঁটাহাটি করবে না।

৫. সমুদ্র উপকূলে বসবাস করলে সমুদ্র থেকে দূরে সরে যাও। সুনামি এসে আঘাত করতে পারে।

৬. ধ্বংসপ্রাপ্ত বিল্ডিংয়ের নিচে আটকা পড়লে। ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে বের হওয়ার চেষ্টা না করে উদ্ধারকারীদের জন্য অপেক্ষা কর। নিজের শক্তি বাঁচিয়ে রাখো, উদ্ধারকারী দল এলে তাদেরকে সংকেত দেওয়ার জন্য কোনো কিছুতে নিয়মিতভাবে আঘাত করে দৃষ্টি আকর্ষণ কর।

৭. বড় ভূমিকঙ্গ হলে আফটার শক হিসেবে আরো ভূমিকঙ্গ হতে পারে, সে জন্য প্রস্তুত থেকো।



### ଦଳଗତ କାଜ

**କାଜ:** ଭୂମିକଳେ କରଣୀୟ କାଙ୍ଗଳୁ ଦିରେ ପୋଷଟାର ଏବଂ ଶିକଳେଟ ତୈରି କରେ ତୋଘରା ଏଲାକାଯ ବିଭିନ୍ନ କର ।



### ଦଳଗତ କାଜ

**କାଜ:** ଭୂମିକଳେ ସମୟ କରଣୀୟ କାଜେର ଏକଟି ଛିଲେର ଆରୋଜନ କର ।

## ୯.୪ ଯାନସମ୍ପତ୍ତ ଓ ଉତ୍ସତ ପରିବେଶେର ପୁରୁଷ

ଆମାଦେର ଜୀବନଧାରଣେର ଜଳ୍ୟ ଯେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ ଆହେ, ତାର ମଧ୍ୟେ ଅନୁଭବ ହଜେ ବାତାସ । ବାତାସ ବା ଅଞ୍ଚିଜେନ ଛାଡ଼ା ଆୟରା କର୍ତ୍ତକଣ ବାଢ଼ିଲେ ପାରି? ଖୁବ ବେଶି ହେଲେ ଦୁଇ କିଲୋ ତିନ ମିନିଟ । ଏହି ବାତାସ ଯଦି ଦୂରିତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏତେ ଯଦି ନାନା ରକମ କ୍ରତିକର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ (ସେମନ:  $\text{CO}$ ,  $\text{SO}_2$ ,  $\text{SO}_3$ ,  $\text{NO}_2$  ଇତ୍ୟାଦି), ଖୁଲାବାଲିର କୁଦ୍ର କୁଦ୍ର କଣ ଥାକେ, ତବେ ସେତି ନିଃଶ୍ଵାସ-ପ୍ରଶ୍ଵାସେ ଅଞ୍ଚିଜେନେର ସାଥେ ଆମାଦେର ଶରୀରେ ଥିବେଶ କରେ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ରକମର କ୍ୟାମାରେର ମତୋ ନାନା ରକମ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାନ୍ତେ ପାରେ । ଏକଇଭାବେ ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପାହଶାଳା, ଯାଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀର ଜଳ୍ୟ ମାରାଘକ କ୍ରତିର କାରଣ ହତେ ପାରେ । ବାତାସେର ମତୋ ପାନିର ଆମାଦେର ଜୀବନଧାରଣେର ଜଳ୍ୟ ଖୁବି ଜରୁରି ଏକଟି ଉପାଦାନ । ନନ୍ଦ-ନନ୍ଦୀର ପାନି ଦୂରିତ ହେଲେ ସେଥାନେ ମାହସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳଙ୍ଗ ପ୍ରାଣୀ ମାରାଘକ ହୁଅକିର ଯୁଧେ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ପରିବେଶେର ଭାବରୀତ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହବେ । ବାତାସ ଏବଂ ପାନିର ମତୋ ପରିବେଶେର ଥିଲିଟି ଉପାଦାନରେ ଆମାଦେର ଜୀବନଧାରଣେର ଜଳ୍ୟ ଅପରିହାର୍ୟ । ତାଇ ଏହି ପରିବେଶ ଯଦି ଯାନସମ୍ପତ୍ତ ଏବଂ ଉତ୍ସତ ନା ହୁଏ ତାହେଲେ ଏକ ସମୟ ସେତି ଜୀବବୈଚିକ୍ୟର ଜଳ୍ୟ ବଢ଼ି ରକମେର ହୁଅକି ହୁଏ ଦୌଡ଼ାବେ ଏବଂ ଏକ ସମୟ ଆମାଦେର ଅନ୍ତିମ ଟିକିଯେ ରାଖାଇ କଟିଲ ହୁଁ ପଡ଼ିବେ । ତାଇ ଏ ବ୍ୟାପାରେ ଆମାଦେର ନିଜେଦେର ସେମନ ସତ୍ୟତନ ହତେ ହବେ, ଟିକ ସେଇକମ ଆଶପାଶେ ସବାଇକେ ସତ୍ୟତନ କରାନ୍ତେ ହବେ ।

### ୯.୪.୧ ପ୍ରକୃତି ସଂରକ୍ଷଣଶୀଳତାର ତାଙ୍ଗର୍ଫ

ପ୍ରକୃତି ସଂରକ୍ଷଣଶୀଳତା ହେଲୋ ଆମାଦେର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସଙ୍କଳ ରକ୍ଷା କରା । ଆମାଦେର ଅତି ପୁରୁଷଗ୍ରୂପ ପ୍ରାକୃତିକ ସଙ୍କଳ ହଜେ ବାତାସ, ପାନି, ଯାଟି, ପାହଶାଳା, ପ୍ରାଣିଙ୍କ ସଙ୍କଳ, ଖଣିଙ୍କ ସଙ୍କଳ, ତେଲ, ଗ୍ୟାସ

ইত্যাদি। আমাদের জীবনধারণের জন্য প্রতিটি সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ। বাতাস, পানি না থাকলে বা ধৰ্মস হলে আমরা যেমন বাঁচতে পারব না, তেমনি তেল, গ্যাস আর গাছপালা ছাড়াও বেঁচে থাকা অসম্ভব। আমরা যদি আমাদের প্রকৃতি সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা না নিই, গাছপালা বনজ সম্পদ নিধন বন্ধ না করি, বাতাস, পানি ইত্যাদি দূষণ বন্ধ না করি, তাহলে আমাদের এই প্রকৃতি একসময় আর বাসযোগ্য থাকবে না এবং আমরা আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারব না।

## ১.৪.২ প্রকৃতির সংরক্ষণশীলতার বিভিন্ন কৌশল

প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতার বেশ কয়েকটি কৌশল আছে। সেগুলো হলো:

### ১. সম্পদের ব্যবহার করানো

আমরা পরিমিত সম্পদ ব্যবহার করে সম্পদ রক্ষা করতে পারি। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। বাজার থেকে কিছু কিনে আনলে একটি নতুন প্যাকেট দেওয়া হয়। আমরা যদি একটি প্যাকেটই বারবার ব্যবহার করি, তাহলে সম্পদের ব্যবহার সীমিত করা সম্ভব। আজকাল প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে আমরা টিস্যু, ন্যাপকিন ব্যবহার করি। একটুখানি সতর্ক হলেই এগুলোর ব্যবহার কমিয়ে দেওয়া সম্ভব। এবার তোমরা নিজেরা বের কর আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কোন কোন কাজে এভাবে সম্পদের ব্যবহার কমিয়ে প্রকৃতি সংরক্ষণ করতে পারি।

একসময় অফিস-আদালতের সকল কাজকর্মে কাগজ ব্যবহার করতে হতো। এখন বেশির ভাগ কাজ কম্পিউটার ব্যবহার করে করা হয় বলে কাগজের ব্যবহার কমে গেছে। অনেক অফিস কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাগজের ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ করে “কাগজবিহীন অফিস” প্রকল্প হাতে নিয়েছে। কাগজ তৈরি হয় গাছপালা থেকে, কাগজের ব্যবহার করানোর অর্থই হলো গাছপালা কম কাটতে হবে আর তাতে বনজ সম্পদ রক্ষা পাবে অর্থাৎ প্রকৃতির সংরক্ষণ হবে।

### ২. দূষণ থেকে সম্পদ রক্ষা করা

আমাদের প্রকৃতি বা সম্পদ দূষিত হলে সেটি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো নদ-নদীর পানি। তোমরা অনেকে হয়তো বুড়িগঙ্গা নদীর কথা জান। দূষণের ফলে নদীর পানি এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে আজ আর বুড়িগঙ্গা নদীতে মাছ তো দূরের কথা, কোনো জলজ প্রাণীই খুঁজে পাওয়া কঠিন। বুড়িগঙ্গা নদীর মতো বাংলাদেশের অনেক নদীই দূষণের শিকার হয়েছে। এসব দূষণ রোধ করা না গেলে এমন এক সময় আসবে যখন নদ-নদীতে মাছই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। অনিয়ন্ত্রিত কল-কারখানা, যানবাহনের ধোঁয়া ইত্যাদির কারণে বাংলাদেশের অনেক শহরে বিপজ্জনকভাবে বায়ুদূষণ হয়েছে। বায়ুদূষণে পৃথিবীর প্রথম ১০০টি শহরের মাঝে বাংলাদেশের আটটি শহরের নাম রয়েছে।

### ৩. একই জিনিস বারবার ব্যবহার করা

সম্বৰ হলে একই জিনিস বারবার ব্যবহার করে প্রকৃতি সংরক্ষণ করা যায়। আজকাল কম্পিউটারের প্রিন্টারে বা ফটোকপি মেশিনে অসংখ্য কাগজ ব্যবহার করা হয় এবং অনেক সময়েই সেখানে শুধু একটি পৃষ্ঠা ব্যবহার করা হয়। একটুখনি সচেতন হলেই কাগজের অন্য পৃষ্ঠা আমাদের নানা কাজে ব্যবহার করতে পারি। ব্যানার বিলবোর্ডে যে পলিথিন ব্যবহার করা হয়, সেগুলো অনেক উচ্চত মানের, সেগুলো সংগ্রহ করে ব্যাগ তৈরি বা অন্য কাজে ব্যবহার করা যায়। প্রতিদিন আমরা অনেক প্লাস্টিকের বোতল ছুড়ে দেলে দিই। খুব সহজেই সেগুলো পুনর্ব্যবহার বা Recycle করা সম্ভব। আমাদের ব্যবহার্য অনেক জিনিস শিল্প-কারখানার তৈরি হলেও তা কোনো না কোনো পর্যায়ে প্রকৃতির উপরই নির্ভরশীল। কাজেই একই জিনিস বারবার ব্যবহারে থাকৃতিক সঞ্চাদের উপর চাপ কমে এবং এতে প্রকৃতি সংরক্ষণ হয়।

### ৪. পুরাতন জিনিস কেলে না দিয়ে তা থেকে নতুন জিনিস তৈরি করা

পুরাতন জিনিস একেবারে কেলে না দিয়ে তা থেকে নতুন জিনিস তৈরি করেও প্রকৃতি সংরক্ষণ করা যায়। আমাদের কালচারে সেটি আমরা বছু আগে থেকে করে আসছি, কাঁথা হচ্ছে তার উদাহরণ। পুরাতন কাপড় বা শাড়ি কেলে না দিয়ে সেগুলো দিয়ে কাঁথা তৈরি করা হচ্ছে। ঠিক সেরকম পুরাতন কাগজ দিয়ে তোলা, পুরোনো টাইপ থেকে স্যান্ডেল কিংবা পৃষ্ঠাগুলির বর্জ্য থেকে জৈব সার এ ধরনের নানা রকম জিনিসের কাঁথা বলা যায়।

### ৫. প্রাকৃতিক সংস্কার পুরোপুরি রক্ষা করা

প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতার একটি অন্য উপায় হলো এর বিরোধিতা না করে একে রক্ষা করা বা এতে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ না করা। জোমরা হয়তো জান, অনেক দুষ্প্রত্যক্ষ সুন্দরবনে হরিণ, বাঘ এগুলো শিকার করে বা চুরি করে গাছ কাটে। শীতের পাখিকে ধরে বাজারে বিক্রয় করে, সমুদ্র উপকূলে অনিয়ন্ত্রিত অপরিকল্পিত জাহাজ ভাস্ত শিল্প গড়ে তুলে সমুদ্রের পানিকে দূষিত করা। এসব কার্যক্রম বন্ধ করাই হলো প্রকৃতি সংরক্ষণ। সুন্দরবনের খুব কাছে কলকারখানা বসিয়ে বাসুদূষণ করে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য নষ্ট করে। সুন্দরবনের যত্তো আমাদের অনেক প্রাকৃতিক সংস্কার অনেকাংশে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, যা গোধ করা অতি আবশ্যিক হয়ে পড়েছে।



#### দলগত কাজ

**কাজ:** জোমদের স্কুলের আশপাশে কোথায় কোথায় পরিবেশদূষণ হচ্ছে, সেগুলো চিহ্নিত করে একটি প্রতিবেদন লিখো। স্কুলের যান্ত্রিক সেটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাঝে পাঠিয়ে দেখো।

পরিবেশদূষণ বন্ধ করা যায় কি না।



## দলগত কাজ

**কাজ:** তোমার এলাকায় মানসমত ও উন্নত পরিবেশ সৃষ্টির অস্তরায় কী এবং সে জন্য করণীয় কী হতে পারে, সেগুলো চিহ্নিত কর। ৪-৫ জন বন্ধু বা সহপাঠী মিলে একটি শুপ তৈরি কর। নিজ নিজ এলাকার পরিবেশগত সমস্যা চিহ্নিত কর। একেব্রহ্ম পানিদূষণ, ঘৰাতত ঘয়লা ফেলা, খোলা জায়গার ঘলঘূঢ় ভ্যাগ ইত্যাদি বিবেচনায় রাখ। এসব দৃষ্টিতে ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে পোষ্টার বা লিপলেট তৈরি করে সবার মাঝে বিলি কর। প্রতিপ্রতিকার চিঠি লিখো, এলাকার গম্ভীরতা ব্যক্তিদের সহযোগিতা কাজে শাগাও। প্রয়োজনবোধে শূল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সরকারি কর্মকর্তা, পরিবেশবাদী সংগঠন, বেসরকারি সংস্থার সাহায্য নাও।

## অনুশীলনী



### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন দুর্বোগটি শুধু শাশ্বতে সংঘটিত হয়?

- |              |            |
|--------------|------------|
| (ক) কালৈশারী | (গ) সুনামি |
| (খ) ভূমিকক্ষ | (ঘ) বন্যা  |

২. কীন ছাউল প্যাস বৃন্তির কারণ—

- যানবাহন
- শিল্পকারখানা
- বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| (ক) i ও ii  | (গ) ii ও iii    |
| (খ) i ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |

পাশের চিহ্ন অবস্থানে ৩ ও ৪ থেকের উচ্চর দাত।

৩. চিহ্ন পদর্শিত কারখানা থেকে কোন গ্যাস নির্গত হচ্ছে না?

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| (ক) $\text{SO}_2$ | (গ) $\text{NH}_3$ |
| (খ) $\text{CO}_2$ | (ঘ) $\text{NO}_2$ |

৪. উচ্চরের কারখানা হতে নির্গত গ্যাসের মাঝমে সৃষ্টি এগিজ বৃক্ষ  
শানুবের কোন গোপটি সৃষ্টি করে?

- |            |                |
|------------|----------------|
| (ক) বহুমূল | (গ) ক্যালার    |
| (খ) আজমা   | (ঘ) হার্ট আটাক |



### সূজনশীল প্রশ্ন

১. নওশাদ মিয়ার বাড়ি বরপুরী জেলার। তার বয়স ৭০ বছর। ২০০৭ সালের পূর্ণিমাতে সিভেজে  
তিনি হাত্তা সরাই আরা যান। বরবাড়ি সরকিলু থাকে উচ্চে যাই। বাড়ের পূর্বাভাস পেঁচে বেজানেরক  
মল করেক মাইল দূরের আর্বানকেজে বাত্তার পরাবর্ষ দেন। নওশাদ মিয়া এবং তার পরিবার কেউ  
আর্বানকেজে যাননি। সাম্পর্ক সাহেব আর্বানকেজে বাত্তার বাহিনীর কালেও পরিবারের সকল  
সদস্য দেইচে আছে। আর্বান-পরিজনহীন অসহায় কৃষ্ণ নওশাদ মিয়া এখন শুধুই আকসাল করেন যে  
কেন তিনি সাম্পর্ক সাহেবের সাথে সরাইকে নিজে আর্বানকেজে পেলেন না?

- (ক) সাইক্লন কী?
- (খ) বৈশিক উচ্চতা ব্যাখ্যা কর।
- (গ) উচ্চীপকে উল্লিখিত পূর্ণিমাত বীভাবে সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা কর।
- (ঘ) নওশাদ মিয়া পূর্ণিমাতের কবল হতে রেহাই পাওয়ার জন্য কী কী পদক্ষেপ নিতে পারতেন?  
বিশ্লেষণ কর।

২. চুলি পড়ালেখা শেষ করে রাত ১২টার মুহাতে শেষ। হঠাৎ শক্ত করল, তার পোবার খাট ও  
শিশির ক্যান কাঁপছে, এবং ঘরের ভাকে হালকা জিনিসগুল নিচে পড়ে যাচ্ছে। চুলি পরমিল সকালে  
শক্ত করল, আশাপাশের কিছু পুরাতন বিভিন্ন মেটে শিরেছে, আবার কোলোটি তেজে শিরেছে, এবং  
হেসে গড়েছে। চুলি বুরাতে গোলু রাতে এক বরলের প্রাকৃতিক দূর্বোগ সংঘটিত হয়েছিল।

- (ক) খরা কী?
- (খ) বালাদেশ পূর্ণিমাত-কবলিত দেশ হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।
- (গ) চুলির শক্ত করা প্রাকৃতিক দূর্বোগ কীভাবে সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা কর।
- (ঘ) উচ্চীপকের প্রাকৃতিক দূর্বোগ থেকে রক্ত পাওয়ার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাই?  
বিশ্লেষণ কর।

## দশম অধ্যায়

# এসো বলকে জানি



আমাদের সৈন্যদিন জীবনের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতিদিনই আমাদের কোনো কিছুকে টালতে হয়, ঠেলতে হয় কিংবা ধাক্কা দিতে হয়। কোনো বস্তুর গতির অবন্ধার পরিবর্তন ঘটাতে চাইলেই আমরা সেটাকে টানি, ঠেলি বা ধাক্কা দিই অর্থাৎ বল প্রয়োগ করি। বল প্রয়োগ করে স্থির বস্তুকে পতিশীল করা যায়, আবার পতিশীল বস্তুর গতি পরিবর্তন করা যায়, এমনকি গতি খামিয়েও দেওয়া যায়। এ অধ্যায়ে আমরা জড়তা, বল, স্থিতি এবং গতি আলোচনা করব। গতির উপর বলের প্রভাব বোঝার জন্য আমরা নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে বলের প্রকৃতি জানব। নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে বলের পরিমাপ করব এবং নিউটনের তৃতীয় সূত্র থেকে বলের কিম্বা-প্রতিক্রিয়া আলোচনা করব।



### এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- বস্তুর জড়তা এবং বলের গুণগত ধরণ নিউটনের প্রথম সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জড়তার ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন থকার বলের থকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ব্যবহারিক জীবনে ঘর্ষণের সুবিধা বর্ণনা করতে পারব।
- স্থিতি ও গতির ওপর বলের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র ব্যবহার করে বলের পরিমাপ করতে পারব।
- সহজ পরীক্ষণের সাহায্যে বল পরিমাপ করতে পারব।
- নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রের সাহায্যে সংস্থিত কলেকটি জনপ্রিয় ষটলা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আমাদের জীবনে বলের প্রয়োজনীয়তা উপস্থিতি করতে পারব।

## ১০.১ ধাক্কা ও টানা: বল

কোনো কিছুকে দূরে সরাতে চাইলে আমরা সেটাকে ঠেলি বা ধাক্কা দিই। আবার কোনো কিছুকে কাছে আনতে চাইলে আমরা তাকে টানি। কোনো বস্তুর উপর অন্য বস্তুর ধাক্কা বা টানাই হচ্ছে বল প্রয়োগ। যখনই আমরা কোনো কিছুকে ঠেলি বা টানি, উঠাই বা নামাই তখন আমরা আসলে বল প্রয়োগ করি। যখন কোনো কিছুকে মোচড়াই বা ছিঁড়ি, প্রসারিত করি বা সংকুচিত করি, তখনো বল প্রয়োগ করতে হয় কিন্তু এই অধ্যায়ে আমরা শুধু বলের মাধ্যমে গতি পরিবর্তনের বিষয়টি আলোচনা করব। আমরা সবাই দেখেছি স্থির বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করা হলে সেটি নড়ে আবার নড়তে থাকা বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করে সেটি থামানো যায়। অর্থাৎ বল প্রয়োগ করে বস্তুর গতির পারিবর্তন করা যায়। বিজ্ঞানী নিউটন বল, ভর, জড়তা ও গতির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে তিনটি সূত্র প্রকাশ করেন। এই তিনটি সূত্র নিউটনের গতিবিশয়ক সূত্র নামে পরিচিত। নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে আমরা বস্তুর জড়তা ও বল সম্পর্কে ধারণা পাই। এ প্রসঙ্গে নিউটনের প্রথম সূত্র হলো:

বাইরে থেকে কোনো বল প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু স্থিরই থাকবে এবং সমবেগে চলতে থাকা বস্তু সমবেগে চলতে থাকবে।

নিউটনের প্রথম সূত্রের প্রথম অংশ নিয়ে কারো সমস্যা হয় না, কারণ আমরা সব সময়েই দেখেছি স্থির বস্তুকে ধাক্কা না দেওয়া পর্যন্ত সেটা নিজে থেকে নড়ে না, স্থির থেকে যায়। দ্বিতীয় অংশটি নিয়ে সমস্যা, কারণ আমরা কখনোই কোনো চলন্ত বস্তুকে অনন্তকাল চলতে দেখি না। ধাক্কা দিয়ে কোনো বস্তুকে গতিশীল করে ছেড়ে দিলেও দেখা যায় কোনো বল প্রয়োগ না করলেও শেষ পর্যন্ত বস্তুটা থেমে যায়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়, যেকোনো কিছুকে সমবেগে চালিয়ে নিতে হলে ক্রমাগত বুরি সেটাতে বল প্রয়োগ করে যেতে হয়। নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে আমরা জানতে পেরেছি সেটা সত্য নয়, সমবেগে চলতে থাকা কোনো বস্তু যদি থেমে যায় তাহলে বুরতে হবে সেখানে কোনো না কোনোভাবে বল প্রয়োগ করা হয়েছে। ঘরণ, বাতাসের বাধা এ রকম অনেক কিছু আসলে উল্টো দিক থেকে বল প্রয়োগ করে চলমান একটা বস্তুকে থামিয়ে দেয়। যদি সত্য সত্য সব বল বন্ধ করে দেওয়া যেত, তাহলে আমরা সত্যই দেখতে পেতাম সমবেগে চলতে থাকা একটা বস্তু অনন্তকাল ধরে চলছে।

### ১০.১.১ জড়তা

আমরা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে দেখি, প্রত্যেক বস্তু যে অবস্থায় আছে, সে অবস্থায় থাকতে চায়। বস্তু স্থির থাকলে স্থির থাকতে চায় আর গতিশীল থাকলে গতিশীল থাকতে চায়। বল প্রয়োগ না

করা পর্যন্ত বস্তু বে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থার থাকতে চাওয়ার বে প্রবণতা, সেটাই হচ্ছে জড়তা। স্থিতিশীল বস্তুর স্থিতির থাকতে চাওয়ার প্রবণতাকে বলে স্থিতি জড়তা এবং গতিশীল বস্তুর সমবেগে গতিশীল থাকার প্রবণতাকে বলে গতি জড়তা।

### জড়তার ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা

থেমে থাকা বাস হঠাতে শুরু করলে বাসবাত্রীরা পিছনের দিকে হেলে পড়েন জড়তার কারণে। বাস ধখন থেমে থাকে, তখন যাত্রীর শরীরও স্থিতি থাকে। কিন্তু হঠাতে বাস চলতে শুরু করলে যাত্রীদের শরীরের বাসের সিটে বসে থাকা বাসসংলগ্ন অংশ গতিশীল হয় কিন্তু শরীরের উপরের অংশ জড়তার জন্য স্থিতি থাকে এবং স্থিতি থাকতে চার বলে পিছনে হেলে পড়ে।

চলন্ত বাস থেকে নামতে গেলে ঠিক তার বিপরীত বাপারটি ঘটে। পুরো শরীরটি গতিশীল অবস্থায় গা ধখন যাটি শৰ্ষ করে, তখন শরীরের নিচের অংশ স্থিতি হয়ে গেলেও উপরের অংশ গতিশীল থেকে বায় এবং যাত্রী সামনে ঝুঁঢ়ি থেঝে পড়ে যায়।



### একক কাজ

**কাজ:** একটি প্লাসের উপর একটা কার্ড, বোর্ড বা শক্ত কাগজ রেখে তার উপর কয়েন রাখ। (চিত্র: ১০.০১)। হঠাতে কাজটিকে জোরে টোকা দাও। কী দেখলে?

কয়েনটি প্লাসের মধ্যে পড়ে গেল কেন? হঠাতে জোরে টোকা দেওয়ার জন্য কাজটি সরে গেল, কিন্তু জড়তার কারণে কয়েনটি তার নিষ্কম্ভ স্থিতি অবস্থান বজায় রাখতে চাওয়ার জন্য প্লাসের মধ্যে পড়ে গেল।



চিত্র ১০.০১: জড়তার পরীক্ষা



চিত্র ১০.০২: গতি জড়তার উন্নাহরণ

সিট বেল্ট চালককে উইন্ড স্ক্রিনে আঘাত পাওয়া থেকে রক্ষা করছে।

কোনো বস্তুর দিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও আমরা জড়তার প্রভাব অনুভব করি। যদি কোনো বাস বা গাড়ি হঠাতে বাঁক নেয়, তাহলে যাত্রীরা অন্য পাশে ঝুঁকে পড়ে। এর কারণ আরোহীর বাস বা গাড়ির গতির দিকে গতিশীল ছিলেন, বাস বা গাড়ি হঠাতে দিক পরিবর্তন করলেও জড়তার কারণে আরোহীর মূল দিক বজায় রেখে গতিশীল থাকতে চান, তাই বাসের সাপেক্ষে অন্য পাশে সরে যান।

## ১০.২ বলের পরিমাণ ও নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র

আমরা নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে জেনেছি যে বস্তুর গতির অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে অর্থাৎ স্থির বস্তুকে গতিশীল করতে হলে বা গতিশীল বস্তুর গতির পরিবর্তন করতে হলে বল প্রয়োগ করতে হবে। বস্তুর জড়তা থাকার কারণে এ বল প্রয়োগ করতে হয়। যে বস্তুর জড়তা যত বেশি, তার অবস্থা পরিবর্তনের জন্য তত বেশি বল দিতে হবে। জড়তার পরিমাণ হচ্ছে ভর, সূতরাং যে বস্তুর ভর যত বেশি হবে, গতির পরিবর্তন করতে হলে সেই বস্তুর উপর তত বেশি বল প্রয়োগ করতে হবে।

একটি নির্দিষ্ট ভরের বস্তুর উপর কতখানি বল প্রয়োগ করা হলে বস্তুটির বেগের কতখানি পরিবর্তন হবে, নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র সোচি ব্যাখ্যা করেছে। তবে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রটি জানার আগে আমাদের দুটো রাশির কথা জানতে হবে। একটি হচ্ছে ভরবেগ অন্যটি ত্বরণ।

**ভরবেগ:** ভরবেগ হচ্ছে ভর এবং বেগের গুণফল। অর্থাৎ কোনো বস্তুর ভর  $m$  এবং বেগ  $v$  হলে ভরবেগ  $p$  হচ্ছে :

$$p = mv$$

যদি ভরের পরিবর্তন না হয়, তাহলে ভরবেগের পরিবর্তন হচ্ছে বেগের পরিবর্তনের সাথে ভরের গুণফল। অর্থাৎ  $m$  ভরের কোনো বস্তুর বেগ  $u$  থেকে বেড়ে  $v$  হলে তার ভরবেগের পরিবর্তন  $m(v-u)$ ।

**ত্বরণ:** ত্বরণ হচ্ছে বেগের পরিবর্তনের হার। অর্থাৎ কোনো বস্তুর বেগ যদি  $t$  সময়ে  $u$  থেকে পরিবর্তিত হয়ে  $v$  হয়, তাহলে তার ত্বরণ  $a$  হচ্ছে:

$$a = \frac{(v-u)}{t}$$

আমরা যদি ভরবেগ এবং ত্বরণ বুঝে থাকি তাহলে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রটি বোঝা খুবই সহজ।

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রটি হলো, বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক। তবে বলকে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যে আমরা সমানুপাতিক না বলে “সমান” বলতে পারি। অর্থাৎ

আমরা বলতে পারি, কোনো বস্তুর ভরবেগ  $t$  সময়ে  $m v$  থেকে পরিবর্তিত হয়ে  $m v$  হলে তার ভরবেগের পরিবর্তনের হার  $ma = m(v-u)/t$  অসূজ বল  $F$ -এর সমান হবে। অর্থাৎ,

$$F = \frac{m(v-u)}{t} = ma$$

বলের একক নিউটন। যে পরিমাপ বল এক কিলোগ্রাম ভরের কোনো বস্তুর উপর অসূজ হয়ে এক মিটার/সেকেন্ড<sup>২</sup> দ্রবণ সূচি করে তাকে এক নিউটন (N) বলে।



### উদাহরণ

একটি বস্তুর ভর ২০ কেজি। এর উপর একটি বল অসূজ হওয়ায় এর দ্রবণ হলো ২ মি./সে<sup>২</sup>।  
অসূজ বলের ঘান কত ছিল?

সমাধান: এখানে, বস্তুর ভর,  $m = ২০$  কেজি

দ্রবণ,  $a = ২$  মি./সে<sup>২</sup>

বল,  $F = ?$

আমরা জানি,  $F = ma$

= ২০ কেজি × ২ মি./সে<sup>২</sup>

= ৪০ নিউটন

উত্তর: ৪০ নিউটন

## ১০.৩ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বল

তুমি যদি হাত মুক্তিবদ্ধ করে দেওয়ালে একটা শুধি দাও, তাহলে নিশ্চিতভাবেই তুমি তোমার হাতে ব্যথা পাবে। শুধির মাথায়ে “তুমি” দেওয়ালকে বল দিয়েছ, যদি দেওয়ালের ব্যথা অনুভব করার ক্ষমতা থাকত তাহলে সেটি ব্যথা অনুভব করত কিন্তু তুমি কেন ব্যথা পেয়েছ? কারণটি তুমি নিচয়েই অনুমান করতে পারছ। তুমি বখন তোমার মুক্তিবদ্ধ হাত দিয়ে দেওয়ালে বল প্রয়োগ করেছ, তখন দেওয়ালটিও তোমার মুক্তিবদ্ধ হাতে পাল্টা একটা বল প্রয়োগ করেছে। এটি সব সময়েই সত্ত্ব, কোথাও বল প্রয়োগ করলে সেটিও পাল্টা বল প্রয়োগ করে।



## একক কাজ

**কাজ:** একটি রাবার ব্যান্ড হাত দিয়ে ধরে দেখ সেটি কত লম্বা। এবাবে একটা ছোট বই সুতা দিয়ে রাবার ব্যান্ডের সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে দাও, দেখবে রাবার ব্যান্ডটি খালিকটা লম্বা হয়ে বইটিকে ঝুলিয়ে রেখেছে।

আমরা জানি, বইটির ওজন আছে, ওজন হচ্ছে বল, কাজেই এই বল বইটিকে নিচের দিকে টানছে। বল প্রয়োগ করলে বস্তু গতিশীল হয় কিন্তু এই বইটি গতিশীল নয় বইটি স্থির, কারণ উপর থেকে রাবার ব্যান্ডটি প্রসারিত হয়ে বইটিকে উপরের দিকে টেনে ওজনের বলটিকু নিষ্পত্তি করে রেখেছে।

অর্থাৎ আমরা বলতে পারি, বইটা রাবার ব্যান্ডকে নিচের দিকে টানছে (তাই রাবার ব্যান্ডটা একটু খালি লম্বা হয়ে গেছে) আবার রাবার ব্যান্ডটা বইটাকে উপরের দিকে টানছে। (তাই বইটা নিচে গড়ে না পিঘে স্থির হয়ে আছে)।

উপরের উদাহরণগুলো থেকে আমরা দেখতে পাই, আমরা যখনই কোথাও কোনো বল প্রয়োগ করি, তখনই বিপরীত দিকে একটা বল তৈরি হয়। একটি বলকে ক্রিয়া (বল) বলা হলে অন্যটিকে আমরা প্রতিক্রিয়া (বল) বলতে পারি।

আইজ্যাক নিউটন তিনি তাঁর গতিবিদ্যুক তৃতীয় সূত্রে বলেছেন: প্রত্যক্ষক ক্রিয়া বলেরই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া বল আছে।

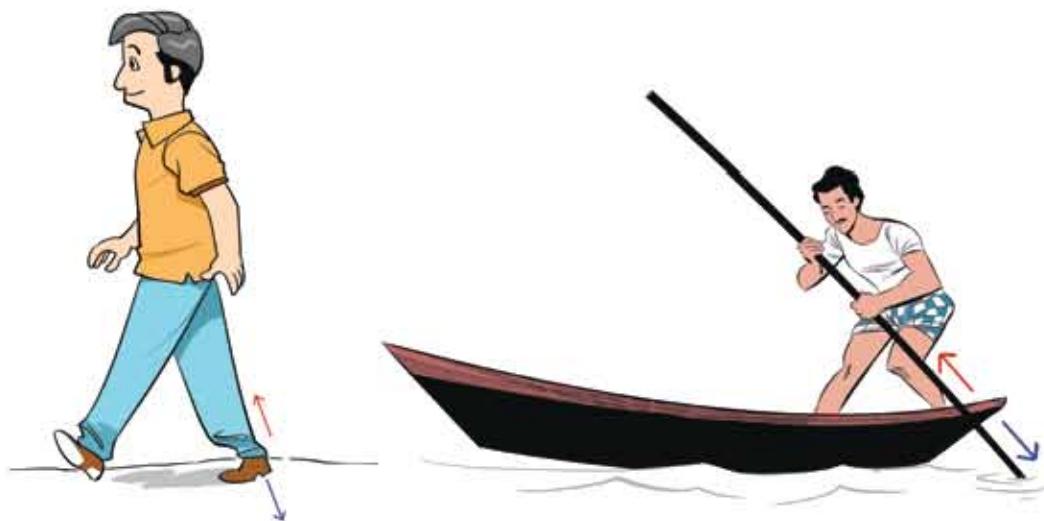
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বল সবসময়ই একটি অন্যটির ওপর কাজ করে—কখনোই একই বস্তুর ওপর কাজ করে না। অর্থাৎ A বস্তু যদি B বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করে তাহলে B বস্তু A বস্তুর উপর বিপরীত দিকে সমান বল প্রয়োগ করবে। প্রতিক্রিয়া বলটি ততক্ষণই থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত ক্রিয়া বলটি থাকবে। ক্রিয়া থেমে পেলে প্রতিক্রিয়াও থেমে যাবে। এ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বলয়ের বস্তুগুলোর স্থিরাবস্থায় বা গতিশীল অবস্থায় বা সাম্যাবস্থায় থাকা বা একে অপরের সংশর্পণ থাকা বা না থাকার উপর নির্ভরশীল নহ—সর্বদাই বর্তমান থাকে।

### ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কঠোকাটি উদাহরণ

নিউটনের তৃতীয় সূত্র বোবার সবচেয়ে সোজা উপায় হচ্ছে আমরা কীভাবে হাঁটি সেটা বোবা। আমরা সবাই হাঁটতে পারি, এর পেছনে কি পদাৰ্থবিজ্ঞান আছে, সেটা না জেনেই সবাই হাঁটে। কিন্তু তোমরা যেহেতু পদাৰ্থবিজ্ঞান শিখতে শুরু করেছ, তোমাদের খুব সহজে একটা প্রশ্ন করা যায়। তুমি যেহেতু স্থির অবস্থা থেকে হাঁটতে পার, কাজেই আসলে তোমার একটি ফুরন হচ্ছে, যার অর্থ তোমার উপর

বল প্রয়োগ করা হচ্ছে। কিন্তু আমরা সবাই জানি, কেউ আমাদের উপর বল প্রয়োগ করে না। আমরা নিজেরই হাঁটি। কেমন করে সেটা সহজ?

নিউটনের তৃতীয় সূত্র না জানা থাকলে আমরা কখনোই হাঁটার বিষয়টা ব্যাখ্যা করতে পারতাম না। আমরা যখন হাঁটি, তখন আমরা পা দিয়ে মাটিতে থাকা দিই (অর্থাৎ বল প্রয়োগ করি), তখন মাটিটা নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী আমাদের শরীরে সমান এবং বিপরীত বল প্রয়োগ করে (চিত্র ১০.০৩)। এই সমান এবং বিপরীত বলটা দিয়েই আমাদের ফর্ম হয়, আমরা হাঁটি! এফইভাবে মাঝি যখন লাগি দিয়ে নদীর তলার মাটিকে থাকা দেয়, তখন নৌকা সামনের দিকে এগিয়ে যাব (চিত্র ১০.০৪)।



চিত্র ১০.০৩: একজন মানুষ হাঁটার সময় পা দিয়ে যখন মাটিকে থাকা দেয়, তখন মাটিটা মানুষটিকে পান্তি থাকা দেয়।

চিত্র ১০.০৪: মাঝি লাগি দিয়ে নৌকা ঠেকে নিয়ে যাচ্ছে।

বিষয়টা যাদের বুঝতে একটু সহজা হচ্ছে, তাদেরকে যন্তে করিয়ে দেওয়া যাব, শক্ত মাটিতে হাঁটা সোজা কিন্তু বুরবুরে বালুর উপর হাঁটা সোজা না, তার কারণ বালুর ওপর বল প্রয়োগ করা যায় না, বালু সরে যায়— তাই নিউটনের তৃতীয় সূত্রের পাস্টা বলটাও ঠিকভাবে পাওয়া যায় না। ব্যাক্সারটা আরো অনেক স্পষ্ট করে দেওয়া যায় যদি কাউকে অসম্ভব মসৃণ একটা ঘেঁষেতে সাবান পানি কিংবা তেল দিয়ে পিচিল করে হাঁটতে দেখো হয়! সেখানে ঘর্ষণ খুব কম, তাই আমরা শিখলে বল প্রয়োগ করতেই পারব না এবং সে জন্য তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে আমাদের ওপর কোনো বলও পাব না! আর তাই হাঁটতেও পারব না (বিশাস না হলে চেষ্টা করে দেখতে পাব)। বল প্রয়োগ করলে বিপরীত এবং সমান বল পাওয়া যায়, যদি প্রয়োগ করতেই না পারি তাহলে তার প্রতিক্রিয়া বল পাব কেমন করে? আর হাঁটব কেমন করে?

তুমি শজন মাপার ঘরের উপর দাঁড়াও। সেখানে তোমার শজন দেখতে পাবে, এটি হচ্ছে শজন মাপার ঘরের উপর তোমার প্রযুক্তি বল। এখন তুমি যদি উপরে উঠতে চাও তাহলে নিচেরভাবে নিচ থেকে তোমার উপরের দিকে বল প্রয়োগ করতে হবে। সেই বলটি কোথা থেকে আসবে?



### একক কাজ

**কাজ:** তুমি একটি লাক দিয়ে দেখ। দেখবে মুহূর্তের জন্য শজন মাপার ঘরের কৌটাটি সরে পিলে অনেক বেশি শজন দেখাচ্ছে। তুমি এই বাড়তি বলটুকু মুহূর্তের জন্য নিচের দিকে প্রয়োগ করেছ এবং তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে শজন মাপার ঘরের তোমার উপরের দিকে বল প্রয়োগ করেছে। সেই প্রতিক্রিয়া বলের কারণে তুমি উপরে উঠতে পেরেছ।



### একক কাজ

**কাজ:** একটি বেলুন নিয়ে একে ভালোভাবে ফোলাও। হাত দিয়ে শুল্ক করে মুখ বন্ধ করে রাখ। এর পর হঠাৎ হাত ছেড়ে বেলুনটিকে মুক্ত করে দাও। (চিত্র: ১০.০৫)। কী দেখলে? তুমি দেখবে বেলুনটি উড়ে বেড়াচ্ছে। বেলুনটিকে যখন ফোলানো হয়েছে তখন বেলুনের রাবারটি প্রসারিত হয়ে ভিতরকার বাতাসের উপর একটা চাপ সৃষ্টি করেছে। যখন তুমি বেলুনের মুখটি ছেড়ে দিয়েছ, তখন বেলুনটি ভেতরকার বাতাসের উপর বল প্রয়োগ করে বেলুনের মুখ দিয়ে সঙ্গেরে বের করতে শুরু করেছে। বেলুনটি যখন বাতাসের উপর বল প্রয়োগ করতে শুরু করেছে, তখন বেলুনের বাতাসও বেলুনটির উপর বল প্রয়োগ করতে শুরু করেছে। এই বলের কারণে বেলুনটি বিপরীত দিকে ছুটতে শুরু করেছে।



চিত্র ১০.০৫: বেলুন থেকে পিছন দিকে বাতাস বের হওয়ার সময় বেলুনটি সামনে এগিয়ে যাব।

## ১০.৪ বলের প্রকৃতি (Nature of Force)

### ১০.৪.১ চারটি মৌলিক বল

পৃথিবীতে কত ধরনের বল আছে জিজ্ঞেস করা হলে তোমরা নিচয়ই বলবে অনেক ধরনের। কোনো কিছুকে যদি ধাক্কা দিই, সেটা একটা বল, ট্রাক যখন বোঝা টেনে নিয়ে যায়, সেটা একটা বল, বড়ে যখন গাছ উপড়ে পড়ে, সেটা একটা বল, চুম্বক যখন লোহাকে আকর্ষণ করে সেটা একটা বল, বোমা বিস্ফোরণে যখন ঘরবাড়ি উড়িয়ে দেয়, সেটা একটা বল, ক্রেন যখন কোনো কিছুকে টেনে তোলে সেটা একটা বল। একটুখানি সময় দিলেই এ রকম নানা ধরনের বলের তোমরা একটা বিশাল তালিকা তৈরি করতে পারবে।

কিন্তু চমকপ্রদ ব্যাপারটি কী জান? প্রকৃতিতে মাত্র চার রকমের বল রয়েছে, ওপরে যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, সেগুলোকে বিশ্লেষণ করা হলে দেখা যাবে, এগুলো ঘূরে-ফিরে এই চার রকমের বাইরে কোনোটা নয়। আসলে মৌলিক বল মাত্র চারটি। সেগুলো হচ্ছে: মহাকর্ষ বল, তড়িৎ চৌম্বক বা বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় বল, দুর্বল নিউক্লীয় বল ও সকল নিউক্লীয় বল।

#### মহাকর্ষ বল (Gravitation)

এই সৃষ্টিজগতের সকল বস্তু তাদের ভরের কারণে একে অপরকে যে বল দিয়ে আকর্ষণ করে, সেটাই হচ্ছে মহাকর্ষ বল। এই মহাকর্ষ বলের কারণে গ্যালাক্সির ভেতরে নক্ষত্ররা ঘূরপাক খায় কিংবা সূর্যকে ঘিরে পৃথিবী ঘোরে, পৃথিবীকে ঘিরে চাঁদ ঘোরে। পৃথিবীর মহাকর্ষ বল যখন আমাদের ওপর কাজ করে, আমরা সেটাকে বলি মাধ্যকর্ষণ। এই মাধ্যকর্ষণ বল আমাদেরকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনে রেখেছে এবং এর কারণেই আমরা নিজেদের ওজনের অনুভূতি পাই।

পদার্থবিজ্ঞানের একটি চমকপ্রদ বল হচ্ছে মহাকর্ষ বল। ভর আছে সেরকম যেকোনো বস্তু অন্য বস্তুকে মহাকর্ষ বল দিয়ে আকর্ষণ করে।

#### তড়িৎ চৌম্বক বল বা বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় বল (Electromagnetic Force)

চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে সেটা দিয়ে কাগজের টুকরোকে আকর্ষণ করা বা চুম্বক দিয়ে অন্য চুম্বককে আকর্ষণ-বিকর্ষণ আমাদের অনেকেই কখনো না কখনো করেছি। যদিও তড়িৎ বা বিদ্যুৎ এবং চুম্বকের বলকে আলাদা ধরনের বল মনে হয়, আসলে দুটি একই বল শুধু দুইভাবে দেখা যায়। শুধু এই বলটা আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ দুটোই করতে পারে অন্যগুলো শুধু আকর্ষণ করতে পারে বিকর্ষণ করতে পারে না। মাধ্যকর্ষণ শক্তির তুলনায় এটা অনেক শক্তিশালী ( $10^{36}$  গুণ বা ট্রিলিওন ট্রিলিওন ট্রিলিওন গুণ শক্তিশালী!) কথাটা যে সত্যি সেটা নিচয়ই তোমরা সহজেই অনুমান করতে পারবে। কারণ যখন তুমি একটা চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে একটা কাগজকে আকর্ষণ করে তুলে নাও, তখন কিন্তু সেই কাগজটাকে

পুরো পৃথিবী তার সমস্ত ভর দিয়ে তৈরি মাধ্যাকর্ষণ বল দিয়ে টেনে রাখার চেষ্টা করে, তবুও তোমার চিরনির অল্প একটু বিদ্যুৎ সেই বিশাল পৃথিবীর পুরো মাধ্যাকর্ষণকে হারিয়ে দেয়।

### দুর্বল নিউক্লীয় বল (Weak Force)

এটাকে দুর্বল বলা হয় কারণ এটা তড়িৎ চৌম্বক বল থেকে দুর্বল (প্রায় ট্রিলিওন গুণ) কিন্তু মোটেও মহাকর্ষ বলের মতো এত দুর্বল নয়। মহাকর্ষ এবং তড়িৎ চৌম্বক বল যেকোনো দূরত্ব থেকে কাজ করতে পারে কিন্তু এই বলটা খুবই অল্প দূরত্বে ( $10^{-18}$  "m") কাজ করে। তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াস থেকে যে বেটা ( $\beta$ ) রশ্মি বা ইলেক্ট্রন বের হয় সেটার কারণ এই দুর্বল নিউক্লীয় বল।

### স্বল নিউক্লীয় বল (Strong Nuclear Force)

এটি হচ্ছে সৃষ্টি জগতের সবচেয়ে শক্তিশালী বল, তড়িৎ চৌম্বক বল থেকেও একশগুণ বেশি শক্তিশালী কিন্তু এটাও খুবই অল্প দূরত্বে ( $10^{-15}$  "m") কাজ করে। পরমাণুর কেন্দ্রে যে নিউক্লিয়াস রয়েছে তার ভেতরকার প্রোটন এবং নিউট্রনের নিজেদের মাঝে এই প্রচণ্ড শক্তিশালী বল কাজ করে নিজেদের আটকে রাখে। প্রচণ্ড বলে আটকে থাকার কারণে এর মাঝে অনেক শক্তি জমা থাকে তাই বড় নিউক্লিয়াসকে ভেঙে কিংবা ছোট নিউক্লিয়াসকে জোড়া দিয়ে এই বলের কারণে অনেক শক্তি তৈরি করা সম্ভব। নিউক্লিয়ার বোমা সে জন্য এত শক্তিশালী। সূর্য থেকে প্রাপ্ত আলো ও তাপ এই বল দিয়ে তৈরি হয়।

বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, এই চার ধরনের বলের মূল এক জায়গায় এবং তাঁরা সবগুলোকে এক সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছেন। তড়িৎ চৌম্বক (বিদ্যুৎ চৌম্বকীয়) এবং দুর্বল নিউক্লিয়ার বলকে এর মাঝে একই সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে এবং সেটি তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের একটি আকাশছোঁয়া সাফল্য। (কাজেই তুমি ইচ্ছে করলে বলতে পার বল তিন ধরনের: মহাকর্ষ, ইলেক্ট্রো উইক (Electro-weak) এবং নিউক্লিয়ার বল। (কেউ এটাকে ভুল বলতে পারবে না) অন্যগুলোকেও একসূত্রে গাঁথার জন্য বিজ্ঞানীরা কাজ করে যাচ্ছেন।

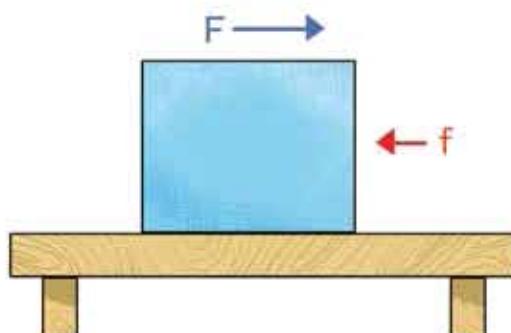
### ১০.৪.২ স্পর্শ বল এবং অস্পর্শ বল

তোমরা যখন তোমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানা কাজে বল ব্যবহার কর তখন তোমাদের মনে হতে পারে কোনো কোনো বল প্রয়োগ করতে হলে স্পর্শ করতে হয় (শ্রেণ দিয়ে ভারী জিনিস তোলা, কোনো কিছুকে ধাক্কা দেওয়া, কিংবা চলতে চলতে ঘর্ষণের জন্য চলন্ত বস্তুর খেয়ে যাওয়া) আবার তোমরা লক্ষ করেছ, কোনো কোনো বল প্রয়োগের জন্য স্পর্শ করতে হয় না (কোনো কিছু ছেড়ে দিলে মাধ্যাকর্ষণ বলের জন্য নিচে পড়া, চুম্বকের আকর্ষণ) কাজেই আমরা বলকে স্পর্শ এবং অস্পর্শ দুই ধরনের বলে ভাগ করতে পারি। স্পর্শ বলের উদাহরণ হিসেবে আমরা ঘর্ষণ বল নিয়ে আলোচনা করব।

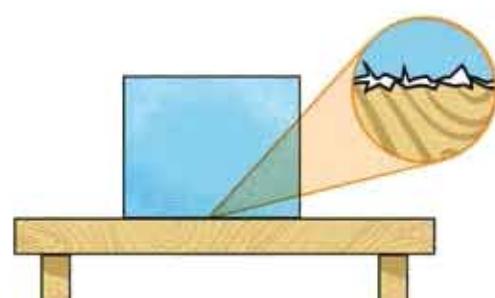
যদিও আমরা ঘর্ষণ বলকে স্পর্শ বলের জ্ঞানীয়তা হিসেবে আলোচনা করছি, কিন্তু তোমরা নিচ্ছাই বুঝতে পারছ আমরা যেখানে স্পর্শ করছি বলে ধারণা করছি, সেখানে কিন্তু পরম্পরার অনু-পরমাণু, তাদের বিরে শূর্ণায়মান ইলেক্ট্রন সমাসরি স্পর্শ দিয়ে নয়, তাদের ভড়িৎ চৌহক বল দিয়ে একে অন্যের সাথে কাজ করছে। অন্য কথায় বলা যায়, আমরা বলি আণবিক-পারমাণবিক পর্যায়ে চলে যাই, তাহলে সব বলই অস্পর্শক। এক পরমাণু অন্য পরমাণুকে আকর্ষণ-বিকর্ষণ করে দূর থেকে, তাদেরকে আকরিক অর্থে স্পর্শ করতে হয় না।

## ১০.৫ ঘর্ষণ বল (Frictional Force)

ধরা বাক, একটা টেবিলে কোনো একটা কাঠের টুকরো রয়েছে এবং সেই কাঠের টুকরোর উপর বল প্রয়োগ করে সেখানে ক্রম সৃতি করতে চাই। ধরা বাক, ১০.০৬ চিত্রে যেভাবে সেখানে হয়েছে, সেভাবে অন্তরি উপর বাম থেকে ডানে  $F$  বল প্রয়োগ করছি, সেখা যাবে কাঠের টুকরোর টেবিলের সাথে কাঠের টুকরোর ঘর্ষণের কারণে একটা ঘর্ষণ বল  $f$  তৈরি হয়েছে এবং সেটি ডান থেকে বাম দিকে কাজ করে প্রয়োগ করা বস্টিকে করিয়ে দিচ্ছে।



চিত্র ১০.০৬: একটি তালের উপর বল প্রয়োগ করলে ঘর্ষণের অন্য বিপরীত দিকে একটি বল তৈরি হতে পাবে।



চিত্র ১০.০৭: ঘর্ষণ থ্রুতপক্ষে দৃষ্টি এবংচোখেবচো শৃঙ্খলে কারণে তৈরি হয়।

কাঠের টুকরোর উপরে যদি খানিকটা ওজন বসিয়ে দিই, সেখা যাবে ঘর্ষণ বল আঝো বেড়ে পেছে। ঘর্ষণ বল কীভাবে তৈরি হয় যাপাইটা বুঝতে পারলেই আমরা দেখব এতে অবাক হওয়ার কিন্তু নেই। যদিও আপাতদৃষ্টিতে কাঠ, টেবিলকে (কিংবা যে সুটো তলদেশের মাঝে ঘর্ষণ হচ্ছে) অনেক মুগ্ধ মনে হয় কিন্তু অপূর্বীকল যখন দিয়ে দেখলে সেখা যাবে (চিত্র ১০.০৭) সব তলদেশেই এবংচোখেবচো এবং এই এবংচোখেবচো অশ্বগুলো যখন একে অন্যকে স্পর্শ করে বা খৌজগুলো একে অন্যের সাথে আটকে যায়, সেটোর কানপেই গতি বাধাধাপ্ত হয় এবং আমরা বলি বিপরীত দিক থেকে ঘর্ষণ বলের জন্য হয়েছে।

যদি দুটো তলদেশকে আরো চাপ দেওয়া হয় তাহলে এবড়োখেবড়ো অংশ আরো বেশি একে অন্যকে সর্প করবে, একটির খাঁজ অন্যটির আরো পঞ্জীর খাঁজে ঢুকে থাবে এবং ঘর্ষণ বল আরো বেড়ে থাবে।

ঘর্ষণের জন্য ভাপ সৃষ্টি হয়। সেটা অনেক সময়েই সমস্যা। যেমন গাড়ির শিলিঙ্গের পিস্টনকে খাঁচা-নামা করার সময়ে সেখানে ঘর্ষণের জন্য ভাপের সৃষ্টি হয় আর সেই ভাপ নিরাপত্ত করার জন্য গাড়ির ইঞ্জিনকে শীতল রাখতে হয়। তাই সেখানে ঘর্ষণ কমানোর জন্য নানা ধরনের ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

### ১০.৫.১ ঘর্ষণের শ্রেণীগতি

ঘর্ষণকে চারভাগে ভাগ করা যায়। স্থিতি ঘর্ষণ, গতি ঘর্ষণ, আবর্ত ঘর্ষণ এবং প্রবাহী ঘর্ষণ:

**স্থিতি ঘর্ষণ (Static Friction):** দুটি বস্তু একে অন্যের সাপেক্ষে স্থিত থাকা অবস্থায় যে ঘর্ষণ বল থাকে, সেটা হচ্ছে স্থিতি ঘর্ষণ। স্থিতি ঘর্ষণের জন্য আমরা হাঁটতে পারি, আমাদের পা কিংবা জুতোর তলা মাটিতে স্থিতি ঘর্ষণে আটকে থাকে এবং পিছলে পড়ে থাই না।

**গতি ঘর্ষণ (Sliding Friction):** একটি বস্তুর সাপেক্ষে অন্য বস্তু যখন চলমান হয়, তখন যে ঘর্ষণ বল তৈরি হয়, সেটি হচ্ছে গতি ঘর্ষণ। সাইকেলের ব্রেক চেপে ধরলে সেটি সাইকেলের চাকাকে চেপে ধরে এবং সুরক্ষ চাকাকে গতি ঘর্ষণের কারণে ধারিয়ে দেয়। গতি ঘর্ষণ উজলের উপর নির্ভর করে, ওজন ব্যত বেশি হবে, গতি ঘর্ষণ তত বেশি হবে।

**আবর্ত ঘর্ষণ (Rolling Friction):** একটি তলের উপর যখন অন্য একটি বস্তু পড়িয়ে বা সুরক্ষ সুরক্ষ চলে, তখন সেটাকে বলে আবর্ত ঘর্ষণ। সবগুলো ঘর্ষণ বলের মধ্যে এটা সবচেয়ে ছোট তাই আমরা সবসময়েই সকল রুকম ধানবাহনের মাঝে চাকা লাগিয়ে নেই। চাকা লাগানো সূটকেস খুব সহজে টেনে নেওয়া যায়- যদি এর চাকা না থাকত তাহলে যেখের উপর টেলে নিতে আমাদের অনেক বেগ পেতে হতো।

**প্রবাহী ঘর্ষণ (Fluid Friction):** যখন কোনো বস্তু তরল বা বায়ুবীয় পদার্থের (Fluid) ভেতর দিয়ে যাব, তখন সেটি যে ঘর্ষণ বল অনুভব করে, সেটি হচ্ছে প্রবাহী ঘর্ষণ। প্যারাসুট নিয়ে যখন কেউ ফ্লেন থেকে বাঁপিয়ে পড়ে, তখন বাজাসের প্রবাহী ঘর্ষণের কারণে ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসতে পারে। (চিত্র ১০.০৮)



চিত্র ১০.০৮: যাহাকাশমান এপোলো ১৫-এর ক্যাপ্সুল প্যারাসুট দিয়ে সমুদ্রে নামানো হচ্ছে।



### একক কাজ

#### প্রবাহী ঘর্ষণ

**কাজ:** একটা কাগজ উপর থেকে ছেড়ে দাও, নিচে পড়তে কভেট্টকু সময় লেগেছে অনুমান কর। এবারে কাগজটি দলায়োচ করে হোট একটা বলের ঘত করে ছেড়ে দাও। এবারে নিচে পড়তে কভো সময় লেগেছে? কেন?



### একক কাজ

#### শিথি ঘর্ষণ এবং গতি ঘর্ষণ

**কাজ:** কয়েকটা ম্যাচের খালি বাজ্জ নাও। সেগুলোর ক্ষেত্রে মাটি ভরে বাজ্জগুলো খানিকটা জরী করে নাও। এবারে একটা বইয়ের উপর ম্যাচ বাজ্জটা রেখে বহুটা ঢালু করতে ধাকো। শিথি ঘর্ষণের কারণে ম্যাচটি পড়িয়ে যাবে না, তবে একটা নির্দিষ্ট কোণে গেলে ম্যাচ বাজ্জটা পড়িয়ে পড়তে শুরু করবে। এই অবস্থায় ম্যাচ বাজ্জের গতি ঘর্ষণ কার্যকর হতে শুরু করেছে। একটা ম্যাচ বাজ্জের উপর আরো একটি বা কয়েকটি ম্যাচ বাজ্জ রেখে পরীক্ষাটি আবার করো, দেখবে প্রতিবার তুমি একই ফলাফল পাবে। একাধিক ম্যাচবাজ্জ রেখে তুমি তখন বাড়িয়ে শিথি ঘর্ষণ বাড়িয়ে দিছু কিন্তু ঢালু করার সময় একই ম্যাচের ঢালের দিকে বেড়ে যাবে বলে ফলাফলের পরিবর্তন হচ্ছে না।

আমরা আগেই বলেছি ঘর্ষণ বল সবসময়েই প্রয়োগ করা বলের বিপরীত দিকে কাজ করে। সেজল্য স্বাভাবিকভাবেই ঘর্ষণ বল গতিকে কমিয়ে দেয় এবং আমাদের ধারণা হতে পারে আমরা সর্বক্ষেত্রে বৃদ্ধি ঘর্ষণ করানোর চেষ্টা করি। কিন্তু সেটি সত্য নয়। তোমরা নিচেরই কখনো না কখনো কাদার মাঝে কোনো গাঢ়ি বা ট্রাককে আটকে যেতে দেখেছ। তখন গাড়ির চাকা সুরলেও ঘর্ষণ কর বলে কাদা থেকে গাঢ়ি বা ট্রাক উঠে আসতে পারে না। চাকা পিছলিয়ে যায়। তখন গাঢ়ি বা ট্রাকটিকে তুলে আনার জন্য অন্যভাবে চাকা এবং কাদার মধ্যে ঘর্ষণ বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়।

## ১০.৫.২ ঘর্ষণ বাড়ানো-কমানো

আমরা এর মাঝে জেনে পেছি বে আমাদের ধ্রোজনে ঘর্ষণকে কখনো বাড়াতে হয় এবং কখনো কমাতে হয়।

**ঘর্ষণ কমানো:** ঘর্ষণ কমানোর জন্য আমরা যেসব কাজ করি সেগুলো হচ্ছে;

১. যে পৃষ্ঠটিতে ঘর্ষণ হয়, সেই পৃষ্ঠটিকে যত সম্ভব মসৃণ করা। মসৃণ পৃষ্ঠে গতি ঘর্ষণ কম।
২. তেল মবিল বা গ্রিজ-জাতীয় পদার্থ হচ্ছে পিচ্ছিলকারী পদার্থ বা লুভিকেন্ট। দুটি তলের মাঝখানে এই লুভিকেন্ট থাকলে ঘর্ষণ অনেকখানি কমে যায়।
৩. চাকা ব্যবহার করে ঘর্ষণ কমানো যায়। চাকা ব্যবহার করা হলে বড় গতি ঘর্ষণের পরিবর্তে অনেক ছোট আবর্ত ঘর্ষণ দিয়ে কাজ করা যায়। ঘূরন্ত চাকাতে বল বিয়ারিং ব্যবহার করে সরাসরি ঘর্ষণের বদলে ছোট স্টিলের বলগুলোর আবর্তন ঘর্ষণের সাহায্যে ঘর্ষণ অনেক কমানো সম্ভব।
৪. গাড়ি, বিমান এ ধরনের দ্রুতগামী যানবাহনের ডিজাইন এমনভাবে করা হয়, যেন বাতাস ঘর্ষণ তৈরি না করে স্ট্রিম লাইন করা পৃষ্ঠদেশের উপর দিয়ে যেতে পারে।
৫. যে দুটি পৃষ্ঠদেশে ঘর্ষণ হয়, তারা যদি খুব অল্প জায়গায় একে অন্যকে স্পর্শ করে তাহলে ঘর্ষণ কমানো যায়।
৬. আমরা দেখেছি ঘর্ষণরত দুটি পৃষ্ঠে বল প্রয়োগ করা হলে ঘর্ষণ বেড়ে যায়, কাজেই লম্বভাবে আরোপিত বল কমানো হলে ঘর্ষণ কমানো যায়।

**ঘর্ষণ বাড়ানো:** ঘর্ষণ কমানোর জন্য যে প্রক্রিয়াগুলো করা হয়, সেগুলো করা না হলে কিংবা তার বিপরীত কাজগুলো করা হলেই ঘর্ষণ বেড়ে যায়। তাই ঘর্ষণ বাড়ানোর জন্য আমরা যে সব কাজ করি সেগুলো হচ্ছে:

১. যে দুটি তলে ঘর্ষণ হচ্ছে, সেগুলো অমসৃণ বা খসখসে করে তোলা।
২. যে দুটি তলে ঘর্ষণ হয়, সেগুলো আরো জোরে চেপে ধরার ব্যবস্থা করা।
৩. ঘর্ষণরত তল দুটির মাঝে গতিকে থামিয়ে স্থির করে ফেলা, কারণ স্থির ঘর্ষণ গতি ঘর্ষণ থেকে বেশি।
৪. ঘর্ষণরত তলের মাঝে খাঁজ কাটা বা ঢেউ খেলানো করা। তাহলে এটি তলদেশকে জোরে আঁকড়ে ধরতে পারে। পানি বা তরল থাকলে সেটি খাঁজে ঢুকে গিয়ে পৃষ্ঠদেশের ঘর্ষণ বাড়াতে পারে।
৫. বাতাস বা তরলের ঘনত্ব বাড়ানো।
৬. বাতাস বা তরলে ঘর্ষণরত পৃষ্ঠদেশ বাড়িয়ে দেওয়া।
৭. চাকা বা বল বিয়ারিং সরিয়ে দেওয়া।

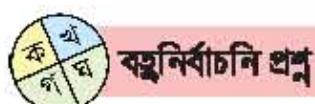
### ১০.৫.৩ ঘর্ষণ: একটি প্রয়োজনীয় উপহৰ

আমরা সবাই নিচয়ই লক্ষ করেছি যে ঘর্ষণের কারণে তাগশঙ্কা তৈরি হয়। শীতের দিনে আমরা হাত ঘষে হাত উচ্ছৃঙ্খল করি। গাড়ির ইঞ্জিন যে গরম হয়ে ওঠে, সেটিও ঘটে ঘর্ষণের কারণে। কাজেই ঘর্ষণের কারণে অপ্রয়োজনীয়তা সূচি করে শক্তির অপচয় হয়। গাড়ি, ট্রেন, আবাস, সাময়ের ক্ষেত্রে ঘর্ষণ বলকে পরামর্শ করে এগিয়ে বেতে হয়, সেখানেও অতিরিক্ত ঝালানি থ্রেচ করতে হয়। এভাবে দেখা হলে মনে হতে পারে ঘর্ষণ বুঝি আমাদের জীবনের একটি উপহৰ ছাড়া আর কিছু নয়।

আবার আমরা এর মাঝে দেখেছি ঘর্ষণ আছে বলেই আমরা হাঁটতে পারি, রাস্তায় গাড়ি চলতে পারে, কাগজে পেছিল কলম দিয়ে লিখতে পারি, দাঢ়ান পড়ে তুলতে পারি, পারাস্যুট দিয়ে নিরাপদে নিয়ে নামতে পারি। আমরা এ ঘর্ষনের অসংখ্য উদাহরণ দিতে পারি বেধানে ঘর্ষণ না থাকলে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় কাজগুলো করতে পারতাম না।

কাজেই ঘর্ষণকে উপহৰ মনে করা হলেও আমাদের মনে নিয়ে হবে এটি আমাদের জীবনের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় একটি উপহৰ।

### অনুশীলনী



#### বহুনির্ধাচনি প্রশ্ন

১. পাছ থেকে একটি কল সাটিতে পড়ল—এটি কোন বলের উদাহরণ?

- (ক) যথাকর্ত্ত বল
- (খ) চৌম্বক বল
- (গ) ভক্ষিত চৌম্বক বল
- (ঘ) দূর্বল নিউক্লীয় বল

২. বল :

- (i) বস্তুর দিক অপরিবর্তিত রাখে
- (ii) বস্তুর আকৃতি পরিবর্তন করে
- (iii) স্থির বস্তুকে গতিশীল করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii
- (খ) i ও iii
- (গ) ii ও iii
- (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুজ্ঞাদিটি পছে ৩ ও ৪ নং ধারার উভয় দাও:

২৫ বল প্রয়োগ করার একটি বস্তুর ঘরণ হল ৪ মি/সে<sup>2</sup>। বল প্রয়োগ ব্যবহ করে বস্তুটিকে মেঝেতে ছেড়ে দেওয়া হলো। বস্তুটি কিছুদূর থাওয়ার পর থেমে গেল।

৩. বস্তুর ভর কত?

- (ক) ২০০ gm
- (খ) ৪০০ gm
- (গ) ৫০০ gm
- (ঘ) ৭৫০ gm

৪. কোন বলের কারণে বস্তুটি থেমে গেল?

- (ক) ঘর্ষণ বল
- (খ) মহাকর্ষ বল
- (গ) চৌম্বক বল
- (ঘ) অভিত চৌম্বক বল



### সৃজনশীল প্রশ্ন

১. শ্যামা বাসে কুটিলা থেকে ঢাকা থাইল। বাসটির ভর ছিল ১৪০০ kg এবং এটি ৪ মি/সে<sup>2</sup> ঘরণে চলছিল। চলত বাসটিকে বর্তাই ছাইভার দ্বেক ঢাললে স্বাস্থ্য থাকার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। আবার বাসটি বর্ধন চলতে শুরু করল, তখন ভাগ্না পিছনের দিকে হেলে পড়ল।

- (ক) শর্ণ বল কাকে বলে?
- (খ) বল বলতে কী বুবার?
- (গ) বাসটির ওপর ক্রিয়াশীল বলের মান নির্ণয় কর।
- (ঘ) থাকারা প্রথমে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেও পরবর্তীতে পিছনে হেলে গড়ার কারণ বিশ্লেষণ কর।

২. তৃতীয় দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকে। একদিন সে বাসায় একটি ভারী টেবিলের সামনের চেয়ারে বসে টেবিলকে টানতে শুরু করল। কিন্তু চেয়ারসহ সে নিজেই টেবিলের দিকে সরে গেল। পরদিন সে একটি মার্বেলকে রুমের মসৃণ মেঝেতে নির্দিষ্ট বলে গড়িয়ে দিল। এরপর বাসার বাইরে পিচের রাস্তায় একই মার্বেলকে একই বলে গড়িয়ে দিল। তখন এটি তার চেয়ে কম দূরত্ব অতিক্রম করল।

- (ক) নিউটনের গতিবিষয়ক দ্বিতীয় সূত্রটি কী?
- (খ) জড়তা বলতে কী বুঝায়?
- (গ) চেয়ারসহ তৃতীয় টেবিলের দিকে সরে আসলো কেন? ব্যাখ্যা কর।
- (ঘ) মার্বেলটির দুইটি স্থানে অতিক্রান্ত দূরত্ব ভিন্ন হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ কর।

## একাদশ অধ্যায়

# জীবপ্রযুক্তি



গৃহিণীর প্রথম স্তন্যপায়ী হাশীর জোন ডলি নামের একটি জোন

আধুনিক বংশগতি বিজ্ঞান (Genetics) ভিত্তি পড়ে উঠেছে আজ থেকে প্রায় ১৫০ বছর পূর্বে গ্রেগর মেডেল নামে একজন অস্ট্রীয় ধর্মজ্ঞানকের প্রবেশদার মাধ্যমে। মেডেলের আবিক্ষানের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে জীবের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য এক জোড়া ক্ষাণের হারা নিয়ন্ত্রিত। বেটসন ১৯০৮ সালে মেডেলের ফ্যান্টেজের নাম দিলেন জিন। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই বংশগতি বিজ্ঞা নানাভাবে বিকাশ লাভ করতে থাকে। নানা তথ্যে সম্মত হতে থাকে এর ভাভাগ। বংশগতির একক বা জিনের উপাদানের প্রকৃতি, রাসায়নিক এবং অণুর গঠন ও জৈবনিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের পক্ষত্বস্থলো আবিক্ষৃত হওয়ার পর জীববিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন, নিষেক ছাঢ়াই কীভাবে একটা জীবকোষ থেকে জিন আরেকটা জীবকোষে প্রতিস্থাপন করা যায়, সেটি নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। ফ্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবেক হার্বার্ট বিশ্বার এবং স্ট্যানলি কোহেন ১৯৭৩ সালে প্রথম নিষেক ছাঢ়াই কৃতিমভাবে জিন সংযোজনে সাফল্য লাভ করেন। জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে যেটি ছিল এক অচিক্ষিত ঘটনা। স্থাপিত হলো জীবপ্রযুক্তি (Biotechnology) নামে জীববিজ্ঞানের নতুন এক শাখা।

আমরা এ অধ্যায়ে জীবপ্রযুক্তি সমূহে আলোচনা করার পূর্বে ক্লোমোজেম, জিন, ডিএনএ ও আরএনএ সমূহে আলোচনা করব। এগুলো সম্পর্কে আমরা অন্য প্রেসিডেন্ট খানিকটা ধারণা পেয়েছি। এ অধ্যায়ে ৯৫

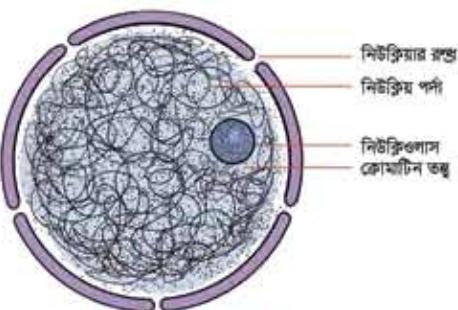


### এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- চারিত্বিক বৈশিষ্ট্য বৎসরসম্পর্কের স্থানান্তরের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ডিএনএ টেস্টের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জেনেটিক বিষয়া (Genetic Disorder) কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারব।
- জীবশিক্ষা এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ধারী ও উদ্ভিদে ক্লোনিং ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ক্লোনের সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও বায়োটেকনোলজির ব্যবহার এবং এদের সুবল বিশ্লেষণ করতে পারব।

## ১১.১ ক্রোমোজোম

কোষ হচ্ছে জীবদেহের একক। যেটি অন্য কোনো সংজীব মাধ্যমের সাহায্য ছাড়াই নিজের প্রতিবৃপ্ত তৈরি করতে পারে। কোষকে দুই ভাগে ভাগ করা যাওয়া, এক ধরনের কোষে কোনো সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে না, অন্য ভাগে সুগঠিত নিউক্লিয়াস (চিত্র ১১.০১) থাকে, এই কোষের নিউক্লিয়াসের ভেতর জীবদেহের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক উপাদান থাকে, যার একটি হচ্ছে ক্রোমোজোম।



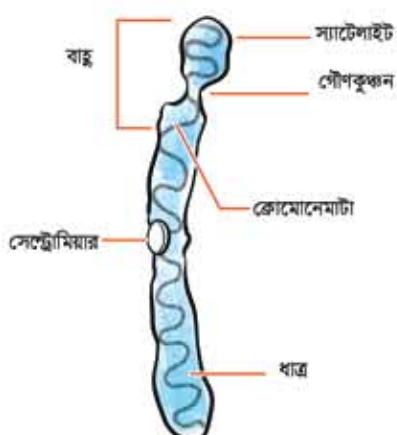
চিত্র ১১.০১: নিউক্লিয়াস

প্রতিটি প্রকৃত কোষবিশিষ্ট জীবের নিউক্লিয়াসের নিউক্লিওপ্লাজমে অনেক ক্রোমাটিন ফাইবার বা ভন্ডু থাকে। কোষের স্থানান্বিক অবস্থার এগুলো নিউক্লিয়াসের ভিতরে বিচৃঙ্খল অবস্থায় থাকে। কোষ বিভাজনের সময় পানি বিয়োজনের ফলে এগুলো স্পষ্ট আকার ধারণ করে এবং আকারে এগুলো সুতাৰ মতো হয়। এগুলোকে ক্রোমোজোম (চিত্র ১১.০২) বলে। কোষ বিভাজনের সময় প্রোকেজ ও মেটাকেজ দশাৰ ক্রোমোজোমগুলো স্পষ্ট হয়। প্রতিটি প্রজাতিৰ কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা সবসময় নির্দিষ্ট। অর্থাৎ একটি প্রজাতিৰ প্রাণী অথবা উদ্ধিস কোষে যদি ১২টি ক্রোমোজোম থাকে, তাহলে সেই প্রজাতিৰ সকল সদস্যেৰ কোষে সবসময় ক্রোমোজোমের সংখ্যা ১২ থাকবে।

### ১১.১.১ ক্রোমোজোমের আকৃতি

ক্রোমোজোমের আকার সাধারণত লম্বা। প্রতিটি ক্রোমোজোমের দেহ দুই পুঁজ সুতাৰ মতো অংশ নিয়ে গঠিত (চিত্র ১১.০৩)। প্রতিগুছ সুতাৰ মতো অংশকে ক্রোমেটো (বেহুবচনে ক্রোমোনেয়াটা) বলে। কোষ বিভাজনের সময় প্রতিটি ক্রোমোজোম সহান দুভাগে ভাগ হয়ে যাওয়া। এদের প্রতিটিকে ক্রোমাটিড বলে। প্রতিটি ক্রোমাটিড একটি ক্রোমেটো নিয়ে গঠিত।

বর্তমানে কোষতত্ত্ববিদ্যা বলেন ক্রোমাটিড ও ক্রোমেটো ক্রোমোজোমের একই অংশের দুটি নাম। মাইকোসিস কোষ বিভাজনের মেটাকেজ দশাৰ প্রত্যেকটি ক্রোমোজোমে যে

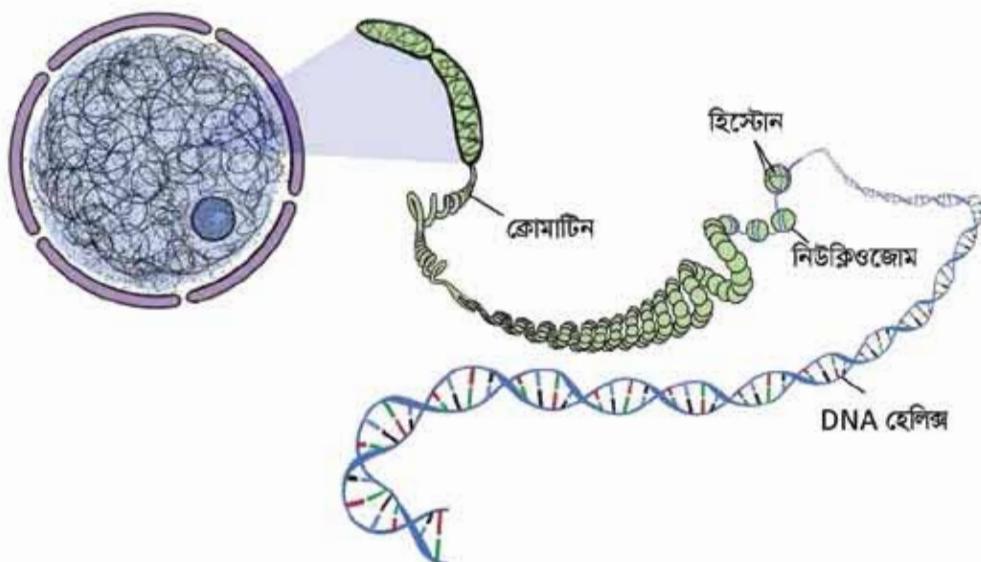


চিত্র ১১.০২: ক্রোমোজোম

গোলাকৃতি ও সংকুচিত স্থান দেখা যাব, তার নাম সেন্ট্রোমিরার। অনেকে আবার একে কাইলেটোকোরণ বলে। ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিরারের উভয় পার্শ্বের অংশকে বাহু বলা হয়। পূর্বে ধারণা করা হতো ক্রোমোজোম একটা মাতৃকা বা ধাত্র ধারা আবৃত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এটি কিছু প্রোটিন ও অজৈব পদার্থের সমাবেশ, বা ইলেক্ট্রন মাইক্রোকোপ ছাড়া দেখা যায় না।

### ক্রোমোজোমের প্রকারভেদ

উচ্চ শ্রেণির ধারী বা উচ্চিদের কোষের ক্রোমোজোমের ঘণ্টে প্রকারভেদ দেখা যায়। এদের দেহকোষে যতগুলো ক্রোমোজোম থাকে, তাদের ঘণ্টে এক জোড়া ক্রোমোজোম অন্যান্য ক্রোমোজোম থেকে ভিন্নথারী। এই ভিন্নথারী ক্রোমোজোমকে সেক্স ক্রোমোজোম বলা হয়। যাকি ক্রোমোজোমগুলোকে অটোজোম (Autosome) বলা হয়। সেক্স ক্রোমোজোমগুলোকে সাধারণত X ও Y নামে নামকরণ করা হয়ে থাকে। তোমরা এর মাঝে আলোর অস্থানে সেখে এসেছ বে মানুষের প্রতিটি দেহকোষে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম আছে এবং মাঝে ২২ জোড়া অটোজোম এবং এক জোড়া সেক্স ক্রোমোজোম।



চিত্র ১১.০৩: নিউক্লিওসের তিতারে ক্রোমোজোম ও DNA-এর অবস্থান।

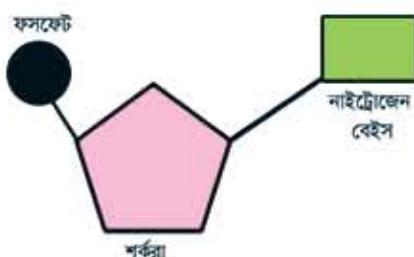
### ১১.১.২ ক্রোমোজোমের রাসায়নিক পঠন

ক্রোমোজোমের রাসায়নিক পঠনে দেখা যায় এর মধ্যে রয়েছে নিউক্লিক এসিড, প্রোটিন এবং অন্যান্য উপাদান।

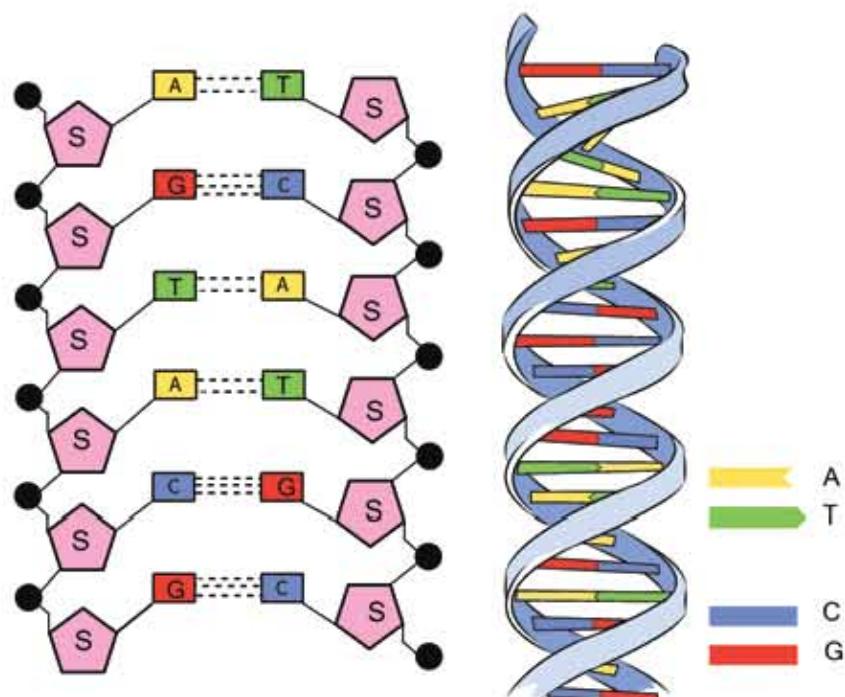
**নিউক্লিক এসিড:** নিউক্লিক এসিড দুই ধরনের হয়, (ক) ডিএনএ বা ডিঅ্সিরাইবেনিউক্লিক এসিড (DNA) এবং (খ) আরএনএ বা রাইবোনিউক্লিক এসিড (RNA)।

### ডিএনএ (DNA)

ডিএনএ-এর পূর্ণ নাম ডিঅ্যুক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড। ডিএনএ সকল জীবের আদি বস্তু এবং জীবকোষের নিউক্লিয়াসের সকল ক্ষেত্রেও এর অবস্থান রয়েছে। এ তথ্যটি উদ্বাটিত হওয়ার পর বিজ্ঞানীরা ডিএনএর পাঠিনিক উপাদান জানার কাজে সচেষ্ট হলেন। ১৯৫৩ সালে জেমস শ্রোডসন ও ফ্রানসিস ক্রিক ডিএনএ অণুর গঠন বের করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই মুগান্তকারী আবিষ্কারের অন্ত ছিল ১৯৬২ সালে তারা নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তারা দেখিয়েছিলেন যে ডিএনএ অণু আসলে দুটি সুতার মতো লম্বা নিউক্লিওটাইডের (চিত্র ১১.০৪) শেকল বা পলিনিউক্লিওটাইড। প্রতিটি নিউক্লিওটাইডে রয়েছে একটি করে পাঁচ কার্বনের রাইজোম শর্করা। একটি ফসকেট এবং নাইট্রোজেন ক্ষারক। ডিএনএ অণুর আকৃতি পাঁচানো সিডির মতো (চিত্র ১১.০৫)। পাঁচানো সিডির দুপার্শের মূল কাঠামো গঠিত হয় নিউক্লিওটাইডের পাঁচ কার্বন মুক্ত শর্করা এবং ফসকেট দিয়ে। শর্করা ফসকেটের কাঠামোটি বাইরের কাঠামো। ভেতরে নিউক্লিওটাইডগুলো মুক্ত থাকে নাইট্রোজেনের ক্ষারক দিয়ে। চার



চিত্র ১১.০৪: নিউক্লিওটাইড

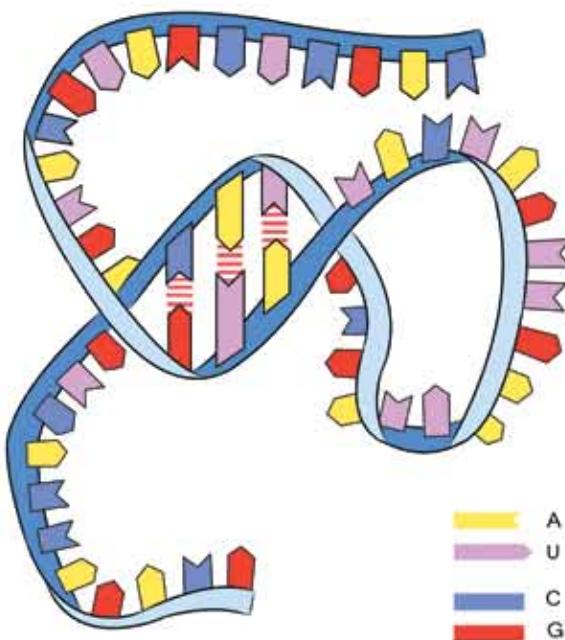


চিত্র ১১.০৫: DNA অণুর গঠন

ধরনের নাইট্রোজেন কারকের মধ্যে দুটি করে কার জোড় বেঁধে তৈরি করে সিন্ড্রির ধাপগুলো। ডিএনএ অপূর চার ধরনের কারক হচ্ছে আডিনিন (A), গুয়ানিন (G), সাইটোসিন (C) ও থাইমিন (T)-এর মাঝে আডিনিন সবসময় থাইমিনের সাথে (A-T) এবং সাইটোসিন সবসময় গুয়ানিনের সাথে (C-G) জোড়া বাঁধে। ডিএনএ পাঁচালো সিন্ড্রির মতো কাঠামোকে ডাবল হেলিক্স বলা হচ্ছে থাকে।

### আরএনএ (RNA)

আরএনএ হলো রাইবোনিউক্লিক এসিড (চিত্র ১১.০৬)। DNA-এর মতো দুটি শেকলের বদলে এটি একটিমাত্র পলিনিউক্লিওটাইড শেকলে ভাঁজ হয়ে থাকে। আরএনএ পাঁচ কার্বন যুক্ত রাইবোজ শর্করা ও ফসফেট নির্মিত একটি যাজ পার্শ্ব কাঠামো ধারা পঢ়িত, যার ডিএনএর মতোই চার ধরনের নাইট্রোজেন কারক রয়েছে। শুধু পার্শ্বক্য হচ্ছে ডিএনএতে থাইমিন আছে, কিন্তু আরএনএ-তে থাইমিনের পরিবর্তে থাকে ইউরাসিল (U)। জীবকোষে আরএনএ তিনি রকমের। সেগুলো হচ্ছে: (ক) বাণী বাহক আরএনএ (Messenger RNA বা m RNA), (খ) রাইবোজোমাল আরএনএ (Ribosomal RNA বা r RNA) এবং (গ) ট্রান্সফার আরএনএ (Transfer RNA বা t RNA)।



চিত্র ১১.০৬: RNA অণু

### প্রোটিন

ক্রোমোজোমে দুই ধরনের প্রোটিন থাকে। সেগুলো হচ্ছে-হিস্টোন ও নন-হিস্টোন প্রোটিন।

ওপরের বর্ণিত রাসায়নিক পদার্থগুলো হাড়া ক্রোমোজোমে লিপিত, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম আয়ন ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়।

### ১১.১.৩ জিন

অটো প্রেপিটে বিভিন্ন অধ্যায় এ আমরা বৎসর্গতি বলতে কী বুঝায় সেটা জেনেছি। বৎসর্গতিতে ক্রোমোজোমের কী স্থূলিকা আমরা সেটাও জেনে এসেছি। মেডেল বৎসর্গতির ধারক এবং বৎসর্গত বৈশিষ্ট্যের নির্ধারকের একককে ফ্লাইর নামে আখ্যায়িত করেছিলেন এবং বলেছিলেন ফ্লাইরগুলোর

মাধ্যমে পিতামাতার বৈশিষ্ট্যগুলো বৎসরম্পরায় সন্তানদের মাঝে বাহিত হয়। বর্তমানে বৎসরগতি বিদ্যার অগ্রগতির ফলে বৎসরগতির কৌশল সমন্বে আরও অনেক জ্ঞান অর্জিত হয়েছে। মটরশুটি ছাড়াও অন্যান্য জীবের বৎসরানুগতির পদ্ধতি নিয়ে এর পর ব্যাপক গবেষণা শুরু হয়। বেটসন ১৯০৮ সালে মেডেলের ফ্যাস্টের নামের পরিবর্তে জিনেটিক শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। ১৯০৯ সালে জোহানসেন বৎসরম্পরায় কোনো বৈশিষ্ট্যের নির্ধারক একককে আরো সংক্ষেপে জিন নামকরণ করেন। ক্রোমোজোমের ভেতর ডিএনএ র যে দীর্ঘ “শেকল” রয়েছে, তার একটি অংশে বৎসরগতির কোনো একটি একক লিপিবদ্ধ থাকে সেটিকে বলা হয় জিন। ক্রোমোজোমের গায়েই সন্নিবেশিত থাকে অসংখ্য জিন বা বৎসরগতির একক। জীবজন্তুর বৈচিত্র্যের নিয়ন্ত্রক হচ্ছে জিন। এককোষী ব্যাকটেরিয়া, আমাশয় রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু অ্যামিবা থেকে শুরু করে বিশাল আকৃতির বটবৃক্ষ, বিশাল আকৃতির হাতি, তিমি ইত্যাদি বৃদ্ধিমান জীব মানুষ পর্যন্ত সবারই আকৃতি প্রকৃতি নির্ধারিত হয় তার জিনের সংকেত দ্বারা।

বৎসরবৃদ্ধির প্রয়োজনে প্রতিটা জীব তার অনুরূপ জীবের জন্ম দেয়। এসবই জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এভেরি, ম্যাকলিওড এবং ম্যাককারটি (১৯৪৪) মানুষের নিউমোনিয়া রোগ সৃষ্টিকারী নিউমোকক্স ব্যাকটেরিয়ার রাসায়নিক গঠন যেমন- প্রোটিন, শর্করা, ফ্যাট এবং নিউক্লিক এসিডগুলো পৃথক করেছিলেন। প্রত্যেকটি উপাদান নিয়ে পৃথকভাবে পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা নিশ্চিত হলেন যে শুধু ডিএনএ বৎসরগত বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পর্কিত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ডিএনএ কীভাবে বৎসরগত বৈশিষ্ট্যগুলোকে পরবর্তী বৎসে সঞ্চালিত করে? ছবিতে একটি ডিএনএ কীভাবে দুটি ডিএনএতে বিভাজিত হয় দেখানো হয়েছে। প্রথমে ডিএনএ শেকল লম্বালম্বিভাবে স্ববিভাজনের (Self duplication) দ্বারা ভাগ হয়ে পরিপূরক দুটি পার্শ্ব কাঠামো গঠিত হয়। তখন কোষের মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা A, T, C এবং G ক্ষারকগুলো ডিএনএ র উন্মুক্ত A, T, C এবং G সাথে যুক্ত হয়। সব সময়ই A-এর সাথে T এবং C-এর সঙ্গে G যুক্ত হয় বলে একটি ডিএনএ অণু ভেঙে তৈরি হয় দুটি নতুন অণু। নতুনভাবে সৃষ্টি প্রতিটা অণুতে থাকে একটা পুরাতন ও একটা নতুন ডিএনএ পার্শ্ব কাঠামো, যার ফলে প্রতিটি নতুন ডিএনএ অণু হয় মূলটির হুবহু অণুলিপি। এভাবে ডিএনএ অণুতে রক্ষিত জীবের বৎসরগত বৈশিষ্ট্যের সাংকেতিক নীলনকশা পরিবর্তন ছাড়াই সংরক্ষিত হয় এবং পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চালিত হয়।

অতএব তোমরা বুঝতে পারছ বৎসরগত ধারা পরিবহনে ক্রোমোজোম, ডিএনএ কিংবা আরএনএ র গুরুত্ব অপরিসীম। ক্রোমোজোমের প্রধান উপাদান হচ্ছে ডিএনএ। ডিএনএ র অংশ বিশেষ জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত ধারক, যাকে জিন বলা হয়। আরএনএ জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করতে ডিএনএ-কে সাহায্য করে। ক্রোমোজোম ডিএনএ এবং আরএনকে ধারণ করে বাহক হিসাবে। ক্রোমোজোম ডিএনএ, আরএনএ-কে সরাসরি বহন করে পিতা-মাতা থেকে তাদের পরবর্তী বৎসরারের মাঝে নিয়ে যায়। কোষ বিভাজনের মায়োসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৎসরগতির এ ধারা অব্যাহত থাকে। এ কারণে ক্রোমোজোমকে বৎসরগতির ভৌত ভিত্তি বলে আখ্যায়িত করা হয়।

## ডিএনএ টেস্ট

যখন কোনো সন্তানের পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয় অথবা কেউ যদি কোনো সন্তানকে তার সন্তান হিসেবে দাবি করে, তখন ডিএনএ টেস্ট দ্বারা এ ধরনের বিবাদ নিষ্পত্তি করা যায়। ডিএনএ টেস্ট করার সময় পিতা, মাতা ও সন্তানের শরীর থেকে কোনো ধরনের জীবকোষ (রক্ত, লালা ইত্যাদি) সংগ্রহ করা হয়। সেখান থেকে নানা ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা পিতা, মাতা ও সন্তানের ডিএনএ র একটি চিত্র (প্রোফাইল) প্রস্তুত করা হয়। এরপর সন্তানের ডিএনএ র চিত্রের সাথে পিতামাতার ডিএনএ চিত্র মিলানো হয় এবং যদি প্রত্যেকের সাথে প্রায় ৫০% মিল পাওয়া যায়, তাহলে সে সেই সন্তানের জৈব পিতামাতা (Biological Parents) অর্থাৎ প্রকৃত পিতামাতা হিসাবে গণ্য করা হয়।

## ১১.১.৪ মানুষের জেনেটিক বিশৃঙ্খলা

চিকিৎসাবিজ্ঞানে মানুষের জেনেটিক বিশৃঙ্খলার কারণে সৃষ্টি রোগগুলো একটি অনেক বড় উদ্বেগের বিষয়। এ রোগগুলো কীভাবে মাতাপিতা থেকে সন্তানদের মধ্যে সঞ্চালিত হয় এবং কী ধরনের জেনেটিক বিশৃঙ্খলার কারণে রোগগুলো ঘটে— এগুলো বিজ্ঞানীরা বুঝতে শুরু করেছেন। নিম্নলিখিত কারণে এ রোগগুলো ঘটতে পারে-

১. পয়েন্ট মিউটেশন বা জিনের ভিতর পরিবর্তনের জন্য
২. ক্রোমোজোম সংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধির জন্য
৩. ক্রোমোজোমের কোনো অংশের হ্রাস বা বৃদ্ধির জন্য
৪. মায়োসিস কোষ বিভাজনের সময় হোমোলোগাস (মা থেকে পাওয়া একটি এবং বাবার কাছ থেকে পাওয়া আরেকটি ক্রোমোজোমের জোড়া) ক্রোমোজোমের বিচ্ছিন্নকরণ (Non-disjunction) না ঘটার জন্য।

এই কারণগুলোর জন্য মানুষের যে বংশগত রোগগুলো সৃষ্টি হয় তার কয়েকটা নিচে উল্লেখ করা হলো:

**১. সিকিল সেল (Sickle cell):** মানুষের রক্ত কণিকার এ রোগটি হয় পয়েন্ট মিউটেশনের ফলে। স্বাভাবিক লোহিত রক্ত কণিকাগুলোর আকৃতি চ্যাপ্টা। কিন্তু সিকিল সেলের ক্ষেত্রে লোহিত কণিকাগুলোর আকৃতি কিছুটা কাস্টের মতো হয়। সিকিল সেলগুলো সূক্ষ্ম রক্তনালিগুলোতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং শরীরের সেই স্থানগুলোতে তীব্র ব্যথা অনুভূত হয়। এই রক্তকণিকাগুলো যত দ্রুত ভেঙে যায়, তত দ্রুত লোহিত রক্তকণিকা তৈরি হয় না বলে শরীরে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।

**২. হানটিংটনস রোগ (Huntington's Disease):** এ রোগটিও হয় পয়েন্ট মিউটেশনের কারণে। এই রোগে মস্তিষ্ক ঠিকমতো কাজ করে না। শরীরের পেশিগুলোর মধ্যে সমন্বয় করার ক্ষমতা লোপ পায় এবং পরবর্তীতে মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে মৃত্যু ঘটে। এ রোগটির লক্ষণ আক্রান্ত ব্যক্তির বয়স চাঙ্গিশ

হওয়ার আগে প্রকাশ পায় না।

মায়োসিস কোষ বিভাজনের সময় অ্যানাফেজ ধাপে হোমোলোগাস ক্রোমোজোমগুলোর যেকোনো একটি জোড়ায় ক্রোমোজোম দুটির একটি অপরটি থেকে পৃথক না হয়ে দুটিই যেকোনো মেরুতে চলে যায়। এ অবস্থাকে নন-ডিসজাংশন বলে। যেকোনো একটি বিশেষ ক্রোমোজোমের নন-ডিসজাংশন ঘটলে একসাথে বেশ কতগুলো লক্ষণ দেখা দেয়, তাকে সিন্ড্রোম বলে।

**৩. ডাউন'স সিন্ড্রোম (Down's Syndrome):** মানুষের ২১তম ক্রোমোজোমের নন-ডিসজাংশনের ফলে এ রোগ হয়। সে কারণে ডাইন'স সিন্ড্রোমের মানুষে দুটির বদলে তিনটি ২১ নম্বর ক্রোমোজম থাকে। এদের চোখের পাতা ফুলা, নাক চ্যাপ্টা, জিহ্বা লম্বা এবং হাতগুলো তুলনামূলকভাবে ছোট হয়। এরা হাসিখুশি প্রকৃতির খর্বাকৃতির এবং এদের মানসিক পরিপন্থতা কম হয়।

**৪. ক্লিনিফেল্টার'স সিন্ড্রোম (Klinefelter's Syndrome):** এ রোগটি পুরুষ মানুষে সেক্স ক্রোমোজোমের ডিসজাংশনের কারণে সৃষ্টি হয়। ফলে পুরুষটির কোষে XY ক্রোমোজোম ছাড়াও অতিরিক্ত আর একটি X ক্রোমোজোম সংযুক্ত হয় এবং পুরুষটি হয় XXY ক্রোমোজোম বিশিষ্ট। ক্লিনিফেল্টারস সিন্ড্রোম বিশিষ্ট বালকদের মধ্যে একজন স্বাভাবিক পুরুষের যে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা দরকার তা থাকে না। এদের কঠিন্যের খুব কর্কশ হয় এবং স্তনগুলো আকারে বড় হয়। এদের বৃদ্ধি কম থাকে এবং এরা বন্ধ্যা হয়।

**৫. টার্নার'স সিন্ড্রোম (Turner's Syndrome):** এ রোগটি নারীদের সেক্স ক্রোমোজোমের নন-ডিসজাংশনের কারণে হয় এবং স্ত্রীলোকটি হয় XX -এর পরিবর্তে শুধু একটি X ক্রোমোজোম-বিশিষ্ট। এ ধরনের স্ত্রীলোক খর্বাকৃতি হয় এবং এদের ঘাড় প্রশস্ত হয়। পূর্ণবয়স্ক অবস্থায় এদের স্তন ও জনন অঙ্গের বিকাশ ঘটে না। যার কারণে এরা বন্ধ্যা হয়।

পুরুষ মানুষের সেক্স ক্রোমোজোম (X এবং Y) ছাড়া মানুষের অন্য সবগুলো ক্রোমোজোম দুটি করে আছে (হোমোলোগাস), যার অর্থ প্রত্যেকটা জিনও দুটি করে আছে। কাজেই কোনো একটি ক্রোমোজোমের কোনো একটি জিনে সমস্যা থাকলে, অন্য ক্রোমোজোমের সেই জিনটি সাধারণত দায়িত্ব নেয় বলে সমস্যাটি প্রকাশ পায় না। সমস্যাটি যদি X ক্রোমোজোমের কোনো একটি জিনে ঘটে থাকে তাহলে নারীদের দ্বিতীয় X ক্রোমোজোমের জিনটি সেই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু পুরুষ মানুষের যেহেতু একটি মাত্র X ক্রোমোজম তাই সমস্যাটি X ক্রোমোজমে হলে তার দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা থাকে না। তাই X ক্রোমোজোম-সংক্রান্ত রোগগুলো পুরুষ মানুষের বেলায় অনেক বেশি হয়। একইভাবে বলা যায় Y ক্রোমোজোমের কোনো জিনে সমস্যা থাকলে সেটি শুধু পুরুষ মানুষের সমস্যা এবং দ্বিতীয় কোনো জিন না থাকায় সেটিও তারা কাটিয়ে উঠতে পারে না।

প্রত্যেকটি জিনের দুটি করে কপি থাকে, তার মাঝে যেটি, তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে সেটিকে প্রকট (Dominant) জিন বলে। যেটি তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে না, সেটিকে প্রচলন (Recessive) জিন বলে।

আবার যদি দুটি জিনই একই সাথে প্রচলম কিংবা একই সাথে প্রকট হয়, তখন তাকে হোমোজাইগাস বলে। যদি একটি প্রচলম অন্যটি প্রকট হয়, তখন তাকে হেটোরোজাইগাস বলে।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টা সহজে বোধ যাবে। X ক্রোমোজোমের জিন-সংক্রান্ত একটি রোগের নাম হেমোফিলিয়া এবং এটি প্রচলম জিন। কাজেই কন্যাসম্ভানের বেলায় একটি X ক্রোজোমের হেমোফিলিয়া জিন থাকলেও অন্য X ক্রোজোমের সৃষ্টি জিনটি প্রকট হবে বলে হেমোফিলিয়া রোগটি প্রকাশিত হবে না। নিজের তেতুর রোগটি প্রকাশিত না হওয়াও এই কন্যা সম্ভান রোগের বাহক হবে। কন্যাসম্ভানের হেমোফিলিয়া রোগ হতে হলে তার দুটি এজ ক্রোজোমেই হেমোফিলিয়ার জিন আসতে হবে।

কিন্তু পুরুসম্ভানের বেলায় একটি হেমোফিলিয়ার জিন এলেই তার রোগটি প্রকাশিত হবে, কাজেই হেলেদের বেলায় অনেক বেশি হেমোফিলিয়ার রোগ দেখা যায়।



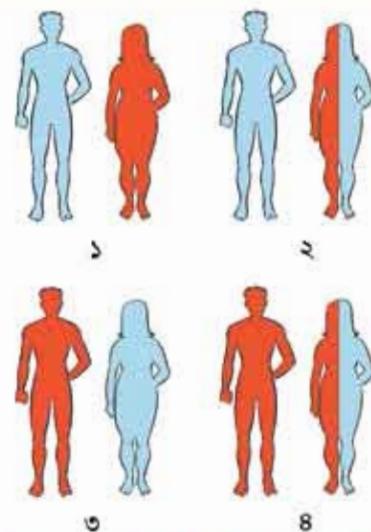
### একক কাজ

**কাজ:** ধরা বাক হেমোফিলিয়া জিন  $X^h$   
সৃষ্টি জিন  $X^H$

এবাবে নিজেরা চারটি ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে :

- (১) বাবা সৃষ্টি ( $X^H Y$ ) মা অসৃষ্টি ( $X^h X^h$ )
- (২) বাবা সৃষ্টি ( $X^H Y$ ) মা বাহক ( $X^h X^H$ )
- (৩) বাবা অসৃষ্টি ( $X^h Y$ ) মা সৃষ্টি ( $X^H X^H$ )
- (৪) বাবা ( $X^h Y$ ) অসৃষ্টি মা বাহক ( $X^H X^h$ )

কোন পুরুসম্ভান সৃষ্টি কোন পুরুসম্ভানের হেমোফিলিয়া এবং কোন কন্যাসম্ভান সৃষ্টি কোন কন্যাসম্ভানের হেমোফিলিয়া এবং কোন কন্যাসম্ভান বাহক নির্ধারণ কর।



**চিত্র ১১.০৭:** চারটি ভিন্ন পরিস্থিতিতে পুরু ও কন্যাসম্ভানের যাঁথে কে সৃষ্টি, কে অসৃষ্টি এবং কে বাহক হবে?

জিন তত্ত্বের কয়েকটি ধারণা এবং ক্ষেত্র:

(Recessive) ধারণা জিন: যে জিনের বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে না।

(Dominant) ধারণা জিন: যে জিনের বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে।

সেক্স লিংকড জিনের কারণে মানুষে যেসব সমস্যা দেখা দেয়, নিচের ছকে সেগুলো দেখানো হলো:

বৈশিষ্ট্যের নাম বা সমস্যা	লক্ষণ
বর্ণন্ধতা	বিভিন্ন বর্ণের পার্থক্য বুঝতে না পারা
হেমোফিলিয়া	রক্ততপ্তনে অস্বাভাবিক বিলম্বের কারণে ক্ষতস্থান থেকে অবিরাম রক্তক্ষরণ ঘটে। এতে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে
অ্যাস্ট্রোডার্মাল ডিসপ্লেসিয়া	ঘামগ্রন্থি ও দাঁতের অনুপস্থিতি
রাতকানা	রাতে কোনো জিনিস স্পষ্ট দেখতে না পাওয়া
অপটিক অ্যাট্রিফি	অপটিক স্লায়ের ক্ষয়িক্ষণতা
জুভেনাইল প্লুকোমা	অক্ষিগোলকের কাঠিন্য
হোয়াটাই ফোরলক	মাথায় সম্মুখভাগে এক গোছা সাদা চুল
মায়োপিয়া	দৃষ্টিক্ষীণতা
মাসকুল্যার ডিস্ট্রাফি	পেশি জটিলতা, দশ বছর বয়সেই শিশুর চলনশক্তি লোপ পাওয়া।

ওপরের বর্ণিত জেনেটিক বিঘ্নতা ছাড়াও তেজক্ষিয় রশ্মির কারণে মানুষের ভূগে জেনেটিক বিঘ্নতা ঘটতে পারে। এতে স্ন্তান বিকলাঙ্গ ছাড়াও ক্যান্সারসহ নানা ধরনের রোগ হতে পারে।

## ১১.২ জীবপ্রযুক্তি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

প্রচারের কারণে জীবপ্রযুক্তি বিষয়টা বর্তমানে আমাদের কাছে খুব পরিচিত। কিন্তু বাস্তবে এর প্রয়োগ শুরু হয় অনেক আগে থেকে। সভ্যতার বিকাশের ধারাবাহিকতায় মানুষ যখন যায়াবর জীবন ছেড়ে স্থায়ী জীবনযাপন শুরু করে, তখন থেকেই জীবপ্রযুক্তির উৎপত্তি। কারণ, মানুষের কাছে তখনই অধিক ফলনশীল গাছপালা এবং শক্ত-সমর্থ প্রাণিকুল গুরুত্ব পেয়েছে। পছন্দসই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে মানুষ তখনই গাছপালা আর প্রাণী বেছে নিতে শুরু করে এবং শুরু হয় জীবপ্রযুক্তির যাত্রা। অনেক আগে থেকে মানুষ অণুজীব বা ব্যাকটেরিয়াকে কাজে লাগিয়ে দই, মদ, বিয়ার, সিরকা, পাউরুটি— এসব উৎপাদন করে এসেছে। এরপর থেকে বিভিন্ন অণুজীবের জৈবিক কর্মকাণ্ডকে কাজে লাগিয়ে শিল্প ক্ষেত্রে এবং মানবকল্যাণে নতুন নতুন উৎপাদন পৃথিবীর জীবপ্রযুক্তির ভাগ্নারকে সমৃদ্ধ করেছে। জীবপ্রযুক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত গবেষণা জীববিজ্ঞানে নতুন নতুন দিক উন্মোচিত করছে। জীবপ্রযুক্তিকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন মানবকল্যাণে প্রয়োগের জন্য জীবকে ব্যবহার করে

বিভিন্ন উপাদান তৈরির প্রযুক্তিকে জীবপ্রযুক্তি বলা হয়। আমেরিকার National Science Foundation-এর দেওয়া সংজ্ঞানুযায়ী জীবপ্রযুক্তি বলতে বুঝায় মানকল্যাণের উদ্দেশ্যে জীব প্রতিনিধিদের (যেমন: অণুজীব বা জীবকোষের) কোষীয় উৎপাদনের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার। যদিও দই, সিরকা, পাউরুটি, মদ, পনির ইত্যাদি উৎপাদন জীবপ্রযুক্তির ফসল কিন্তু এসব জীবপ্রযুক্তিকে পুরোনো জীবপ্রযুক্তি বলে আখ্যায়িত করা হয়। সম্প্রতি আগবিক জীববিজ্ঞানের গবেষণার মাধ্যমে জীবপ্রযুক্তির যে প্রসার ঘটেছে, তাকে বলা হয় নতুন বা আধুনিক জীব প্রযুক্তি। বাস্তবিক অর্থে আধুনিক জীবপ্রযুক্তি তিনটি বিষয়ের সমন্বয়। যথা:

১. অণুজীব বিজ্ঞান
২. টিস্যু কালচার
৩. জিন প্রকৌশল

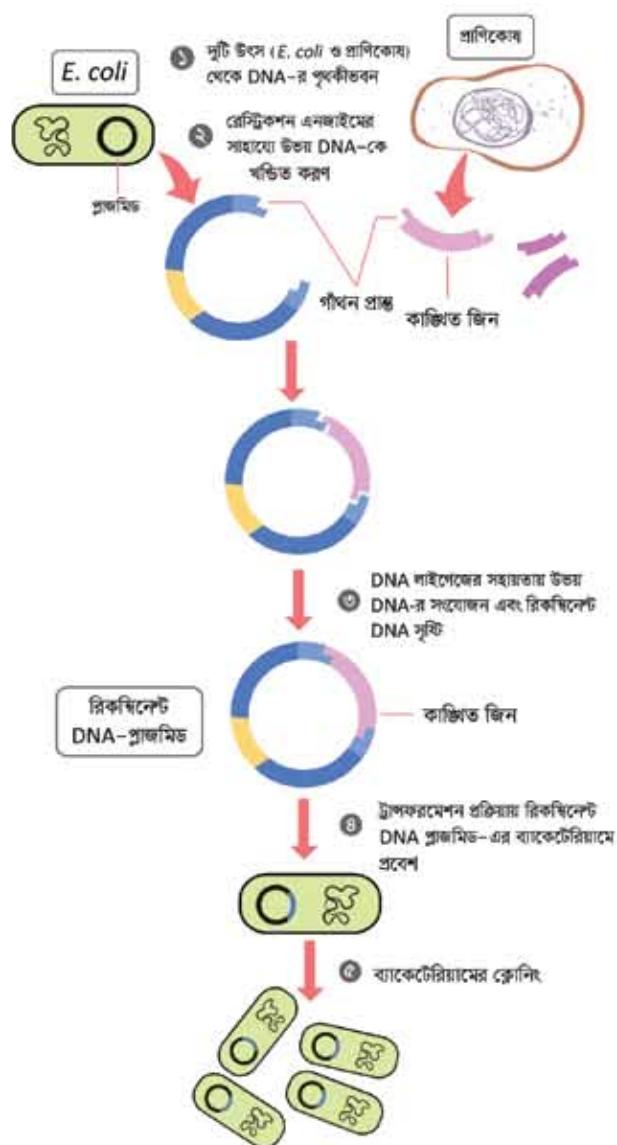
তাই জীবপ্রযুক্তি হচ্ছে একটি সমন্বিত বিজ্ঞান। বর্ণিত তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে গড়ে উঠা জীববিজ্ঞানের অত্যধুনিক এই শাখাটি মানবসভ্যতার নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

### ১১.২.১ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

বংশানুগতির উপাদানের প্রকৃতি, রাসায়নিক গঠন এবং জৈবনিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিসমূহ আবিস্কৃত হওয়ার পর বিজ্ঞানীরা আর একটা বিষয় নিয়ে ভাবা শুরু করলেন। তাঁরা দেখলেন, একটা জীবের সকল জিনই তার জন্য মঙ্গলজনক নয়। এ ভাবনার ফলে জন্ম নিলো জিন প্রকৌশল নামে জীববিজ্ঞানের এক নতুন শাখা। একটি জীব থেকে একটি নির্দিষ্ট জিন বহনকারী ডিএনএ খন্দ পৃথক করে ভিন্ন একটি জীবে স্থানান্তরের কৌশলকে জিন প্রকৌশল (Genetic Engineering) বলে। আরও সহজভাবে বলতে পারি কাজ্ঞিত নতুন একটি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির জন্য কোনো জীবের ডিএনএ-র পরিবর্তন ঘটানোকে জিন প্রকৌশল বলে। এই জিন যে কৌশলগুলোর মাধ্যমে স্থানান্তর করা হয়, তাদের একত্রে রিকমিনেন্ট ডিএনএ কৌশল বলে। রিকমিনেন্ট ডিএনএ কৌশল অবলম্বন করে একটি ডিএনএ অণুর কাজ্ঞিত অংশ কেটে আলাদা করে অন্য একটি ডিএনএ অণুতে প্রতিস্থাপনের ফলে যে নতুন ডিএনএ অণুর সৃষ্টি হয়, তাকে রিকমিনেন্ট ডিএনএ বলে। রিকমিনেন্ট ডিএনএ তৈরির প্রক্রিয়াকে রিকমিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি বা জিন ক্লোনিং বলা হয়।

মানুষের অন্ত্রে বসবাস করে একধরনের ব্যাকটেরিয়া যার নাম Escherichia coli। এই ব্যাকটেরিয়ার ওপর গবেষণা করে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধিকাংশ কৌশল আবিস্কৃত হয়েছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা রিকমিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি নিচে উল্লেখ করা ধাপগুলো (চিত্র ১১.০৮) অবলম্বন করে সম্পূর্ণ করা হয়:

১. প্রথমে দাতা জীব থেকে কাজ্ঞিত জিনসহ ডিএনএ অণুকে পৃথক করা হয়। এরপর এই জিনের বাহক বা ক্যারিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিড ডিএনএ পৃথক করা হয়।



চিত্র ১১.০৮: কাঞ্চিত জিন বহনকারী ব্যাকটেরিয়া ফ্রেন্ড

প্রাজমিক হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া কোষের ক্রোমোজোমের বাইরে আরেকটি স্বতন্ত্র ডিএনএ অণু বেটি বিভাজিত হতে পারে বা স্ববিভাজনে সক্ষম।

২. এ ধাপে প্রাজমিক ডিএনএ এবং দার্তা ডিএনএ এক বিশেষ ধরনের এনজাইম বা উৎসেচক দিয়ে অভিত করা হয়। দার্তা ডিএনএর এসব খন্ডের কোনো একটিতে কাঞ্চিত জিনটি থাকে।

৩. এ ধাপে লাইগেজ নামক একধরনের এনজাইম দিয়ে দাতা ডিএনএ কে প্লাজমিড ডিএনএ এর কাটা প্রান্ত দুটোর মাঝখানে স্থাপন করা হয়। লাইগেজ এখানে আঠার মতো কাজ করে। এর ফলে নির্দিষ্ট জিনসহ রিকমিনেন্ট ডিএনএ প্লাজমিড তৈরি হয়। এই রিকমিনেন্ট প্লাজমিড এখন দাতা ডিএনএ র খণ্ডিত অংশ বহন করে।

৪. এখন এই রিকমিনেন্ট প্লাজমিডকে ব্যাকটেরিয়ার ভেতরে প্রবেশ করানো হয়। খণ্ডিত ডিএনএ গ্রাহক কোষে প্রবেশ করনোর পদ্ধতিকে ট্রান্সফরমেশন বলে। ট্রান্সফরমেশনের ফলে নতুন জিন নিয়ে যে ব্যাকটেরিয়া বা জীবের উক্ত ঘটে, তাকে ট্রান্সজেনিক জীব বলে।

৫. এরপর নির্দিষ্ট জিন বহনকারী রিকমিনেন্ট প্লাজমিড ধারণ করা ব্যাকটেরিয়াকে শনাক্ত করে আলাদা করা হয়। এরপর নির্দিষ্ট জিন বহনকারী ব্যাকটেরিয়াগুলোর ব্যাপক বংশবৃদ্ধি ঘটানো হয়। এই ব্যাকটেরিয়াগুলোর প্রত্যেকটিতে এখন একটি করে কাঞ্চিত জিন রয়েছে। এই পদ্ধতিতে জিন তৈরি করাকে বলা হয় জিন ক্লোনিং। জিনকে ব্যবহার করার জন্য প্লাজমিডকে আবার আলাদা করে নেওয়া হয়।

## ১১.২.২ ক্লোনিং

প্রাকৃতিক ক্লোন বলতে একটি জীব অথবা এক দল জীবকে বোঝানো হয়, যাদের উক্ত ঘটে অযৌন অঙ্গজ প্রজননের দ্বারা। এগুলোর প্রকৃতি হয় পুরোপুরি তার মাতৃজীবের মতো। জীব ছাড়াও একটি কোষ বা একগুচ্ছ কোষ যখন একটিমাত্র কোষ থেকে উৎপত্তি হয় এবং সেগুলোর প্রকৃতি মাতৃকোষের মতো হয়, তখন তাকেও ক্লোন বলে। প্রকৃতিতে ব্যাকটেরিয়া, অনেক শৈবাল, বেশির ভাগ প্রোটোজোয়া এবং ইস্ট ছত্রাক ক্লোনিং পদ্ধতি দিয়ে বংশবৃদ্ধি করে।

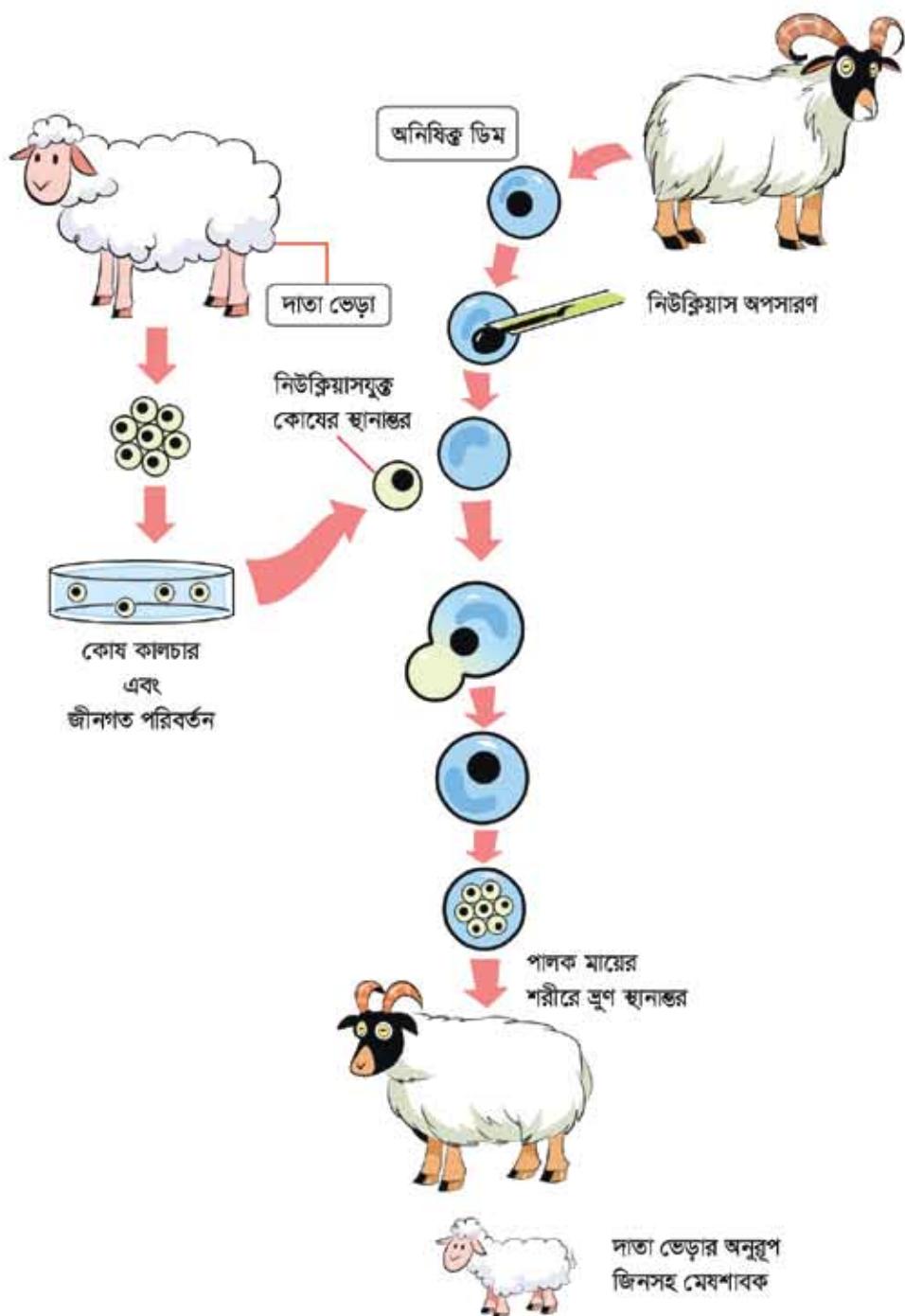
জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে তিনি ধরনের ক্লোনিং করা হয়।

১. জিন ক্লোনিং: একই জিনের অসংখ্য নকল তৈরি করাকে জিন ক্লোনিং বলে। জিন ক্লোনিং রিকমিন্যান্ট ডিএনএ টেকনোলজির সাহায্যে ঘটানো হয়।

২. সেল ক্লোনিং: একই কোষের অসংখ্য হুবহু একই রকমের কোষ সৃষ্টি করাকে সেল ক্লোনিং বলে।

৩. জীব ক্লোনিং: দুটির পরিবর্তে একটিমাত্র জীব থেকে জিনগত হুবহু এক বা একাধিক জীব তৈরির পদ্ধতিকে জীব ক্লোনিং বলে।

ডলি নামক ভেড়া হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম স্তন্যপায়ী প্রাণী, যা একটি পূর্ণবয়স্ক দেহকোষ থেকে ক্লোন করা হয়েছে। ক্লোন করার সময় নিচের ধাপগুলো (চিত্র ১১.০৯) অনুসরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ডিস্টাগু থেকে যে প্রাণী সৃষ্টি হয়, তা হুবহু তার মাতার মতো হয়।



চিত্র ১১.০৯: জলির সৃষ্টি

১. ডলি নামক ভেড়াকে ক্লোন করার জন্য বিজ্ঞানীরা একটা ছয় বছর বয়সের সাদা ভেড়ার দুধগ্রন্থিখণ্ডকে কোষ সংগ্রহ করেছেন।
২. এই কোষের ভেতরের নিউক্লিয়াসটিকে তার কোষে “অভুত্ত” রাখা হয়েছে, যেন এটি যে দুগ্ধগ্রন্থির একটি কোষের নিউক্লিয়াস এই তথ্যটি ভুলে যায়।
৩. কালো মুখের আরেকটি ভেড়া থেকে একটি ডিস্ট্রাগুলি সংগ্রহ করে তার ভেতরকার নিউক্লিয়াসটিকে অপসারণ করা হয়েছে।
৪. সাদা ভেড়া থেকে সংগ্রহ করা কোষের নিউক্লিয়াসটি এবার ডিস্ট্রাগুলি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এবং ইলেক্ট্রিক শক দিয়ে নিউক্লিয়াসটিকে কার্যকর করা হয়েছে।
৫. ডিস্ট্রাগুলি ভূগে পরিণত হওয়ার পর সেটি একটা পালক মাতা ভেড়ার দেহে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। মাতা ভূনটিকে যথাসময়ে মেষশাবক হিসেবে জন্ম দিয়েছে। এই মেষশাবকটি হুবহু তার মায়ের মত।

এই ক্লোনিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে ক্লোন ইঁদুর, খরগোস, গরু ও শুকর এমনকি বানর পর্যন্ত ক্লোন করা হয়েছে। ইঁদুর, ভেড়া, বানর প্রভৃতি ক্লোনিংয়ের পর স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি এখন মানুষের ওপর। এ প্রক্রিয়াটি এখন আর দুরুহ নয়, কিন্তু ইতোমধ্যে বিভিন্ন দেশ মানুষের ক্লোন করার প্রক্রিয়া আইন করে নিষিদ্ধ করে রেখেছে।

**ক্লোনিংয়ের সামাজিক প্রভাব:** সম্পূর্ণ প্রাণীর ক্লোনিংকে বলে রিপ্রোডাকচিভ ক্লোনিং। ‘ডলি’ নামক ভেড়া তার উদাহরণ। পশুদের ক্লোনিং নিয়ে তেমন কোনো বিতর্ক সৃষ্টি হয়নি, তবে এর মধ্যে মানুষের ক্লোনিংয়ের চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। এখন এর নৈতিকতা নিয়ে বিতর্ক উঠেছে। নৈতিকতা প্রশংগুলো এরকম:

প্রথমত হচ্ছে ক্লোনিং হয়ে ভূমিষ্ঠ হওয়া শিশুটি যখন বড় হবে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিত্ব ওই ক্লোন হতে পাওয়া ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মতো হবে, নাকি অন্যরকম হবে। দ্বিতীয় এইভাবে ক্লোন হয়ে সৃষ্টি হওয়ায় শিশুটির উপর কী কোনো ধরনের সামাজিক চাপ থাকবে? ক্লোনিং জাত শিশুটি সম্পূর্ণ সুস্থ হবে, নাকি প্রতিবন্ধী বা বিকলাঙ্গ হবে, সেটি সম্পর্কেও বিজ্ঞানীরা এখনো পুরোপুরি নিশ্চিত নন। এখন পর্যন্ত মানুষ বা মানবগোষ্ঠীর সফল ক্লোনিংয়ের খবর পাওয়া যায়নি।

আরব্য উপন্যাসের সেই দৈত্যের কাহিনী আমরা জানি, যাকে বোতল থেকে বের করার পর পুনরায় বোতলে ঢেকানো যায়নি। পরমাণু শক্তির মতো জীবপ্রযুক্তি ঠিক তেমন এক অবাধ্য শক্তি। তাই আমাদের কাজ হচ্ছে, দায়িত্বশীল মানুষের মতো বিবেচনা করে মানবজাতির কল্যাণে এই জীবপ্রযুক্তিকে কাজে লাগানো।

## ১১.৩ উন্নত প্রাণী ও উভিদ উভাবনে জিনপ্রযুক্তির ব্যবহার

জিন প্রকৌশল ব্যবহার করে উন্নত প্রাণী উভাবনের জন্য বিজ্ঞানীরা অনেক দিন থেকে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং কোথাও কোথাও সফলও হয়েছেন। তারই একটি ফসল হচ্ছে ট্রান্সজেনিক জীব (প্রাণী অথবা উভিদ)। ট্রান্সজেনিক জীব উৎপাদনের পদ্ধতিকে ট্রান্সজেনেসিস বলে। রিকমিনেন্ট ডিএনএ ও মাইক্রোইনজেকশন কৌশল প্রয়োগ করে ট্রান্সজেনিক জীব উভাবন করা হয়।

ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে উভিদ ও অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রে ট্রান্সজেনিক জীব উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে। ফলে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং দিয়ে উভাবিত ট্রান্সজেনিক জীব পৃথিবীতে একটি নতুন সম্ভাবনার দ্বারা খুলে দিয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে এবং গৃহপালিত পশুদের উন্নতিসাধনে ট্রান্সজেনেসিস সহজভাবে আমাদের সাফল্য বয়ে এনেছে।

**ট্রান্সজেনিক প্রাণী:** মানুষের জিন বিশেষ পদ্ধতিতে ইঁদুরে প্রবেশ করিয়ে এমন ট্রান্সজেনিক ইঁদুর উৎপাদন সম্ভব হয়েছে, যা মানুষের অ্যান্টিবিডিগুলো তৈরি করতে সক্ষম। একই পদ্ধতিতে ট্রান্সজেনিক গবাদিপশু, ভেড়া, ছাগল, শুকর, পাখি ও মাছ উৎপাদন করা হয়েছে।

**ট্রান্সজেনিক উভিদ:** জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে জিনের স্থানান্তর ঘটিয়ে যেসব উভিদ সৃষ্টি করা হয়, সেগুলোকে ট্রান্সজেনিক উভিদ বলে। রিকমিনেন্ট ডিএনএ কৌশল প্রয়োগ করে একটি কাঙ্ক্ষিত জিন উভিদেহের কোষের প্রোটোপ্লাজমে প্রবেশ করানো হয়।

গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থকরী ফসলকে ট্রান্সজেনিক উভিদে পরিণত করে পতঙ্গ, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক প্রতিরোধী করে উৎপাদন করা হচ্ছে। শৈত্য, লবণাক্ততা, খরা, নাইট্রোজেন ও ফাইটোহরমোন স্বল্পতা ট্রান্সজেনিক উভিদ উভাবন করে মোকাবিলা করা সক্ষম হয়েছে। বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রায় ৬০টির মতো উভিদ প্রজাতিতে এ প্রক্রিয়ার সফল প্রয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে: টমেটো, তামাক, আলু, লেটুস, বাঁধাকপি, সয়াবিন, সূর্যমুখী, শসা, তুলা, মটর, গাজর, আপেল, মূলা, পেঁপে, ধান, গম, ভূট্টা ইত্যাদি। টান্সজেনিক টমেটো উভাবন করে পাকা টমেটোর ত্বক নরম হওয়া প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, এগুলোকে বিলম্বে পাকানো এবং এর ভেতর সুক্রোজের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

### ১১.৩.১ কৃষি উন্নয়নে জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার

মানুষের অন্যতম প্রধান মৌলিক চাহিদা খাদ্য। কিন্তু সীমিত ভূখণ্ডে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা নিয়ে কীভাবে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া যায় কিংবা কীভাবে উদ্বৃত্ত খাদ্য উৎপাদন করে ব্যবসায়িক ফায়দা ওঠানো যায়, সেটি নিয়ে সারা পৃথিবীতে চলছে এক অঘোষিত যুদ্ধ। এ যুদ্ধ জয়ের হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে সফল জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগ।

কৃষি উন্নয়নে যেসব জীবপ্রযুক্তিগত পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো:

**১. চিস্যু কালচার:** এ পদ্ধতিতে উড়িদের বর্ধনশীল অঙ্গের ক্ষুদ্র অংশ; যেমন মূল, কাণ্ড, পাতা, অঙ্কুতির চারার বিভিন্ন অংশ ইত্যাদি নির্ধারিত আবাদ মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে আবাদ করা হয়। এই কালচারের ফলে এসব বর্ধনশীল অঙ্গসমূহ থেকে অসংখ্য অণুচারা উৎপন্ন হয়। এসব অণুচারার প্রত্যেকটি পরে উপযুক্ত পরিবেশে পৃথক পৃথক পূর্ণাঙ্গ উড়িদে পরিণত হয়। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে অল্প জায়গায় নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বাণিজ্যিকভাবে লাখ লাখ কাঙ্ক্ষিত চারা তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে।

**২. অধিক ফলনশীল উড়িদের জাত সৃষ্টি:** কোনো বন্য উড়িদের উৎকৃষ্ট জিন ফসলি উড়িদে প্রতিস্থাপন করে কিংবা জিনের গঠন বা বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটিয়ে উন্নত জাতের উড়িদ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। এভাবে ধান, গম, তেলবীজসহ অনেক শস্যের অধিক ফলনশীল উন্নত জাত উত্তোলন করা হয়েছে।

**৩. গুণগত মান উন্নয়নে:** জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে প্রাণী ও উড়িদজাত দ্রব্যাদির গঠন, বর্ণ, পুষ্টিগুণ, স্বাদ ইত্যাদির উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে। যেমন: অস্ট্রেলিয়ায় ভেড়ার লোমকে উন্নতমানের করতে তাদের খাদ্য ক্লোভার ঘাসে রিকমিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তির মাধ্যমে সূর্যমুখীর সালফার অ্যামিনো অ্যাসিড সৃষ্টিকারী জিন স্থানান্তর করা হয়েছে। ফলে খাদ্য হিসেবে এই ঘাস খেলেই ভেড়ার লোম উন্নতমানের হচ্ছে, পৃথকভাবে সালফার সমৃদ্ধ খাবার দেওয়া প্রয়োজন হচ্ছে না।

**৪. সুপার রাইস সৃষ্টি:** জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে সুইডেনের এক বিজ্ঞানী সুপার রাইস বা গোল্ডেন রাইস নামক এক ধরনের ধান উত্তোলন করেছেন। এটি ভিটামিন A সমৃদ্ধ।

**৫. ভিটামিন সমৃদ্ধ ভুট্টার জাত সৃষ্টি:** সম্প্রতি স্পেনের একদল গবেষক জেনেটিক্যালি মডিফাইড ভুট্টার ধীজ উত্তোলন করেছেন যাতে ভিটামিন সি, বিটা ক্যারোটিন ও ফলিক অ্যাসিড পাওয়া যাবে। এই ভুট্টা ব্যালেন্স ডায়েটের পাশাপাশি গরিব দেশগুলোর মানুষের অপুষ্টি দূর করবে।

**৬. স্টেরাইল ইনসেন্ট টেকনিক:** জীবপ্রযুক্তি দিয়ে শাক-সবজি, ফল ও শুঁটকির ক্ষতিকর পতঙ্গ, মশা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে স্টেরাইল ইনসেন্ট টেকনিকট (SIT) উত্তোলন করা হয়েছে। এটি ব্যবহার করে পতঙ্গের বংশবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। জাপান, ফিলিপিনস, থাইল্যান্ড, গুয়াতেমালা, ব্রাজিল এসব দেশে এই প্রযুক্তি ব্যাপক প্রচলিত।

**৭. ট্রাইলজেনিক উড়িদ:** এ সময় পর্যন্ত প্রায় ৬০টি উড়িদ প্রজাতিতে রিকমিনেন্ট ডিএনএ কৌশল সফলভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে তামাক, টমেটো, আলু, মিষ্টি আলু, লেটাস, সূর্যমুখী, বাঁধাকপি, তুলা, সয়াবিন, মটর, শসা, গাজর, মূলা, পেঁপে, আঙুর, কৃষ্ণচূড়া, গোলাপ, নাশপাতি, নিম, ধান, গম, রাই, ভুট্টা প্রভৃতি। এগুলো পতঙ্গ, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক প্রতিরোধী এবং একই সাথে যেকোনো পরিবেশকে মোকাবিলা করতে পারে।

### ১১.৩.২ ঔষধশিল্পে জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার

প্রতিবছর জনসংখ্যা ও রোগের জটিলতা বেড়েই চলছে। এ অবস্থায় দ্রুত চিকিৎসা পেঁচে দিতে বিজ্ঞানীরা জীবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে ঔষধশিল্পের উন্নতি ঘটিয়েছেন। মারাত্মক রোগ-ব্যাধি শনাক্তকরণের পাশাপাশি জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে ঔষধ উৎপাদনের প্রক্রিয়া জোরালো হয়েছে। নিচে তার কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো।

**১. ভ্যাকসিন উৎপাদন:** বর্তমানে জিন প্রকৌশল প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন ভ্যাকসিন বা টিকা উৎপাদন করা হয়েছে যেগুলো পোলিও, যস্ফা, হাম, বসন্তসহ বিভিন্ন সংক্রামক রোগের রোগ প্রতিরোধক হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

**২. ইন্টারফেরন উৎপাদন:** ইন্টারফেরন আধুনিক ঔষধশিল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রোটিন অণুর সমন্বয়ে গঠিত এ উপাদানটি দেহের রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থায় অত্যন্ত সহায়ক। জিন প্রকৌশল প্রয়োগ করে বাণিজ্যিক ভিত্তিক ইন্টারফেরন উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এটি হেপাটাইটিসের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় এবং ক্যান্সার রোগীদেরকে প্রাথমিকভাবে ইন্টারফেরন প্রয়োগ করে ক্যান্সারকে নিয়ন্ত্রণে রাখার পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

**৩. হরমোন উৎপাদন:** বিভিন্ন হরমোন (যেমন: ডায়াবেটিস রোগের ইনসুলিন কিংবা মানুষের দেহ বৃদ্ধির হরমোন ইত্যাদি) উৎপাদন জীবপ্রযুক্তির এটি উল্লেখযোগ্য দিক। জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে প্রস্তুত করা হরমোন সহজসাধ্য এবং দামও অনেক কম।

**৪. অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন :** কম সময়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনের জন্য জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগ করে বর্তমানে এক হাজারের বেশি অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদিত হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পেনিসিলিন ও সেফালোস্পোরিন অ্যান্টিবায়োটিক।

**৫. এনজাইম উৎপাদন:** পরিপাক-সংক্রান্ত রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধের উপাদান হিসেবে কিছু এনজাইম, (যেমন: অ্যামাইলেজ, প্রোটিয়েজ ও লাইপেজ, পেঁপে থেকে প্যাপেইন) প্রস্তুত করা হয়। বটগাছ থেকে ফাইসন (যা কৃমিরোগে ব্যবহৃত হয়), গবাদিপশুর প্লাজমা থেকে থ্রুম্বিন (রক্তপাত বন্ধে ব্যবহৃত হয়) এবং ট্রিপসিন (যা ক্ষত নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়) জৈবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদিত এবং বাজারজাত হচ্ছে।

**৬. ট্রান্সজেনিক প্রাণী থেকে ঔষধ আহরণ:** ট্রান্সজেনিক প্রাণী উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রাণীগুলোর দুধ, রক্ত ও মৃত্ত থেকে প্রয়োজনীয় ঔষধ আহরণ করা হয়। একে মলিকুলার ফার্মিং বলে।

### ১১.৩.৩ গৃহপালিত পশু উন্নয়নে জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার:

উন্নত জাতের পশু উৎপাদনের লক্ষ্য হচ্ছে: (ক) চর্বিমুক্ত মাংস উৎপাদন, (খ) দ্রুত বিক্রয়যোগ্য করা

এবং (গ) রোগ প্রতিরোধী করা। ইতোমধ্যে ট্রাইজেনিক ভেড়া উৎপাদন করা হয়েছে। এই ভেড়ার প্রতি লিটার দুধে ৩৫ শাম পর্যন্ত হিউম্যান আলফা এন্টিট্রিপসিন প্রোটিন পাওয়া যায়। এ প্রোটিনের অভাবে এমফাইলেমা নামক মাঝারীক রোগের সৃষ্টি হয়। জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে ভেড়াদেহের মাঝে বৃদ্ধি এবং শরীরের পশম-বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে দ্রব্যাবিত করা হয়েছে। চৰিহীন মাস ও মানুষের হরমোন উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ট্রাইজেনিক শূকর উৎপাদন সফল হয়েছে। উৎপাদিত হয়েছে ট্রাইজেনিক ছাগল। এসব ছাগলের দুধে পাওয়া যায় এক বিশেষ ধরনের প্রোটিন যা জ্যাট রক্তকে পলিয়ে করে নারি প্রয়োগিস থেকে মানুষকে রক্ষা করে। ট্রাইজেনিক গরু উৎপাদনের মাধ্যমে মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের মাতৃদূধের অতি প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ল্যাকটোফেরিনও পাওয়া যাচ্ছে।

দুর্ঘজাত হ্রব্য উৎপাদনে জিন প্রযুক্তির ব্যবহার: বিশেষ দুধের প্রধান উৎস পাওয়া। এর পরেই রয়েছে মহিষ, ছাগল ও ভেড়া। দুধের সরাসরি নানাবিধ ব্যবহার খাকলেও দুধ থেকে বিভিন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে দুর্ঘজাত হ্রব্যাদি তৈরি করা হয়। যেমন: দুধ থেকে মাখন, পলির, দই ইত্যাদি খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করা হয়। দুধ থেকে খাদ্যসামগ্রী তৈরির জন্য জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে নানা রকমের ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হচ্ছে। নিচে কয়েকটি দুর্ঘজাত হ্রব্য তৈরি সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

**১. মাখন:** বিশেষ ব্যাকটেরিয়া থেকে উৎপন্ন এনজাইম দিয়ে মাখনে বিশেষ সুগন্ধি ও স্বাদ সৃষ্টি করা হয়।

**২. পনির:** আমাদের দেশে গরুর দুধ কিংবা মহিষের দুধ থেকে পনির তৈরি করা হয়। পনির তৈরিতে ব্যাকটেরিয়া কিংবা ছাগল প্রয়োগ করা হয়। এতে পনিরের স্বাদ, বর্ণ এবং গন্ধের ভারতীয় রূপ। এই উৎকৃষ্ট মানের পনির উৎপাদন সম্ভব হয়েছে জীব প্রযুক্তির দ্বারা।

**৩. দই:** দুধে ল্যাকটোজ নামক শর্করা খাকায় বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া প্রয়োগ করে সেটা থেকে দই বা দইজাতীয় খাদ্য উৎপাদন করা যায়। ল্যাকটিক আসিড ব্যাকটেরিয়া দুধের জ্যাট বাঁধা অবস্থা সৃষ্টি করে দইয়ে রূপান্তরিত করে। এটি করার জন্য ল্যাকটিক আসিড ব্যাকটেরিয়া নামে এক প্রকার ব্যাকটেরিয়ার বীজ ব্যবহার করা হয়। মূলত এর গুণাগুণের উপরেই দই এর গুণাগুণ নির্ভর করে।

### ১১.৩.৪ ফরেনসিক টেস্ট



করোনসিক টেস্টের ঘারা রস, বীর্বল, মূত্র, অশ্ব, লালা ইত্যাদির ডিএনএ অথবা আণ্টিবড়ি থেকে অপরাধীকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়।

জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে করোনসিক টেস্ট (চিত্র ১১.১০) করার পদ্ধতি এরকম:

সেরোলজি (Serology) টেস্ট দিয়ে মানুষের রস, বীর্বল এবং লালাকে চিহ্নিত করে তার ডিএনএ বিশ্লেষণ করে অপরাধীকে শনাক্ত করা হয়।

আমরা এ পর্যন্ত জিন থাকোশলের প্রয়োগ ও অবদান সম্পর্কে যেসব আলোচনা করেছি, এগুলো ছাড়াও আরও অনেক ধরনের কাজ হয়েছে। জিন থাকোশল প্রযুক্তি ব্যবহার করে “হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট”-এর মাধ্যমে ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলোর অবস্থান ও কাজ সম্বলে জানা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে মানুষের শরীরের ক্ষতিকর জিনকে অপসারণ করে সুস্থ জিন প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হতে যাচ্ছে। এই পদ্ধতিকে জিন থেরাপি বলে।

## অনুশীলনী



### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সেজ ক্রোমোজোমের সংখ্যা কতটি?

- (ক) ১টি
- (খ) ২টি
- (গ) ২২টি
- (ঘ) ৪৪টি

২. ক্রোমোজোমে যে পৌরীক পদ্ধতি থাকে তা হলো:

- (i) ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম
- (ii) পৌর ও ম্যাগনেসিয়াম
- (iii) ক্যালসিয়াম ও আলুমিনিয়াম

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii
- (খ) ii ও iii
- (গ) i ও iii
- (ঘ) i, ii ও iii

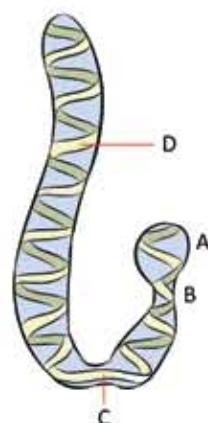
পাশের চিত্রটি থেকে ৩ ও ৪ নং ধরের উভয় দাঁও:

৩. চিত্রটি কিসের?

- (ক) DNA
- (খ) RNA
- (গ) ক্রোমোজোম
- (ঘ) নিউক্লিওসাস

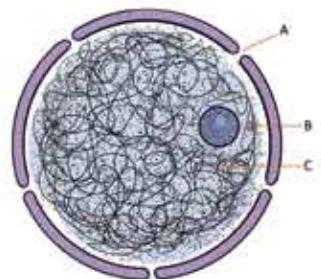
৪. চিত্রের কোন অংশটি সেক্রেটিভার?

- |       |       |
|-------|-------|
| (ক) A | (খ) B |
| (গ) C | (ঘ) D |



### সূজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের চিত্রটি দেখ এবং ধর্মগুলোর উভয় দাঁও।



- (ক) RNA-এর পুরো নাম লিখ।
- (খ) DNA টেস্ট কী? বুবিয়ে লিখ।
- (গ) আদি কোথের ক্ষেত্রে ওপরের চিত্রগুটি ব্যাখ্যা কর।
- (ঘ) A এবং C-এর মধ্যে কোনটি লিঙ্গ নির্ধারণে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ কর।

২. করিহা ভার আক্ষুর সাথে কৃষি ধানের বেড়াতে বাস। সেখানে সে টেস্টো, ভাষাক, জ্বৰ, পেশেন্সহ অনেক ধজাতির উভিস দেখতে পার, যা বেশ সতেজ ও ঝোগজীবাসুরুক্ত। কিন্তু বাক্তিতে শাসানা উচ্চিদপ্তুলা ঝোগজোক। সে ভার আক্ষুর নিকট এবং কারণ জানতে চাইল। আক্ষু বললেন, “ধানাদের উভিসে জিন বিনিময় প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে”।

- (ক) নিউক্লিওসাস কাকে বলে?
- (খ) সিকিলসেল ঝোগ বলতে কী বুবায়?
- (গ) উকীশকে উল্লিখিত প্রযুক্তি ব্যাখ্যা কর।
- (ঘ) উকীশকে উল্লিখিত প্রযুক্তি কৃষির উন্নতিসাধনে কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে? বিশ্লেষণ কর।

## দাদশ অধ্যায়

# প্রাত্যহিক জীবনে তড়িৎ



শক্তির নামা বৃপের মাঝে তড়িৎ বা বিদ্যুৎ শক্তি। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় একটি শক্তি, কারণ এটি দিয়ে আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে সবচেয়ে বেশি কাজ করতে পারি। বিদ্যুৎ বা তড়িৎ আলো জ্বালাই, পাখা চালাই, রেডিও, ফ্রিজ, টিভি বা কলিউটার চালাই। বিদ্যুতের সাহায্যে রান্না করা যায়। এর ব্যবহারকে আলো করে বুঝতে হলে আমাদেরকে বিদ্যুৎ বা তড়িৎ সকলকে ধারণা নিতে হবে। বিদ্যুৎ বা তড়িৎ সকলকে স্পষ্ট ধারণা থাকলেই আমরা তড়িতের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে এর অগ্রচেয় বন্ধ করার ফেরে নিজেরা যত্নবান হতে পারব এবং অন্যদের সচেতন হতে সাহায্য করতে পারব।



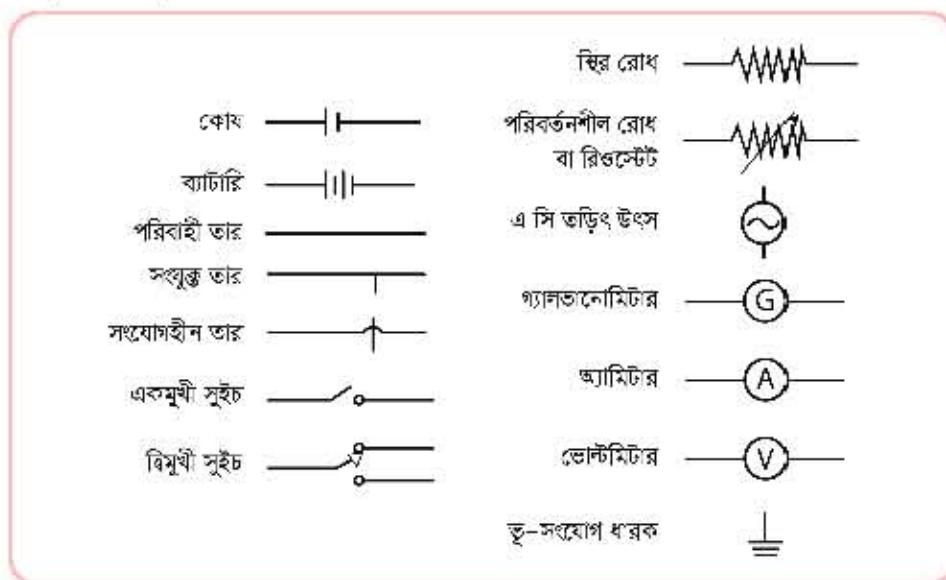
### এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- ভড়ি উপাখণ্ড ও বজ্র ধৰ্মীকের সাহায্যে প্রকাশ করতে পারব।
- ব্যাটারির কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাসা-বাড়িতে ব্যবহার উপযোগী বজনীর নকশা প্রণয়ন করতে পারব।
- ভড়ি বিশ্লেষণ এবং ভড়ি প্রলেপন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আভ্যন্তরীণ জীবনে ভড়ি বিশ্লেষণের এবং ভড়ি প্রলেপনের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- কিলোওয়াট ও কিলোওয়াট-সেন্টা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বৈদ্যুতিক ক্ষমতার হিসাব করতে পারব।
- এনার্জি সেভিং বাদের সুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আইপিএস ও ইউপিএসের কার্যক্রম ও ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সিলেক্ট লস এবং লোড শেডিং ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উচ্চমন কার্যক্রমে বিস্তৃতের অবদান ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাসা বাড়িতে ব্যবহার উপযোগী বজনীর ব্যবহার অদর্শন করতে পারব।
- পরীক্ষার সাহায্যে ভড়ি বিশ্লেষণ প্রদর্শন করতে পারব।
- ভড়ি উপকরণ ও যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবহারে সক্ষম হব।
- ভড়িতের অপচয় রোধে বক্সবাল হ্ব এবং অন্যদের সচেতন করব।

## ১২.১ চল তড়িৎ

### ১২.১.১ তড়িৎ বক্টোর প্রতীক

ইলেক্ট্রিক সার্কিট বা তড়িৎ বক্টোর চিহ্ন বা নকশা আমরা সুবিধার জন্য আমরা প্রতেকটি ঘরের বা সংযোগের একটি প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করে থাকি। নিচের ছকে এ গুরুত্ব কিছু ঘরের বা সংযোগের প্রতীক চিহ্ন দেওয়া হলো।



চিত্র ১২.০১: ইলেক্ট্রিক সার্কিট বা তড়িৎ বক্টোরে ব্যবহার করা প্রতীক চিহ্ন

### ১২.১.২ ব্যাটারির কার্যক্রম

আমরা সবাই আমাদের ডেলনিম জীবনে টর্চ সাইটে বা যোবাইল ফোনে ব্যাটারি সেল ব্যবহার করেছি। সাধারণত কথাবার্তায় একটি সেলের জন্যে ব্যাটারি শব্দটি ব্যবহার করলেও বিজ্ঞানের আধাৱ ব্যাটারি বলতে একাধিক কোষের (Cell) সমষ্টিকে বোঝানো হয়। একটি তড়িৎ ব্যাটারি বলে উল্লেখ করলেও প্রকৃতপক্ষে ব্যাটারি হলো একাধিক তড়িৎ কোষের সমষ্টি। ব্যাটারি সেলে ব্যবহারের জন্য তড়িৎ শক্তি জমা থাকে। চিত্র ১২.০২-এ একটি ব্যাটারির পাঁচ সেলখালো হলো। ব্যাটারিতে সাধারণত তিনটি অংশ



চিত্র ১২.০২: ব্যাটারি সেল

থাকে। একটি আলোড়, একটি ক্যাথোড এবং মার্কথালে ইলেক্ট্রোলাইট। ব্যাটারি সেলে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় আলোড় থেকে ইলেক্ট্রন সরিয়ে ক্যাথোডে জমা করা হয়। এর বশে আলোড় এবং ক্যাথোডের মধ্যে ভড়ি বিভব পার্থক্য তৈরি হয়। এ অবস্থার আলোড় এবং ক্যাথোডকে পরিবাহী তার ঘারা সংস্কৃত করলে ক্যাথোডের ইলেক্ট্রনগুলো আলোড়ে প্রবাহিত হতে থাকে। ইলেক্ট্রন প্রবাহের বিপরীত দিকে বিদ্যুৎ প্রবাহ ধরে সেওয়া হয়। তাই আমরা বলি আলোড় থেকে ক্যাথোডে বিদ্যুৎ প্রবাহ হচ্ছে।

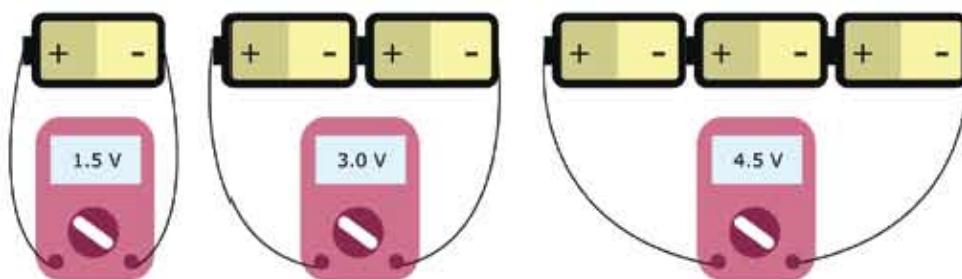
সাধারণ ব্যাটারি সেলের রাসায়নিক পদার্থ বিক্রিয়া করে খরচ হয়ে যাওয়ার পর সেটি আলোড় এবং ক্যাথোডে আর বিভব পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে না বলে বিদ্যুৎ প্রবাহ বশ হয়ে থার।

আমরা মোবাইল টেলিফোনে যে ব্যাটারি ব্যবহার করি, সেগুলোর বিদ্যুৎ প্রবাহ তৈরিয়ে ক্ষমতা শেষ হয়ে যাবার পর সত্ত্বে চার্জ করিয়ে নেওয়া যায়, তখন ব্যাটারির রাসায়নিক পদার্থগুলো পুনরায় রাসায়নিক বিক্রিয়া করে বিদ্যুৎ তৈরি করার জন্য প্রস্তুত হয়।

### ১২.১.৩ ইলেক্ট্রিক সার্কিট বা ভড়ি বৃত্তী

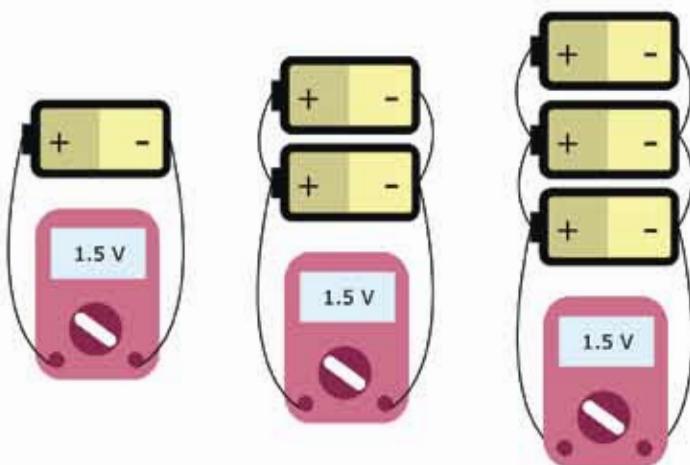
আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যুৎ কীভাবে ব্যবহার করা হয়, সেটি বুঝতে হলে আমাদের ইলেক্ট্রিক সার্কিট বা ভড়ি বৃত্তী সম্পর্কে কিছু বিষয় জানতে হবে।

(ক) সিরিজে ব্যাটারি সেল: ব্যাটারি সেলকে সিরিজে (চিত্র ১২.০৩) লাগানো হলে ব্যাটারির বিভব যোগ হয়। অর্থাৎ একটি ব্যাটারি সেলে ১.৫ ভোল্ট হলে দুটি ব্যাটারি সেল দিয়ে ৩ ভোল্ট এবং তিনটি সেল দিয়ে ৪.৫ ভোল্ট পাওয়া সম্ভব।



চিত্র ১২.০৩: সিরিজে ব্যাটারি সেল

(খ) সমন্তরালে ব্যাটারি সেল: কয়েকটি সেল সমন্তরাল ভাবে (চিত্র ১২.০৪) লাগানো হলে তার বিভবের পরিবর্তন হয় না কিন্তু বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহ করতে পারে কিংবা সার্কিটে বেশি সময় ধরে বিদ্যুৎ প্রবাহ করতে পারবে।

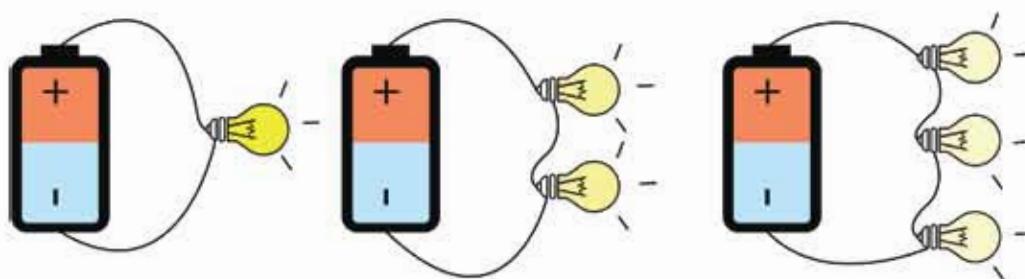


চিত্র ১২.০৪: সমান্তরালে ব্যাটারি সেল

(গ) ধরা যাক আমরা ব্যাটারি দিয়ে কয়েকটি বাল্ব জ্বালাতে চাই। সেটি দুইভাবে করা সত্য, সিরিজ সার্কিট বা সিরিজ বক্তনী এবং সমান্তরাল সার্কিট বা সমান্তরাল বক্তনী।

### সিরিজ সার্কিট

সিরিজ সার্কিটে (চিত্র ১২.০৫) একটি বাল্ব অনেক উচ্চলভাবে জ্বলবে কিন্তু দুটি বা তিনটি বাল্ব লাগানো

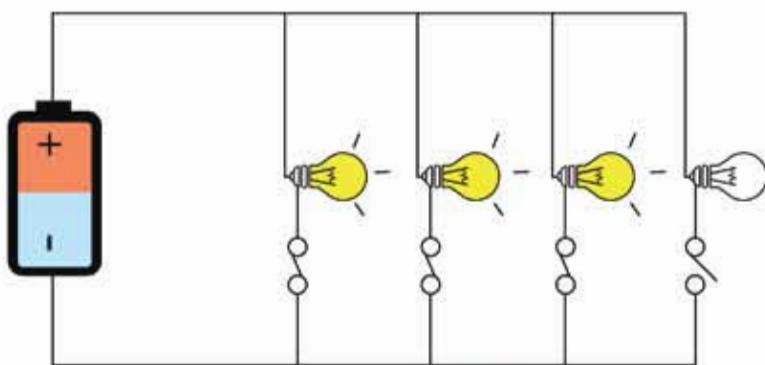


চিত্র ১২.০৫: সিরিজ সার্কিট

হলে বিদ্যুৎ প্রবাহ আনুপাতিকভাবে কমে যাবে বলে বাল্বগুলো অনুকূলভাবে জ্বলবে। সিরিজ সার্কিট একটি সুইচ লাগানো হলে সুইচ অফ করার সাথে সাথে সবগুলো বাল্ব একসাথে নিষেক ঘোরবে।

### সমান্তরাল সার্কিট

সমান্তরাল সার্কিটে (চিত্র ১২.০৬) আমরা যতগুলো বাল্বই লাগাই না কেন, সবগুলোর দুই প্রাণ্ডেই



চিত্র ১২.০৬: সমান্তরাল সার্কিট

ব্যাটারি সেল থেকে সমান বিভিন্ন পার্শ্বক্ষয় প্রয়োগ করা হয়ে বলে সবগুলো বাইরেই সহান উজ্জ্বলতার মূলবে। এই সার্কিটে ইচ্ছে করলে প্রত্যেকটা বাবের জন্য আলাদা সুইচ লাগিয়ে প্রত্যেকটিকে আলাদাভাবে ঝুলানো এবং নেওনো সত্ত্ব।

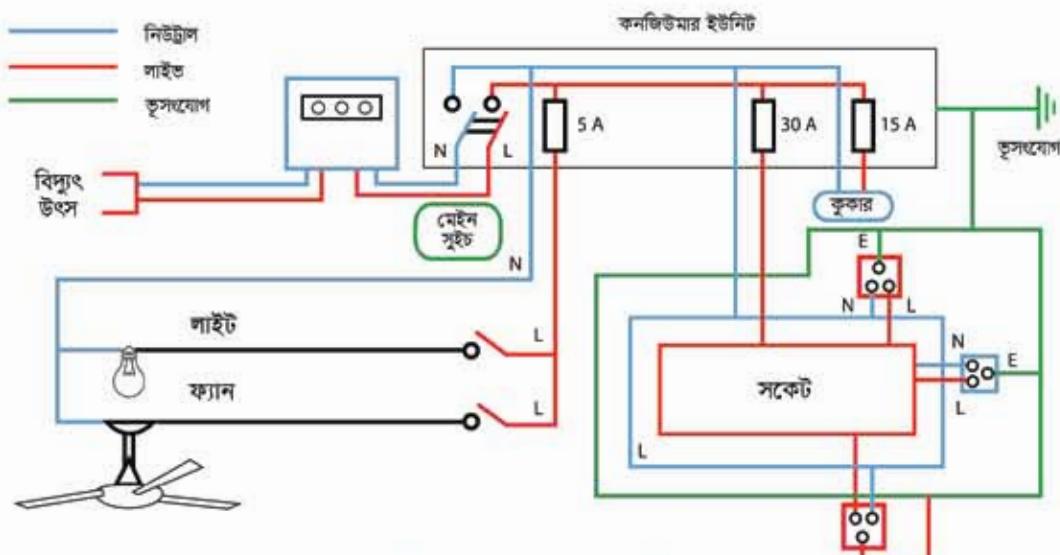
ব্যাটারি সেলের বিভিন্ন পার্শ্বক্ষয় সহান থাকে বলে এগুলোকে ডিসি সাপ্লাই বলা হয়। আমাদের বাসায় যে বৈদ্যুতিক সাপ্লাই দেওয়া হয়, সেগুলো প্রতি সেকেতে পরিপন্থৰ ধনায়ক থেকে বাধায়ক বিভিন্নবে পরিবর্তিত হয়ে বলে সেগুলোকে এসি (Alternating Current) বলা হয়। একটি সাধারণ ব্যাটারি সেলে বিভিন্ন পার্শ্বক্ষয় যাজ ১.৫V। সেই তুলনায় আমাদের বাসার বিদ্যুৎ সাপ্লাই ২২০V, এখানে উজ্জ্বল্য, বিদ্যুৎ প্রবাহ ৫০V থেকে বেশি হলে আমরা সেটি অনুভব করতে পারি এবং ২২০V সাপ্লাই থেকে অনেক বড় ইলেক্ট্রিক শক খাওয়া সত্ত্ব এবং এই ইলেক্ট্রিক শকের কারণে শরীরের ক্ষেত্রে দিয়ে বাধেট বিদ্যুৎপ্রবাহ হলে মানবের মৃত্যুও হতে পারে।

**উদাহরণ:** সুইচ বিমুক্তি সুইচ ব্যবহার করে একটি সার্কিট ডিজাইন করো, যেটি ব্যবহার করে থেকোনো সুইচ দিয়েই একটি লাইট বাব ঝুলানো কিংবা নেওনো সত্ত্ব।

### ১২.১.৪ বাঢ়িতে তড়িৎ বর্তনীর নকশা বা হাউজ প্লানিং

আমাদের ধার সবার বাঢ়িতেই বিদ্যুৎ-সংযোগ আছে। তোমরা কী জান, এই সংযোগ দেওয়ার পূর্বে বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং বিতরণ করার জন্য একটা নকশা আঁকতে হয়? বাসার বিদ্যুৎ বিতরণের একটি নকশা কেনন হতে পারে সেটি দেখানো হলো। বাঢ়িতে তড়িৎ-সংযোগের জন্য সিরিজ বর্তনী উপযোগী নয়। কারণ সুইচ অন করলে একই সাথে সংযুক্ত সব বাব ঝুলে উঠবে, ক্যান চলতে থাকবে। আবার অফ করলে সবগুলো একই সাথে অফ হয়ে যাবে। তার চাইতে বড় কথা, সবগুলো সিরিজে থাকলে কোনো বাব বা ক্যানই প্রয়োজনীয় ভোল্টেজ পাবে না, আপাতত হ্যান্ড্মার কারণে ভোল্টেজ কমে যাব। মূলত বাসার তড়িৎ-সংযোগ সমান্তরাল সংযোগব্যবস্থা মেলে করা হয়।

এবার নিচে একটি হাউজ ওয়ারিংসের বিশদ চিত্র দেওয়া হলো (চিত্র ১২.০৭) এতে মেইন লাইনকে কীভাবে সহযোগ করে অন্যান্য উপাদান যেমন ফিউজ বা সার্কিট ব্রেকার, মেইন সুইচ, প্লাগ-সকেট, ডিস্ট্রিবিউশন বক্স এবং প্রয়োজনীয় বাতি বা পাখাৰ সহযোগ দেওয়া হয় তা দেখানো হলো।



চিত্র ১২.০৭: হাউজ ওয়ারিং

বাসার বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রধান ভার দুটির একটি হলো জীবন্ত (সাধারণত কালো রঙের) ভার এবং অন্যটি নিরশেক ভার (সাধারণত কালো রঙের) জীবন্ত ভারে বিদ্যুৎ ভোল্টেজ ( $220\text{ Volt}$ ) থাকে। নিরশেক ভারে বোনো ভড়ি $\times$ ভোল্টেজ থাকে না বেহেজ এটিকে মাটির সাথে সহযোগ করে দেওয়া হয়। এটি সার্কিট পূর্ণ করে বিদ্যুৎ প্রবাহ নিশ্চিত করে থাকে।

মেইন ভারটি ফিউজ বা সার্কিট ব্রেকার হয়ে ঘিটারে যায়। এর মাথায়ে বাড়িতে কী পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি অবচ হচ্ছে তা ঘিটারে শিখিব্বত্ত হয়। ঘিটার হতে ভার দুটি মেইন সুইচে যায়। এই সুইচের সাহায্যে বাড়ির ডিজেলের বিদ্যুৎ প্রবাহ প্রয়োজন হলে পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া।

মেইন সুইচ থেকে ভার দুটি ডিস্ট্রিবিউশন বক্সে যায়। সেখানে ভার দুটি বিভিন্ন শাখা লাইনে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রত্যেক শাখা লাইনের জন্য পৃথক পৃথক ফিউজ বা সার্কিট ব্রেকার থাকে। ছবিতে লাইটের জন্য ৫A, ক্লানের জন্য ১০A, হিটারের জন্য ১৫A এবং প্লাগ সকেটের জন্য ৩০A সার্কিট ব্রেকার দেখানো হয়েছে। এদের প্রত্যেকটিতেই জীবন্ত ভারের সহযোগ আছে এবং প্রত্যেকটি বাতি পাখাৰ জন্য আলাদা আলাদা সুইচ সহযোগ দেওয়া আছে।

বাড়িতে বৈদ্যুতিক ওয়ারিং দেওয়াৰ সময় বাতি বা পাখাৰ সুইচের যাবতীয় ফিউজ যেন জীবন্ত ভারের সাথে সহযোগ হয়, সেদিকে বিশেষ করে নজর দিতে হবে। ভাষাঙ্গ সমস্ত ভার গিভিসি বা যেকোনো

অপরিবাহী পদার্থ দ্বারা মোড়ানো হতে হবে।

বর্তমানে ওয়ারিং কেবলকে সাধারণত দেয়ালের প্লাস্টারের ভিতর দিয়ে টানা হয়। তাছাড়া সব ধরনের যন্ত্রপাতির জন্য ফিউজ সংযোগ নিশ্চিত করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতির (যেমন ফ্রিজ, টিভি ইত্যাদি) জন্য উপযোগী ফিউজ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া প্রয়োজনীয় লোড নিতে পারে, সে ধরনের কেবল (Cable) ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে বিদ্যুৎ প্রবাহের সময় তার উত্তৃত্ব হয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

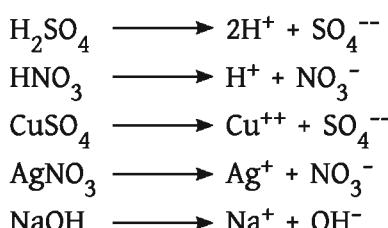
## ১২.২ তড়িৎ বিশ্লেষণ (Electrolysis)

কোনো দ্রবণের মধ্যে বিদ্যুৎ বা তড়িৎ প্রবাহিত করে এর অণুগুলোকে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক অংশে বিভক্ত করার পদ্ধতিকে তড়িৎ বিশ্লেষণ বলে।

তড়িৎ প্রবাহ করে দ্রবণের যে দ্রবটিকে দুই ভাগে বিভক্ত বা বিশ্লেষণ করা হয়, তাকে তড়িৎ দ্রব বা তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ বলে। আমরা আগে দেখেছি যে পরিবাহকের দুই পাশে ব্যাটারি সেল দিয়ে বিভব পার্থক্য তৈরি করলে পরিবাহকের মুক্ত ইলেকট্রনগুলো প্রবাহিত হয়, যেটাকে আমরা বিদ্যুৎ বা তড়িৎ প্রবাহ বলি। তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় দ্রবণের ভেতর দিয়ে কীভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হবে? তড়িৎ বিশ্লেষণের বা ইলেক্ট্রোলাইসিসের সময় তড়িৎ দ্রবটি ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আয়নে বিভক্ত এবং ঋণাত্মক আয়নের প্রবাহ দিয়ে দ্রবণে বিদ্যুৎ প্রবাহ করা হয়। সকল এসিড, ক্ষার, কয়েকটি নিরপেক্ষ লবণ, এসিড মেশানো পানি ইত্যাদি তড়িৎ দ্রব বা তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ। যেমন:  $H_2SO_4$ ,  $HNO_3$ ,  $CuSO_4$ ,  $AgNO_3$ ,  $NaOH$  ইত্যাদি।

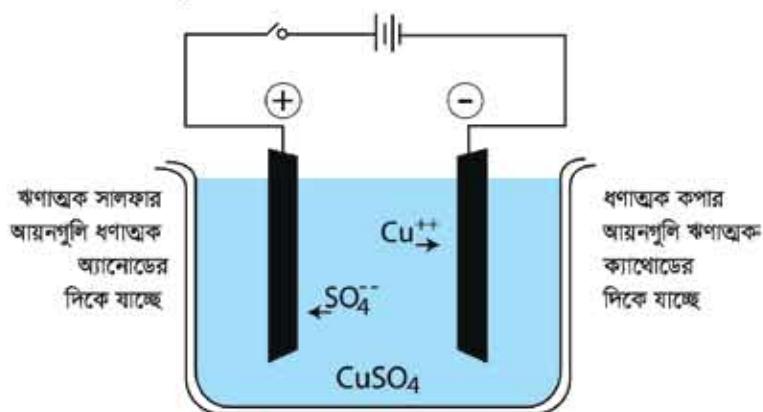
আমরা জানি, স্বাভাবিক অবস্থায় পরমাণু বা অণুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা নিউক্লিয়াসে অবস্থিত প্রোটনের সংখ্যার সমান হয়ে থাকে। কোনো অণু, পরমাণু বা যৌগমূলকে যদি স্বাভাবিক সংখ্যার ইলেকট্রনের চেয়ে কম বা বেশি ইলেকট্রন থাকে তাহলে তাকে আয়ন বলে। ইলেকট্রনের সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে কম হলে তাকে বলে ধনাত্মক আয়ন। আর যদি ইলেকট্রনের সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয় তাহলে তাকে বলে ঋণাত্মক আয়ন।

তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় তড়িৎ দ্রব ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আয়নে ভাগ হয়ে যায়। একটু আগে উল্লেখ করা তড়িৎ দ্রবগুলো নিচে দেখানো উপায়ে আয়নে বিভক্ত হয়ে যাবে:



বিখ্যাত বিজ্ঞানী আর্থেনিয়াস (Arrhenius) ১৮৮১ সালে তড়িৎ বিপ্লবশের ব্যাখ্যা দেন। তিনি সেখাইয়েছিলেন এসিজ, কার বা শবলজাতীয় ঘোণিক পদার্থকে তরলে অবিভূত করলে সেগুলো আয়নায়িত হয়ে সম-পরিমাণ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধান বা চার্জস্টুন্ট আয়নে ভাগ হয়ে যায়। আধানযুক্ত অবস্থায় আয়নগুলোর রাসায়নিক ধর্ম প্রকাশ পায় না। তবে চার্জহীন বা নিষ্ক্রিয় হলে এরা আবার রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে। আয়নগুলো তরলের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে শুরু বেঢ়ায়। পরিবাহকে বেরকম ইলেক্ট্রন বিদ্যুৎ প্রবাহ করতে পারে, তবলে এই আয়নগুলো সেরকম বিদ্যুৎ প্রবাহ করতে পারে। এখন এই তরলের মাঝে দুটি পরিবাহী দণ্ড বা তড়িৎবার রেখে তরলের ডেড়র ঘনি বিদ্যুৎ প্রবাহ করা হয় তাহলে ঋণাত্মক আয়নগুলো অ্যানোড ও ধনাত্মক আয়নগুলো ক্যাথোডের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। দুটি পরিবাহী দণ্ড বা ইলেক্ট্রোডের মধ্যে আয়নগুলোর এই বিপরীতমুখী প্রবাহের জন্য তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি হয়।

### ১২.২.১ তড়িৎের ছবশের তড়িৎ বিপ্লবশের ব্যাখ্যা



চিত্র ১২.০৮: তড়িৎ বিপ্লবশ

ধরা থাক একটি কাচপাত্রে কিছু তৃঢ়ত বা  $\text{CuSO}_4$  ও পানি নেওয়া হলো।  $\text{CuSO}_4$  পানিতে অবিভূত হয়ে  $\text{Cu}^{++}$  ও  $\text{SO}_4^{2-}$  আয়নে বিপ্লিট হয় (চিত্র ১২.০৮)। এখন ছবশের মধ্যে দুটি তামার পাত ডুবিয়ে ঘনি পাত দুটির সাথে একটি তড়িৎ কোষ সংযুক্ত করা হয় তাহলে আয়নের প্রবাহ শুরু হবে।  $\text{Cu}^{++}$  আয়নগুলো ক্যাথোডে পিয়ে ক্যাথোড থেকে দুটি ইলেক্ট্রন প্রাপ্ত করে এবং নিষ্ঠড়িত তামার পরিণত হয়ে ক্যাথোডে জমা হতে থাকবে। অন্যদিকে  $\text{SO}_4^{2-}$  আয়নগুলো অ্যানোড থারা আকৃষ্ট হয়ে সেখানে যাবে এবং সেখানে দুটি ইলেক্ট্রন তাগ করে নিষ্ঠড়িত হয়। নিষ্ঠড়িত  $\text{SO}_4^{2-}$  অ্যানোড থেকে  $\text{Cu}$  প্রাপ্ত করে  $\text{CuSO}_4$  উৎপন্ন করবে। এই  $\text{CuSO}_4$  আবার ছবশে অবিভূত হবে বলে ছবশের ঘনত্ব অপরিবর্তিত থাকবে।

সূতরাং দেখা যাবে, ছবশ থেকে যে পরিমাণ  $\text{Cu}$  ক্যাথোডে জমা হচ্ছে, ঠিক সেই পরিমাণ  $\text{Cu}$  অ্যানোড থেকে ছবশে চলে আসছে। অর্থাৎ মোট ফল হচ্ছে অ্যানোডের তর ঘতাটকু হ্রাস পায় ক্যাথোডের তর

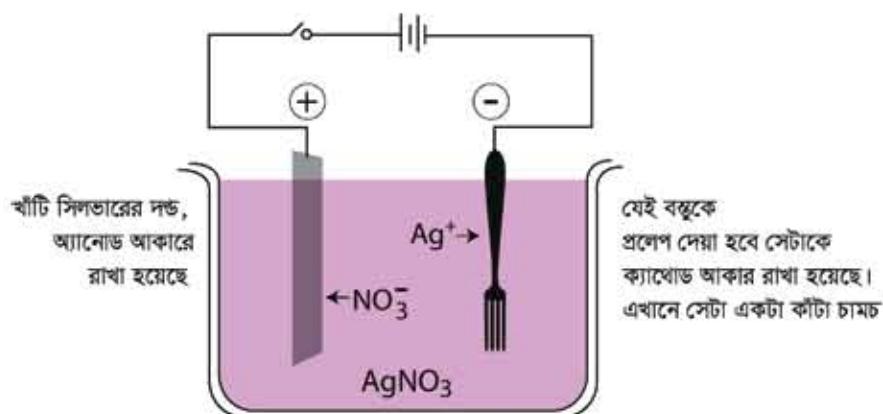
ঠিক ততটুকই বৃদ্ধি পায়, আমাদের মনে হবে অ্যানোড থেকে Cu বুরি ক্যাথোডে জমা হচ্ছে। কিন্তু ইলেক্ট্রোল দুটি তামার বদলে অন্য কোনো নিষ্ক্রিয় খাতুর তৈরি হলে ক্যাথোডে ঠিকই আলের মতো তামার অশুর জমা হবে কিন্তু  $CuSO_4$  অ্যানোড থেকে Cu নিয়ে  $CuSO_4$  হতে পারবে না বলে শুধুমাত্র বাঢ়ি ইলেক্ট্রন ভ্যাগ করে পানির সাথে বিক্রিয়া করে  $H_2SO_4$  উৎপন্ন করবে এবং  $O_2$  গ্যাস বুদ্বুদ আকারে বেরিয়ে আসতে থাকবে। ফলে আমরা দেখব ছবিশের ঘনত্ব ধীরে ধীরে কমে আসছে।

## ১২.২.২ প্রাক্তনিক জীবনে ভড়িৎ বিজ্ঞানের গুরুত্ব:

### ১. ভড়িৎ প্লেটিং (Electroplating)

ভড়িৎ বিজ্ঞান করে একটি খাতুর ওপর অন্য কোনো খাতুর প্লেট দেওয়াকে ভড়িৎ প্লেটিং বলে। সাধারণত কোনো কম দামি খাতু (যেমন তামা, লোহা, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি) দিয়ে তৈরি জিনিসকে জলবায়ু থেকে রক্ষা করার জন্য কিংবা সূন্দর দেখানোর জন্য সেগুলোর ওপর সোনা, রূপা, নিকেল এরকম মূল্যবান খাতুর প্লেট দেওয়া হয়। যে খাতব বস্তুটিকে প্লেট দিতে হবে, সেটি খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে খুঁরে একটি পাত্রে রাখতে হবে। এটি হবে ক্যাথোড ইলেক্ট্রোল। যে খাতুর প্লেট দিতে হবে তাকে অ্যানোড করা হয়। ভড়িৎ ছব হিসেবে যে খাতুর প্লেট দিতে হবে, তার কোনো একটি সবশেষ ছবশ ব্যবহার করা হয়। এখন ব্যাটারি বা পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করে অ্যানোড থেকে ক্যাথোডে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে খাতুর ভড়িৎ বিজ্ঞানের ফলে ক্যাথোডে রাখা খাতব বস্তুর ওপর খাতুর প্লেট পড়ে (চিত্র ১২.০৯)।

উদাহরণ হিসেবে ছবিতে কীভাবে রূপার প্লেট দিতে হবে সেটি দেখানো হয়েছে।



## ২. তড়িৎ মুদ্রণ (Electrotyping)

তড়িৎ প্রলেপের একটি বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করে হরফ, ব্লক মডেল ইত্যাদি তৈরি করাকে তড়িৎ মুদ্রণ বলে। তড়িৎ মুদ্রণের জন্য প্রথমে লেখাটি সাধারণ টাইপে মোমের ওপর ছাপ নেওয়া হয়। এর উপরে কিছু গ্রাফাইট গুঁড়ো ছাড়িয়ে একে তড়িৎ পরিবাহী করা হয়। তারপর কপার সালফেট দ্রবণে এটি ক্যাথোড পাত হিসেবে ডুবানো হয় এবং একটি তামার পাতকে অ্যানোড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এখন দ্রবণের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ চালালে মোমের ছাঁচের ওপর তামার প্রলেপ পড়বে। প্রলেপ খানিকটা পুরু হলে ছাঁচ থেকে ছাড়িয়ে ছাপার কাজে ব্যবহার করা হয়।

## ৩. ধাতু নিষ্কাশন ও শোধন (Extraction and purification of metals)

খনি থেকে কোনো ধাতু সাধারণত বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না। এদের মধ্যে নানা ধাতুর মিশ্রণ থাকে যাকে আকরিক বলা হয়। তড়িৎ বিশেষণের সাহায্যে আকরিক থেকে সহজে ধাতু নিষ্কাশন এবং শোধন করা যায়। যে আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশন করতে হবে, সেটিকে অ্যানোড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যে ধাতু নিষ্কাশন করতে হবে, তার কোনো লবণের দ্রবণকে তড়িৎ দ্রব এবং তার ছোট একটি বিশুদ্ধ পাতকে ক্যাথোড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এখন দ্রবণের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চালনা করলে আকরিক থেকে বিশুদ্ধ ধাতু নিষ্কাশিত হয়ে ক্যাথোডে সঞ্চিত হতে থাকবে।

## ১২.৩ তড়িৎ ক্ষমতা

পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় “কাজ” কথাটির একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে। কাজ এবং শক্তির একক হচ্ছে জুল। শক্তি প্রয়োগ করে কাজ করা যায় এবং কাজ করার হার অর্থাৎ একক সময়ে সম্পন্নকৃত কাজকে ক্ষমতা বলে। কোনো তড়িৎ যন্ত্র প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ তড়িৎ শক্তি ব্যবহার করে কিংবা অন্য শক্তিতে (তাপ, আলো, যান্ত্রিক ইত্যাদি) রূপান্তরিত করে তাকে তড়িৎ ক্ষমতা বলে।

### কিলোওয়াট

কোনো রোধ বা তড়িৎ যন্ত্রের দুই পাশের বিভিন্ন পার্থক্য এক ভোল্ট হলে যদি এর মধ্য দিয়ে এক অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহিত হয়, তবে ঐ যন্ত্রের ক্ষমতা এক ওয়াট।

$$\text{এক ওয়াট} = 1 \text{ ভোল্ট} \times 1 \text{ অ্যাম্পিয়ার}$$

যখন অনেক বেশি তড়িৎ ক্ষমতা ব্যবহৃত হয় তখন সেটাকে কিলোওয়াট বা মেগাওয়াটে প্রকাশ করা সুবিধাজনক।

$$1 \text{ কিলোওয়াট} = 1000 \text{ ওয়াট} \text{ বা } 10^3 \text{ ওয়াট} \text{ এবং}$$

$$1 \text{ মেগা ওয়াট} = 10^6 \text{ ওয়াট}.$$

### কিলোওয়াট-ঘণ্টা

এক ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো তড়িৎ যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে এক ঘণ্টা ধরে তড়িৎ প্রবাহিত হলে যে পরিমাণ তড়িৎ শক্তি অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয় (যেমন বাতি জুললে আলোক শক্তি বা পাখা ঘুরালে যান্ত্রিক শক্তি পাওয়া যায়) সেটি হচ্ছে এক ওয়াট-ঘণ্টা।

$$1 \text{ ওয়াট-ঘণ্টা} = 1 \text{ ওয়াট} \times 1 \text{ ঘণ্টা}$$

অনেক সময় ওয়াট ঘণ্টার পরিবর্তে কিলোওয়াট ঘণ্টাও ব্যবহার করা হয়।

আমরা ইচ্ছা করলে এক কিলোওয়াট ঘণ্টা কতটুকু শক্তি সেটাও বের করতে পারি।

$$\begin{aligned} \text{বা, } 1 \text{ কিলোওয়াট-ঘণ্টা} &= 1000 \text{ ওয়াট} \times 3600 \text{ সেকেন্ড} \\ &= 3,60,0000 \text{ ওয়াট-সেকেন্ড} \\ &= 3,60,0000 \text{ জুল} \end{aligned}$$

অর্থাৎ শক্তির এককে এটি ৩.৬ মেগা জুল।

আন্তর্জাতিকভাবে, তড়িৎ সরবরাহকে কিলোওয়াট-ঘণ্টা এককে পরিমাপ করা হয়। এই একককে বোর্ড অব ট্রেড (BOT) ইউনিট বা সংক্ষপে ইউনিট বলে। আমরা যে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করি তা এই এককেই হিসাব করা হয়।

### তড়িৎ ক্ষমতার হিসাব

আমরা জানি, তড়িৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান প্রতি মাসেই আমাদের বাড়ি বা প্রতিষ্ঠানের তড়িৎ খরচের একটি বিল পাঠায়। এই প্রতিষ্ঠান প্রতি ইউনিটের মূল্য ঠিক করে দেয়। সেই অনুযায়ী আমরা তড়িৎ বা বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে থাকি। অর্থাৎ ব্যয়িত তড়িৎ শক্তির খরচ = ব্যয়িত তড়িৎ শক্তির একক  $\times$  প্রতি এককে খরচ। সব বৈদ্যুতিক যন্ত্রে (লাইট, ফ্যান, কম্পিউটার) কী পরিমাণ বিদ্যুৎ বা তড়িৎ ক্ষমতার প্রয়োজন হয়, সেটি উল্লেখ থাকে। কাজেই সেখান থেকে সহজেই আমরা ব্যয়িত শক্তি বের করতে পারব।

আমরা ব্যয়িত শক্তি ইউনিট বা কিলোওয়াট বের করতে চাই। যদি একটি যন্ত্রের ক্ষমতা P ওয়াট হয় এবং সেটি আমরা t ঘণ্টা ব্যবহার করি তাহলে ব্যয়িত শক্তি E হচ্ছে:

$$E = P \times t \text{ ওয়াট ঘণ্টা}$$

$$E = (P \times t) / 1000 \text{ কিলোওয়াট ঘণ্টা} \text{ (অথবা ইউনিট)}$$

সুতরাং কোনো যন্ত্রের ক্ষমতা জানলে সহজেই তড়িৎ শক্তি ব্যয়ের খরচ বের করতে পারি। যেমন ৬০ ওয়াটের একটি বাল্ব ( $P=60 \text{ W}$ ) প্রতিদিন ৫ ঘণ্টা করে ৩০ দিন ( $t=30 \times 5 \text{ hour}$ ) জুললে কত তড়িৎ শক্তি ব্যয় হবে?

আমরা জানি,

$$\text{ব্যক্তি শক্তি} = (P \times t) / 1000 \text{ ইউনিট}$$

$$= 60 \times (30 \times 5) / 1000 \text{ ইউনিট}$$

$$= 9 \text{ ইউনিট}$$

এখন যদি প্রতি ইউনিটের মূল্য ৮ টাকা হয়, তবে উক্ত পরিমাণ বিস্তৃতের জন্য মোট ব্যয় হবে  
মোট তত্ত্বিক ব্যয় =  $9 \times 8$  টাকা

$$= 72 \text{ টাকা}$$

**220V-60W-এর অর্থ :** তত্ত্বিক আলো পাওয়ার জন্য আমরা যে বাস্তু ব্যবহার করি তার গায়ে দুটি  
সংখ্যার পাশে V এবং W লেখা থাকে। কেবলো বাস্তুর পাশে ২২০V এবং ৬০W লেখা থাকলে বোধ্য  
যায় ২২০ বিভব পার্ষ্যক্য বাস্তুটিতে সংযুক্ত করলে বাস্তুটি সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বলভাবে জ্বলবে এবং তখন  
প্রতি সেকেন্ডে ৬০ জ্বল বৈদ্যুতিক শক্তি আলো ও তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হবে।

**এনার্জি সেভিং বাস্তুর সুবিধা :** এক সময় আমরা সাধারণ বাস্তু ব্যবহার করতাম। এই বাস্তু একটি  
ধাতব কিলামেন্টকে উত্পন্ন করে আলো তৈরি করতে বলে প্রচুর তাপ শক্তির প্রয়োজন হতো। প্রযুক্তির  
কারণে এখন পৃষ্ঠাখালি কাজে ব্যবহার করার জন্য এনার্জি সেভিং বাস্তু সহজ লভ্য হয়ে গেছে। দুই  
ধরনের এনার্জি সেভিং বাস্তু রয়েছে সি.এফ.এল (Compact Fluorescent Lamp) এবং এল.ই.ডি (Light Emitting Diode) বাস্তু। এই এনার্জি সেভিং বাস্তু বিদ্যুৎ ২০-৮০% সংগ্রহ করতে পারে এবং  
সাধারণ বাস্তুর হালনাম এটি ৩ থেকে ২৫ পৃথি বেশি সময় টিকে থাকতে পারে।

একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে প্রতি পরিবারে যদি একটি করে সাধারণ বাস্তুর পরিবর্তে এনার্জি সেভিং  
বাস্তু ব্যবহার করে, তবে যে পরিমাণ শক্তি বাঁচে তা দিয়ে প্রতিবছরে ৩০ লক্ষ পরিবারে তত্ত্বিক সংযোজন  
দেওয়া সম্ভব।

আমরা যদি এনার্জি সেভিং বাস্তু ব্যবহার করে, শক্তির অপচয় কমাতে পারি, তবে জ্বালানির উপরও  
আমাদের নির্ভরতা কমাতে পারি। কারণ, জীবাণু জ্বালানি দিয়ে তত্ত্বিক উৎপাদনের ফলে পরিবেশের  
উপর বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া পড়ে।

এনার্জি সেভিং বাস্তু সাধারণ বাস্তুর চেয়ে বেশি দিন টিকে। কলে কমসংখ্যক বাস্তু পরিষ্কার হয়। যার  
কারণে যথমতা আবর্জনা ব্যবস্থানারও সুবিধা হয় পরিবেশের উপর চাপও কম পড়ে।



একক কাজ

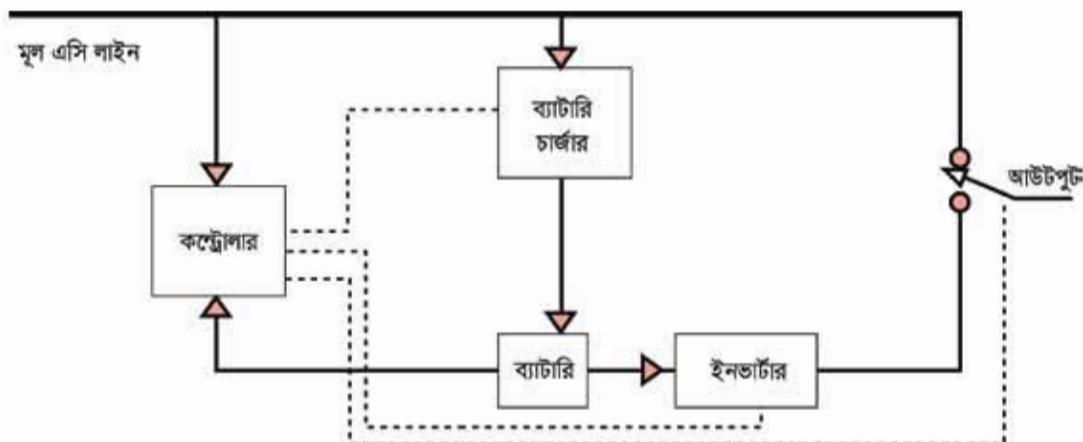
**কাজ:** কেন সবার এনার্জি সেভিং বাস্তু ব্যবহার করা উচিত তার উপর একটি পোস্টার তৈরি করো।

## ১২.৪ তড়িৎ শক্তি ব্যবহার

### ১২.৪.১ আইপিএস এবং ইউপিএস

আমরা আমাদের দৈনন্দিন এবং কর্মজীবনে বিদ্যুতের উপর গুরোপুরি নির্ভরশীল এবং অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সাপ্লাই বন্ধ হলে আমাদের সব কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। অনেক সময়েই তখন আমরা সাময়িকভাবে ডিম্ব বিদ্যুৎ সাপ্লাই ব্যবহার করি। ঘরের লাইট ফ্লানের জন্য এই ডিম্ব বিদ্যুৎ সাপ্লাই চালু করার জন্য দুই এক সেকেন্ড দেরি হলে আমাদের তেমন সমস্যা হয় না কিন্তু কম্পিউটার এবং এ ধরনের যত্নগাতির বেলায় বিদ্যুৎ সাপ্লাই হাঁটাএ করে বন্ধ হয়ে গেলে আমরা বড় ধরনের সমস্যার পক্ষে যাই। কম্পিউটারের তথ্য নষ্ট হতে পারে, এমন কী তার যত্নগাতির ক্ষতি হতে পারে।

মূল বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হওয়ার পর ডিম্ব সাপ্লাই দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ নিরবাচিত রাখার প্রক্রিয়াটি কত মুক্ত করা যায় তার উপর নির্ভর করে আইপিএস এবং ইউপিএস (চিত্র ১২.১০) তৈরি করা হয়েছে।



চিত্র ১২.১০: আইপিএস/ইউপিএস

বাসায় লাইট ফ্লান একটু আলি দেরি করে চালু হলেও ক্ষতি নেই বলে সেখানে আইপিএস ব্যবহার করা হয়। এটি চালু হতে এক দুই সেকেন্ড সময় নেয় এবং সাধারণত বাসার গৃহস্থালি কাজে অর্ধাং লাইট ফ্লান চালু করার কাজে ব্যবহার করা হয়। কাজেই আইপিএস মোটামুটি বেশ অনেকক্ষণ যথেষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ সংরক্ষণ করতে পারে।

জেফটপ কম্পিউটার কিংবা এলবুম সূচ যত্নগাতির বেলায় ইউপিএস ব্যবহার করা হয়। কারণ বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হওয়ার দল মিলিসেকেন্ডের ভেতর ইউপিএস বিদ্যুৎ প্রবাহ নিশ্চিত করতে পারে। কাজেই কম্পিউটারের বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয় না। ইউপিএস এর বিদ্যুৎ প্রবাহ করার ক্ষমতা কম, সাধারণত কর্ম-৫৫, বিজ্ঞান, ৪ম-১০ম শ্রেণি

কম্পিউটারের কাজকর্মগুলো গুছিয়ে নিয়ে, প্রয়োজনীয় ফাইলগুলো সেভ করে, কম্পিউটারটি বন্ধ করে দেওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়।

**১২.১০ ছবিতে আইপিএস কিংবা ইউপিএসের কার্যপদ্ধতি দেখানো হলো।** মূল বিদ্যুৎ প্রবাহ যখন চালু থাকে, তখন আইপিএস কিংবা ইউপিএসের ব্যাটারিগুলো চার্জ করা হতে থাকে। হঠাৎ করে মূল বিদ্যুৎ এবং সুইচটি মূল সাপ্লাই থেকে সরিয়ে ব্যাটারির সার্কিটের সাথে সংযুক্ত করে দেয়। ব্যাটারি থেকে ডিসি সাপ্লাই পাওয়া যায় বলে ইনভার্টর দিয়ে আগে এসি করে নিতে হয়। যখন মূল সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যায় সেই মুহূর্তে কন্ট্রোল সার্কিট ইনভার্টরের সার্কিটও চালু করে দেয়।

## ১২.৪.২ তড়িতের সিস্টেম লস

আমরা জানি, দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত পাওয়ার প্লান্টগুলোতে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করে। এই বিদ্যুৎকে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন এলাকায় পাঠাতে হয়। বিদ্যুৎ বিতরণ করার জন্য প্রথমে বিভিন্ন এলাকার সাব-স্টেশন পাঠানো হয়। সাব-স্টেশন থেকে বিদ্যুৎ বিতরণ-ব্যবস্থা ব্যবহার করে বিদ্যুৎ শক্তিকে একেবারে গ্রাহক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

বিদ্যুৎ শক্তিকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বিতরণ করার জন্য যে পরিবাহী তার ব্যবহার করা হয়, কম হলেও তাদের এক ধরনের রোধ থাকে। একটা রোধের (R) ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ (I) হলে সবসময়েই ( $I^2R$ ) তাপ উৎপন্ন হয় এবং সেটি বিদ্যুৎ শক্তির লস বা ক্ষয়। এই লসকে বলা হয় সিস্টেম লস। তোমরা এর মাঝে জেনে গেছ যে একটা নির্দিষ্ট বিদ্যুৎ শক্তির জন্য যদি উচ্চ ভোল্টেজ বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় তাহলে রোধজনিত তাপশক্তি হিসেবে লস করে যায়। সে জন্যে বিদ্যুৎকেন্দ্রে যে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা হয় সেটিকে স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার দিয়ে উচ্চ ভোল্টেজে রূপান্তর করা হয়। গ্রাহকদের ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ শক্তিকে বিতরণ করার আগে স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করে সেটিকে আবার ব্যবহারযোগ্য ভোল্টেজে নামিয়ে আনা হয়।

## ১২.৪.৩ লোড শেডিং

প্রত্যেকটি বিদ্যুৎকেন্দ্রে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করে এবং সবগুলো বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ হয়। আগেই বলা হয়েছে— এই বিদ্যুৎ স্থানীয় সাব-স্টেশন (বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র)— এর মাধ্যমে গ্রাহকদের মাঝে বিতরণ করা হয়। বিভিন্ন এলাকার চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় গ্রিড বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। কোনো এলাকায় বিদ্যুতের চাহিদা যদি উৎপাদন থেকে বেশি হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সেখানে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে না। তখন বাধ্য হয়ে সাব-স্টেশনগুলো এক এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য অন্য একটি এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়। এই প্রক্রিয়াটার নাম লোড শেডিং। সাব-স্টেশন যখন আবার প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ পায় তখন সেই এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করে।

যদি একনাগাড়ে কয়েক ঘণ্টা লোডশেডিং করতে হয়, তখন গ্রাহক পর্যায়ে লোডশেডিংকে সহনীয় করার জন্য কর্তৃপক্ষ চক্রাকারে বিভিন্ন জায়গা আলাদা আলাদা সময়ে লোডশেডিং করে থাকে।

## ১২.৫ উন্নয়ন কার্যক্রমে শক্তির ব্যবহার

একটি দেশের উন্নয়নের সাথে শক্তির ব্যবহারের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সত্ত্ব কথা বলতে কী, একটি দেশ কতটুকু উন্নত, সেটি বোঝার প্রথম মাপকাঠি হিসেবে শক্তির ব্যবহারকে বিবেচনা করা যেতে পারে।

আমাদের দেশের উন্নয়নের জন্য আমাদের সবার প্রথম শিক্ষার দিকে নজর দেয়া উচিত। এই দেশে বিপুলসংখ্যক ছেলেমেয়ে স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ভালোভাবে চালানোর জন্য সেখানে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হয়। তাদের পড়াশোনা করার জন্য রাতে আলোর দরকার হয় এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা না হলে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উচ্চশিক্ষার বেলায় ল্যাবরেটরি ব্যবহার করতে হয়, কম্পিউটার এবং নেটওয়ার্ককে সচল রাখতে হয় যার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহের কোনো বিকল্প নেই।

আমাদের দেশের অর্থনীতিতে কৃষি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশটি ছোট বলে কৃষি উপযোগী ভূমির পরিমাণ কম এবং সেটি আরো কমে আসছে। এই কৃষিভূমিতে দুই বা ততোধিক ফসল ফলিয়ে আমাদের দেশ খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। এ কারণে শুধু প্রাকৃতিক কৃষির উপর অপেক্ষা না করে কৃষিজমিতে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হয় এবং শক্তির সরবরাহ ছাড়া সেটি কোনোভাবে সম্ভব নয়। পানি সেচের জন্যে পান্থ চালাতে বিদ্যুৎ কিংবা জ্বালানির প্রয়োজন হয়। চাষাবাদের জন্য সারের প্রয়োজন হয় এবং সার কারখানায় বিদ্যুৎ এবং গ্যাস সরবরাহ ছাড়া প্রয়োজনীয় উৎপাদন সম্ভব নয়। জমি চাষ করার জন্য এবং ফসলকে প্রক্রিয়া করার জন্য ট্রান্স্ট্র ব্যবহার করা হয় এবং ট্রান্স্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানির সরবরাহ থাকতে হবে।

কৃষির পর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য শক্তির সরবরাহ প্রয়োজন। সুস্থ দেহে থাকার জন্য একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ দরকার হয়। বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ তৈরি এবং বর্জ্য প্রক্রিয়া করার জন্য শক্তির দরকার হয়। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করার জন্যে শক্তির দরকার হয়। চিকিৎসা সেবার জন্যে হাসপাতালে এক মুহূর্তের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকতে পারে না।

শিক্ষা, কৃষি এবং স্বাস্থ্য ছাড়াও দেশের যোগাযোগব্যবস্থা, শিল্প, কলকারখানা এবং অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য শক্তির দরকার হয়। সে কারণে সঠিক পরিকল্পনা করে দেশে বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে যেন ভবিষ্যতে শক্তির ঘাটতি না হয়। শক্তির অপচয় বন্ধ করতে হবে এবং নতুন কৃপ খনন করে গ্যাস অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে হবে। দেশে বিদ্যুৎ প্রয়োজন অনেক বেড়ে যাওয়ার কারণে নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভাব্য সমাধান হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

## অনুশীলনী



### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি অ্যামিটোরের প্রতীক?

- |           |            |
|-----------|------------|
| (ক) —   — | (খ) —Ⓐ—    |
| (গ) -○-   | (ঘ) —~~~~— |

২. তড়িৎ বিশ্লেষণ একিগাম ধরণের সেগুন্ডা হচ্ছে—

- (ই) সোহার ওপর নিকেলের
- (উ) দ্রুতার ওপর সোহার
- (ঃ) তামার ওপর সোনার

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i এ ii
- (খ) i এ iii
- (গ) ii এ iii
- (ঘ) i, ii এ iii

নিচের অনুজ্ঞাদাতি পক্ষে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

রিপন বকশীগাঁও বাস করে। এখানে আরাই বিদ্যুতের সোডশেডিং হয়। এ কারণে বিজির কাজে অসুবিধা হওয়ায় রিপন বাড়িতে আইলিএস লাগিয়েছে।

৩. বিদ্যুতের বিকল্প হিসেবে আলানো যথাটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য:

- (ই) এটি অপর্যাপ্ত হওয়াহে চলে
- (উ) নিম্ন ভোল্টেজে চার্জিত হয়
- (ঃ) তড়িতের আউটপুটের সাথে সংযুক্ত থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i এ ii
- (খ) i এ iii
- (গ) ii এ iii
- (ঘ) i, ii এ iii

৪. বকশীগাঁওর সমস্যার কারণ:

- (ই) বিদ্যুতের সিস্টেম লস
- (উ) সরবরাহ পদ্ধতির ব্রুটি
- (ঃ) চাহিদার তুলনায় তড়িতের স্বল্প উৎপাদন

নিচের কোনটি সত্ত্বিক?

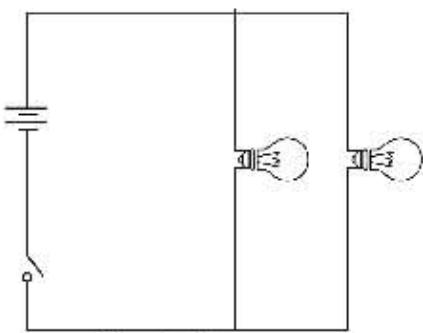
- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| (ক) i ও ii   | (খ) i ও iii     |
| (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |



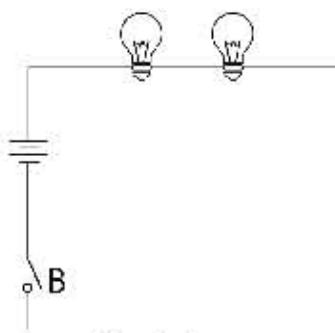
### সূজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের মনসুরা খানম একজন সচেতন গৃহিণী। বাড়ির বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি হিসাব করে ঢালেন। প্রতিদিন পঞ্চে শ বটা করে ১০০ ওয়াটের ৫টি বাতৰ লাইট। ইদানীং তিনি অক্ষ করছেন বিদ্যুৎ বিল বেশি আসছে। এজন্য তিনি বাতৰগুলো পরিবর্তন করে ৫টি ২০ ওয়াটের এনার্জি সেভিং বাতৰ লাগান।

- (ক) তড়িৎ ক্ষমতা কী?
- (খ) একটি বাতৰের পারে ২২০ ভোল্ট-৬০ ওয়াট লেখা আছে এর অর্থ কী?
- (গ) প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের মূল্য ৫ টাকা হলে পূর্বে মনসুরা খানমের কত বিল আসতো?
- (ঘ) পরবর্তীতে বাতৰগুলোর পরিবর্তনে মনসুরা খানমের কী লাভ হলো? যুক্তিসং তোমার মতামত দাও।



চিত্র: ১২.১১



চিত্র: ১২.১২

২. নিচের চিত্র দুটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

- (ক) তড়িৎ বিক্রিয়ণ কাকে বলে?
- (খ) আলোত বলতে কী বুঝায়?
- (গ) 'B' চিহ্নিত অংশে কী অবস্থায় ইলেক্ট্রন প্রবাহিত হয়? ব্যাখ্যা কর।
- (ঘ) চিত্র ১২.১১ ও চিত্র ১২.১২-এর মধ্যে বাড়িতে সংযোগের ক্ষেত্রে কোনটি বেশি সুবিধাজনক? তোমার যৌক্তিক মতামত দাও।

## অঞ্চলিক অধ্যায়

# সবাই কাছাকাছি



যোগাযোগ মানুষের জীবনে খুবই সুবৃহৎপূর্ণ একটি বিষয়। যোগাযোগ মানুষ, দেশ এবং সমাজকে অনেক কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষ নানাভাবে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করে আসছে। এখন আমরা ব্রেডিভ, টেলিভিশন, স্মার্টফোন, টেলিফোন, মোবাইল ফোন বা সেল ফোন ইন্টারনেট, ক্যামেরা ও ই-মেইল ব্যবহার করে যুগুর্তের যাত্রে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যোগাযোগ করতে পারি। যোগাযোগ মানুষের জীবনব্যাপ্তির মান পাল্টে দিয়েছে, তাকে নিয়ে যাচ্ছে উন্নতির চরম শিখরে। সমাজ, দেশ আবৰ বিশ্বে অর্ধপূর্ণ এবং উন্নত জীবন যাগন করতে হলে বিভিন্ন মানুষ, দেশ ও সমাজের সাথে আমাদের যোগাযোগ রক্ষা করতেই হবে। এই অধ্যায়ে আমরা যোগাযোগ, এর নীতিমালা এবং যোগাযোগের বিভিন্ন কৌশল ও প্রযোজনীয় যত্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব।



### এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- তথ্য ও যোগাযোগের মূলনৈতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ব্লকচিন ব্যবহার করে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধারণা বর্ণনা করতে পারব।
- মাইক্রোফোন ও স্পিকারের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারব।
- এনালগ ও ডিজিটাল সংকেতের ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ডিজিটাল সংকেতের সুবিধা বর্ণনা করতে পারব।
- ব্লকচিনের সাহায্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-সংক্রান্ত প্রধান প্রক্রিয়াগুলির (যেশিন) কার্যক্রম ভাসের সুবিধা এবং জীবনে এগুলোর ব্যবহার বর্ণনা করতে পারব।

## ১৩.১ যোগাযোগ (Communication)

### ১৩.১.১ যোগাযোগ কী?

‘যোগাযোগ’ শব্দটির সাথে আমরা সবাই পরিচিত। প্রতিদিন আমরা হাজার রকম যোগাযোগ করছি। যেমন সড়কপথের যোগাযোগ, নৌপথে যোগাযোগ কিংবা আকাশ পথে যোগাযোগ। এসব বলতে বোঝায় গাড়ি, রেল, নৌকা, স্টিমার ও বিমানকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করে এক জায়গা থেকে অন্য যায়গায় যাওয়া বা কোনো মালপত্র পেঁচে দেয়া। আজকে আমরা একটু ভিন্ন ধরনের যোগাযোগের কথা বলব। এর নাম তথ্য যোগাযোগ। ভোর বেলা যখন তোমার ঘড়ির অ্যালার্ম বাজে এবং তুমি ঘুম থেকে উঠ, সেটি হচ্ছে ঘড়ির সাথে তোমার যোগাযোগ। টেলিভিশনে বা রেডিওতে খবর শুনছ বা কোনো অনুষ্ঠান দেখছ বা শুনছ—এটাও এক ধরণের যোগাযোগ। টেলিফোনে কোনো ট্যাক্সি ক্যাবকে তোমার বাসায় ডাকলে সেটিও যোগাযোগ। এই যে লেখাটা তুমি পড়ছ বা ক্লাসে তোমার শিক্ষকের কথা শুনছ, তাঁকে প্রশ্ন করছ, তাঁর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছ— এগুলো সবই কোনো না কোনো ধরনের যোগাযোগ। সুতরাং যোগাযোগ হলো, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বা এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে বা এক যন্ত্র থেকে অন্য যন্ত্রে কথা-বার্তা, চিন্তাভাবনা বা তথ্যের আদান-প্রদান বা বিনিময় করা।

### ১৩.১.২ যোগাযোগের মৌলিক নীতিমালা

- যোগাযোগের জন্য অবশ্যই প্রেরক এবং গ্রাহক থাকতে হবে। প্রেরক আর গ্রাহক ছাড়া যোগাযোগ হয় না। যোগাযোগের জন্য প্রেরক ও গ্রাহকের পরস্পরের প্রতি আস্থা থাকবে, থাকবে আগ্রহ এবং গ্রহণযোগ্যতা।
- যোগাযোগের ভাষা হতে হবে সহজ, সরল, সুস্পষ্ট এবং সম্পূর্ণ। যোগাযোগ আসলে একটি আর্ট বা কলা। এর তথ্য বা সংকেত বা ভাষা হবে প্রেরক ও গ্রাহকের নিকট বোধগম্য এবং সুস্পষ্ট।
- সঠিক তথ্য পাঠাতে হবে সঠিক ব্যক্তির কাছে।
- যোগাযোগের ভাষা, কথা বা বার্তার মধ্যে অবশ্যই সৌজন্যবোধ থাকবে।

### ১৩.১.৩ যোগাযোগের প্রক্রিয়া ও এর ধাপ

যোগাযোগের জন্য প্রেরক বার্তাকে কোনো এক ধরনের সংকেতে রূপ দিয়ে সেটি কোনো মাধ্যম দিয়ে প্রেরণ করে। গ্রাহক সংকেতরূপী বার্তা গ্রহণ করে এর অর্থ উদ্ধার করে এবং প্রয়োজন হলে সাড়া প্রদান করে বা উত্তর দেয় (চিত্র ১৩.০১)। এ সাড়া বা উত্তরকে পাঠানো হয় প্রেরকের কাছে, এ কাজটিকে বলা হয় ফিডব্যাক। এভাবে যোগাযোগ প্রক্রিয়া চলতে থাকে।



চিত্র ১০.০১: যোগাযোগ প্রক্রিয়া

যেকোনো ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগব্যবস্থায় থাকে একটি প্রেরক যন্ত্র, একটি যোগাযোগমাধ্যম এবং একটি গ্রাহকযন্ত্র। অধিকাংশ যোগাযোগব্যবস্থার মেসেজ বা বার্তাটি তৈরি করে কোনো ব্যক্তি। পরে তা প্রেরকযন্ত্রের সাহায্যে যোগাযোগ মাধ্যম দিয়ে প্রেরণ করা হয়। গ্রাহকযন্ত্র এ বার্তা গ্রহণ করে অপর কোনো ব্যক্তির কাছে পৌছে দেয়। এগুলোই হলো যোগাযোগের খাল (চিত্র ১০.০২)।



চিত্র ১০.০২: ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগ ব্যবহারের মূল উপাদান বা খাল

### ১০.১.৪ যোগাযোগের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

যোগাযোগ হলো তথ্য আদান-প্রদানের মূল প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে মানুষ তার চিন্তা, ধারণা, অনুভব একে অন্যের কাছে প্রকাশ করে বা পৌছে দেয়। মানব সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষ একে অন্যের সাথে নানাভাবে যোগাযোগ করছে। এখন আমরা যুক্তুর্ভূত মধ্যে টেলিফোন, মোবাইল ফোন, ই-টেলিমেটে, ক্যাম্রা ও ই-মেইলের মাধ্যমে পৃথিবীর এক প্রাচ থেকে অন্য প্রাচে যোগাযোগ করতে পারি।

কোনো সমস্যা সমাধান বা সকলকের উন্নতি নির্ভর করে সার্বক এবং কার্যকর যোগাযোগের উপর। পঞ্জালেখা, গবেষণা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা, রাজনীতি, অর্থনীতি, কৃষকনীতি, পরিবহন ব্যবস্থাগুলি, অপরাধী ধরা, অপরাধ দমন ইত্যাদি সব কাজ সার্বক্ষণিক ও স্মৃত সকাদন করা হাল উন্নত যোগাযোগের মাধ্যমে। তথ্য বিনিয়ন, কোনো পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন, কোনো যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ, মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি পথের বিজ্ঞাপন প্রদান করে মানুষকে প্রভাবিত করা ইত্যাদি সব কাজই যোগাযোগের ধারা করা সহজ। ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগ প্রযুক্তি আমাদের দিন দিন পৌছে দিচ্ছে উন্নতির শিখরে। প্রতিদিনই এগিয়ে বাজি আয়োজন। তাই এ যুগকে বলা হয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগ।

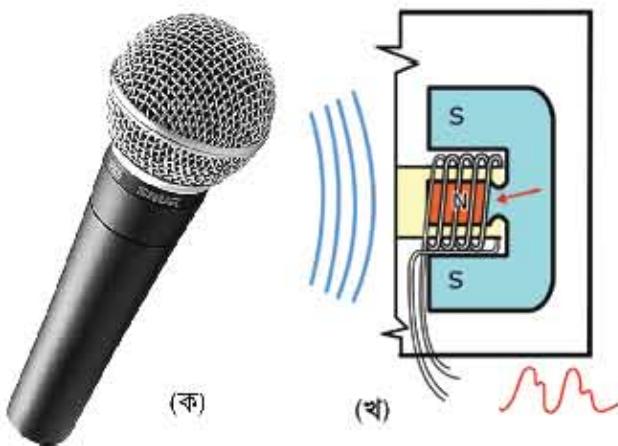
## ১৩.২ মাইক্রোফোন ও স্পিকার

### ১৩.২.১ মাইক্রোফোন

কোনো সভা বা অনুষ্ঠানে বক্তৃরা যে ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলেন তাকে মাইক্রোফোন বলে। মাইক্রোফোন বক্তৃর কষ্টস্বরকে বিন্দুৎ সংকেত বা তত্ত্বৎ সংকেতে রূপান্তর করে। সেই বিন্দুৎ সংকেতকে এমপ্লিফায়ার দিয়ে বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং স্পিকারে পাঠানো হয়। স্পিকার সেটাকে শব্দে রূপান্তর করে এবং প্রোত্তোরা লাউড স্পিকারে জোরে শুনতে পান। তোমরা শখন মোবাইল ফোন ব্যবহার করো তখন বাইরে থেকে দেখা না গেলেও তোমরা আসলে মোবাইল ফোনের মাইক্রোফোনে কথা বল এবং স্পিকারে শুনতে পাও।

#### মাইক্রোফোনের কার্যক্রম

দেশবিদ্যন কিংবা বিশেষ কাজে ব্যবহারের জন্য নানা ধরনের মাইক্রোফোন রয়েছে, ১৩.০৩ চিত্রে সেরকম সাধারণ একটি মাইক্রোফোনের পঠন দেখানো হচ্ছে। এই মাইক্রোফোনের সামনে ধাতুর একটি পাতলা পাত বা ডারাঙ্গাম থাকে। ডারাঙ্গামের সাথে একটা চলকুণ্ডলী (Coil) লাগানো থাকে যেটি জৰিতে দেখানো উপায়ে একটা চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের শেক্ষণ নাড়া চড়া করতে পারে। বখন কেউ এই মাইক্রোফোনের সামনে কথা বলে তখন ডারাঙ্গামটি শব্দ তরঙ্গের কলনের সাথে কৰ্ণপত্তে থাকে।



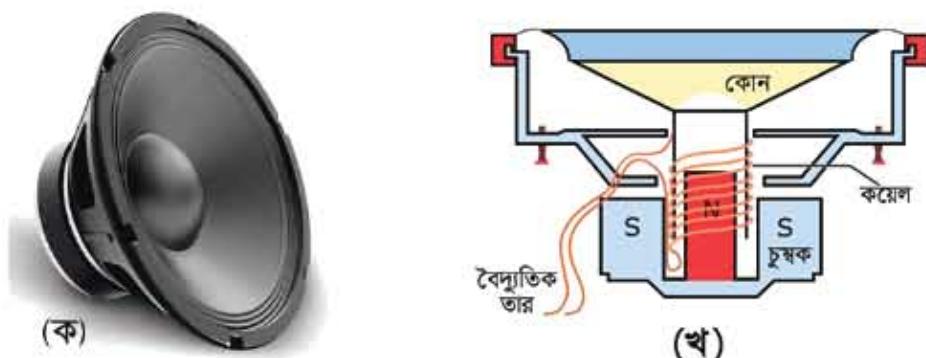
চিত্র ১৩.০৩: (ক) মাইক্রোফোন এবং আর (খ) পঠন

ডারাঙ্গামের সাথে লাগানো চলকুণ্ডলীটিও চৌম্বক ক্ষেত্রে সামনে পিছনে নড়তে থাকে। চৌম্বক ক্ষেত্রে একটি চলকুণ্ডলী নাড়াচড়া করলে দেখানে একটি বিন্দুৎ শক্তির আবেশ হয়, কাজেই মাইক্রোফোনটি শব্দ-শক্তিকে বিন্দুৎ শক্তিতে রূপান্তর করে একটি বৈদ্যুতিক সিগন্যাল পাঠায়।

শব্দের এই বৈদ্যুতিক সিগন্যাল বা সিগন্যাল শব্দের নির্খুত উপস্থাপন হলেও এর মান খুবই কম থাকে তাই তাকে ব্যবহার করার জন্য এমপ্লিফায়ার বাড়িয়ে নিতে হয়। তারপর সেটি শুধু স্পিকারে নয়, টেলিফোন লাইন, রেডিও সম্পর্কে বা রেকর্ডিংয়ে ব্যবহার করা যায়।

### ১৩.২.২ স্পিকার

স্পিকার মাইক্রোফোনের ঠিক বিগৱীত কাজটি করে অর্থাৎ বিদ্যুৎ শক্তিকে শব্দের রূপান্তর করে। ১৩.০৪ চিত্রে একটি স্পিকারের গঠন সেখানে হলো, মাইক্রোফোনের ডার্বান্টগুম্বের বদলে স্পিকারে



চিত্র ১৩.০৪: (ক) স্পিকার এবং তার (খ) গঠন

চলকুজলী বা Coil টি কাগজ বা হালকা ধাতুর তৈরি একটি কোন (Cone) বা শঙ্খুর সাথে লাগানো থাকে। যখন শব্দ থেকে তৈরি বৈদ্যুতিক সিগনালকে এয়াপ্লিফায়ার দিয়ে বিবর্ধিত করে স্পিকারে পাঠানো হয়, তখন কাগজ বা হালকা ধাতুর তৈরি কোনটি সামনে পিছনে কল্পিত হয়ে ঘৰাঘৰ শব্দ তৈরি করে।

### ১৩.৩ এনালগ ও ডিজিটাল সংকেত

সংকেত হলো কোনো চিহ্ন বা কার্য বা শব্দ যেটি নির্দিষ্ট তথ্য বহন করে। তথ্য বহন করার অন্য নানা ধরনের মাধ্যমে নানা ধরনের সংকেত ব্যবহার করা সম্ভব। এই মাধ্যমে আমরা শুধু বৈদ্যুতিক বা ভড়িভড়ি সংকেতের মাঝে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

সংকেত প্রেরণের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে ইলেক্ট্রিকাল সংকেতকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: এনালগ ও ডিজিটাল।

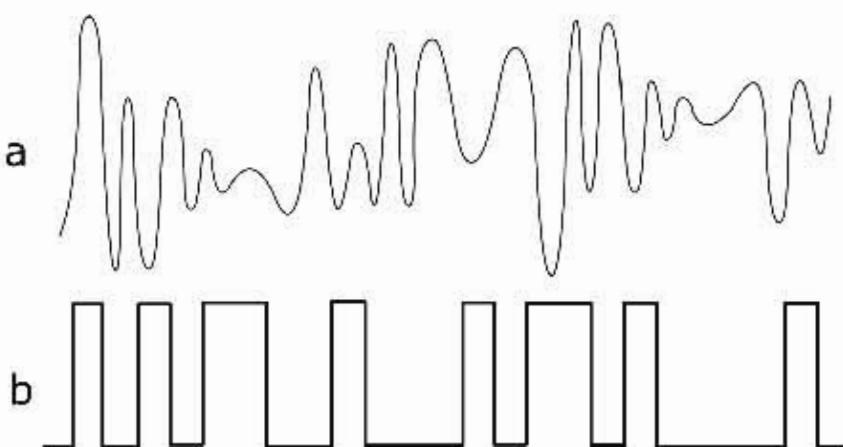
#### এনালগ সংকেত

আমাদের চারপাশে প্রতিমুছুর্তে যা ঘটেছে, বেমন শব্দ, আলো চাপ ডাপমাটা বা অন্য কিছু সেগুলোকে আমরা কেন্দ্রে এক ধরনের তথ্য বা উপাত্ত হিসেবে প্রকাশ করি। তাদের মান নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। আমাদের নানা কাজে সেই মানের প্রয়োজন হতে পারে, তাই সেই মান আমরা সংরক্ষণ করি, বিশ্লেষণ করি কিংবা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় প্রেরণ করি। উপাত্ত প্রক্রিয়া করার অন্য আমরা ইলেক্ট্রনিক্স ব্যবহার করতে পারি। নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তিত হতে থাকা এই তথ্য বা উপাত্তকে

বৈদ্যুতিক সিগন্যালে পরিবর্তন করা সম্ভব এবং এই ধরনের সংকেত বা সিগন্যালকে আমরা বলি এনালগ সংকেত বা এনালগ সিগন্যাল। এই এনালগ সিগন্যালকে যদি সরাসরি কোনো এক ধরনের ইলেক্ট্রনিক্স দিয়ে আমরা প্রক্রিয়া করি, তাহলে সেটাকে বলা হয় এনালগ ইলেক্ট্রনিক্স।

### ডিজিটাল সংকেত

নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তিত হতে থাকা তথ্য বা উপায়ের এই সিগন্যালকে সম্পূর্ণ অন্যভাবে প্রক্রিয়া করা সম্ভব। সেটি করার জন্য একটু পর পর তার মানটি কত বের করে কোনো এক ধরনের সংখ্যার প্রকাশ করে নিতে হয়। তারপর ধারাবাহিকভাবে এই সংখ্যাটির মানকে সংরক্ষণ করতে হয়। যখন সংকেতের মানকে সংখ্যায় বা ডিজিটে পরিবর্তন করে নেয়া হয়, তখন তাকে আমরা বলি ডিজিটাল সংকেত। আমরা তখন ডিজিটাল সংকেতের এই সংখ্যাগুলো আমদের প্রয়োজনমতো ইলেক্ট্রনিক্স ব্যবহার করে প্রক্রিয়া করতে পারব। যখন আবার সেটিকে তার মূল এনালগ সিগন্যালে পরিবর্তন করতে হয়, তখন ধারাবাহিকভাবে সংরক্ষিত মানের সমান বৈদ্যুতিক সিগন্যাল তৈরি করে নিতে হয়। আমরা দৈনন্দিন



চিত্র ১৩.০৫: (a) এনালগ এবং (b) ডিজিটাল সিগন্যাল

জীবনে মূল ডিজিক দশমিক (Decimal) সংখ্যা ব্যবহার করি। কিন্তু ইলেক্ট্রনিক্সে সংখ্যা প্রকাশ করা হয় বাইনারি সংখ্যা দিয়ে, কারণ তাহলে খুব সহজেই কোনো একটি নির্দিষ্ট ভোল্টেজকে ১ এবং শূন্য ভোল্টেজকে ০ ধরে প্রক্রিয়া করা যায়। এই ধরনের ইলেক্ট্রনিক্সকে ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক্স (চিত্র ১৩.০৫) বলা হয়।

ইলেক্ট্রনিক্সের সবচেয়ে বড় অবদান কল্পিউটার এবং কল্পিউটারে সকল তথ্যের আদান-প্রদান বা তথ্য প্রক্রিয়া হয় ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক্স দিয়ে। ইন্টারনেট বা কল্পিউটার নেটওর্কারেও ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক্স ব্যবহার করে তথ্য আদান প্রদান করা হয়। শব্দ ছবি বা ভিডিও ইত্যাদি সিগন্যালগুলো শুরু হয় এনালগ সিগন্যাল হিসেবে এবং ব্যবহারও হয় এনালগ সিগন্যাল হিসেবে কিন্তু সেগুলো ডিজিটাল সিগন্যাল

হিসেবে সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকরণ বা প্রেরণ করা হয়। এনামগ সিগন্যালে খুব সহজেই নয়েজ (Noise) প্রবেশ করে সিগন্যালের গুণগত মান নষ্ট করতে পারে। একবার সেটি ডিজিটাল সিগন্যালে পরিবর্তিত করে নিলে সেখালে Noise এতো সহজে অনুপ্রবেশ করতে পারে না। কাজেই সিগন্যালের গুণগত মান অবিকৃত থাকে।

ডিজিটাল সিগন্যাল প্রক্রিয়া করার জন্য বিশেষ ধরণের আইসি তৈরি করা হয়। এই আইসিগুলো ধীরে ধীরে অনেক কমতাপালী হয়ে উঠছে। অর্থাৎ অনেক কম সময়ে নির্ভুলভাবে অনেক বেশি পরিমাণ ডিজিটাল সিগন্যালে প্রক্রিয়া করতে পারে। কাজেই বজাই দিন যাচ্ছে, ডিজিটাল প্রক্রিয়া করার বিষয়টি ততই সহজ হয়ে যাচ্ছে এবং এটি বলা বাস্তুত নয় যে আমাদের চারপাশের অপর্যট্টি একটি ডিজিটাল জগতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

## ১৩.৪ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এখন খুবই পরিচিত একটি বিষয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কাজ থেকে শুরু করে পেশাগত জীবনের অনেক শুরুতপূর্ণ কাজ এখন আমরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজেই করে ফেলতে পারি। ফোনবিল্প শক্তকে টেলিফোন ও টেলিথ্রাফের বিকাশ উভয়েরে মানুষের যোগাযোগে আর কমতো অনেক দূর এগিয়ে পিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীতে যোগাযোগের বিপ্লব এলেছে রেডিও, টেলিভিশন, সেলফোন বা ফ্ল্যান্স। সাম্প্রতিক কালে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট।

### ১৩.৪.১ রেডিও

রেডিও (চিত্র ১৩.০৬) বিনোদন ও যোগাযোগের একটি শুরুতপূর্ণ মাধ্যম। রেডিওতে আমরা অবরের পাশাপাশি বিনোদনের জন্য গান বাজনা এবনকি পথের বিজ্ঞাপনও শুনতে পারি। সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনী তথ্য আদানপ্রদানের জন্য নিজের রেডিও ব্যবহার করে। মোবাইল বা সেলুলার টেলিফোন যোগাযোগের রেডিও প্রযুক্তি ব্যবহার হয়।



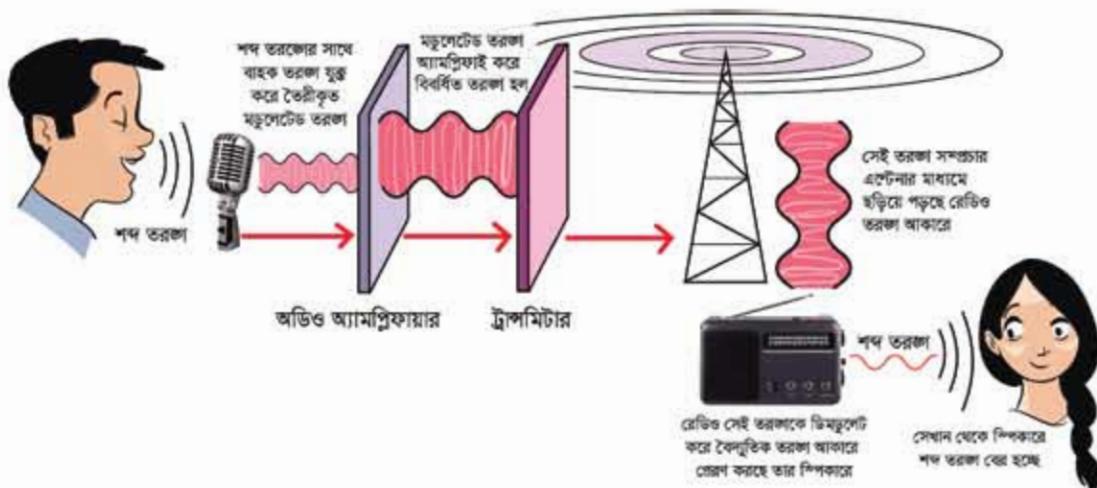
কোনো রেডিও সম্পাদন সেটিলের স্টেডিওতে যখন কেউ মাইক্রোফোনে কথা বলে, তখন সেই শব্দ বিন্দুৎ তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়। আমরা ২০ Hz থেকে ২০,০০০ Hz কম্পাঙ্ক পর্যন্ত শুনতে পারি কাজেই শব্দ থেকে বিন্দুৎ তরঙ্গে রূপান্তরিত সিগন্যালটিও এই কম্পাঙ্কের হয়। এটিকে পাঠানোর জন্য উচ্চ কম্পাঙ্কের তরঙ্গের সাথে ঝুঁট

চিত্র ১৩.০৬: রেডিও সেট

করা হয়। এই উচ্চ কম্পাক্ষের তরঙ্গকে বাহক তরঙ্গ বলে।

বাহক তরঙ্গের সাথে যুক্ত করার এই প্রক্রিয়াটিকে মডুলেশন বলা হয়। এই মডুলেটেড তরঙ্গ এমপ্লিফায়ার দিয়ে বিবর্ধন করা হয় এবং এন্টেনার সাহায্যে চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই বিন্দুৎ চৌম্বকীর তরঙ্গ বা রেডিও তরঙ্গ সৃষ্টি তরঙ্গ হিসেবে কিংবা বায়ুমণ্ডলের আয়োনোস্পিয়ারে অতিক্রমিত হয়ে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে পারে (চিত্র ১৩.০৭)। আহক ঘনের জ্ঞেয় বে এন্টেনা থাকে সেটি এই রেডিও তরঙ্গকে বিন্দুৎ তরঙ্গে রূপান্তর করে নেয়। এরপর আয়োজনীয় ইলেক্ট্রনিক্স ব্যবহার করে বাহক তরঙ্গ থেকে আলাদা করে নেওয়া হয়— এই প্রক্রিয়াটিকে ডিমডুলেশন বলা হয়। ডিমডুলেটেড বৈদ্যুতিক সিগন্যালটিকে এমপ্লিফায়ার দিয়ে বিবর্ধন করে শোনার জন্য স্পিকারে পাঠানো হয়।

রেডিও তরঙ্গ হিসেবে পাঠানোর জন্য রেডিও সম্প্রচার স্টেশনগুলো আলাদা আলাদা কম্পাক্ষ ব্যবহার করে। আহক ঘনে নির্মিত কোনো স্টেশন শুনতে হলে সেই কম্পাক্ষের সিগন্যালে টিউন করে নেয়— তাই আলাদা আলাদা রেডিও স্টেশন সবাই নিজের অনুষ্ঠান প্রচার করতে পারে এবং প্রোত্তরা নিজের পছন্দের রেডিও স্টেশনের অনুষ্ঠান শুনতে পারে।



চিত্র ১৩.০৭: রেডিও সম্প্রচার ও প্রোত্তরা

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আহক তরঙ্গের উচ্চতা বা কিন্তুর বাড়িয়ে বা কমিয়ে (Amplitude Modulation) সিগন্যালটি সংযুক্ত করা হয় বলে এই পদ্ধতিটির নাম AM রেডিও। যদি কিন্তুর সমান রেখে কম্পাক্ষ পরিবর্তন করে মডুলেট করা হতো (Frequency Modulation) তাহলে এই পদ্ধতিকে বলা হতো FM রেডিও।



চিত্র ১৩.০৮: আগের এবং বর্তমান টেলিভিশন সেট

### ১৩.৪.২ টেলিভিশন

তোমরা সবাই টেলিভিশন দেখেছ এবং আল যে টেলিভিশন এমন একটি যন্ত্র, যেখানে দূরবর্তী কোনো টেলিভিশন সম্পর্কের স্টেশন থেকে শব্দের সাথে সাথে ভিডিও বা চলমান ছবিও (চিত্র ১৩.০৮) দেখতে পাই। ১৯২৬ সালে জন লজি বেনার্ড প্রথম টেলিভিশনের মাধ্যমে ভিডিও বা চলমান ছবি প্রাপ্তিরেছিলেন। তাঁর পদ্ধতিটি ছিল একটি যান্ত্রিক পদ্ধতি, পরে ইলেক্ট্রনিক্স ব্যবহার করে ছবি প্রাপ্তানোর পদ্ধতিটি আরো আধুনিক পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে।

রেডিও ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার কীভাবে কাজ করে সেটি যদি তোমরা বুঝে থাকো তাহলে টেলিভিশন কীভাবে কাজ করে সেটিও সহজেই বুঝতে পারবে। টেলিভিশনে শব্দ এবং ছবি আলাদা সিগন্যাল হিসেবে প্রাপ্তানো হয়। শব্দ প্রাপ্তানোর এবং ছবির ঘন্টে সেটি শুরু করে শোনার বিষয়টি ইতোমধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে আমরা ছবি প্রাপ্তানোর বিষয়টি ব্যাখ্যা করি।

চলমান ছবি বা ভিডিও প্রাপ্তাতে হলে প্রতি সেকেন্ডে ২৫টি স্থিরচিত্র প্রাপ্তাতে হয় এবং আমাদের চোখে



চিত্র ১৩.০৯: টেলিভিশন সম্পর্কের প্রক্রিয়া

তখন সেগুলোকে আলাদা আলাদা স্থিরচিত্র মনে না হলে একটি চলমান ছবি বলে মনে হয়।

টেলিভিশনে গ্রাফিন ছবি পাঠানোর জন্য টেলিভিশন ক্যামেরা প্রতিটি ছবিকে লাল-সবুজ ও নীল (RGB) এই তিনটি মৌলিক রংহে তাপ করে তিনটি আলাদা ছবি স্থলে নেয়। টেলিভিশন ক্যামেরার ভেতরে আলো CCD (Charge Coupled Device) ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক সিগন্যালে রূপান্তরিত করা হয়। এই বৈদ্যুতিক সিগন্যালকে উচ্চ কম্পাক্ষের বাহক তরঙ্গ ব্যবহার করে একটোর ভেতর দিয়ে পাঠানো হয় (চিত্র ১৩.০৯)।

বাহক যজ্ঞ বা টেলিভিশন সেট তার একটো দিয়ে উচ্চ কম্পাক্ষের বাহক তরঙ্গকে প্রাপ্ত করে এবং রেকটিফারার দিয়ে বাহক তরঙ্গকে সরিয়ে মূল ছবিকে সিগন্যালকে বের করে নেয়। আগে এই সিগন্যাল থেকে তিন রংহের তিনটি ছবিকে ক্যাষোড রে টিউব নামের পিকচার টিউবে তার ক্লিনে ইলেক্ট্রন গান দিয়ে প্রক্ষেপণ করা হতো। এখন পিকচার টিউব থায় উচ্চ সিয়েছে এবং এলইডি (Light Emitting Diode) টেলিভিশন তার জ্বালাণী দখল করেছে। এখানে ইলেক্ট্রন গান দিয়ে ক্লিনে ছবি তৈরি না করে লাল সবুজ ও নীল রংহের সূত্র সূত্র এলইডিতে বিদ্যুৎ প্রবাহ করে ছবি তৈরি করা হয়। এলইডি টেলিভিশনে ছবির ঔজ্জ্বল্য অনেক বেশি এবং শুধুগত মানও অনেক ভালো।

এখানে উক্তখন যে একটোর সাহায্যে টেলিভিশনের সিগন্যাল পাঠানো ছাড়াও কো-অ্যান্ড্রয়েল ক্যাবল দিয়েও সিগন্যাল পাঠানো হয়। এই ধরনের টিভির সম্পর্কের ক্যাবল টিভি নামে পরিচিত। গাছড়াও স্যাটেলাইট টিভি নামে এক ধরণের টিভি অনুষ্ঠানের সম্পর্কের ক্যাবল হয়, এটি মহাকাশে পাঠানো উপগ্রহ বা স্যাটেলাইট থেকে সরাসরি পৃথিবীতে পাঠানো হয়।

### ১৩.৪.৩ টেলিফোন ও ফ্লার্স:

টেলিফোন (চিত্র ১৩.১০) হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত একটি যোগাযোগ মাধ্যম। আমরা এখন এই টেলিফোন ব্যবহার করে পৃথিবীর যেকোনো পান্তে একজন মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে পারি।

#### স্মার্টফোন

১৮৭৫ সালে আলেকজান্ডার থাইম বেল টেলিফোন আবিষ্কার করেছিলেন, নানা ধরনের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সেটি বর্তমান আধুনিক টেলিফোনে রূপ নিয়েছে, কিন্তু তার মূল কাজ করার প্রক্রিয়াটি ঠিক এখনো আপের মতোই আছে।



চিত্র ১৩.১০: স্মার্টফোন এবং মোবাইল বা সেলুলার ফোন।

তোমরা সবাই টেলিফোন দেখেছ এবং ব্যবহার করেছ। টেলিফোন পাঁচটি উপাংশ থাকে। (ক) সুইচ: যেটি মূল টেলিফোন নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত অথবা বিচ্ছিন্ন করে (খ) রিংগার: যেটি শব্দ করে জানিয়ে দেয় যে কেউ একজন যোগাযোগ করেছে (গ) কি-প্যাড: যেটি ব্যবহার করে একজন অন্য একজনকে ডায়াল করতে পারে (ঘ) মাইক্রোফোন: যেটি আমাদের কণ্ঠস্বরকে বৈদ্যুতিক সিগন্যালে পরিবর্তন করে (ঙ) স্পিকার: যেটি বিদ্যুতিক সিগন্যালকে শব্দে রূপান্তর করে শোনার ব্যবস্থা করে দেয়।

প্রত্যেকটি টেলিফোনই তামার তার দিয়ে আঞ্চলিক অফিসের সাথে যুক্ত থাকে। আমরা যখন কথা বলার জন্য কোনো নম্বরে ডায়াল করি, তখন আঞ্চলিক অফিসে সেই তথ্যটি পৌঁছে যায়। সেখানে একটি সুইচ বোর্ড থাকে যেটি নির্দিষ্ট গ্রাহকের টেলিফোনের সাথে যুক্ত করে দেয়। যদি আমরা অনেক দূরে কিংবা ভিন্ন কোনো দেশে একজনের সাথে কথা বলতে চাই, তাহলে সুইচবোর্ড সেভাবে আমাদেরকে নির্দিষ্ট নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করে দেয়।

প্রযুক্তির উন্নতি হওয়ার আগে যখন পৃথিবীর দুই প্রান্তের দুইজন মানুষ টেলিফোনে কথা বলত, তখন কথাবার্তা পাঠানোর জন্য তাদের টেলিফোনকে তামার তার দিয়ে সংযুক্ত করে দিতে হতো, সে কারণে পুরো প্রক্রিয়াটা ছিল অনেক খরচ সাপেক্ষ। আধুনিক যোগাযোগব্যবস্থায় পুরোটা অনেক সহজ হয়ে গেছে, এখন একটি অপটিক্যাল ফাইবারে একই সাথে আক্ষরিক অর্থে লক্ষ লক্ষ মানুষের কথাবার্তা পাঠানো সম্ভব তাই টেলিফোন কথাবার্তা বলার বিষয়টি অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে।

### মোবাইল টেলিফোন

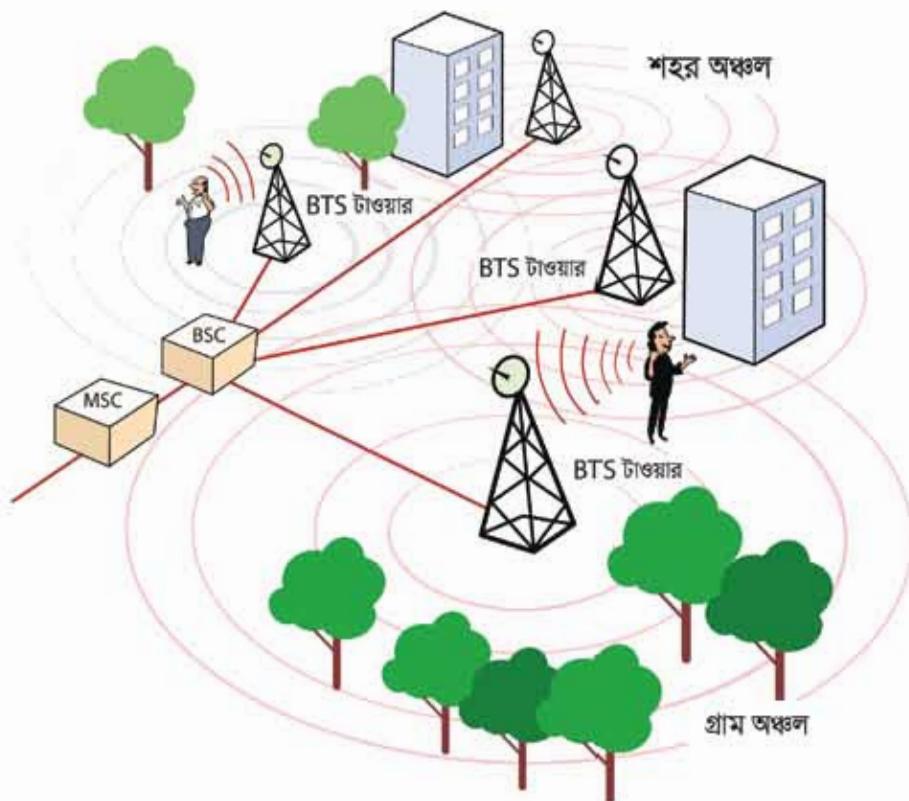
ল্যান্ডফোন যেহেতু তামার তার দিয়ে যুক্ত তাই এটাকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় রাখতে হয় এবং টেলিফোন করার জন্য কিংবা টেলিফোন ধরার জন্য সেই জায়গাটিতে আসতে হয়। মোবাইল টেলিফোন আমাদের সেই বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি দিয়েছে এবং এই টেলিফোনটি আমরা আমাদের সাথে রেখে যেকোনো জায়গায় যেতে পারি এবং যতক্ষণ আমরা নেটওয়ার্কের ভেতরে আছি, যেকোনো নম্বরে ফোন করতে পারি, কথা বলতে কিংবা এস.এম.এস বিনিময় করতে পারি। সে কারণে মোবাইল ফোন এখন সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় যোগাযোগমাধ্যম।

তোমরা সবাই দেখেছ মোবাইল টেলিফোন কোনো তার দিয়ে যুক্ত নয়—যার অর্থ এটি ওয়ারলেস বা রেডিও তরঙ্গ দিয়ে যোগাযোগ করে থাকে। কাজেই প্রত্যেকটি মোবাইল টেলিফোন আসলে একই সাথে একটি রেডিও ট্রান্সমিটার এবং রেডিও রিসিভার।

ল্যান্ড টেলিফোনে যে যে যান্ত্রিক উপাংশ থাকা প্রয়োজন, মোবাইল টেলিফোনেও সেগুলো কোনো না কোনো রূপে থাকতে হয়, তার সাথে আরো কয়েকটি বাড়তি বিষয় হয়। সেগুলো হচ্ছে (a) ব্যাটারি: এই ব্যাটারি দিয়ে মোবাইল ফোনের জন্যে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা হয় (b) স্ক্রিন: এই স্ক্রিনটিতে মোবাইল ফোনের যোগাযোগের তথ্য দেখানো হয় (c) সিম কার্ড: (SIM: Subscriber Identity Module) যেখানে ব্যবহারকারীর তথ্যগুলো সংরক্ষণ করা হয় (d) রেডিও ট্রান্সমিটার ও রিসিভার: ফর্মা-৩৭, বিজ্ঞান, ৯ম-১০ম শ্রেণি

এগুলো দিয়ে মোবাইল ফোন তার নেটওয়ার্কের সাথে যোগাযোগ করে (e) ইলেক্ট্রনিক সার্কিট; এটি মোবাইল টেলিফোনের জিলি কার্ডকে ঠিকভাবে সক্ষম করতে সাহায্য করে।

মোবাইল টেলিফোনে যোগাযোগ করার কাজটি সকল কর্তৃর জন্য পুরো এলাকাকে অনেকগুলো সেল (Cell) ভাগ করে নেয় (চিত্র ১৩.১১) এজন্য মোবাইল টেলিফোনকে অনেক সময় সেলকোনও বলা হয়। এই সেলগুলো প্রদোজনের উপর নির্ভর করে ১ কিলোমিটার থেকে ২০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। প্রসেক্ট সেল একটি করে বেস স্টেশন (BTS: Base Transceiver Station) থাকে। একটি এলাকার অনেকগুলো বেস স্টেশন একটি বেস স্টেশন কন্ট্রোলারের (BSC: Base Station



চিত্র ১৩.১১: মোবাইল টেলিফোনের নেটওয়ার্ক

Controller) মাধ্যমের মোবাইল সুইচিং কেন্দ্রের (MSC: Mobile Service Switching) সাথে যোগাযোগ করে। মোবাইল সুইচিং কেন্দ্রটি মোবাইল নেটওয়ার্কের একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এখানে প্রেরক আৱ বাহকের মধ্যে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হয়।

কেউ (প্রেরক) যখন তার মোবাইল ফোনে অন্য কোনো নামাবে (বাহকের) ডায়াল করে, তখন প্রেরকের মোবাইল কোনটি সে যে সেলে আছে তার বেস স্টেশনের (BTS) সাথে যুক্ত হয়। সেই বেস স্টেশন থেকে

তার কলটি বেস স্টেশন কন্ট্রোলারের (BSC) ভেতর দিয়ে মোবাইল সুইচিং কেন্দ্রে (MSC) পৌঁছায়। মোবাইল সুইচিং কেন্দ্র তার কাছে রাখা তথ্যভাণ্ডার থেকে গ্রাহক সেই মুহূর্তে কোন সেলের ভেতর আছে সেটি খুঁজে বের করে। তারপর প্রেরকের কলটি গ্রাহকের সেই সেলের বেস স্টেশনের সাথে যুক্ত করে দেয় এবং সেই বেস স্টেশন থেকে গ্রাহকের মোবাইল ফোনে রিং দেওয়া হয়।

মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ককে সচল রাখার জন্য অনেক ধরনের প্রযুক্তিগত উভাবন করা হয়েছে। আমাদের মোবাইল টেলিফোন থেকে খুবই কম শক্তির সিগন্যাল ব্যবহার করে কাছাকাছি বেস স্টেশনের সাথে যুক্ত করা হয় এবং আমরা যদি একটি সেল থেকে অন্য সেলে চলে যাই, এই নেটওয়ার্ক সেটি জানতে পারে এবং এক বেস স্টেশন থেকে অন্য বেস স্টেশনে যোগাযোগটি স্থানান্তর করে দেয়। একটি ঘনবসতিপূর্ণ শহরে যদি অনেক মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী থাকে, তাহলে ছোট ছোট অনেকগুলো সেল দিয়ে তাদের ফোন করার সুযোগ দেওয়া হয়। আবার গ্রামের কম জনবসতি এলাকায় একটি অনেক বড় সেল দিয়ে পুরো এলাকাতে নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত রাখা হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে শুধু কথা বলার জন্য টেলিফোন উভাবন করা হয়েছিল। মোবাইল টেলিফোনে কথার সাথে সাথে এস.এম.এস. পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন স্মার্টফোন নামে নতুন যে ফোনগুলো এসেছে, সেগুলো কষ্টস্বরের (Voice) সাথে সাথে সব ধরনের তথ্য (Data) পাঠাতে পারে। কাজেই সেগুলো সরাসরি ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত হতে পারে এবং আগে যে কাজগুলো কম্পিউটার বা ল্যাপটপ ছাড়া করা সম্ভব ছিল না, সেগুলো এই স্মার্ট ফোন দিয়ে করা সম্ভব হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, এই স্মার্টফোনগুলোর জন্য নানা ধরনের অ্যাপ (Application) তৈরি হচ্ছে, সেগুলো দিয়ে স্মার্টফোন আমাদের আরো নানা ধরনের কাজ করতে সাহায্য করে।

স্মার্টফোন একদিকে আমাদের জীবনযাত্রার একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে, একই সাথে খুব সহজে স্মার্টফোনে ইন্টারনেটে যুক্ত হওয়ার সুযোগের কারণে নতুন প্রজন্ম সামাজিক নেটওয়ার্ক-জাতীয় বিষয়গুলোতে অনেক অপ্রয়োজনীয় সময় ব্যয় করছে, সেটি এই মুহূর্তে শুধু আমাদের দেশের নয় সারা পৃথিবীর একটি বড় সমস্যা।

### ফ্যাক্স

ফ্যাক্স শব্দটি হচ্ছে ফ্যাক্সিমিল (Facsimile)-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। ফ্যাক্স করা বলতে আমরা বোঝাই কোনো ডকুমেন্টকে কপি করে টেলিফোন লাইন ব্যবহার করে তৎক্ষণিকভাবে সরাসরি পাঠিয়ে দেওয়া। বর্তমান যুগে কম্পিউটার, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট এই ফ্যাক্স প্রযুক্তিকে অনেক পিছনে ফেলে এসেছে, তারপরও প্রায় সব প্রতিষ্ঠানই এখনো এই প্রাচীন কিন্তু নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে যাচ্ছে। শুনে অবাক লাগতে পারে, ফ্যাক্স পাঠানো হয় টেলিফোন লাইন দিয়ে কিন্তু প্রথম ফ্যাক্সের ধারণাটি পেটেন্ট করা হয় টেলিফোন আবিষ্কারেরও ত্রিশ বছর আগে।



চিত্র ১৩.১২: ফ্যাক্স মেশিন এবং তার কর্মপরিণতি

ফ্যাক্স মেশিন একই সাথে একটা ডকুমেন্টের কপি পাঠাতে পারে এবং এই মেশিনে পাঠানো একটি কপিকে প্রিন্ট করে দিতে পারে। ফ্যাক্স মেশিনে যখন একটি ডকুমেন্ট দেওয়া হয়, তখন সেখানে উজ্জ্বল আঙো ফেলা হয়, ডকুমেন্টের কালো অংশ থেকে কম এবং সাদা অংশ থেকে বেশি আঙো প্রতিফলিত হয়, সেই তথ্যগুলো সহজে করে ডকুমেন্টটির কপিকে বৈদ্যুতিক সিগনচালে রূপান্তর করে টেলিফোন লাইন দিয়ে পাঠানো হয়।

টেলিফোন লাইনের অন্য প্রাচ্যে ফ্যাক্স মেশিনটি তার কাছে পাঠানো ডকুমেন্টের কপিটিকে একটি প্রিন্টারে প্রিন্ট করে দেয় (চিত্র ১৩.১২)। ফ্যাক্স মেশিন এখনো একটি নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তি, এটি একটি ডকুমেন্টের কপিটিকে শুধু সাদা এবং কালো হিসেবে পাঠানো হয় বলে সিদ্ধিত ডকুমেন্টের জন্য ঠিক ধাকলেও ব্রাউন কিংবা ফটোগ্রাফের জন্য উপযুক্ত নয়। এছাড়া বেশিরভাগ ফ্যাক্স মেশিনে ধার্মাল পেপার ব্যবহার করা হয় বলে ডকুমেন্টটি খুব তাঙ্গাতাঙ্গি অস্পষ্ট হয়ে যেতে পারে।

### ১৩.৪.৪ রেডিও, টেলিভিশন ও মোবাইল ফোন থেকে সৃষ্টি সমস্যা

রেডিও এবং টেলিভিশন থেকে যে সমস্যা দেখা দিতে পারে, সেগুলো প্রধানত পদ্ধতিগতভাবে সমস্যা। অনেকেই খুব হাই-তেলিয়ুমে রেডিও টেলিভিশন ব্যবহার করে। এতে নিজের কানের যেমন সমস্যা হতে পারে, তেমনি আশ্চর্যে আরা থাকে, তাদেরও সমস্যা হতে পারে। যারা কানে হেডফোন লাগিয়ে সারাক্ষণ খুব বেশি শব্দে রেডিও বা মিডিজিক শোনে, তারা মাথাব্যথা, কানে কম শোনা— এরকম আশ্চর্য সমস্যায় পড়তে পারে।

এছাড়া যারা দিনে তিন-চার ঘণ্টা থেকে বেশি টিভি দেখে, তাদের মাথাব্যথা, নিম্নাহিনতা, চোখে ব্যথা বা চেঁথের দৃষ্টি কমে যাওয়ার মতো সমস্যায় পড়তে পারে। এ প্রতিক্রিয়াগুলো শিশুদের জন্য অনেক বেশি

হয়ে থাকে। তাদের বিকাশমান কোষের যথোপযুক্ত বিকাশে টেলিভিশন থেকে নিঃসূত বিকিরণ ঘটে ক্ষতি করতে পারে।

থেকেনো স্বাস্থ্য সমস্যা প্রতিকারের চেরে প্রতিরোধ করা সহজ। তাই শক্তদূর্বল বা অন্যান্য সমস্যা থেকে রক্ত পেতে উচ্চ শব্দে ব্রেডিও বা টিভি না চালানো, একনাগাড়ে অধিক সময় ব্রেডিও এবং টিভি না শোনা বা না দেখা আসো। শুধু তাই নয়, টেলিভিশন থেকে নিঃসূত বিকিরণ থেকে রক্ত পেতে টেলিভিশন থেকে নিরাগদ দূরত্বে বসে টিভি দেখতে হবে।

পৃথিবীতে অটিস্টিক শিশুর সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে এবং এর পিছনে শিশুদের অল্প বয়সে টেলিভিশন দেখার একটি বোগসূজ থাকতে পারে। সেজন্য অটিস্টিক শিশুদের পরিবারে ডাক্তারের টেলিভিশন না দেখার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

এরপর আসা যাক, মোবাইল ফোন থেকে সৃষ্টি স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে। মোবাইল ফোন হলো একটি নিম্ন ক্ষমতার ব্রেডিও ডিভাইস, বা একটি ছোট এন্টেনার সাহায্যে একই সাথে ব্রেডিও কম্পাক্ষে বিকিরণ, প্রেরণ এবং শুন্ধণ করে। মোবাইল ফোন ব্যবহারের সময় এ এন্টেনাটি ব্যবহারকারীর মাথার খুব কাছে থাকে। এ নিয়ে পৃথিবীর মানুষ এখন উদ্বিগ্ন যে এই মাইক্রো তরঙ্গের ক্রমাগত ব্যবহার হয়েতো মাথার ক্যালার রোগের সৃষ্টি করতে পারে। এসব সমস্যার সৃষ্টি সম্পর্কে খুব বেশি শংগাল নেই। তবু অত্যধিক বিকিরণ থেকে রক্ত পেতে সবাইকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। প্রাণবন্ধকদের মধ্যে বিকিরণের প্রভাব খুব বেশি না পড়লেও শিশুদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ, এ বিকিরণ শিশুদের মস্তিষ্কের কোর বিকাশে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

গাঢ়ি চালানোর সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার না করার জন্য সবাইকে সাবধান করা হয়েছে। গাঢ়ি চালানোর সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার করলে দুর্ব্যবহার আশঙ্কা অনেক বেড়ে যাব।

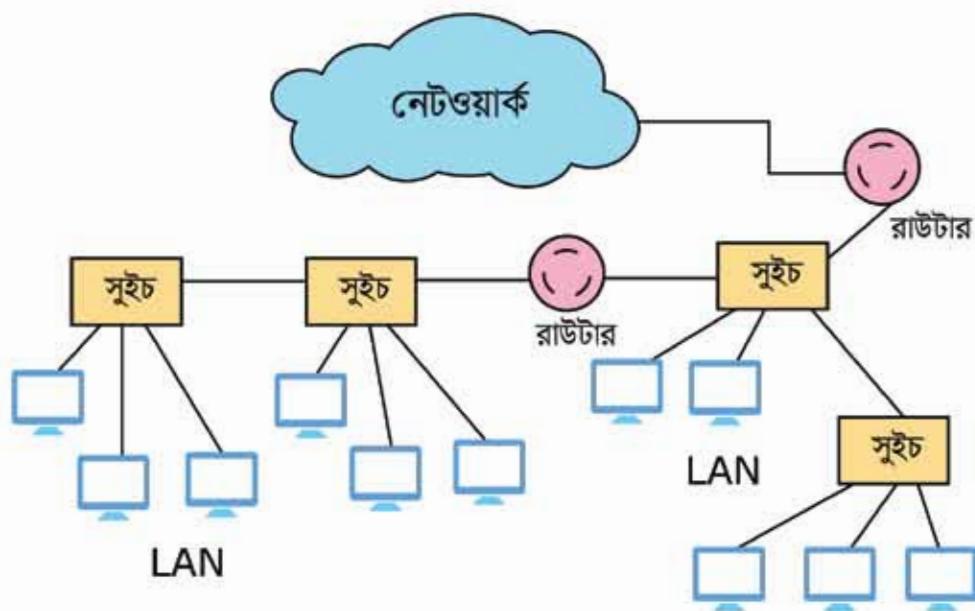
আধুনিক শব্দসূচি আমাদের জীবনকে অনেক সহজ করে ভূলেছে। কিন্তু আমরা বলি এই শব্দসূচি সুবিবেচকের যতো ব্যবহার না করে অবিবেচকের মতো অনিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহার করি, তাহলে খুব সহজেই আমাদের জীবনে আরো বড় নতুন নতুন অটিস্টিক শব্দসূচি হতে পারে।



চিত্র ১৩.১০: একটি কম্পিউটারের যুগ অল্পগুলো

## ১৩.৫ কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং

### ১৩.৫.১ কম্পিউটার



চিত্র ১৩.১৪: নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত একাধিক LAN

আমরা সবাই কম্পিউটার ব্যবহার করছে। যারা একটু ইতস্তত করছ, তাদেরকে বলা যেতে পারে কম্পিউটার বলতেই বাদের চোখের সামনে একটা মনিটর, একটা সিপিইউ বা ফি-বোর্ড কিংবা ল্যাপটপের ছবি জেসে থটে—শুধু সেগুলোই কম্পিউটার নয়। আমরা যে মোবাইল টেলিফোন ব্যবহার করি, তার মাঝেও হেট ছেট এবং পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটার রয়েছে।

আধুনিক জগতে কম্পিউটারের পুরুষত্ব বিশাল। তার কারণ এটি অন্য দশটি যজ্ঞের মতো নয়। অন্য যেকোনো বজ্ঞ বা টুল (Tool) সব সময়েই একটা নির্দিষ্ট কাজ করতে পারে। একটা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে বালি বাজানো সত্ত্ব নয় আবার বাঁশি দিয়ে স্ক্রু খোলা যায় না। কিন্তু কম্পিউটারের অমন একটা বজ্ঞ, যেটা দিয়ে সম্ভাব্য সকল কাজ করা যায় এবং কী কী করা যাবে তার সীমাবদ্ধ নাও একটি এবং সেটি হচ্ছে মানুষের সৃজনশীলতা। একজন মানুষ যত সৃজনশীল সে কম্পিউটারের তত বেশি ব্যবহার বের করতে পারবো তাই কম্পিউটার দিয়ে আমরা যে রকম হিসাব (compute) করতে পারি, তিক সে রকম গান শুনতে পারি, ছবি আঁকতে পারি, তথ্য আদান-প্রদান করতে পারি, বজ্ঞাপত্তি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, এমনকি যারা ঘানু অপরাধী, তারা এটা ব্যবহার করে মানুষকে প্রতারণা পর্যবেক্ষণ করে ফেলে।

**কম্পিউটারের গঠন:** যারা কম্পিউটারের ভেতর উঁকি দিয়েছ, নিঃসন্দেহে তাদের মনে হতে পারে এটি খুবই জটিল একটি যন্ত্র, কিন্তু তোমরা জেনে খুশি হবে, এর কাজ করার মূল বিষয়টি খুবই সহজ। একটা কম্পিউটারের মূল অংশ দুটি: একটি হচ্ছে মাইক্রোপ্রসেসর, অন্যটি হচ্ছে মেমোরি। (চিত্র ১৩.১৩) মেমোরির ভেতর নানা ধরনের নির্দেশ বা ইনস্ট্রাকশন জমা করা থাকে, সেগুলো কিছু ডিজিটাল সিগন্যাল ছাড়া আর কিছুই নয়। মেমোরি থেকে এই ইনস্ট্রাকশনগুলো মাইক্রোপ্রসেসরে পাঠানো হয়, মাইক্রোপ্রসেসর কোন ইনস্ট্রাকশনের জন্য কী করতে হবে, সেটি জানে এবং তার জন্য বরাদ্দকৃত কাজটি শেষ করে এবং যখন প্রয়োজন হয়, তখন ফলাফলটি আবার মেমোরিতে জমা করে দেয়। এভাবে মেমোরিতে রাখা সবগুলো ইনস্ট্রাকশন শেষ করা হলে আমরা বলে থাকি এটা তার প্রোগ্রাম পুরোটা শেষ করেছে। কম্পিউটারের তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য শুধু মেমোরির ওপর নির্ভর করা হয় না, পাকাপাকিভাবে সেখানে তথ্য রাখার ব্যবস্থা করা হয়, সেটাকে আমরা হার্ড ড্রাইভ বলে থাকি।

কম্পিউটারে একটা প্রোগ্রাম চালাতে হলে তার সাথে বাইরে থেকে যোগাযোগ করতে হয়। যেসব যন্ত্রপাতি (কি-বোর্ড কিংবা মাউস) দিয়ে কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করা হয়, তাদেরকে বলা হয় ইনপুট ডিভাইস। কম্পিউটার আবার তার তথ্য ব্যবহারকারীর কাছে দিতে পারে, যেসব যন্ত্রপাতি দিয়ে কম্পিউটার বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ করে (মনিটর, প্রিন্টার), তাকে বলা হয় আউটপুট ডিভাইস।

তবে আজকাল কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে নেটওয়ার্কিং। প্রত্যেকটা কম্পিউটারেই নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড (NIC: Network Interfacing Card), থাকে যেটি দিয়ে সেটি একটি নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত থাকে এবং কম্পিউটার সেটি দিয়ে তথ্য প্রেরণ করে আবার তথ্যকে প্রেরণ করে।

## ১৩.৫.২ ইন্টারনেট ও ই-মেইল

### ইন্টারনেট

তোমরা এর মাঝে অনেকবার কম্পিউটার কী এবং সেটা কীভাবে কাজ করে, সেটা পড়ে এসেছ। একটা প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটারগুলোকে সাধারণত একটা নেটওয়ার্ক দিয়ে পরস্পরের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয় যেন একটা কম্পিউটার অন্য একটা কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করতে পারে, আবার প্রয়োজন হলে একটা কম্পিউটার অন্য কম্পিউটারের Resource ব্যবহার করতে পারে। এই ধরনের নেটওয়ার্ককে LAN (Local Area Network) বলা হয়ে থাকে। আজকাল LAN তৈরি করার জন্য একটা সুইচের সাথে অনেকগুলো কম্পিউটার যুক্ত করে সুইচগুলোকে পরস্পরের সাথে যুক্ত করে দিতে হয়। যখন একটা কম্পিউটারকে অন্য কম্পিউটারের যোগাযোগ করতে হয়, সেটি যদি তার নিজের সুইচের সাথে যুক্ত কম্পিউটারের মাঝে পেয়ে যায় তাহলে তার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে। সেখানে না পেলে অন্য সুইচে খোঁজ করতে থাকে।

একটি প্রতিষ্ঠানের একটি LAN-কে অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের অন্য একটি LAN-এর সাথে যুক্ত করার জন্য রাউটার (Router) ব্যবহার করা হয়। (চিত্র ১৩.১৪) বিভিন্ন নেটওয়ার্ক (Network)-এর নিজেদের মাঝে Inter Connection করে Networking-কে Internet বলা হয়। এই মুহূর্তে পৃথিবীর প্রায় নয় বিলিয়ন কম্পিউটার বা অন্য কোনো ডিভাইস ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত আছে এবং সংখ্যাটি প্রতিদিনই বাঢ়ছে।

কাজেই ইন্টারনেট হচ্ছে নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক, যেখানে প্রাইভেট, পাবলিক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারি-বেসরকারি স্থানীয় বা বৈশ্বিক সব ধরনের নেটওয়ার্কগুলো জড়িত হয়েছে। এই বিশাল নেটওয়ার্ক তৈরি করার জন্য নানা ধরনের ইলেক্ট্রনিক, ওয়ারলেস এবং ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে।

ইন্টারনেট ব্যবহার করে এখন নানা ধরনের তথ্য আদান-প্রদান করা যায় এবং নানা ধরণের সেবা দেয়া যায়। উদাহরণ দেওয়ার জন্যে বলা যেতে পারে, ইন্টারনেটে রয়েছে নানা ধরনের ওয়েব সাইট, ইলেক্ট্রনিক মেইল, টেলিফোন এবং ভিডিও যোগাযোগ, তথ্য আদান-প্রদান, সামাজিক নেটওয়ার্ক, বিনোদন, শিক্ষা এবং গবেষণা টুল এবং নানা ধরনের ইন্টারনেটভিত্তিক সেবা। সারা পৃথিবীর মানুষ এখন ইন্টারনেটের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে এবং আমাদের জীবনধারার একটি বৈপ্লাবিক পরিবর্তন এসেছে। এখানে উল্লেখ করা যায়, ইন্টারনেটে পৃথিবীর সকল মানুষেরই যোগাযোগ করার সমান সুযোগ আছে বলে নানা ধরনের প্রচার এবং অপপ্রচারে ব্যবহার এবং অপব্যবহার সুযোগ তৈরি হয়েছে। নানা ধরনের ক্ষতিকর সফটওয়্যার তৈরি করে নেটওয়ার্কের ক্ষতি করা, বিদ্যেষ এবং হিংসা ছড়ানো আপত্তিকর তথ্য উপস্থাপন ছাড়াও অপরাধীরাও তাদের কার্যক্রমে গোপনে ইন্টারনেট ব্যবহার করে।

কিছু নেতৃত্বাচক বিষয় থাকার পরও ইন্টারনেট এই সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান এবং এই প্রথমবার পৃথিবীর সকল মানুষ সমানভাবে একটি প্রযুক্তিতে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে। ভবিষ্যতের পৃথিবীতে এই নেটওয়ার্কের কী প্রভাব পড়বে, তা দেখার জন্য সারা পৃথিবীর মানুষ আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে।

## ই-মেইল

ইলেক্ট্রনিক মেইলের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে ই-মেইল এবং ই-মেইল বলতে আমরা বোঝাই কম্পিউটার, ট্যাবলেট, স্মার্টফোন ইত্যাদি ডিজিটাল ডিভাইস দিয়ে নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে একজন বা অনেকজনের সাথে ডিজিটাল তথ্য বিনিয়য় করা। ১৯৭১ সালে প্রথম ই-মেইল পাঠানো হয় এবং মাত্র ২৫ বছরের ভেতরে পোস্ট অফিস ব্যবহার করে পাঠানো চিঠি থেকে ই-মেইলের সংখ্যা বেশি হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে ই-মেইলের ব্যবহার ছাড়া আমরা একটি দিনও কল্পনা করতে পারি না।

ই-মেইল পাঠানোর জন্য প্রথমেই যিনি পাঠাবেন এবং যিনি পাবেন দুজনেরই ই-মেইলের ঠিকানার দরকার হয়। তোমরা সবই ই-মেইল ঠিকানার সাথে পরিচিত এবং সবাই লক্ষ্য করেছ ই-মেইল ঠিকানাটি @ বর্ণটি দিয়ে ভাগ করা হয়েছে। যদি abc@def.com একটি ই-মেইল ঠিকানা হয়ে থাকে তাহলে @

এর পরের অংশটুকুকে হচ্ছে ডোমেইন নেইম, যেটা দিয়ে বোবানো হয় ব্যবহারকারী কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। প্রথম অংশটুকু হচ্ছে ব্যবহারকারীর কোনো ধরনের পরিচয়।

কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট বা অন্য কোনো ডিজিটাল ডিভাইস দিয়ে ই-মেইল পাঠাতে হলে সবসময়েই একটি ই-মেইল সার্ভারের দরকার হয়। এই ই-মেইল সার্ভার ব্যবহারকারীদের ই-মেইল সংরক্ষণ করে এবং নেটওর্কের মাধ্যমে অন্য ব্যবহারকারীদের সাথে ই-মেইল বিনিময় করে। ই-মেইল বিনিময় করার আরেকটি এবং বর্তমানে অনেক জনপ্রিয় উপায় হচ্ছে ইন্টারনেটের দেওয়া ই-মেইল সার্ভিস। তাদের মাঝে রয়েছে Gmail, Yahoo, Hotmail ইত্যাদি ই-মেইলের সেবা শুধু মে বিশাখাল্যে দেওয়া হয় তা নয়, ব্যবহারকারীর ই-মেইল সংরক্ষণ করার দায়িত্বও গ্রহণ করে থাকে।

ই-মেইল পাঠানোর জন্য সবসময় প্রেরণকারী এবং গ্রাহকের ই-মেইল ঠিকানা লিখতে হয়। একটি ই-মেইল একাধিক গ্রাহকের কাছে পাঠানো যায়। আরোজনে ই-মেইলকে অন্য একজনকে “কার্বন কপি” হিসেবে (CC) পাঠানো যায়। ই-মেইলের শুরুতে বিষয় হিসেবে ই-মেইলের বক্তব্যটির একটি শিরোনাম লেখা যায়। শুধু তা-ই নয় ই-মেইলের বিষয়কস্তু লেখার পাশাপাশি তার সাথে অন্য কোনো ভক্তমেট, ছবি সংযুক্ত করে পাঠিয়ে দেওয়া যায়। আমরা ই-মেইল ছাড়া এখন একটি মুকুর্তও কল্পনা করতে পারি না।

ই-মেইল, ইন্টারনেট কিংবা ইন্টারনেটভিত্তিক নানা ধরনের সামাজিক নেটওর্ক আমাদের জন্য একটি নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে। একই সাথে এই প্রযুক্তিগুলোর অপ্রযুবহার আমাদের জীবনে খুব সহজেই বড় ধরনের বিপর্যয় নিয়ে আসতে পারে। কাজেই এটা বলা বাস্তু, অত্যন্ত শক্তিশালী এই প্রযুক্তিগুলো আমাদের দায়িত্বশীলের মতো ব্যবহার করতে হবে। উদ্দেশ্য, এই বিষয়টি শুধু তথ্যপ্রযুক্তি নয়, সকল প্রযুক্তির জন্য সজি।



### একক কাজ

**কাজ:** ই-মেইল, ইন্টারনেট কিংবা সামাজিক নেটওর্কে দায়িত্বশীল হিসেবে কী কী ব্যবহার করা সহজ তার তালিকা তৈরি কর।

## ১৩.৫.৩ কম্পিউটার থ্রুন্তি ও স্বাস্থ্য সমস্যা

### স্বাস্থ্য সমস্যা

তথ্য ও থ্রুন্তির অনিয়ন্ত্রিত ব্যাপক ব্যবহারের কলে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। যারা ঝোঁজই মাঝাতিরিত সময় ধরে কম্পিউটারের কোনো গেইম খেলে, তারা হাতের আঙুলের মাধ্যমে সুই ফুটনোর

মতো ব্যথা অনুভব করা এমনকি আঙ্গুলের মাথায় ফোস্কা পড়া, আঙ্গুল ফুলে যাওয়ার মতো স্বাস্থ্য সমস্যায় পড়ে যাওয়ার উদাহরণও আছে।

যারা অধিকক্ষণ ধরে কম্পিউটার নিয়ে কাজ করে, কম্পিউটারের কি-বোর্ড ও মাউসের দীর্ঘক্ষণ ও দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে তাদের হাতের রগ, ম্লায়, কজি, বাহুতে, কাঁধ ও ঘাড়ে অতিরিক্ত টান (stress) বা চাপ পড়ে। কাজেই কাজের ফাঁকে যথেষ্ট বিশ্রাম না নিলে এসব অঙ্গ ব্যথাসহ নানা রকম সমস্যার সূচী হতে পারে।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রাম না নিয়ে দীর্ঘদিন ও দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটারের কাজ করলে চোখে নানা রকম সমস্যার সূচী হয়, একে বলা হয় কম্পিউটার ভিশন সিনড্রোম। এই সিনড্রোমের মধ্যে রয়েছে চোখ জ্বালাপোড়া করা, চোখ শুক্র হয়ে যাওয়া, চোখ চুলকানো, চোখ লাল হয়ে যাওয়া এবং চোখের পানি শুকিয়ে যাওয়া।

**প্রতিকারের উপায়:** কম্পিউটার ব্যবহার থেকে সৃষ্টি স্বাস্থ্য সমস্যার চিকিৎসার চাইতে এই সমস্যা সৃষ্টি হতে না দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। আমাদের সতর্ক হতে হবে যেন এসব স্বাস্থ্য সমস্যার সূচী না হয়। হাত, হাতের কজি, আঙ্গুল, কাঁধ ও ঘাড়ের সৃষ্টি বিভিন্ন সমস্যার জন্য যা করতে হবে তা হলো :

১. কম্পিউটারের কাজ করার সময় সঠিকভবে বসতে হবে এবং সোজা সামনে তাকাতে হবে।
২. সঠিক পদ্ধতিতে টাইপ করতে হবে। টাইপ করার সময় হাতে যেন কোনো কিছুর ওপর রাখা না থাকে এবং হাত ও আঙ্গুল যেন সোজা থাকে।
৩. কাজের ফাঁকে ফাঁকে অন্তত আধা ঘণ্টা পর পর ৫ মিনিটের জন্য হলেও বিশ্রাম নিতে হবে এবং কাঁধ ও ঘাড়কে রিল্যাক্স করতে দিতে হবে।

কম্পিউটার ভিশন সিনড্রোমের কারণে সৃষ্টি চোখের সমস্যা প্রতিরোধ যেসব সতর্কতা অবলম্বন করবে তা হলো:

১. তোমার কম্পিউটারের পর্দাটি যেন অবশ্যই তোমার চোখ থেকে ৫০-৬০ সেন্টিমিটার দূরে থাকে।
২. কোনো ডকুমেন্ট হোল্ডার ব্যবহার করলে তা অবশ্যই পর্দার কাছাকাছি রাখবে।
৩. মাথার ওপরকার বাতির আলো এবং টেবিলের বাতির আলো এমনভাবে কমিয়ে দিতে হবে তা যেন তোমার চোখে বা কম্পিউটারে পর্দায় না পড়ে।
৪. প্রতি ১০ মিনিট পর পর কিছুক্ষণের জন্য দূরের কোনো কিছুর দিকে তাকাবে, এতে চোখ আরামবোধ করবে।

এই সহজ কিছু নিয়ম মেনে চললেই কম্পিউটার ব্যবহারের কারনে শারীরিক সমস্যাগুলোকে এড়িয়ে চলা সম্ভব হবে।

### আনসিক সমস্যা

কম্পিউটার ব্যবহারে যেসব শারীরিক সমস্যা হতে পারে, তার চাইতে অনেক গুরুতর সমস্যা হচ্ছে মানসিক সমস্যা। ইন্টারনেট সহজলভ্য হওয়ার কারণে আজকাল প্রায় সবাই এটি ব্যবহার করতে পারে। ইন্টারনেটে একদিকে বেশি তথ্য ও জ্ঞানের আঙীর উপর করে রাখা আছে, ঠিক সেরকম সামাজিক নেটওয়ার্ক জাতীয় সার্ভিসের মাধ্যমে অসচেতন ব্যবহারকারীদের মোহৃষ্ট করে রাখার ব্যবস্থাও করে রাখা আছে। যন্মেবিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখাতে শুরু করেছেন যে মানুষ যেভাবে যাদকে আসত্ত হয়ে যায়, সেভাবে অতিরিক্ত কম্পিউটার ব্যবহার, ইন্টারনেট বা সামাজিক নেটওয়ার্কে আসত্ত হয়ে যেতে পারে। অতিরিক্ত কম্পিউটার পেম খেলে যুক্তবরণ করেছে এরকম উদাহরণও আছে। কাজেই সবসময়েই যন্মে রাখতে হবে, আধুনিক প্রযুক্তি যাইই তালো নয়, পৃথিবীতে যেমন অনেক অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর প্রযুক্তি আছে, ঠিক সেরকম তালো প্রযুক্তির অপ্রয়োজনীয় কারণে সেটি আমাদের জীবনে অভিশাপ হয়ে দেখা দিতে পারে।



### অনুসন্ধান (২ পিরিয়ড)

যদে কর, তোমার কাজটির শিরোনাম:

“যেসব হেসেমেরে অতিরিক্ত কম্পিউটার ব্যবহার করে, তাদের স্বাস্থ্য সমস্যা: একটি অনুসন্ধান”।

তোমার গবেষণার উদ্দেশ্য হতে পারে:

১. অতিরিক্ত কম্পিউটার ব্যবহারের ফলে সৃষ্টি স্বাস্থ্য সমস্যা শনাক্তকরণ।
২. পেশাদার ও অপেশাদার কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি না তা জানা।
৩. এসব স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টির কারণ জানা।
৪. ব্যবহারকারীদের বয়স ও স্বাস্থ্য সমস্যার সাথে কোনো সম্পর্ক আছে কি না তা জানা।
৫. কী করে এসব স্বাস্থ্য সমস্যার প্রতিরোধ ও প্রতিকার করা যায় তা জানা।

এরপর তোমাকে এলাকা চিহ্নিত করতে হবে এবং তারপর কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের চিহ্নিত করতে হবে। কোনো কোনো সময় একই এলাকায় বেশি কম্পিউটার ব্যবহারকারী না-ও পেতে পার। তখন তোমাকে বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের খুঁজে বের করতে হবে এবং খুব বেশি ব্যবহারকারী থাকলে তাদের থেকে নমুনা নিতে হবে। এছল্য বশ্পুরা কাজ আগাঞ্চানি করে নিতে পার।

এরপর তোমাকে তোমার অনুসন্ধানের একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে। এ প্রতিবেদনে ধারণা:

১. প্রোগ্রাম
২. একটি ভূমিকা
৩. অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য
৪. অনুসন্ধানের নথুনা (অঞ্চল বা ব্যক্তি)
৫. অনুসন্ধানের তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি
৬. অনুসন্ধানের তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি
৭. অনুসন্ধানের কলাকল ও মন্তব্য এবং সুপারিশ

## অনুশীলনী



### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সকল লেটারার্সের অনলাইন কোনটি?
  - ক. ই-মেইল
  - খ. ইন্টারনেট
  - গ. মোবাইল
  - ঘ. টেলিফোন
২. কম্পিউটারের ক্ষেত্রে ধর্মোজ্য:
  - i. কম্পিউটার ভূল করে না, ভূল খনাস্ত করতে পারে
  - ii. কম্পিউটার নিজে ভূল সংশোধন করতে পারে
  - iii. কম্পিউটার অক্সিজন ও নির্ভুলভাবে কাজ করতে পারে

### নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের চিত্রগুলো থেকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



P



Q



R



S

৩. আবহাওয়ার সম্বাদ শুনতে কোনটি কার্যকর?

- ক. P
- খ. Q
- গ. R
- ঘ. S

৪. 'P' বজ্জটির অধিক ক্ষব্যাহো:

- i. মাধ্যমিক ও বমি বমি ভাব হতে পারে
- ii. খিলি ও উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে
- iii. ভালো শুন হতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii



### সূজনশীল প্রশ্ন

১. কারহান ও কারহাদ সময় পেলেই কলিউটার পেষ খেলে এবং টিকি দেখে। কারহান খুব কাছে বসে টিকি দেখে। ইন্দৌর কারহাদের আশুলে ব্যাখ্যা ও চোখ ঢালা পোড়া করে। যা কারহানকে কলিউটার চালাতে ও কাছাকাছি বসে টিকি দেখতে শিখেখ করলেন।

- ক. রফিল টেলিভিশনের মৌলিক রং করতি?
- খ. ডিজিটাল সংকেত বলতে কী বুঝার?
- গ. উচ্চীপকের প্রথম বজ্জটির মাত্রিক কৌণ্ডল বর্ণনা কর।
- ঘ. উচ্চীপকে উন্নিষিত কারহানের সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ কর।

২. নজরুল ইসলাম সবসময় ইন্টারনেটে কাজ করেন। একদিন ইন্টারনেটে বিদেশে একটি চাকরির বিজ্ঞপ্তি দেখে তিনি আবেদন করলে অপর প্রান্ত থেকে দরকারি কাগজপত্র, মূল সার্টিফিকেটের কপি পাঠাতে বলা হয়। তিনি কাগজপত্র স্ক্যান না করে বিশেষ প্রক্রিয়ায় কয়েক মিনিটের মধ্যে সেগুলো পাঠিয়ে দেন।

ক. হার্ডওয়্যার কী?

খ. অডিও সংকেত বলতে কী বুঝায়?

গ. নজরুল ইসলামের যোগাযোগের প্রথম মাধ্যমটির কার্যকারিতা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. নজরুল ইসলাম প্রয়োজনীয় কাগজপত্রগুলো ইন্টারনেটের পরিবর্তে বিশেষ প্রক্রিয়ায় কেন পাঠালেন? বিশ্লেষণ কর।

## চতুর্দশ অধ্যায়

# জীবন বাঁচাতে বিজ্ঞান



বেঁচে থাকার জন্য আমাদের দরকার সুস্থ, সবল এবং নীরোগ দেহ। স্বাভাবিকভাবেই আমরা সবসময় সুস্থ থাকতে পারি না। কখনো কখনো কোনো একটি রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ি। রোগ হলে দরকার ভালো চিকিৎসা আর ভালো চিকিৎসার জন্য সবার আগে দরকার সঠিকভাবে রোগ নির্ণয়। বর্তমান সময়ে চিকিৎসা ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের প্রয়োগে তৈরি হয়েছে রোগ নির্ণয়ের নতুন নতুন যত্নাপাতি। যার কারনে মানুষের বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা শনাক্তকরণে এবং সেগুলো নিরাময় আর প্রতিরোধে বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করাও অনেক সহজ হয়ে পড়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা বিজ্ঞান, বিশেষ করে পদাধিবিজ্ঞান ব্যবহার করে রোগ নির্ণয় আর চিকিৎসার নানা পদ্ধতির কথা আলোচনা করব।



### এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- টিকিংসাবিজ্ঞানের রোগ নির্ণয়ে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাত্রিতে বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও ধারণার ব্যবহার  
বর্ণনা করতে পারব।
- আধুনিক টেকনিক এবং যন্ত্রপাত্র ব্যবহারের ফলে সৃষ্টি স্মার্থ্য সমস্যা এবং প্রভিয়োথের কৌশল  
বর্ণনা করতে পারব।
- রোগ নির্ণয়ে বিজ্ঞানের অবদানকে প্রশংসন করতে পারব।

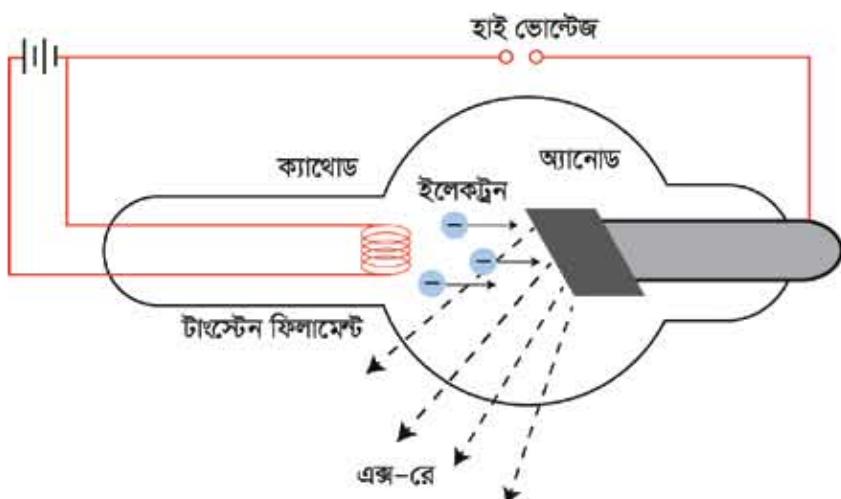
## ১৪.১ রোগ নির্ণয়ে ব্যবহৃত যজ্ঞপাতি

১৯৫০ সালে পৃথিবীর মানুষের গড় আয়ু ছিল ৫০ বছরের কাছাকাছি, বাট বছরে সেই আয়ু ২০ বছর থেকে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃথিবীর মানুষের জীবনধারণের মান উন্নত হওয়া, রোগ অভিযোগের ব্যবহার, স্বাস্থ্য সচেতন হওয়া এবং চিকিৎসার মান উন্নয়নের জন্য সারা পৃথিবীতে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে গেছে।

তোমরা নিচয়েই অনুমান করতে পারছ, মানুষের গড় আয়ু বেড়ে বাঁওয়ার পিছনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির একটা সক্ষর্ক আছে। আর চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির পিছনে রয়েছে আধুনিক যজ্ঞপাতি, সেগুলো দিয়ে অনেকে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। একটা সময় ছিল বখন চিকিৎসকরো রোগীর বাস্তিক বিভিন্ন লক্ষণ দেখেই রোগ নির্ণয় করতেন। শরীরের তখন অনেক কিছু অনুমান করতে হতো, সঠিকভাবে রোগ নিরূপণ করা যেত না। আধুনিক যজ্ঞপাতির কারণে শুধু বে অনেক নির্ধুতভাবে রোগ নিরূপণ করা যাচ্ছে তা নয়, অনেক কার্যকরভাবে চিকিৎসা করা সম্ভব হয়েছে।

### ১৪.১.১ এক্স-রে (X-Ray)

১৮৮৫ সালে উইলহেল্ম রন্টেজেন উচ্চশক্তিসম্পন্ন এক ধরনের রশ্মি আবিষ্কার করেন, যেটি শরীরের মাংসপেশি ভেদ করে পিয়ে ফটোগ্রাফিক প্লেটে ছবি তুলতে পারত। এই রশ্মির প্রকৃতি তখন জানা ছিল না বলে তার নাম দেওয়া হয়েছিল এক্স-রে। এখন আমরা জানি, এক্স-রে হচ্ছে আলোর মতোই বিদ্যুৎ



চিত্র ১৪.০১: এক্স-রে টিউবের কার্য পর্যাপ্তি

চৌম্বকীয় তরঙ্গ, তবে তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য আমাদের পরিচিত দৃশ্যমান আলো থেকে করেক হাজার গুণ ছোট। তাই তার শক্তি সাধারণ আলো থেকে করেক হাজারগুণ বেশি। যেহেতু তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনেক ছোট তাই আমরা খালি চোখে এক্স-রে দেখতে পাই না।

১৪.০১ চিত্রে কীভাবে এক্স-রে তৈরি হয়, সেটি দেখানো হয়েছে। একটি কাচের পোলকের দুই পাশে দুটি ইলেক্ট্রোড থাকে একটি ক্যাথোড অ্যানোড। ক্যাথোড টাইটেনের ভেতর দিয়ে বিস্তৃত প্রবাহ করে উৎপন্ন করা হয়। তাপের কারণে ফিলামেন্ট থেকে ইলেক্ট্রন মুক্ত হয় এবং অ্যানোডের ধনাত্মক ভোল্টেজের কারণে সেটি তার দিকে ছুটে যায়। ক্যাথোড এবং অ্যানোডের ভেতর ভোল্টেজ যত বেশি হবে, ইলেক্ট্রন তত বেশি গতিশীলতে অ্যানোডের দিকে ছুটে যাবে। এক্স-রে টিউবে এই ভোল্টেজ ১০০ হাজার ভোল্টেজ কাছাকাছি হতে পারে। ক্যাথোড থেকে প্রচন্ড শক্তিতে ছুটে আসা ইলেক্ট্রন অ্যানোডকে আঘাত করে। এই শক্তিশালী ইলেক্ট্রনের আঘাতে অ্যানোডের পরমাণুর ভেতর দিবের কক্ষপথের ইলেক্ট্রন কক্ষপথচ্ছত্র হয়। তখন বাইরের দিকে কক্ষপথের কোনো একটি ইলেক্ট্রন সেই জায়গাটা পূরণ করে। তখন যে শক্তিচূর্ণ উৎপন্ন হয়ে যায়, সেটি শক্তিশালী এক্স-রে হিসেবে বের হয়ে আসে। ঠিক কতো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এক্স-রে বের হবে সেটি নির্ভর করে আনোড হিসেবে কোন ধাতু ব্যবহার করা হবে তার উপর। সাধারণত তামাকে অ্যানোড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এক্স-রে অনেকভাবে ব্যবহার করা যায়, নিচে তার কয়েকটি ব্যবহারের তালিকা দেওয়া হলো।



চিত্র ১৪.০২: হাত এবং পায়ের এক্স-রে

১. স্থানচূর্ণ হাত, হাড়ে ফাটে, ভেঁজে যাওয়া হাড় ইত্যাদি খুব সহজে শনাক্ত করা যায় (চিত্র ১৪.০২)।
২. দাঁতের ক্যানিটি এবং অ্যান্যান্য ক্ষয় বের করার অন্ত এক্স-রে ব্যবহার করা হয়।
৩. পেটের এক্স-রে করে অঙ্গের প্রতিবন্ধকতা (Intestinal Obstruction) শনাক্ত করা যায়।
৪. এক্স-রে দিয়ে শিশুধলি ও কিডনি পাথরের অস্তিত্ব বের করা যায়।

৫. বুকের এক্স-রে করে ফুসফুসের গোগ বেগন বক্তা, নিউমোনিয়া ফুসফুসের ক্যালার নির্ণয় করা যায়।

৬. এটি ক্যালার কোষকে মেরে ফেলতে পারে, তাই রেডিওথেরাপিতে এক্স-রে চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হয়।

এক্স-রের অপ্রয়োজনীয় বিকিরণ যেন শরীরে কোনো ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য অ্যোজনীয় সতর্কতা

অবসরন করা হয়। এজন্য কোনো গ্রোগীর এজ-তে নেওয়ার সময় এজ-তে করা অংশটুকু ছাঢ়া বাকি শরীর সিংহ দিয়ে তৈরি এখন দিয়ে জেকে নিতে হয়। অঙ্গত প্রয়োজন না হলে পর্যবেক্ষণ মেরেদের পেট বা তলপেটের অংশটুকু এজ-তে করা হয় না।

## ১৪.১.২ আলট্রাসনোগ্রাফি (Ultrasonography)

আলট্রাসনোগ্রাফি দিয়ে শরীরের ভেতরের অঙ্গাঙ্গগুলি, মাস্কেলসি ইত্যাদির ছবি তোলা হয়, এটি করার জন্য খুব উচ্চ কম্পারকের শব্দ ব্যবহার করে তার প্রতিক্রিয়াকে ব্যবহার করা হয়। শব্দের কম্পাক্ষ ১-১০ মেগাহার্টজ হয়ে থাকে বলে একে আলট্রাসনোগ্রাফি বলা হয়ে থাকে। ১৪.০৩ ছিলো সাধারণ 2D এবং সাম্প্রতিক আবিস্কৃত 3D আলট্রাসনোগ্রাফি ছবি দেখানো হলো।

আলট্রাসনোগ্রাফি যেভে ট্রালডিউসার নামে একটি স্ফটিককে বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে উচ্চীশ্বত্ত করে উচ্চ কম্পাক্ষের আলট্রাসনিক তরঙ্গ উৎপন্ন করা হয়। আলট্রাসনিক যন্ত্রে এই তরঙ্গকে একটা সবু বিমে পরিপন্থ করা হয়। শরীরের ভেতরের যে অঙ্গটির প্রতিবিম্ব দেখার প্রয়োজন হয় ট্রালডিউসারটি শরীরে উপরে দেখানে স্বীকৃত করে যীমটিকে শরীরের ভেতরে প্রবেশ করানো হয়, গ্রোগী সে যেন কোনো ব্যথা বা অস্থির অনুভব করে না। যে অঙ্গের দিকে বিমটি নির্দেশ করা হয়, সেই অঙ্গের প্রকৃতি অনুমানী



চিত্র ১৪.০৩: সাধারণ 2-D এবং 3-D আলট্রাসনোগ্রাফি ছবি

প্রতিফলিত, শোষিত বা সংবাহিত হয়। যখন বিমটি মাস্কেলসি বা রক্তের বিজ্ঞিন ঘনত্বের বিজ্ঞেদত্তন আগতিত হয়, তখন তরঙ্গের একটি অংশ প্রতিক্রিয়া পুনরায় ট্রালডিউসারে কিরে আসে। এই প্রতিক্রিয়াকে বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তর করে সমষ্টি করে একটি পূর্ণাংশ প্রতিবিম্ব তৈরি করে।

আলট্রাসনোগ্রাফি নিচের কাজগুলো করার জন্য ব্যবহার করা হয়:

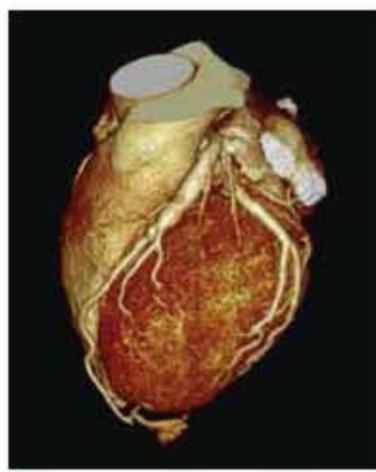
১. আলট্রাসনোগ্রাফির সবচেয়ে পুরুষপূর্ণ ব্যবহার জ্বারোগ এবং অসুস্থিরিজানে। এর সাহায্যে ড্রবের আকার পঠন, স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক অবস্থান জানা যায়, অসুস্থিরিজানে এটি একটি মূত্ত, নিরাপদ এবং নির্ভয়হোচ্য পদ্ধতি।

২. আলট্রাসনোগ্রাফি দিয়ে জরায়ুর টিউমার এবং অনান্ত পেসেডিক উপস্থিতিগু শনাক্ত করা যায়।
৩. পিনপাথর, হৃদযন্তের ঝুঁটি এবং টিউমার বের করার জন্যও আলট্রাসনোগ্রাম ব্যবহার করা হয়। হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করার জন্য যখন আলট্রাসার্টিড ব্যবহার করা হয়, তখন এই পরীক্ষাকে 'ইকোকার্ডিয়োগ্রাফি' বলে।
৪. এক্স-রের তুলনায় আলট্রাসনোগ্রাফি অনেক বেশি নিরাপদ, তবুও এটাকে ঢালাও আবে ব্যবহার না করে সীমিত সময়ের জন্য ব্যবহার করা হয় ট্রাঙ্কিউলারটি যেন কোনো নির্দিষ্ট স্থানে বেশি সময়ের জন্য একটানা বিষ না পাঠাব সেজন্য আলট্রাসার্টিড করার সময় ট্রাঙ্কিউলারটিকে ঝুঁটাচড়া করতে হয়।

### ১৪.১.৩ সিটি স্ক্যান (CT Scan)

সিটি স্ক্যান শব্দটি ইংরেজি Computed Tomography Scan— এর সংক্ষিপ্ত রূপ। টোমোগ্রাফি বলতে বোালো হয় ত্রিমাত্রিক বস্তুর একটি ফালির বা দিমাত্রিক অংশের প্রতিবিম্ব তৈরি করা। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই বজ্জে এক্স-রে ব্যবহার করা হয়। সাধারণ এক্স-রে করার সময় শরীরের ভেতরের একবাৰ ত্রিমাত্রিক অংশের ত্রিমাত্রিক একটা প্রতিচ্ছবি নেওয়া হয়। সিটি স্ক্যান যজ্ঞে একটি এক্স-রে টিউব রোগীর শরীরেকে বৃত্তাকারে শুরু এক্স-রে নির্গত করতে থাকে এবং অন্য পাশে ডিটেক্টর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করতে থাকে। প্রতিবিম্বটি স্পষ্ট করার জন্য অনেক সময় রোগীর শরীরে বিশেষ Contrast দ্বাৰা ইনজেকশন করা হয়।

বৃত্তাকারে চারপাশের এক্স-রে পোওয়াৰ পৱ কলিউটোৱ দিয়ে সেগুলো বিপ্রেৰণ করে সমষ্টি করা হয় এবং একটি পরিপূর্ণ ফালির (Slice) অভ্যন্তরীণ গঠন পাওয়া যায়। একটি ফালিৰ ছবি নেওয়াৰ পৱ সিটি স্ক্যান কৰার যত রোগীকে একটুখানি সামনে সরিয়ে পুনৰাবৃত্তাকারে চারদিক থেকে এক্স-রে প্রতিচ্ছবি গ্রহণ করে দেগুলো বিপ্রেৰণ করে বিতীয় আৱেকটি ফালিৰ অভ্যন্তরীণ গঠনটিৱ একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি তৈরি কৰে (চিত্ৰ ১৪.০৪)। একাবে রোগীকে একটুখানি একটু খানি কৰে সামনে এগিৱে নিয়ে তাৰ শরীরেৰ কোনো একটি অংশৰ অনেকগুলো ফালিৰ প্রতিচ্ছবি নেওয়া হয়। একটা স্লিস অনেকগুলো স্লাইস পৱপৰ সাজিৱে নিয়ে আমৰা বেৱকম পুৱো রুটিটি পেয়ে যাই, ঠিক সেৱকম শরীরেৰ কোনো অংশৰ অনেকগুলো স্লাইসেৰ ছবি একত্ৰ কৰে আমৰা রোগীৰ শরীরেৰ ভেতৱেৰ একটা ত্রিমাত্রিক প্রতিচ্ছবি তৈরি কৰে নিতে পাৰি। সিটিস্কানেৰ কাজেৰ পদ্ধতিটি দেখে তোমৰা নিশ্চয়ই অনুমান কৰতে পাৰছ এটি অভ্যন্ত বায়বছুল, জাটিল এবং একটি বিশাল যত্ন।



চিত্ৰ ১৪.০৪: হৃৎপিণ্ডেৰ সিটি স্ক্যান

যদ্যপি শরীরের ভেতরে না পিয়ে বাইরে খেকেই শরীরের ভেতরের অঙ্গসংস্থালোর নিখুঁত মিয়ামিক হৃবি তৈরি করতে পারে। এটি আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের খুব প্রয়োজনীয় একটি যত্ন (চিত্র ১৪.০৫) হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সিটিস্ক্যান করে নিচের কাজগুলো করা সহজ:

১. সিটিস্ক্যানের সাহায্যে শরীরের নরম টিস্যু, রক্তবাহী শিরা বা ধমনী, ফুসফুস, ব্রেন ইত্যাদির পূর্ণাঙ্গ ছবি পাওয়া যায়।

২. যকৃত, ফুসফুস এবং অক্ষর্ণের ক্যালার সন্তুষ্ট করার কাছে সিটিস্ক্যান ব্যবহার করা হয়।

৩. সিটিস্ক্যানের প্রতিবিম্ব টিউমারকে শনাক্ত করতে পারে। টিউমারের আকার ও অবস্থান সংশ্লিষ্ট বলতে পারে এবং টিউমারের আশপাশের টিস্যুকে কী পরিমাণ আক্রান্ত করেছে, সেটিও জানিয়ে দিতে পারে।

৪. মাথার সিটিস্ক্যানের সাহায্যে মণ্ডিকের ভেতর কোনো ধরনের রক্তপাত হয়েছে কীনা, ধমনী ফুলে গেছে কী না কিংবা কোনো টিউমার আছে কি না, সেটি বলে দেওয়া যায়।

৫. শরীরে রক্ত সঞ্চালনে সমস্যা আছে কিনা সেটিও সিটিস্ক্যান করে জানা যায়।

**সর্তকতা:** সিটিস্ক্যান করার জন্য যেহেতু এক্স-রে ব্যবহার করা হয়, তাই পর্তবর্তী নারীদের সিটিস্ক্যান করা হয় না। ছবির ফটোস্ট বাড়ানোর জন্যে যে “রং” ব্যবহার করা হয় সেটি কাঠো শরীরে এলার্জির জন্ম দিতে পারে বলে সেটি ব্যবহার করার আগে সর্তক থাকতে হয়।



চিত্র ১৪.০৫: সিটি স্ক্যান করার যত্ন

#### ১৪.১.৪ এমআরআই (MRI: Magnetic Resonance Imaging)

মানুষের শরীরের প্রায় সমস্তরাগ পানি, যার অর্ধ মানুষের শরীরের প্রায় সব অঙ্গসংস্থালো পানি থাকে। পানির প্রতিটি অনুভূত থাকে হাইড্রোজেল এবং হাইড্রোজেলের নিউক্লিয়াস হচ্ছে প্রোটন। শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র থেকে করলে প্রোটনগুলো চৌম্বকক্ষেত্রের দিকে সামিবল্প হয়ে যায়, তখন নির্দিষ্ট একটি কলানের বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ পাঠানো হলে এই প্রোটনগুলো সেই তরঙ্গ থেকে শক্তি প্রদত্ত করে তাদের নিক পরিবর্তন করে এবং এই প্রক্রিয়াটিকে বলে নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোনেল। পদার্থবিজ্ঞানের এই চমকপ্রদ অটনাটিক উপর ভিত্তি করে ম্যাগনেটিক রেজোনেল ইমেজিং বা এমআরআই তৈরি করা হয়েছে। (চিত্র ১৪.০৬)

এমআরআই যজ্ঞটি দেখতে সিটিস্ক্যান যন্ত্রের মতো কিন্তু এর কার্বনপালি সম্পূর্ণ ভিত্তি। সিটিস্ক্যান যন্ত্রে এক্স-রে পাঠিয়ে প্রতিচ্ছবি নেওয়া হয়, এমআরআই যজ্ঞে একজন শরীরের অনেক শক্তিশালী চৌম্বকফের রেখে তার শরীরে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সির বিস্তৃত চৌম্বকীয় তরঙ্গ দেওয়া হয়। শরীরের পানির অণুর ডেতরকার হাইড্রোজেনের প্রোটন থেকে ফিলে আসা সংকেতকে কল্পিতটাৰ দিয়ে বিশ্লেষণ করে শরীরের ডেতরকার অভ্যন্তর্যানের প্রতিবিম্ব তৈরি করা হয়।



চিত্র ১৪.০৬: এম আর আই করার যন্ত্র

সিটিস্ক্যান দিয়ে যা কিছু করা সম্ভব, এমআরআই দিয়েও সেগুলো করা সম্ভব। তবে এমআরআই দিয়ে শরীরের ডেতরকার কোমল টিস্যুর ডেতরকার পার্থক্যগুলো জালো করে বোঝা সম্ভব। সিটিস্ক্যান করতে পাঁচ থেকে দশ মিনিটের বেশি সময়ের দরকার হয় না, সেই তুলনায় এমআরআই করতে একটু বেশি সময় দেয়। সিটিস্ক্যানে এক্স-রে ব্যবহার করা হয় বলে যত কথই হোক ডেজক্সিয়াতার একটু ঝুঁকি থাকে এমআরআইয়ে সেই ঝুঁকি নেই।

শরীরের ডেতরে কোনো খাতব কিছু ধাকলে (যেমন: গেল যেকার) এমআরআই করা যায় না, কারণ আর এফ (RF) তরঙ্গ ধাতুকে উৎসৃত করে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।

### ১৪.১.৫ ইসিজি (ECG)

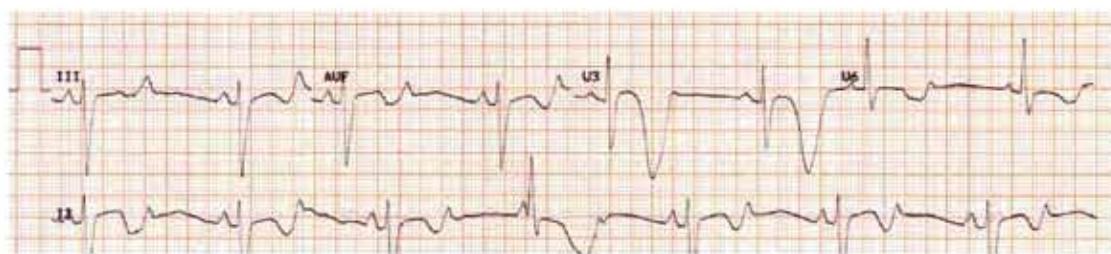
ইসিজি হলো ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম (Electro Cardiogram) শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। ইসিজি করে আনুষের হৃৎপিণ্ডের বৈদ্যুতিক এবং পেশিজনিত কাছকর্মগুলো পর্যবেক্ষণ করা যায়। আমরা জানি, বাইরের কোনো ডিস্পলে ছাঢ়াই হৃৎপিণ্ড ক্ষুভি বৈদ্যুতিক সংকেত তৈরি করে এবং এই সংকেত পেশির ডেতর ছাড়িয়ে পড়ে, যার কারণে হৃৎপিণ্ড হয়। ইসিজি যন্ত্র (চিত্র ১৪.০৭) ব্যবহার করে আমরা হৃৎপিণ্ডের এই বৈদ্যুতিক সংকেতগুলো শনাক্ত করতে পারি।

এর সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হার এবং হৃৎসময়স্থা পরিমাপ করা যায়। ইসিজি সংকেত হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রস্তাখাতের একটি পরোক্ষ প্রয়োগ দেয়।

ইসিজি করতে হলো বৈদ্যুতিক সংকেতগুলো ধ্রুণ করার অন্য শরীরে ইলেক্ট্রোড লাগাতে হয়। দুই হাতে দুটি, দুই পায়ে দুটি এবং ছয়টি হৃৎপিণ্ডের অক্ষধার-সংলগ্ন বুকের উপর লাগানো হয়। থেক্সেকটি ইলেক্ট্রোড থেকে বৈদ্যুতিক



চিত্র ১৪.০৭: ই সি জি মেশিন



চিত্র ১৪.০৮: ইসিজি মেশিন থেকে পাওয়া বৈদ্যুতিক সংকেত

সংকেতকে সংগ্রহ করা হয়। এই সংকেতগুলোকে যখন ছাপানো (চিত্র ১৪.০৮) হবে, তখন সেটিকে বলে ইলেক্ট্রোকার্ডিগ্রাম।

একজন সুস্থ মানুষের অভ্যন্তরীণ ইলেক্ট্রোড থেকে পাওয়া বৈদ্যুতিক সংকেতের একটা স্বাভাবিক লকশা থাকে। যদি কোনো মানুষের হৃৎপিণ্ডে অস্বাভাবিক অবস্থা তৈরি হয়, তখন তার ইলেক্ট্রোড থেকে পাওয়া সংকেতগুলো স্বাভাবিক লকশা থেকে ভিন্ন হবে।

সাধারণ কোনো রোগের কারণ হিসেবে বুকের খড়কড়ানি, অনিয়মিত কিংবা ছুত হৃৎস্পন্দন বা বুকে ব্যথা হলে ইসিজি করা হয়। এছাড়া নির্মিত চেক আপ করার জন্য কিংবা বড় অগ্রারেশনের আশে ইসিজির সাহায্য নেওয়া হয়।

হৃৎপিণ্ডের যেসব অস্বাভাবিক অবস্থা ইসিজি করা যায়, সেগুলো হচ্ছে:

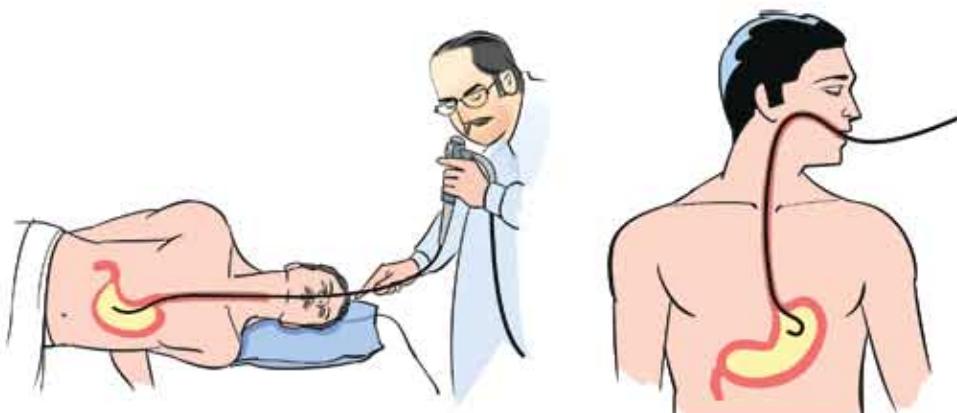
১. হৃৎপিণ্ডের যেসব অস্বাভাবিক স্পন্দন, অর্ধাং স্পন্দনের হার যেখি বা কম হলে
২. হার্ট এটাক হয়ে থাকলে
৩. হৃৎপিণ্ডের আকার বড় হয়ে থাকলে

ইসিজি মেশিনটি অত্যন্ত সহজ সরল মেশিন। এটি ব্যবহার করে শরীরের ভেতরকার হৃৎপিণ্ডের অবস্থার অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। একজন রোগীর চিকিৎসার জন্য এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়।

## ১৪.১.৬ এন্ডোস্কপি (Endoscopy)

চিকিৎসার কার্যপে শরীরের ভেতরের কোনো অংশ বা গহ্বরকে বাইরে থেকে সরাসরি দেখার প্রক্রিয়াটির নাম এন্ডোস্কপি। এন্ডোস্কপি যা দিয়ে শরীরের ফাঁপা অংশগুলোর ভেতরে পরীক্ষা করা যায় (চিত্র ১৪.০৯)।

এন্ডোস্কোপ বজ্জে দুটি স্বচ্ছ নল থাকে। একটি নল দিয়ে বাইরে থেকে রোগীর শরীরের নির্দিষ্ট অংশের ভেতরে তীব্র আলো ফেলা হয়। এটি করা হয় অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে, আলো এই ফাইবারে পূর্ণ অস্তিত্বাধীন প্রতিক্রিয়া মাধ্যমে প্রবেশ করে বলে নলটি সোজা থাকতে হবে না, আঁকাবাঁকা হতে পারে।



চিত্র ১৪.০৯: এডেসকপির মাধ্যমে পাকস্থলীর ভেতরে দেখার একিয়া

শরীরের শরীরের অতিবাহিত বা গ্রোগজ্বাহ জায়গাটি আলোকিত করার পর সেই এলাকার ছবিটি ছিটীয় স্বচ্ছ নলের ভেতর দিয়ে দেখা বাব। কোনো বস্তু দেখতে হলে সেটি সরল রেখায় থাকতে হয়। কিন্তু শরীরের ভেতরের কোনো অঙ্গের ভেতরে সরল রেখার তাকানো সহজ নয়। তাই ছবিটি দেখার জন্য অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করা হয় বেখালে আলো পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠলন হয়ে আঁকাবাঁকা পথে যেতে পারে। শরীরের অভ্যন্তরের একটি নির্দিষ্ট জায়গা সূক্ষ্মভাবে দেখার জন্য অভ্যন্ত সরু ৫ থেকে ১০ হাজার অপটিক্যাল ফাইবারের একটি বালিল ব্যবহার করা হয়। প্রজেক্টি ফাইবার একটি বিস্তুর প্রতিচ্ছবি নিয়ে আসে বলে সব মিলিয়ে অভ্যন্ত নির্ণৃত একটি ছবি দেখা সহজ হয়। অপটিক্যাল ফাইবার অভ্যন্ত সরু হয় বলে ৫ থেকে ১০ হাজার ফাইবারের বালিলটির প্রস্থচ্ছেদও করেক মিলিয়েটির থেকে বেশি হয় না।

বর্তমানে অভ্যন্ত ক্লিনিক ক্যামেরার প্রযুক্তির কারণে এডেসকপি যদের নলের মাথায় একটি ক্লিনিক ক্যামেরা বসিয়ে সেটি সরাসরি শরীরের ভেতরে ঢুকিয়ে ডিডিও সিগন্যাল দেখা সহজে হচ্ছে। এডেসকপি ব্যবহার করে ডাক্তারেরা যেকোনো ধরনের অস্বস্তিবোধ, ক্ষত, প্রদাহ এবং অস্বাভাবিক কোষ বৃদ্ধি পরীক্ষা করে থাকেন। বে অঙ্গগুলো পরীক্ষা করার জন্য এডেসকপি ব্যবহার করা হয় সেগুলো হচ্ছে-

১. ক্লুসক্লুস এবং বুকের কেল্লীয় বিভাগের অংশ
২. পাকস্থলী, ক্লুসার্স, বৃহদজ বা কোলন
৩. ঝী অঞ্জনেন অংশ
৪. উদর এবং পেনিসিস
৫. মূরানালির অভ্যন্তর ভাগ
৬. নাসা পাত্তুর, নাকের ঢারপাশের সাইনাস এবং কান

একটি করার সময় যেহেতু একটি নল সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেটি নিয়ে সেই ক্ষতিগ্রস্ত নল নিয়ে আসা সম্ভব এবং প্রয়োজনে এটা ব্যবহার করে কিছু কিছু সার্জারিও করা সম্ভব।

### ১৪.১.৭ অঙ্গিওগ্রাফি (Angiography)

অঙ্গ-রের মাধ্যমে শরীরের ক্ষতিগ্রস্ত নল দেখার জন্য অঙ্গিওগ্রাফি ব্যবহার করা হয়। সাধারণ অঙ্গ-রে করে ক্ষতিগ্রস্ত ভালোভাবে দেখা যাব না বলে অঙ্গিওগ্রাফি করার সময় ক্ষতিগ্রস্ত বিশেষ Contrast Material বা বৈসাদৃশ্য রঞ্জিন তরল (ডাই) ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ক্ষতিগ্রস্ত যে অংশটুকু পরীক্ষা করতে হবে ঠিক সেখানে রঞ্জিন তরল দেওয়ার জন্যে একটি সরু এবং নমনীয় নল কোনো একটি ধমনি দিয়ে শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এই সরু এবং নমনীয় নলটিকে বলে ক্যাথিটার। ক্যাথিটার দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত নিসিটি জায়গায় ডাই দেওয়ার পর সেই এলাকার অঙ্গ-রে নেওয়া হয়। ডাই থাকার কারণে অঙ্গ-রে ক্ষতিগ্রস্ত নলকে স্পষ্ট দেখা যায় (চিত্র ১৪.১০)। ডাই পরে কিডনির সাহায্যে হেকে আলাদা করা হয় এবং হাতাবের সাথে শরীর থেকে বের হয়ে যায়।

সাধারণত যেসব সমস্যা পরীক্ষা করার জন্য ডাঙ্কারের অঙ্গিওগ্রাফি করার পরামর্শ দেন, সেগুলো হচ্ছে:



চিত্র ১৪.১০: উপরের ছবিতে ক্ষতিগ্রস্ত নলের অঙ্গিওগ্রাফিতে ধমনিতে ঢুকেজ দেখা যাচ্ছে এবং নামের ছবিতে অঙ্গিওগ্রাফি করার পর স্থানান্তর রক্ত

#### ১. হৃৎপিণ্ডের বাইরের ধমনিতে ঢুকেজ হলে।

হলে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্লক হলে ক্ষেত্রের স্থানান্তর থেকার পারে না, হৃৎপিণ্ডে যথেষ্ট ক্ষেত্র সরবরাহ করা না হলে সেটি ঠিকভাবে কাজ করতে পারে না এবং হার্ট এটাকের আশঙ্কা বেঙ্গে যায়।

#### ২. ধমনি থসারিত হলে

#### ৩. কিডনির ধমনির অক্ষণাগুলো বোঝার জন্য

#### ৪. শিরার কোনো সমস্যা হলে।

সিস্টিম্যান কিংবা এমআরআই করার সময় সকল পরীক্ষাগুলো শরীরের বাইরে থেকে করা হয়। অঙ্গিওগ্রাফি করার সময় একটি ক্যাথিটার শরীরের প্রত্যন্তের ক্ষতিগ্রস্ত নলে ঢোকানো হয় বলে কোনো

রকম সার্জারি না করেই ডাঁকনগুলি ত্রুটের চিকিৎসা করা সম্ভব। যে প্রক্রিয়ায় এনজিওগ্লাম করার সময় ধমনির ত্রুট করা হয়, তাকে এনজিওগ্লাস্টি বলা হয়। এনজিওগ্লাস্টি করার সময় ক্যাথিটার দিয়ে ছোট একটি বেশুন পাঠিয়ে সেটি সুলিঙ্গে রক্তনালিকে প্রসারিত করে দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে যেখানে একটি রিং (ring) প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয় যেন সংকুচিত ধমনিটি প্রসারিত থাকে এবং আঙোজনীয় রক্তের প্রবাহ হতে পারে।

## ১৪.২ রোগ নিরাময়ে বিজ্ঞান (Science in Treatment)

### ১৪.২.১ রেডিও থেরাপি (Radio Therapy)

রেডিও থেরাপি শব্দটি ইংরেজি Radiation Therapy শব্দটির সংক্ষিপ্তরূপ। রেডিওথেরাপি হচ্ছে কোলো রোগের চিকিৎসায় তেজস্বিয় বিকিরণের ব্যবহার। এটি মূলত ক্যালার রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। রেডিওথেরাপিতে সাধারণত উচ্চক্ষমতার একটি ব্যবহার করে ক্যালার কোষকে খাস করা হয়। এই এক্স-রে করে ক্যালার কোষের জ্ঞেতরকার ডিএনএ (DNA) খাস করে কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি করার ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। একটি টিউমারকে সার্জারি করার আগে ছোট করে নেওয়ার জন্য কিংবা সার্জারির পর টিউমারের অবশিষ্ট অংশ খাস করার জন্যও রেডিওথেরাপি করা হয়।

বাইরে থেকে রেডিওথেরাপি দিয়ে চিকিৎসা করার জন্যে সাধারণত একটি লিনিয়ার এক্সেলেটর ব্যবহার করে উচ্চক্ষমতার এক্স-রে তৈরি করা হয়। শরীরে যেখানে টিউমারটি থাকে সেদিকে তাক করে তেজস্বিয় বিমটি (চিত্র ১৪.১১) পাঠানো হয়। বিমটি তখন শুধু ক্যালার কোষকে খাস করে দেয় না, তার বিভাজন ক্ষমতাও নষ্ট করে দেয়। বিমটি শুধু ক্যালার আক্রান্ত জ্বরগুলি পাঠানো সম্ভব হয় না বলে আপসাপের কিছু সুস্থ কোষও খাস হয়। রেডিওথেরাপি বশ্য হওয়ার পর সুস্থ কোষগুলো আবার সঞ্চয় হয়ে উঠতে শুরু করে।

### ১৪.২.২ কেমোথেরাপি (Chemotherapy)

ক্যালারে শরীরের কিছু কোষ বিভাজনের গতি অস্থান্তরিকভাবে বেড়ে যায়। কেমোথেরাপি হলো এমন এক ধরনের চিকিৎসা, যেখানে বিশেষ



চিত্র ১৪.১১: রেডিও থেরাপি যন্ত্র

ধরনের রাসায়নিক ঔষধ ব্যবহার করে শরীরের জন্য ক্ষতিকর দ্রুত বিভাজনরত ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করা হয়। এটি ক্যান্সার চিকিৎসায় একটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি।

**কার্যপ্রণালি :** প্রতিটি জীবদেহ কোষ দ্বারা গঠিত। এই কোষ বৃদ্ধি পায় বা বিভাজিত হয়। জীবদেহের এই কোষ বিভাজনের ওপর ভিত্তি করে কেমোথেরাপি গঠিত হয়েছে। কেমোথেরাপিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক ঔষধ কোষ বিভাজনের নির্দিষ্ট ধাপে প্রয়োগ করা হয়। কোষ বিভাজনের কোন ধাপে কী প্রয়োগ করা হবে তার ওপর নির্ভর করে রাসায়নিক ঔষধগুলো ঠিক করা হয়। এটি একটি নির্দিষ্ট সময় জুড়ে থাকে। যেমন: প্রতিদিনে ১ বার, সপ্তাহে ১ বার বা মাসে ১ বার প্রভৃতি। সাধারণত এভাবে প্রায় ৬ বার ঔষধ প্রয়োগ করা হয়।

**কেমোথেরাপির ঝুঁকি বা পাশ্চাত্যিয়া—প্রতিক্রিয়া:** কেমোথেরাপির বিশেষ ঔষধ ক্যান্সার আক্রান্ত কোষ ছাড়াও সংশ্লিষ্ট অন্য কোষও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এতে নিম্নোক্ত ঝুঁকি থাকতে পারে:

১. চুল পড়ে যাওয়া

২. হাতের তালু, পায়ের তালু প্রভৃতি অঙ্গের চামড়া পুড়ে যাওয়া

৩. হজমে সমস্যা হওয়া এবং এর কারণে ডায়ারিয়া, পানিশূল্যতা, বমি প্রভৃতি সমস্যা হওয়া

৪. লোহিত রক্ত কণিকা, শ্বেতরক্ত কণিকা ও অণুচক্রিকা উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হওয়া।

কেমোথেরাপির ঝুঁকি এড়াবার কিছু কৌশল এরকম:

১. শরীরের তাপমাত্রার দিকে লক্ষ রাখা।

২. তরল বা নরম খাবার খাওয়া।

৩. কেমোথেরাপি গ্রহণকৃত রোগীর বর্জ্য, যেমন মলমূত্র, বমি ইত্যাদি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে জীবাণুনাশক নিয়ে পরিষ্কার করে ফেলা।

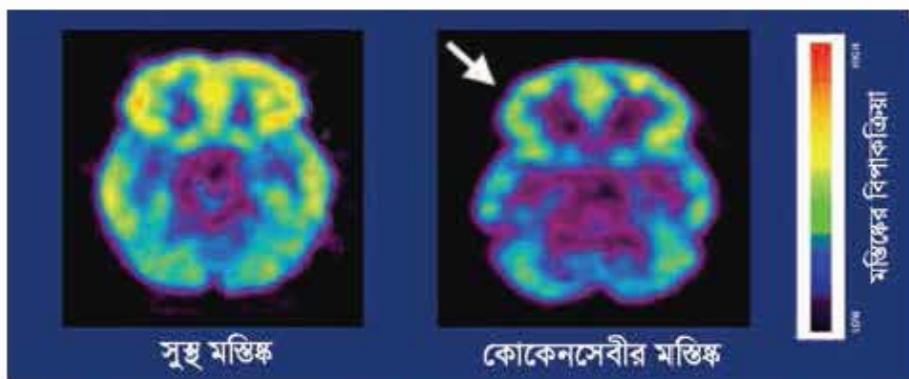
৪. বর্জ্য পরিষ্কার করার সময় খালি হাত ব্যবহার না করে গ্লাভস বা কমপক্ষে প্লাস্টিকের ব্যাগে হাত ভালভাবে মুড়িয়ে পরিষ্কার করা।

৫. শরীরের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঠিক রাখার জন্য সার্বক্ষণিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলা ও যোগাযোগ রাখা।

### ১৪.২.৩ আইসোটোপ এবং এর ব্যবহার (Isotopes and its Uses)

মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসে নিউট্রনের সংখ্যা ভিন্ন হলে তাকে সেই মৌলিক পদার্থের আইসোটপ বলে।

প্রকৃতিতে অনেক মৌলের বিভিন্ন আইসোটপকে স্বাভাবিকভাবে তেজস্ক্রিয় হিসেবে পাওয়া যায়, আবার নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া করে তেজস্ক্রিয় আইসোটপ বানানো সম্ভব। চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই এই



চিত্র ১৮.১২: PET scan দিয়ে সেখা স্বাভাবিক এবং কোকেন মাসকাস্ট মানুষের মন্তিকের ক্রিয়াশীল অংশের হ্রাস

তেজস্বিক আইসোটপ ব্যবহার করা হয়। এই আইসোটোপগুলো রোগ নির্ণয় করার জন্য সেরকম ব্যবহার করা যায়, ঠিক সেরকম রোগ নিরাময়ের জন্যও ব্যবহার করা যায়।

শরীরের কোনো কোনো অংশে মাঝে মাঝে আলাদাভাবে বিশেষ কোনো বৌলিক পদার্থ মুক্ত হয়। সেই বৌলিক পদার্থের পরিমাণ দেখে অভিযোগ করা সম্ভব নয় কারণ পদার্থের পরিমাণ বোধার জন্য বৌলিক কোনো একটি পরমাণুকে তেজস্বিক আইসোটপ দিয়ে পাল্টে দেওয়া হয় এবং সেই তেজস্বিক আইসোটপের বিকিরণ থেকে নির্দিষ্ট অংশে যৌগের পরিমাণ বোধ করা যায়। সাধারণত আইসোটপটি গামা-রে বিকিরণ করে এবং গামা-রে থেকেই এই গামা-রে শনাক্ত করা যায়।

**সত্ত্বত:** তেজস্বিক আইসোটপ ব্যবহারের একটি চমকপ্রদ উদাহরণ PET বা Positron Emission Tomography যেখানে তেজস্বিক আইসোটপটি পজিট্রন বিকিরণ করে। তোমরা জান, পজিট্রন ইলেক্ট্রনের অতিপদাৰ্থ (Anti Particle) এবং এটি ইলেক্ট্রনের সাথে মুক্ত হয়ে শক্তিতে মুগাদুর হয়। এই শক্তি দুটি গামা-রে হিসেবে বিপরীত দিকে বের হয়ে আসে। কাজেই বিপরীত দিকে দুটি নির্দিষ্ট শক্তির গামা-রে শনাক্ত করে পজিট্রনটি কোথা থেকে বের হয়েছে, সেটি বের করে নেওয়া যাব। সেই তথ্য থেকে আমরা শুধু যে পজিট্রন তৈরির অস্তিত্ব জানতে পারি তা নয়, সেটি ঠিক কোথায় কতটুকু আছে, সেটাও বলে দিতে পারি। হ্রুকোজের ডেডুর পজিট্রন বিকিরণ করে সেরকম একটি আইসোটপ মুক্ত করে দিলে PET ব্যবহার করে আমরা মন্তিকের কোথার কতটুকু জ্বরা হয়েছে, সেটি বের করতে পারব। এই তথ্য থেকে কোন সময় মন্তিকের কোন অংশ বেশি ক্রিয়াশীল (চিত্র ১৮.১২) এবং বেশি হ্রুকোজ ব্যবহার করেছে, সেই তথ্যও বের করা সম্ভব। PET প্রযুক্তি মানুষের মন্তিকের কর্মপদ্ধতি বের করার ব্যাপারে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছে।

তেজস্বিক আইসোটপ ব্যবহার করে শুধু যে রোগ নির্ণয় বা অঙ্গশংক্রান্ত কর্মপদ্ধতি বের করা হয়, তা নয়, এটি দিয়ে রোগ নিরাময় করা হয়।  $^{18}F$  একটি গামা-রে বিকিরণকারী আইসোটপ, এই আইসোটপ ব্যবহার করে গামা রে ক্যান্সার আক্রান্ত কোষকে খালস করা হয়।  $^{131}I$  (আয়োডিন)-কে থাইরয়োডের

চিকিৎসার ব্যবহার করা হয়। থাইরয়োডের চিকিৎসার এটি একই কার্যকর, বা আজকাল থাইরয়োডের সার্জিরির প্রয়োজন হয় না।

এছাড়াও লিঙ্গকেমিয়া নামে জনপ্রিয় ক্যালারের চিকিৎসার ডেজন্সিস ফসফরাস আইসোট্রোপ ৩২P যুক্ত ক্ষসফেট ব্যবহার করা হয়।

## অনুশীলনী



### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক্যালারের চিকিৎসার কোনটি ব্যবহার করা হয়?
  - (ক) এমআরআই
  - (খ) কেমোথেরাপি
  - (গ) এনজিওথাফি
  - (ঘ) আলট্রাসনোগ্রাফি

২. এতোক্ষণ্টে শারীর করা হয়
  - i. আলোর প্রতিসরণ
  - ii. বৈদ্যুতিক তরঙ্গের প্রতিসরণ
  - iii. আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) ii      (খ) iii      (গ) i ও ii      (ঘ) i ও iii

নিচের অনুজ্ঞাদ্বারা পঢ় এবং ও ও নং উক্তের উত্তর দাও:

রক্তিক সাহেব বুকে ব্যথা অনুভব করলে তিনি একটি পরীক্ষা করালেন। এই পরীক্ষা করার সময় রক্তিক সাহেবের রক্তনালিকা দিয়ে এক খরনের বিশেষ ভরণ পদার্থ প্রবেশ করানো হয়।

৩. রক্তিক সাহেব কোন পরীক্ষাটি করালেন?
  - (ক) এজোকেপি
  - (খ) এনজিওথাফি
  - (গ) কেমোথেরাপি
  - (ঘ) রেডিওথেরাপি

৪. রক্তিক সাহেবের রক্ত নালিকায় প্রবেশ করানো পদার্থটি কী?

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| (ক) 'ডাই' নামক তরল | (খ) তরল অক্সিজেন |
| (গ) অলিবডেনাম      | (ঘ) টাংস্টেন     |



### সূজনশীল প্রশ্ন

১. রহমান সাহেব দীর্ঘদিন ধরে পেটের ব্যাথ ছুটছেন। এ সমস্যার জন্য ডাক্তারের শরণার্থী হলে ভাস্তার ভাকে এতোক্ষেপি করতে বললেন। অন্যদিকে রহমান সাহেবের হেলে সুমন হাঁটাঁসি করতে পচে দিয়ে হাতে আঘাত পায় এবং হাত জেঁকে থায়। পরবর্তীসময়ে ডাক্তারের কাছে পেলে ভাস্তার এত্তে-রে করার পরামর্শ দেন।

- (ক) MRI-এর পূর্ণরূপ লিখ।
- (খ) রেডিওফেরাপি বলতে কী বুঝায়?
- (গ) ভাস্তার সুমনকে এত্তে-রে করার পরামর্শ দিলেন কেন?
- (ঘ) রহমান সাহেবের গোপ নির্ণয়ে এতোক্ষেপি কভাটকু কার্যকর? মতামত দাও।

২. রশিদ সাহেব অফিস থেকে বাসায় ফিরছিলেন। হাঁটাঁ গাঢ়িটি দুর্ঘটনায় পড়লে তিনি যাথার আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে থান। সহকর্মীরা ভাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে পেলে ভাস্তার ভাকে সিটি স্প্যান করতে বললেন। কিছুদিন পর রশিদ সাহেবের ভাই বুকে থচত ব্যাখ্যা অনুভব করলেন। পরবর্তীসময়ে ডাক্তারের কাছে পেলে তিনি ECG করার পরামর্শ দিলেন।

- (ক) এনজিওথাকি কী?
- (খ) আলট্রাসনোগ্রাফি বলতে কী বুঝার?
- (গ) রশিদ সাহেবকে ডাক্তার সিটি স্প্যান করতে বললেন কেন?
- (ঘ) রশিদ সাহেবের ভাইয়ের চিকিৎসায় ECG-এর সূমিকা বিশ্লেষণ কর।

# ২০২০

## শিক্ষাবর্ষ

### ৯ম-১০ম বিজ্ঞান

‘দেশ তোমাকে কী দিতে পারবে সেটা জিজ্ঞেস করো না,  
বরং নিজেকে জিজ্ঞেস করো তুমি দেশকে কী  
দিতে পারবে।’ –জন এফ কেনেডি

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন কর  
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য ‘ওগু’ কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে  
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘট্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য